সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৫ ॥ সংখ্যা ১

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা। বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা

পরিষদের সদস্য-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৫ ॥ সংখ্যা ২

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা। বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা

পরিষদের সদস্য-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৫ ॥ সংখ্যা ৩

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৫ ॥ সংখ্যা ৪

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা। বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

পরিষদের সদস্য-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পঞ্চষষ্টিতম বর্ষ ॥ বার্ষিক সূচীপত্র

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৬৫

রজনীকান্ত সেনের কাব্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

অদৃষ্টবিধাতা কোনো কোনো স্বনির্ব্বাচিত পুরুষের জন্য স্বহস্তে গৌরবের মুকুট প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সে মুকুটের উপাদান বেদনার স্বর্ণ ও অশ্রুর মুক্তা। চর্ম্মচক্ষের অভিজ্ঞতায় মনে হয় যে সেই দুরূহ সৌভাগ্যের ভারে হতভাগ্যের সমস্ত জীবন ও যাবতীয় আশাভরসা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তখন বিধাতা যে কী আত্মপ্রসাদ লাভ করেন কে বলিবে। তবে কখনো কখনো বিধাতার মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির চোখে এ হেন দৃশ্য পড়িলে তিনি প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন, তিনি দেখেন যে বিধাতাপুরুষ মানবাত্মার মহত্বের যাচাই করিয়া লইতেছেন, দেহ ও আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মার জয় দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিতেছে না।

ক্যানসার-রোগাক্রান্ত নিশ্চিতমৃত্যু রজনীকান্তকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহা বিধাতার মর্ম্মগ্রাহিতায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার

মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য।...

"আপনি যে গানটি ['আমায় সকল রকমে,...] পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্তই তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের পত্র নিশ্চিতমৃত্যুপথযাত্রীকে বৃথা সান্ত্বনা দান নয়, রুগ্ন কবি সম্বন্ধে অবধারিত সত্য। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কবি যে প্রফুল্লতা, ধীরতা ও শান্তি দেখাইয়াছেন তাহা ভগবানে গভীর বিশ্বাস ব্যতীত সম্ভব নয়। জীবনের আর সব সম্বল যখন ফুরাইয়া যায়, তখন ঐটুকুই হাতে থাকে, যাহার হাতে থাকে সত্যই সে পরম সৌভাগ্যবান্। মৃত্যুশয্যায় শয়ান স্যার ওয়াল্টার স্কট জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—বৎস, এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে পবিত্র জীবনের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুতেই সান্ত্বনা পাইবে না। 'সকল রকমে কাঙাল' রজনীকান্তও শেষ শয্যায় উপনীত হইয়া একমাত্র পবিত্র জীবনের স্মৃতির উপরে নির্ভর করিয়াই ধীরতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে-সময় হাসপাতালে তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের মতো মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করিয়াছেন। কান্তকবি স্বদেশী গানের কবি, হাসির গানের কবি, আবার ভক্তি-সঙ্গীতের কবি। কিন্তু জীবনের দুর্ব্বহ শেষ কটি মাস প্রমাণ করিয়া দিল তাঁহার যথার্থ শক্তি কোথায়। ঐ ভক্তির মূল অস্তিত্বের গভীরে নিহিত ছিল বলিয়াই কবিকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, তুলনায় সামান্য আঘাতে অনেক অন্তঃসারশূন্য মহীরুহ ভাঙিয়া পড়ে। দুর্ব্বহ অন্তিম এই কয়টি মাসকেই তাঁহার জীবনের অক্ষয় কিরীট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কী প্রয়োজন ছিল এই কণ্টক-মুকুটের? বিধাতা বোধ করি মাঝে মাঝে নিজের সৃষ্টির শক্তি যাচাই করিয়া দেখেন।

২

"পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ী গ্রামে সম্রান্ত বৈদ্য-বংশে ১৮৬৫ সনের ২৬শে জুলাই (১২৭২, ১২ই শ্রাবণ) বুধবার রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গুরুপ্রসাদ সেন তখন কাটোয়ার মুনসেফ।"

রজনীকান্ত মূলতঃ পাবনার অধিবাসী হইলেও রাজসাহীর লোক বলিয়াই পরিচিত

ছিলেন, তিনি নিজেও সেইরূপ মনে করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীর খ্যাতনামা উকীল ছিলেন, সেই সূত্রে রাজসাহী তাঁহার আপন স্থান হইয়া উঠিল। কালক্রমে তিনি রাজসাহীর প্রধান অলঙ্কারে পরিণত হইলেন।

রজনীকান্ত প্রভূত মেধার অধিকারী হওয়া সত্বেও স্কুল-কলেজের পাঠে কখনো মনোযোগী ছিলেন না—তাই পরীক্ষাগুলি কোনোরকমে পাশ করিয়া রাজসাহী শহরে ওকালতী ব্যবসা সুরু করিলেন।*

ওকালতী আরম্ভ হইল সেই সঙ্গে আরম্ভ হইল প্রবল সাহিত্য সাধনা। একটা পেশা, অন্যটা নেশা। নেশার কাছে পেশা পারিবে কেন? এই বিসদৃশ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে লিখিতেছেন—

"কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

মধুসূদনও এই রকমটি লিখিলে লিখিত পারিতেন। ওকালতীর সাহারায় সাহিত্য ও সঙ্গীতের উৎস অবলম্বন করিয়া তিনি দিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যরসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনিও রজনীকান্তের মতো অন্য জেলার লোক হইয়াও রাজসাহীর অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। অক্ষয়কুমার পেশায় উকীল, নেশায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্, তার উপরে সাহিত্যিক। তাঁহার কাছে উৎসাহ ও প্রশ্রয় পাইয়া রজনীকান্ত সাফল্যের পথে চলিলেন। এই রাজসাহী শহরেই আর দুইজন ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, যাঁহাদের প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও জলধর সেন।

রাজসাহীতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসিবার সঙ্গেই রজনীকান্ত রাজসাহী শহরের 'উৎসবরাজে' পরিণত হইলেন। সাহিত্যসভা, গানের মজলিশ, লাইব্রেরি, সাহিত্য-সম্মিলন, সর্ব্বত্র রজনীকান্তকে চাই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদায় বা সম্বর্দ্ধনা-সভায় গান লিখিয়া দিতে রজনীকান্তকে চাই।

"এক রবিবারে রাজসাহীর লাইব্রেরিতে কিসের জন্য যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময়ে অক্ষয়ের (মৈত্র) বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম; সে গান গাহিতেই পারে।

* ১৮৮৩	এণ্ট্রান্স, তৃতীয় বিভাগ	কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল, ১৭ বৎসর বয়স
১৮৮৫	এফ. এ. দ্বিতীয় বিভাগ	রাজসাহী কলেজ
১৮৮৯	বি. এ.	সিটি কলেজ
১৮৯১	বি. এল. দ্বিতীয় বিভাগ	সিটি কলেজ

আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি আর গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক্। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্ব্বজন-পরিচিত—

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা।"

—জলধর সেন

অকালে অকস্মাৎ যে-কোনো উপলক্ষ্যে গান বাঁধিয়া দিতে ও গান গাহিয়া আসর মাত করিতে রজনীকান্তকে চাই। ক্রমে তিনি রাজসাহীর আনন্দ, উৎসাহ, প্রাণ হইয়া উঠিলেন। এমন লোককে 'উৎসবরাজ' বলিয়া বোধ করি অন্যায় করি নাই।

এইভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ওকালতীর নেশায় পেশায় যখন তাঁহার জীবন চলিতেছিল এমন সময়ে ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁহার গলায় ক্যানসার রোগ দেখা দিল। এবারে শুরু হইল তাঁহার জীবনমরণের দ্বন্দ্ব, আরম্ভ হইল দুরূহ সৌভাগ্যের মুকুট-ধারণের পালা।

জীবনের শেষ কয় মাস মেডিকেল কলেজে কাটাইয়া দীর্ঘ দেড় বৎসর রোগভোগের পরে ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রজনীকান্ত সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন।

মেডিকেল কলেজে বাসকালে দেশের ছোট বড় অসংখ্য লোকের যে স্নেহ-করুণা তাঁহার উপরে বর্ষিত হইয়াছিল তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে কান্তকবির রচনা দেশের মনকে ব্যাপকভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি যে লিখিয়াছিলেন—

'ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ
আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ'

তাহা আদৌ অলীক বা অত্যুক্তি নয়। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি ভূস্বামীগণ, মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী, সমব্যবসায়ী ও বন্ধুগণ, মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীগণ সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মৃত্যুপথযাত্রীর পথ সুগম ও দুশ্চিন্তা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এ সহৃদয়তা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই অবসিত হয় নাই। প্রথমোক্ত দুই মহানুভব ব্যক্তির বদান্যতা স্বর্গত কবির অনাথ পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীর কলহ সর্ব্বথা সত্য নয়।

৩

রজনীকান্তের সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী নহে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনখানি এবং মৃত্যুর পরে পাঁচখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।*

তাঁহার সমস্ত রচনাই পদ্যে, তাহার অধিকাংশই আবার গীত। গীত বা গীতিকবিতাকেই তাঁহার প্রতিভার প্রধান বাহন বলা যাইতে পারে।

তাঁহার রচিত গানগুলি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর, ভক্তিমূলক, স্বদেশী গান ও হাসির গান। অমৃত ও সদ্ভাব-কুসুম গান নয়, নীতিকবিতা, কবির স্বীকৃতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথের কণিকার আদর্শে রচিত।

লেখকের বহুবিধ প্রবণতার মধ্যে মুখ্য ও গৌণে প্রভেদ করা সমালোচকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। গোড়াতে এই ভাগটা করিয়া লইলে পরিণামে অনেক ভুল বোঝার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণ হিসাব করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভক্তিমূলক গানেই কবির প্রতিভার প্রকৃষ্টতম প্রকাশ, ইহাই তাঁহার মুখ্য প্রবণতা। স্বদেশী গান, হাসির গান ও নীতিকবিতা তুলনায় গৌণ। গৌণের বিচার আগে সারিয়া লওয়া যাইতে পারে, স্বভাবতঃই তাহা সংক্ষিপ্ত হইবে।

রাজসাহীতে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত পরিচয় রজনীকান্তকে হাসির গান রচনায় প্রেরণা দেয়, স্পষ্টতঃ এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তাঁহার আদর্শ। সাহিত্যে হাসির সীমানা কালে কালে ও দেশে দেশে বদল হইয়া থাকে। এক দেশ যে বিষয়কে হাস্যকর মনে করে অন্য দেশ তাহা না করিতেও পারে, এক যুগ যে বিষয়কে হাস্যকর মনে করে অন্য যুগ তাহা না করিতেও পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের জৌলুষ এক সময়ে যেমন ছিল এখন আর তেমন নাই। যুগাত্যয়ে রুচির বদল হইয়াছে, সে যুগের তুলনায় বর্ত্তমান কাল কিছু গম্ভীর ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িয়াছে—সাহিত্যে হাসি এখন সম্পূর্ণ taboo না হইলেও তাহার স্থান এখন সঙ্কীর্ণ। রজনীকান্তের হাসির গান সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত কাহারও হাসির গান এখন বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে পুনরায় যুগাত্যয়ে

* ১. বাণী (কাব্য)। ১৯০২
২. কল্যাণী (কাব্য)। ১৯০৫
৩. অমৃত (নীতিকবিতা)। ১৯১০
মৃত্যুর পরে প্রকাশিত
৪ আনন্দময়ী (আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীত)। ১৯১০
৫. বিশ্রাম (কাব্য)। ১৯১০
৬. অভয়া (কাব্য)। ১৯১০
৭. সদ্ভাব-কুসুম (নীতিকবিতা)। ১৯১৩
৮. শেষ দান (কাব্য)। ১৯২৭

যে হাসির গানের আদর বাড়িবে না এমন বলা যায় না। তবে দুজনের হাসির গানের মধ্যে তুলনা করিলে বলা চলে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অধিক হইলেও উৎকর্ষে রজনীকান্তের হাসির গান ন্যূন নহে। তাঁহার হাসির গান মূলে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত ও প্রেরণাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এক জায়গায় রজনীকান্তের জিত—তাঁহার হাসিতে করুণায় যেমন মাখামাখি দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পূবে বাতাস।

৪

স্বদেশী যুগে স্বদেশী গান লেখেন নাই এমন বাঙালী কবি বোধ হয় ছিলেন না। রজনীকান্তও লিখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রবল প্রভাবটা সেই যুগের হাওয়ার, তার পরেই রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের। রজনীকান্তের স্বদেশী গানে অগ্রজ কবিদ্বয়ের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সর্ব্বত্র লিরিক্যাল, গানের সীমানা ত্যাগ করিয়া বক্তৃতার সীমানায় কখনও পদার্পণ করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান প্রায় সর্ব্বত্র oratorical, তাহা যেন গানে বক্তৃতা। এগুলির তৎকালীন জনপ্রিয়তার মূল এখানে, বক্তৃতার প্রেরণা যেমন সহজ, গানের প্রেরণা তেমন নয়। আবার এগুলির বর্ত্তমান অনাদরের মূলও এখানে, বক্তৃতা যত শীঘ্র পুরাতন হয় গান তেমন হয় না। এখন রজনীকান্তের স্বদেশী গানে এ দুটি গুণই দেখিতে পাওয়া যায়।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই—

এ রচনার ছাঁচ লিরিক্যাল, সুরে গীত না হইলেও এ গান।

আবার—

রাম-যুধিষ্টির ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন ভীম শরাসন টঙ্কৃত,
বীর প্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।

এ রচনা "মিশ্র পরোজ-কাওয়ালী" রাগিণীতে গীত হইলেও লিরিক নয়, বক্তৃতা।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের আদর যে কমিয়াছে, স্বদেশী যুগের অবসান তাহার কারণ নয়—উহার বক্তৃতাত্মক ছাঁচটাই কারণ। ঐ একই কারণে রজনীকান্তের স্বদেশী গানের সে আদর আর নাই, কাল ও ছাঁচ দুই-ই চিরকালীন সমাদরের অন্তরায়।

রজনীকান্তের নীতিকবিতাগুলির বর্ত্তমান অনাদরের কারণ বুঝিতে পারি না। এ গুলি স্পষ্টত: (কবি কর্ত্তৃক স্বীকৃতও বটে) কণিকার আদর্শে লিখিত হইলেও ইহারা সরসতায়, ভূয়োদর্শনে ও মৌলিকতায় 'কণিকা'র অনুজ। খুব সম্ভব অনাদরের কারণ হইতেছে সাধারণ ভাবে রজনীকান্তের কাব্য সম্বন্ধে পাঠকের অবহেলা ও বিস্মৃতি। কবির ভক্তিসঙ্গীতগুলির পরেই, হাসির গান ও স্বদেশী গানের উপরে, নীতিকবিতা গুলির আসন।

৬

বাংলা দেশের ভক্তিসাধনার একটি নিজস্ব ধারা আছে, বহুকালের প্রাচীন এই ধারা। এই ভক্তিসাধনার প্রকৃতি হইতেছে ভগবানের কাছে ভক্তের আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পিত প্রাণ ভক্তকে ভগবানের অপার করুণা রক্ষা করে, দুর্গম পথে চালনা করে এবং শেষ পর্য্যন্ত চরম সার্থকতায় পৌছাইয়া দেয়। প্রধানতঃ সঙ্গীতে ভক্ত আত্মনিবেদন করিয়া থাকে। সঙ্গীত এখানে মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই ভক্তিসাধনার সমান্তরালে একটি সঙ্গীতের প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত—সমস্তই এই ধারার অন্তর্গত। ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীতকেও এই ধারার অন্যতম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রজনীকান্তের কান্তপদাবলীও এই ভক্তিসঙ্গীতধারার অন্তর্গত। ভক্ত ও ভগবান্ সম্পর্কিত নূতন কোনো তত্ত্ব বা পন্থা তিনি উদ্ভাবন করেন নাই; বোধ করি ভক্তির প্রকৃতি এই যে তত্ত্ব বা নূতন পন্থার দিকে তাহা ঝোঁকে না, চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়। কাজেই কান্তপদাবলীর তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা নিরর্থক। ভক্তির অকৃত্রিমতাই উহার প্রধান সম্পদ।

বাণী ও কল্যাণী হইতে অনেক পদ উদ্ধার করিয়া বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তাহার প্রয়োজন আছে মনে করি না। ভক্তির মূলে আছে বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তি সম্ভব নয়। কাজেই তাঁহার বিশ্বাসদ্যোতক সঙ্গীতের সংখ্যাও প্রচুর।

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে ব'সে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে।

কিংবা—

তুমি অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল হরি হে;

আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।···
তাই বলে ডাকি যাহা প্রাণ চায়
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়—

ইহাই তাঁহার ও ভক্তির অন্তর্নিহিত কথা। বিশ্বাস ও ভক্তি প্রাণে থাকিলে ভক্তের সংসার পথ সুগম হইয়া আসে, তখন মৃত্যুতেও সে অনায়াসে বলিতে পারে—

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ।···
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,

তখন মৃত্যুকেও 'তোমার রসাল নন্দন' বলিয়া মনে হয়।

কান্ত কবির ভগবদ্‌বিশ্বাসে এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না বলিয়াই তিনি দুর্ব্বহ পীড়ার অন্তিম মাস কয়েকটি গৌরব-কিরীটের মতো অনায়াসে শিরে বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এ কথা বলিলে কুটিল ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে না যে, কান্তকবির ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাংলা ভক্তিপদাবলীর জাহ্নবীতে যে একটি চির-সলিলা উপনদীরূপে যুক্ত হইয়া আমাদের মানসিক সম্পদকে চিরদিনের জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে তাহা অবিনশ্বর।*

* এই প্রবন্ধ রচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত রজনীকান্ত সেন পুস্তিকার সাহায্য পাইয়াছি।

বেথুন সোসাইটি

ষষ্ঠ প্রস্তাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রতিষ্ঠাবধি বার বৎসর যাবৎ বেথুন সোসাইটির মাধ্যমে ইউরোপীয় ও বাঙালী মনীষীগণ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ললিতকলা, সমাজ-তত্ত্ব, কৃষি-শিল্প ও বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতি-চিন্তায় রত ছিলেন। ইহার পরিচয় আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে পাইয়াছি। ড. আলেকজাণ্ডার ডাফ সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হইবার পর ইহার কার্য্য কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হয়। ইংরেজ-বাঙালী বিদগ্ধজন এই সকল বিভাগেই সাধারণ শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সাহিত্যাদি সমাজোন্নতি বিষয়ক আলোচনা-গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভারত-ত্যাগের (এপ্রিল, ১৮৬৩) পূর্ব্বেই বিভাগীয় কার্য্যে একরূপ ভাটা পড়িয়া যায়। ডাফের ভারত-ত্যাগের কয়েক মাস পরে পাদ্রী জোসেফ মুলেন্‌স বেথুন সোসাইটির সভাপতি হইলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের অনেকেই যে ভারত-বন্ধু, পূর্ব্ববর্ত্তী নীল-আন্দোলন কালে তাঁহাদের দ্বারা প্রজাকুলের সপক্ষতা করায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মুলেন্‌স সত্য সত্যই প্রজা-দরদী ভারত-হিতৈষী ছিলেন। ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনে ইউরোপীয়দেরও যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে, একথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার পত্নী হানা ক্যাথেরিণ মুলেন্‌স বাংলা ভাষা এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" নামে একখানি সুপাঠ্য বাংলা পুস্তক রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৮৫২)। এখানির মধ্যে বাংলা উপন্যাসের ধারা আমরা প্রথম পাই।' সম্প্রতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পর বেথুন সোসাইটির প্রথম মাসিক অধিবেশন হইল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ নবেম্বর তারিখে। সভাপতি মুলেন্‌স এই অধিবেশনে যথারীতি একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় সম্বৎসরের কার্য্যসূচীর পরিচয় আগে-আগে দেওয়া হইত। মুলেন্‌সও বিভাগীয় কার্য্যসম্বন্ধে একটি কর্ম্মসূচী উত্থাপন করিলেন। সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, স্বাস্থ্য এবং স্ত্রীশিক্ষা—এই চারিটি বিষয়ে অন্ততঃ এ সিজনে একটি করিয়া সভা হইবে। তিনি দিন-তারিখও স্থির করিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া তিনি বলেন যে, ইউরোপের বিদ্বজ্জনসভাগুলিতে সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়া থাকেন, সেক্রেটারী বা কর্ম্মসচিব তাঁহাদের কার্য্যকলাপের শুধু সমাহার করিয়াই নিরস্ত থাকেন, পক্ষান্তরে এ দেশের সভা-সমিতিগুলিতে সেক্রেটারীকেই সবকিছু করিতে হয়; সদস্যগণ নিষ্ক্রিয় বা প্রায়-নিষ্ক্রিয় থাকায় ইহাদের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে না। বেথুন সোসাইটির কার্য্যবিবরণে দেখা যায়, সভাপতি মুলেন্‌সের প্রস্তাব অনুসারে কোন কাজই

হয় নাই। তবে মাসিক অধিবেশনগুলি রীতিমত হইতেছিল, এবং বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ ও সমাজ-হিতকর বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাও সুনিয়মে হইতে থাকে। এই অধিবেশনে বক্তৃতা দেন সভাপতি মুলেন্‌স স্বয়ং, তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—"The Roman Empire" বা রোম-সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের পতন-কালে তথাকথিত উচ্চ স্তরে দুর্নীতি, অনাচার এবং পাপ-কলুষের দিকে তিনি শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেন। গথ, এলেম্যান, ভ্যাণ্ডাল ও হুন নামক নানা অসভ্য জাতিরা আসিয়া রোম অধিকার করে। এই সকল তথাকথিত 'অসভ্য' জাতিদের মধ্যে সারল্য, সততা, সামাজিকতা এবং ধর্ম্মবোধ প্রবল ছিল। আর এই সমুদয় গুণই ছিল তাহাদের শক্তির উৎস। মুলেন্‌স ভারতবাসীদের উন্নত অবস্থার সঙ্গে রোমবাসীদের তুলনা করিতেও ভুলেন নাই। এদেশের তথাকথিত 'অসভ্য' আদিবাসীদের সদ্‌গুণাবলীর যথোচিত প্রশংসা করিলেন। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সত্যিকার উন্নতির পক্ষে তাহার অধিবাসীদের মধ্যে সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন বা চর্য্যা একান্ত প্রয়োজন। বক্তা উপসংহারে বলেন—

> "Of all Kingdoms and all generations of men, it is true that our real enemies are our own vices. They are the Huns, and Avars, the Vandals and Goths, the Allemans and Burgundians, who overwhelm us with ruin. If nations would be safe, they must be virtuous, just, truthful, upright; they must themselves be free and give freedom to all their citizens and all their neighbours. Our hope is that India will become increasingly Virtuous and free. That is why she is placed under a foriegn rule. We are all subject to this law, England as well as India. If benefiting by the example, the instructions, the government they enjoy the people of India, grow in virtues, they must grow in power."

সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল ২২ ডিসেম্বর ১৮৬৪ দিবসে। এদিনকার মূল বক্তা শিবচন্দ্র নন্দী "Electric Telegraphy in India" শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন নানা-রূপ তথ্য ও পরীক্ষণ সহযোগে। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ সম্পর্কে গবেষণা ও পরীক্ষণ দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। কলিকাতার স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক উইলিয়াম ব্রুক ওসাগনেসি ১৮৪০-৪১ সনে বিদ্যুৎ এবং বিদ্যুতের সাহায্যে বার্ত্তা প্রেরণ বিষয়ে পরীক্ষণ-কার্য্যে লিপ্ত হন। তাঁহার গবেষণার ফলাফল তিনি বড়লাট অকল্যাণ্ড, পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং মান্যগণ্য ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারত সরকার বৈদ্যুতিক তার স্থাপনের সংকল্প করিয়া ওসাগনেসিকেই পঞ্চম দশক নাগাদ ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেন। প্রথমে উত্তর ভারতে এবং পরে দক্ষিণ ভারতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বা তার স্থাপনের আয়োজন হইল। রেঙ্গুন-পতনের সংবাদ সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক তার যোগেই পরিবেশিত হয় ১৮৫২ সনের ১৯শে এপ্রিল। বড়লাট ডালহৌসী ওসাগনেসিকে ইহার পর বিলাতে পাঠান, এই বিষয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভাকে বিশেষভাবে অবহিত করার নিমিত্ত। ওসাগনেসি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে বৈদ্যুতিক তারের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করাইতে সমর্থ হইলেন এবং সরকারী অর্থে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সিপাহী যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতি যে জয়যুক্ত হয় তাহার মূলে

উত্তর ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক তারে সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা কম কার্য্য করে নাই। শিবচন্দ্র নন্দী বৈদ্যুতিক তার বিভাগে ওসাগনেসির সহকর্মী হইলেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বৈদ্যুতিক তার বিভাগের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেন। কিরূপে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তাহা, পোষ্ট, তার ও যন্ত্রপাতির সহযোগে তিনি উপস্থিত জনগণকে দেখাইলেন। টেলিগ্রাফের সাংকেতিক ভাষা বা অক্ষরের ক্রমিক বিকাশ সম্বন্ধেও তিনি বক্তৃতায় বলিলেন। টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ বিষয়ে কাহারও কাহারও কৌতুককর অজ্ঞতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। একদিন ভারতবর্ষের একটি টেলিগ্রাফ-কেন্দ্রে জনৈক ইউরোপীয় মহিলা তারে 'চিঠি' পাঠাইবার জন্য উপস্থিত হন, অনেক বলিয়া কহিয়া তবে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে হয়।

সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হইল ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৫ তারিখে। এই দিবসের বক্তা ছিলেন সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন, বক্তৃতার বিষয়—"On a Visit to Madras and Bombay with Notes of differences between their customs with those of Bengal।" কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে মাদ্রাজ ও বোম্বাই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজীদের রক্ষণশীলতা এবং বোম্বাইবাসী পার্শীদের ব্যবসায় বুদ্ধি তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। যেমন নাম হইতে বুঝা যায়, বক্তা বাঙালী, মাদ্রাজী এবং পার্শীদের কাজ-কর্ম্ম রীতিনীতি এবং আচার-আচরণের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এ তিনের বৈশিষ্ট্যের প্রতি সোসাইটির সদস্যদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলেন। প্রত্যেকটি প্রদেশবাসীর উন্নতিকল্পে যেমন কতকগুলি বিষয়ের সংস্কারসাধন প্রয়োজন তেমনি সমগ্র দেশের উন্নতির নিমিত্ত ও ইহাদের মধ্যে যে-সব বিশেষ বিশেষ গুণ রহিয়াছে তাহার উৎকর্ষসাধন আবশ্যক। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় অংশবিশেষের এই কথাগুলি বলা হয়—

> "The Lecturer then proceeded to discuss the question, which a comparative view of native society in the three Presidencies, had suggested to his mind, namely, the mission, which each was destined to fulfil in the great future of India. The mission of Bombay seemed to him to be the promotion of the material prosperity of India, her activity and enterprise, and her first-rate bussines habits and talents rendering her peculiarly qualified for that great task. Madras, he thought, would, from her conservatism and orthodoxy, effectively prevent the introduction of foreign fashions into the country, and guard her against inroads on the purity of her national institutions, and primitive manners. The mission of Bengal was the promotion of intellectual and political prosperity."

কেশবচন্দ্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের পর আলোচনা সুরু হইল এবং তাহাতে যোগদান করিলেন অমৃতলাল ঘোষ, পাদ্রী ড্যাল এবং সভাপতি মুলেন্‌স স্বয়ং। পাদ্রী ড্যাল বলেন যে, বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন শিক্ষার এক বিশিষ্ট অঙ্গ। বক্তার মত কেহ যদি মার্কিণ দেশে যান এবং সেখানে স্বদেশের এবং ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনায় রত হন তাহা হইলে আমরা কম লাভবান হইব না। সভাপতি মুলেন্‌স বক্তার কোন কোন মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক সমাজেই দোষত্রুটি লক্ষিত হয়, একটি বিষয় আলোচনাকালে অন্যটির কথাও আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মোট কথা প্রত্যেক প্রদেশবাসীর

সামাজিক দোষত্রুটি পরিহারপূর্ব্বক স্বদেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য আমাদের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

সোসাইটির চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হয় ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ দিবসে। এই দিনের বক্তা ছিলেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বক্তৃতার বিষয়—"On writing in Ancient India and the Sanskrit Alphabet।" রাজেন্দ্রলাল সমাজকর্ম্মী, সুপণ্ডিত ব্যক্তি, এবং পুরাতত্ত্বের আলোচনায় ইতিমধ্যেই তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সোসাইটির এ অধিবেশনে উপস্থিত হন। রাজেন্দ্রলাল বক্তৃতায় প্রথমেই ইংলণ্ডস্থিত দুই জন প্রধান সংস্কৃত-অধ্যাপকের মতামত উদ্ধৃত করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ভারতের প্রাচীন লিপি খ্রীষ্টপূর্ব্ব চারিশত বৎসরের অধিক পুরনো নয় এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পাণিনির সময় হইতেই এ দেশে লিখন আরম্ভ হয়। অধ্যাপক গোল্ডস্টুকার এই মতের ঘোর বিরোধী। তিনি ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থাদিদৃষ্টে এবং পাণিনির সূত্রাদি বিবেচনায় প্রাচীন লিপি যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতকের ঢের পূর্ব্বেকার তাহা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল বক্তৃতায় শেষোক্ত মত সমর্থন করেন এবং সমর্থনকালে তিনি আরও বিস্তর তথ্য-প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন।

সংস্কৃত বর্ণমালার স্বকীয়তা প্রমাণ করিয়া তিনি বলেন যে, ইহা সত্য সত্যই বিজ্ঞানসম্মত এবং ইহা কাহারও নিকট হইতে ধার করা জিনিস নয়। এই বর্ণমালা ভারতের বিবিধ স্থানিক ভাষায়ও গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্ত্তিত বর্ণমালায় (যেমন, ঁ চন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি) বিরূপ সমালোচনা করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে আধুনিক বর্ণমালার ক্রমিক বিকাশ একটি চার্টে উপস্থিত সভ্যগণকে দেখাইলেন। বর্ণমালার আলোচনাপ্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল এদেশে রোমান হরফ চালাইবার প্রচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করেন। তৃতীয় দশকে এই বিষয়ে বাংলা দেশে বেশ একটি আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে রোমান হরফ প্রবর্ত্তনের সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা-বিতর্কও চলে খুবই। সিবিলিয়ান সি. ই. ট্রেভেলিয়ান রোমান হরফে একখানি বাংলা বই ছাপাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা ঐ প্রচেষ্টার অসারতা প্রতিপাদন করেন। নিজস্ব সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে ধর্ম্মীয় যোগাযোগের কথাও তিনি উল্লেখ করিলেন। উপসংহারে রাজেন্দ্রলাল বলেন যে, পুরাতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা দ্বারা আমরা অতীত গৌরবগাথার সঙ্গে পরিচিত হই এবং ইহা আমাদিগকে নূতন করিয়া কর্ম্মে লিপ্ত হইতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি স্বদেশীয় যুবকগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—

> "The Lecturer concluded by a warm exhortation to the rising genration of his country to rise from their slumbers, and shake of the lethargy which sat like an in cubus upon their energies, and shew to the world that they had not in vain inherited the intellect of the primitive civilizers of the human race, and to keep in mind the principles and progress of Western nations, which have raised them to a desavedly erected position in civilization.

বক্তৃতা অন্তে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, পাদ্রী ড্যাল সভাপতি মুলেন্স্ আলোচনায় যোগ দিলেন। লালবিহারী বলেন যে, উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিদ্যাসাগর বর্ণমালার সংস্কারসাধন করিয়াছেন, এ কারণ তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না। ড্যালের মতে একটি "Phonetic Alphabet" বা উচ্চারণমাফিক বর্ণমালার উদ্ভব করিতে পারিলে সব সমস্যার সমাধান হয়। তিনি সুধীবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলেন। সভাপতি বক্তাকে ধন্যবাদ-দানকালে বলেন যে, হিব্রু বর্ণমালার উদ্ভব হয় বিভিন্ন বস্তু ও জীবের আকার হইতে; যেমন—'আলেফ' অক্ষরটির আকার—বৃষের মস্তক, 'বে'র আকার—ঘর। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা যে কত চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে, ঐ দিনকার সাধারণ সভায় তাহা প্রথম লক্ষ্য করা গিয়াছে।

পঞ্চম অধিবেশনে "Heat" (উত্তাপ) সম্পর্কে বক্তৃতা দেন ড. ম্যালকনামারা। বিবিধ পরীক্ষণ ('experiments') সাহায্যে সভ্যগণকে তিনি পদার্থবিদ্যার এই বিশেষ বিষয়টি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ড. রব্‌সন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সোসাইটির ষষ্ঠ বা শেষ অধিবেশনের পূর্ব্বে ইহার একটি বিশেষ অধিবেশন হইল ৫ই এপ্রিল (১৮৬৫) দিবসে। এই অধিবেশনে মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ 'Periodical Census' শীর্ষে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। পরবর্ত্তী ১৮৭১ সন নাগাদ ভারতবর্ষে সেন্সাস গ্রহণের যে আয়োজন হয় তৎসম্বন্ধে আলোচনা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন বিদ্বজ্জনসভায় হইতে থাকে। বেথুন সোসাইটিতেও এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত হইল মৌলবী আবদুল লতিফের বক্তৃতা হইতে। মৌলবী আবদুল লতিফ বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় জানিবার জন্য সেন্সাসের আবশ্যকতা যে কত, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। বাংলার নর-নারী-শিশু, গৃহপালিত জীবজন্তু, কৃষি-শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব বিষয়েই একটি তথ্যমূলক পরিসংখ্যান থাকা প্রয়োজন। সরকারের পক্ষে তো ইহা অত্যাবশ্যকই। তিনি বক্তৃতায় আরও বলেন যে, তাঁহার নিজ মুসলমান সমাজ ইহা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। মুসলমান সমাজে অন্ধ, খঞ্জ, কালা, বোবা প্রভৃতি দুর্গত ও দুঃস্থ লোকের নিরতিশয় প্রাচুর্য্য। তাহাদের পরিসংখ্যান না থাকায় সরকারী কি বেসরকারী কোনরূপ সাহায্য দানেরও ব্যবস্থা হইতে পারিতেছে না। আবদুল লতিফ নানা দিক দিয়াই সেন্সাস লওয়ার আবশ্যকতা শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সোসাইটির ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ১১ই এপ্রিল। এই দিনে বক্তৃতা করেন মেজর জি. বি. ম্যালেসন। ড. মুলেন্সের পরে ম্যালেসন সোসাইটির সভাপতি হন। তাঁহার কথা পরে কিছু বলা যাইবে। ম্যালেসনের বক্তৃতার বিষয় হইল—"Disraeli's Literary and Political Career"। গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গ্লাডষ্টোন ও ডিস্‌রেলীর নাম রাজনীতির কথা আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রত্যেকেরই স্বতঃই মনে থাকিবে। ডিস্‌রেলী

অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ অধ্যবসায় বলে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন একাধিকবার। ডিস্‌রেলী যে সাহিত্যসেবীও ছিলেন একথা হয়ত অনেকের জানা নাই। মেজর ম্যালেসন বক্তৃতায় তাঁহার সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবন—এই উভয় দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করিলেন।

২

বেথুন সোসাইটি চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল (১৮৬৫-৬৬)। সোসাইটির বিভাগগুলির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বেই আমরা তাহা দেখিয়াছি। আগেকার নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বৎসরে অবশ্য ছয়টি করিয়া মাসিক অধিবেশন হইতে লাগিল। তবে মাসিক অধিবেশন ব্যতিরেকে, সোসাইটির বিশেষ অধিবেশনও কোন কোন সময় অনুষ্ঠিত হইত এবং বিশিষ্ট বক্তা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বা উপলক্ষ্যে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। সোসাইটির বৈষয়িক কার্য্যাদি নির্ব্বাচনের জন্য একটি কৌন্সিল বা অধ্যক্ষ-সভা ছিল। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাবধি প্রতি বৎসর অধ্যক্ষসভার সদস্য সভাপতি সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত হইতেন। ডক্টর ডাফের সভাপতিত্ব-কালে অধ্যক্ষ-সভা গঠনের কতকটা রকমফের হইলেও ইহার অস্তিত্ব বরাবরই ছিল। তবে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে প্রতি বৎসরই যে ইহার অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইত তাহা সঠিক বলা যায় না। কেননা সোসাইটির কার্য্যবিবরণ-পুস্তকে বাৎসরিক অধ্যক্ষ-সভা গঠনের উল্লেখ পাই না। দুই বৎসর, তিন বৎসর বা ততোধিক কাল পর পর নূতন সভাপতি নিয়োগের কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। এই সময় বরাবর সম্পাদক ছিলেন সুবিদ্বান্ কৈলাসচন্দ্র বসু। হরমোহন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রথম মাসিক সভা হইল ১৮৬৫ সনের ৯ই নবেম্বর। ডক্টর মুলেন্স্ দুই বৎসর যাবৎ সোসাইটির সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অন্যত্র গমন হেতু তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই দিনকার সভায় প্রথমে সভাপতিত্ব করেন ড° রবসন। তিনি সদস্যগণকে জানান যে, অধ্যক্ষ-সভার অনুরোধে মেজর জি. বি. ম্যালেসন সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। এই কথা সভায় বিজ্ঞাপিত হইলে ম্যালেসন সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হন। ম্যালেসন দীর্ঘকাল ভারতে অবস্থান করিয়াছেন এবং ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানও জন্মিয়াছে। ভারতবাসীর হিতসাধন ছিল তাঁহার একটি প্রধান লক্ষ্য। ঐতিহাসিক রূপেও তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থগুলি তাঁহার অনুসন্ধিৎসা এবং তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় বহন করিতেছে। তাঁহাকে সভাপতিরূপে পাইয়া সোসাইটি বিশেষ লাভবানই হইল। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মাসিক অধিবেশনগুলি সোসাইটির সাধারণ সভাও বটে।

এই দিনকার বক্তা ছিলেন নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি ম্যালেসন স্বয়ং। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়

ছিল,—"Florence Nigtingale and her life of self-denial and loving care of others।" এই মহীয়সী মহিলার মানব-হিতৈষণা সর্ব্বজনবিদিত। ইংরেজ নরনারীর চিত্ত তিনি বিশেষ ভাবে জয় করিয়া লন। কবি টেনিসন "Lady with the Lamp" কবিতায় ইহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। একথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, তাঁহার দরদী মন ভারতবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া উঠিত। বাংলাদেশে তখন ম্যালেরিয়া মহামারীর খুবই প্রকোপ। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এ বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। নাইটিঙ্গেল সম্পর্কে ম্যালেসনের মনোজ্ঞ ভাষণটি সভ্যদের আত্ম-জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে। ম্যালেসনের বক্তৃতার পর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বলেন যে, ছোটখাট আকারে নাইটিঙ্গেলের মত পরহিতব্রতী মহিলা বাংলা দেশেও খোঁজ করিলে মিলিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি পাবনার বামাসুন্দরী দেবীর কথা উল্লেখ করেন। সেখানকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি সেক্রেটারী। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তিনি এই বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দান করিয়াছেন।

সোসাইটির দ্বিতীয় সাধারণ মাসিক অধিবেশন হইল ১৪ই ডিসেম্বর। ম্যালেসন যথারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এ অধিবেশনের বক্তা জে. হ্যারিসন। হ্যারিসন ছিলেন পদস্থ সিবিলিয়ান। তিনি ক্রমে কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান বা কর্ম্মকর্ত্তা হন। সে যুগে তাঁহারই আমলে এবং আগ্রহাতিশয়ে একটি সুদীর্ঘ নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইয়া শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে যাতায়াতের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই নূতন রাস্তার নামকরণ হয় তাঁহার নামে—'হ্যারিসন' রোড। বর্ত্তমানে ইহা 'মহাত্মা গান্ধী রোড' নামে অভিহিত হইয়াছে। হ্যারিসনের বক্তৃতার বিষয় ছিল,—"Lacordaire and his Career in France in connection with the Press and Freedom of Thougt।" নাম হইতেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু সুপ্রকট। মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার স্বাধীনতার কিরূপে অপহৃব ঘটে ভারতবাসী শতাব্দী যাবৎ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। বিদেশী-রাজার অধীন না হইয়াও, ফ্রান্সের একদিন আমাদের মতই অবস্থা ছিল। বীর ল্যাকরডেয়ার এই বিষয়ে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, হ্যারিসন বক্তৃতায় তাহা বিবৃত করিলেন।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১৮ই জানুয়ারী ১৮৬৬) জে. কেভ-ব্রাউন "Hindu Chivalry" শীর্ষক একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। নারীজাতির প্রতি হিন্দুদের ব্যবহার—ইহাই ছিল বক্তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিরূপে ইংরাজী 'শিভালরি' কথাটির উদ্ভব হয় তাহা বিবৃত করিয়া মধ্যযুগে রাজপুতানার হিন্দুদের নারীজাতির সম্মান রক্ষাকল্পে রাজপুতদের বীরত্ব ও ত্যাগ-স্বীকারের কথা বক্তা বিশদরূপে বর্ণনা করিলেন।

এই সময় সোসাইটির অবস্থা কতকটা খারাপ হইয়া পড়ে। চতুর্থ অধিবেশনে (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬) সভাপতি ম্যালেসন দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, দুইবার স্থগিত রাখার

পর এই দিনকার অধিবেশন ডাকা সম্ভব হইয়াছে। বক্তারও অপ্রতুলতা দেখা দিয়াছে। তিনি স্বল্পকালের মধ্যে একটি বিষয় যাহা স্থির করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাই এখানে বক্তৃতায় বলিবেন। বক্তৃতাদানের পূর্ব্বে তিনি সভাপতির আসন ত্যাগ করিলে সার্জন-মেজর সি. আর. ফ্রান্সিস সাময়িক ভাবে সভার পৌরোহিত্য করেন। ম্যালেসনের বক্তৃতার বিষয় ছিল—'লর্ড লেক'। লর্ড লেক একজন বিখ্যাত সেনাপতি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারে তাঁহার কৃতিত্ব অনেকখানি। ম্যালেসন এ সব বিষয় বর্ণনান্তে আর একটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিলেন। লর্ড লেক ভারতীয় সৈন্যগণের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। ইহাদের বীরত্বের প্রশংসায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ। মধ্যযুগে ভারতীয় রণক্ষেত্রে সেনাপতির মতিভ্রম ঘটিলেও, সাধারণ সৈন্যদের বীরত্ব প্রকাশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সকলেই প্রায় একমত। সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে বীরত্বের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগে লর্ড লেকও খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশন হইল—১৮৬৬, ৮ই মার্চ্চ। ম্যালেসন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ দিনকার বক্তা—বিচারপতি ফিয়ার। তাঁহার পুরা নাম জন বাড ফিয়ার। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার পূর্ণ পরিচয় নহে। তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ মেলামেশার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিবিধ সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ম্যালেসনের পরে তিনি বেথুন সোসাইটির সভাপতি হন, এ বিষয় যথাকালে আমরা জানিতে পারিব। ফিয়ার ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কাজেই তাঁহার বক্তৃতাও ছিল ব্যবহার শাস্ত্রের একটি দিক লইয়া, যথা—"English Rules and Evidence in Anglo-Indian Courts of Justice"। মেকলের সময় হইতে এ দেশীয় বিচার-পদ্ধতিকে কিরূপে ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা চলে, এবং দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনা ও সংযোগ-বিয়োগের পর ষষ্ঠ দশকের প্রথমে বিচার-পদ্ধতি নির্ণীত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জীবন সম্পর্কে যাঁহারা কিঞ্চিৎমাত্রও পড়াশুনা করিয়াছেন তাঁহারা একথা জানেন। ভারতীয় বিচারালয়ে এই বিচার-পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয় বক্তা ফিয়ার তাঁহার বক্তৃতায় আলোচনা করিলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসরের ষষ্ঠ বা শেষ মাসিক অধিবেশন হইল—৫ই এপ্রিল ১৮৬৬ তারিখে। এই দিনে কে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাই না। ম্যালেসন, মনে হয় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাসিক অধিবেশনে সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনও বটে, আর এই সভায় প্রয়োজনমত সোসাইটির বৈষয়িক কার্য্যও নিষ্পন্ন হইত; সোসাইটির অন্যতম উৎসাহী সদস্য ডক্টর রবসন সভার আরম্ভেই প্রস্তাব করিলেন যে, ডাফের সভাপতিত্বকালে ১৮৬২ সনে সোসাইটি কর্ত্তৃক যে "Transactions" বা প্রবন্ধ-পুস্তক বাহির হইয়াছিল তাহাই এ ধরণের শেষ গ্রন্থ। সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধ বা প্রদত্ত বক্তৃতার সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে

কতকগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, শীঘ্রই একখানি 'ট্রান্‌জাক্‌শ্যন্‌স' প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এ নিমিত্ত অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন। বেথুন সোসাইটির ঐ সময়কার অবস্থা কিরূপ তাহা নির্ণয়ের জন্য তিনি একটি কমিটির উপর ভার দিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই কমিটিতে ছিলেন প্রস্তাবক ডক্টর রব্‌সন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, সার্জন মেজর সি. আর. ফ্রান্সিস, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতি।

ষষ্ঠ অধিবেশনের বক্তা ছিলেন কলিকাতার লর্ড বিশপ কটন। কটন সোসাইটির একজন বান্ধব ছিলেন। ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। সোসাইটিকে তিনি ইহার একটি বিশিষ্ট মাধ্যম বলিয়া ব্যক্ত করিতেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে দুইবার সোসাইটির সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুইটি বক্তৃতাই যেমন ছিল জ্ঞানগর্ভ তেমনি হৃদ্যতায় ভরপুর। তাঁহার এই দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল—"Employment of Women in Religious and Charitable Works" সম্পর্কে। এই বক্তৃতায় তিনি ইউরোপীয় নারীদের ধর্ম্ম ও দাতব্য বিষয়ে যোগাযোগ সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। বক্তৃতার ভূমিকায় তিনি বলেন যে, খ্রীষ্টজন্মের পর হইতে এ যাবৎ ধর্ম্মবিষয়ে এবং বিবিধ সামাজিক কর্ম্মে আত্মনিয়োগের কথা বলিবেন বলিয়া যেন অন্য কিছু মনে না করা হয়। প্রাক্-পোপ এবং উত্তর-পোপ যুগে বিভিন্ন নারীর অধিকার কিরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাতি কিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে সে সম্বন্ধে কটন সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। সোসাইটিতে প্রদত্ত এই বক্তৃতাই লর্ড বিশপ কটনের শেষ বক্তৃতা। এই বৎসরের শেষে তিনি মারা যান। ঐ যুগে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরিবর্দ্ধমান বিভেদকে নিরাকৃত করিবার জন্য সোসাইটির মাধ্যমে কয়েকজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন ; কটন ছিলেন তাঁহাদের একজন।

মহারাজ কুম্ভকর্ণ-পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

নত্বা মতঙ্গভরতপ্রমুখান্ সুগীত-
সঙ্গীতশাস্ত্রনিপুণাঞ্জয়দেববাচাম্।
শ্রীকুম্ভকর্ণনৃপতিবিবৃতিং তনোতি
গানং নিধায় সরসে রসিকপ্রিয়াহ্বাম্ ॥

ভারতের ইতিহাসে যে স্বল্পসংখ্যক শাসনকর্তার নাম কীর্তিগৌরবে উজ্জ্বল হয়ে আছে, মেবারের মহারাণা কুম্ভকর্ণ বা কুম্ভ তাঁদের একজন। তিনি ছিলেন একাধারে বিজয়ী বীর, উপযুক্ত শাসনকর্তা, স্থাপত্যশিল্পবিশারদ, বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত, সুরসিক কবি এবং বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞ। ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজত্বকাল যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহেই কেটেছে, তা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই জানেন; কিন্তু এ খবর খুব কম লোকই জানেন যে, তিনি একজন কুশল বীণাবাদক ছিলেন, তাঁকে অভিনবভরতাচার্য বলে সম্মানিত করা হয়েছে। বিপদ্‌সংকুল জীবনযাত্রার বিভীষিকা থেকে তিনি যতটা পেরেছেন, নিজেকে রক্ষা করেছেন এবং সেই সব সুযোগে শিল্পকলার চর্চা করেছেন। কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দ রচনা করে এক সময় সারা ভারতে সুরের একটি নূতন ধারা প্রবাহিত করেছিলেন। ক্রমে সেই সুরের পরিচয় গেল হারিয়ে, কেবল কতকগুলি রাগ-তালের নাম তাঁর কাব্যের উপর অঙ্কিত রয়ে গেল। ভারতীয় সংগীতের বিশেষত্ব এইখানে যে, শিল্পীরা মূল সুর হারিয়ে গেলেও নিরস্ত হন না, পুরাতন পদ নিজের সুরে রূপায়িত করেন—তাতে মূল স্রষ্টার সম্মানহানি হয় বলে তাঁরা মনে করেন না। মেবারের মহারাণা কুম্ভকর্ণ জয়দেবের গীতগোবিন্দ পাঠে বিমোহিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে ভারতীয় সংগীতের আদর্শ অনুযায়ী এই প্রবন্ধগুলিকে সুরে রূপায়িত করে সংগীতকলায় তাঁর অপূর্ব পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে গেলেন। বহুদিন হল কুম্ভ-প্রবর্তিত প্রবন্ধগুলির পরিচয়ও হারিয়ে গেছে, তথাপি তাঁর রসিকপ্রিয়া টীকায় এই সংগীতাংশের বিবৃতি থেকে তাঁর চেষ্টার মহত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কুম্ভকর্ণ জয়দেবের কাব্যে নিজস্ব রীতিতে সুর যোজনা করেছেন এবং প্রবন্ধরূপ আরোপ করেছেন ব'লে তিনি জয়দেব-প্রদত্ত গীতরূপকে লঘু প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। বরঞ্চ উপযুক্ত গাতার অভাবে যে গীত তার পূর্বগৌরব থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি স্বীয় আসনে স্থাপন করবারই প্রয়াসী হয়েছিলেন। জয়দেবের প্রতি এটি তাঁর শ্রদ্ধারই নিদর্শন, ঈর্ষার নয়। গীতগোবিন্দের রসিকপ্রিয়া নামক যে টীকা তিনি প্রণয়ন করেছিলেন, সেটি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে রচিত এবং তার মূল্য অসাধারণ। এই টীকায় তাঁর নিজস্ব সংগীতাংশের যে বর্ণনা আছে, সেটি থেকেও বোঝা যায়, গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার

জন্য কত যত্ন এবং চিন্তাপূর্বক সেকালকার বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি তিনি এই গীতিকাব্যে সংযোজিত করেছেন।

রসিকপ্রিয়া টীকার প্রারম্ভে তিনি বলছেন—শ্রীগীতগোবিন্দস্য গীতকস্য নব্যাকৃতি-মাতনোতি। তার পর বলছেন—

অতঃ স্বরাদিভিঃ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ সংযোজ্য তথ্যতাম্।
নীত্বা গীত্বা তদা হিত্বা কুটীকাস্ত প্রবর্ত্যতে॥

অর্থাৎ ষড়ঙ্গ সংযোজনাপূর্বক তিনি একটি কুটিকার প্রবর্তন করেছেন। এই ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে পরে বলছি। তার পূর্বে "কুটিকা" শব্দটি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। সংগীতশাস্ত্রে "কুট্টিকার" নামক একটি শব্দের ব্যবহার আছে। সঙ্গীতরত্নাকরপ্রণেতা শার্ঙ্গদেব বলছেন—"কুট্টিকারোঽন্যধাতৌ তু মাতুকারঃ প্রকীর্তিতঃ"। অর্থাৎ, যিনি অন্য ধাতুতে মাতু রচনা করেন, তিনিই কুট্টিকার। ধাতু[১] শব্দের অর্থ গেয় বস্তু এবং মাতু শব্দের অর্থ বাক্য। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রচলিত কলিনিবদ্ধ একটি গীতরূপকে যিনি পরিবর্তিত করে প্রকাশ করেন, তিনিই "কুট্টিকার"। কুট্টন শব্দের অর্থ ছেদন—এই থেকেই কুট্টিকার শব্দটি এসেছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জয়দেবরচিত গীতগোবিন্দ প্রবন্ধের একটি বিশিষ্ট গীতরূপ ছিল; কুম্ভকর্ণ সেই রূপটির বদলে নিজস্ব রীতিতে উক্ত প্রবন্ধের পদগুলিকে অন্য ভাবে রূপায়িত করে প্রকাশ করলেন। এই ভাবে তিনি জয়দেবের রচিত পদকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করায় এটি "কুট্টি" বা "কুটিকা" হিসাবে পরিগণিত হল। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেও বলেছেন, "গীতৌ জয়দেবকৃতে ধাতুং কুম্ভো নৃপস্তনুতে।" এই শব্দটি উক্ত শ্লোকে "কুটীকা" না হয়ে "কুটিকা" হওয়া উচিত ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে সংগীতের ক্ষেত্রে এই রকম বানানের ব্যতিক্রম প্রায়ই দৃষ্ট হয়ে থাকে।

কুম্ভকর্ণ রসিকপ্রিয়া টীকায় সংগীতাংশ বোঝাবার জন্য তাঁর অপর বিরাট সংগীতগ্রন্থ "সঙ্গীতরাজ" থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এই গ্রন্থটিতেও তাঁর স্বপরিকল্পিত গীতগোবিন্দের অষ্টবিংশ প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। উক্ত শাস্ত্রগ্রন্থ অনুমানিক ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।[২] এই গ্রন্থের প্রবন্ধ অধ্যায়েও তিনি গীতগোবিন্দের যে প্রবন্ধভাগ প্রস্তুত করেন, তার আলোচনা আছে।

জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ কোন্ পর্যায়ের গীত, সে সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেন নি। তবে গীতগোবিন্দ যে প্রবন্ধ-পর্যায়ের গীত, সেটি প্রমাণিত হয় এই শ্লোকে—

বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্॥

১. বাঙ্মাতুরুচ্যতে গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে—সঙ্গীতরত্নাকর, প্রকীর্ণাধ্যায় (অ্যাডায়ার সংস্করণ)

২. Sangitaraja Vol. I ed. Dr. C. R. Kunhan Raja—The Ganga Oriental Series No. 4.

এই "প্রবন্ধ" শব্দের ব্যাখ্যা—"প্রবন্ধং প্রকর্ষেণ বধ্যতে শ্রোতৃণাং হৃদয়স্মিন্নিতি"[১]—এই ভাবে করলে এর সম্যক্ অর্থ প্রকাশ পায় না। আসলে প্রবন্ধ শব্দের অর্থ কলি বা ধাতুদ্বারা নিবদ্ধ কাব্যসংগীত এবং জয়দেব এই অর্থেও প্রবন্ধ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন; কেন না, গীতগোবিন্দ মূলতঃ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রবন্ধসংগীতের প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীভেদ ছিল—সূড়, আলিক্রম এবং বিপ্রকীর্ণ। জয়দেব এই তিনটির কোন্ শ্রেণী অবলম্বনে গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন, তারও কোন উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে সে কালের গীতরীতি এবং মহারাণা কুম্ভের পরিকল্পনা বিচার করে দেখলে অনুমান হয়, গীতগোবিন্দ ছিল প্রধানত সালগ বা ছায়ালগ সূড়শ্রেণীর প্রবন্ধ। গীতগোবিন্দ তৎকালীন রাগসংগীতের পর্যায়ে পড়ে না; কেন না, রাগসংগীতের লক্ষণ এবং আচরণ দেশী প্রবন্ধসংগীতের মত নয়। শার্ঙ্গদেব সংগীতরত্নাকরে স্পষ্টই বলেছেন যে, যদিচ কোন কোন দেশী প্রবন্ধ রাগ অবলম্বনে গীত হয়ে থাকে, তথাপি তাদের রাগগীতির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় এবং সেগুলিকে প্রবন্ধসংগীত হিসাবে বিচার করাই সংগত। গীতগোবিন্দের প্রবন্ধগুলিতে যে সব তালের উল্লেখ আছে, সেগুলি দেশী তাল এবং সালগ-সূড় প্রবন্ধেই সেগুলির ব্যবহার হত। অতএব গীতগোবিন্দ যে মূলতঃ সালগ-সূড় শ্রেণীর প্রবন্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কুম্ভের পরিকল্পিত সংগীত সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে প্রবন্ধসংগীতের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন, নতুবা বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে না। গায়কগণ দেশী রাগাদির প্রয়োগে যে জনমনোরঞ্জনকারী গীত রচনা করেন, গান বলতে সেই বস্তুই বোঝায়। এই গান এবং প্রবন্ধ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। গান দুই প্রকার—নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। নিবদ্ধ গান ধাতু এবং অঙ্গদ্বারা আবদ্ধ। অনিবদ্ধ গান আলাপের মত বন্ধহীন। প্রবন্ধের অবয়বগুলিকে ধাতু বলা হয়। এই রকম চারটি ধাতু আছে—উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ। প্রবন্ধের প্রথম ভাগ হচ্ছে উদ্গ্রাহ। এর পরের অংশটি মেলাপক। প্রবন্ধের তৃতীয় অবয়বের নাম ধ্রুব। এইটি গানের নিত্য অংশ এবং এটি কখনই পরিত্যক্ত হবে না। আভোগ হচ্ছে অন্তিম অবয়ব। ধ্রুব এবং আভোগের মধ্যভাগে অপর একটি ধাতুরও অস্তিত্ব আছে, সেটি হচ্ছে অন্তরা।

প্রবন্ধের অঙ্গ ছয়টি—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট এবং তাল। এই সবগুলি প্রযুক্ত হলে তাকে ষড়ঙ্গ প্রবন্ধ বলা হয়। সা, রে, গা, মা প্রভৃতিকে স্বর বলা হয়। বিরুদ হচ্ছে গুণবাচক অংশ। পদ বলতে বিশেষ ভাবে গানের বাক্যাংশকে বোঝায়। তেনক শব্দটি মঙ্গলার্থবাচক। মহাবাক্যের আদিতে যেমন "ওঁ তৎসৎ" এইরূপ তত্ত্বনির্দেশে ব্রহ্মকে প্রকাশ করা হয়, সেই রকম তেনক অঙ্গে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা মঙ্গল নির্দেশ করা হয়ে থাকে। পাট হচ্ছে বাদ্যাক্ষর বা মৃদঙ্গাদি বাদ্যে প্রযুক্ত বোল। ধা, ধিগ ধিগ্ প্রভৃতি বাদ্যের বোল মুখেও উচ্চারিত হত এবং সেটিও পাট অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত।

---

১. টীকা, পূজারী গোস্বামী, কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধের তিনটি বিভাগের মধ্যে শুদ্ধসূড়ের কৌলীন্য সবাপেক্ষা অধিক। সূড় প্রবন্ধ দ্বিবিধ—শুদ্ধ এবং ছায়ালগ বা সালগ। শুদ্ধসূড়ের সঙ্গে প্রাচীন শুদ্ধসংগীতের কতকটা মিল ছিল, কিন্তু সালগসূড়ে নিয়মের অতিলঙ্ঘন ঘটেছে। এই কারণেই এই জাতীয় গানের নাম দেওয়া হয়েছে—ছায়ালগ সূড়। উক্ত সূড় সাত প্রকার—ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, অড্ড, রাস এবং একতালী। জয়দেব এবং কুম্ভকর্ণ দুজনেই এই সব গীতরীতি অবলম্বন করে সংগীতভাগ রচনা করেন।

প্রথম শ্লোক

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্···"—এইটি গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রথম শ্লোক। কুম্ভকর্ণ এই প্রথম শ্লোক থেকেই গীত আরম্ভ করেছেন। জয়দেব "প্রলয়পয়োধিজলে"—এই গীতের পূবে অপর কোন শ্লোকে রাগ নির্দেশ করেন নি। কুম্ভকর্ণ বলছেন—"গমকালাপপেশলতয়া মধ্যমগ্রামে ষাড়বেন মধ্যমগ্রহেণ মধ্যমাদিরাগেণ গীয়তে"। এই গীতে গমক এবং আলাপ যোজিত হয়েছে। এতে মধ্যমাদি রাগ প্রদত্ত হয়েছে। মধ্যমাদি রাগের একটি বৈশিষ্ট্যও কুম্ভকর্ণ উল্লেখ করেছেন। এই রাগটি গ্রামরাগ মধ্যমগ্রাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর প্রথম (গ্রহ) এবং প্রধান (অংশ) স্বর ছিল মধ্যম এবং অপরাপর লক্ষণ গ্রামরাগ মধ্যমগ্রামের মত। শাস্ত্রানুযায়ী গ্রামরাগ মধ্যমগ্রামের আরোহণে ষড়্‌জমুখ্য প্রসন্নাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ বিধেয়, কিন্তু মধ্যমাদি রাগে গ্রহ এবং অংশস্বর মধ্যম নির্ধারিত হওয়ায় ষড়্‌জের বদলে এই অলঙ্কারটিতে মন্দ্র মধ্যমের ব্যবহার নির্দিষ্ট হয়েছে। সাধারণত সা সা সা—এইটিই হচ্ছে প্রসন্নাদি অলংকার, কিন্তু মধ্যমের প্রাধান্য থাকাতে এখানে মা মা মা এই অলংকারটিকেই প্রসন্নাদি বলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মধ্যমকেই ষড়্‌জ হিসাবে ধরা হচ্ছে। এই কারণেই কুম্ভকর্ণ বলছেন—ষাড়বেন মধ্যমগ্রহেণ মধ্যমাদিরাগেণ গীয়তে।

"প্রলয়পয়োধিজলে···" প্রবন্ধের পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিকে কুম্ভকর্ণ সম্ভাবিতা[1] গীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই গীতির একটি প্রধান লক্ষণ গুরুবর্ণের আধিক্য।

প্রথম প্রবন্ধ—দশাবতার কীর্তিধবল

গীতগোবিন্দের প্রথম গীত "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং" কুম্ভকর্ণের "দশাবতার-কীর্তিধবল" নামক প্রথম প্রবন্ধ। জয়দেব এই সব গীতে কোন প্রকার বিশেষ প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেন নি। কুম্ভকর্ণ বলছেন—

অত্র প্রলয়পয়োধীত্যাদি একাদশেষ্বপি পদেষু কীর্তিধবলং নাম ছন্দঃ। তল্লক্ষণং যথা—অযুজি পদে দ্বাদশৈব যুজি তু যস্য হি দশ বাষ্টমাত্রাশ্চেৎ। পদমপি পদযুগমেব তং কীর্তি-ধবলমিহ ধীরাঃ প্রাহুঃ।

১. সংক্ষেপিতপদা ভূরিগুরুঃ সম্ভাবিতা মতা। সঙ্গীতরত্নাকর।

কুম্ভকর্ণ কীর্তিধবল নামক ছন্দের উল্লেখ করলেও আসলে এটি একটি প্রবন্ধরূপ। এই নামের কোন ছন্দের অস্তিত্ব নেই। সংগীতরত্নাকর অনুসারে ধবল নামক প্রবন্ধ তিন প্রকার—কীর্তি, বিজয় এবং বিক্রম। ধবলপ্রবন্ধ আশীর্বাদসূচক। সাধারণত এই প্রবন্ধের চরণাদিতে "ধবল" বা বিমলত্ব বোঝায়, এইরকম বাক্য বা শব্দ থাকত।

নিয়মানুসারে কীর্তিধবল চারটি চরণে উপনিবদ্ধ। এর বিষমচরণদ্বয়ে অর্থাৎ প্রথম এবং তৃতীয় চরণে দুটি করে ছ-গণ (সংগীতশাস্ত্রানুসারে তিনটি গুরুমাত্রায় একটি ছ-গণ হয়) থাকে এবং সমচরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে এর উপর একটি ত-গণ (একটি গুরু এবং একটি লঘু) বা দ-গণ (একটি গুরু) যুক্ত হয়। বিষমচরণে দুটি ছ-গণ থাকলে মোট বারটি মাত্রা হয় এবং সমচরণে এর সঙ্গে ত-গণ অর্থাৎ আরও তিনটি মাত্রা যোগ করলে পোনেরো মাত্রা হয়; দ-গণ যোগ করলে মাত্রাসংখ্যা হয় চোদ্দ, এটি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু শার্ঙ্গদেব বলছেন, সাধারণ নিয়ম ছাড়াও এই প্রবন্ধ লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে বা শিল্পীর ইচ্ছানুসারে গাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে; কেন না, কুম্ভকর্ণের মতানুসারে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পদে দশ বা অষ্ট মাত্রার সমাবেশ হচ্ছে।

"জয় জগদীশ হরে"—এই ধ্রুব অংশটিতে কুম্ভ ভ্রমর নামক একটি ছন্দ যোজিত করেছেন। কাশী সংস্কৃত সিরিজের "বৃত্তরত্নাকর" গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় এই ছন্দের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে।

এই কীর্তিধবল প্রবন্ধ সম্বন্ধে কুম্ভকর্ণ আরো বলছেন—

ছন্দসা কীর্তিপূর্বেণ ধবলেন বিনির্মিতৈঃ।
পাদান্তাভোগরুচিরস্ততঃ পাটস্বরাঙ্কিতঃ॥

সাধারণ নিয়মানুসারে ধবলপ্রবন্ধ উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব—এই দুই ধাতুদ্বারা নিবদ্ধ। গীতের পূর্বার্ধ উদ্‌গ্রাহ এবং উত্তরার্ধ ধ্রুব। আভোগ অংশটি পৃথক্‌ভাবে কর্তব্য।[১] কুম্ভকর্ণের উদ্ধৃত শ্লোক অনুসারে বোঝা যায়, তিনি পৃথক্‌ভাবে আভোগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তদীয় প্রবন্ধের শেষে পাট বা মৃদঙ্গের বোল উচ্চারিত হত এবং স্বরানুষ্ঠান বা সর্গমেরও অনুষ্ঠান করা হত।

কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধটিতে মধ্যমাদি রাগ এবং আদিতালের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু জয়দেব এই গীতে মালব রাগ এবং রূপক তাল নির্দিষ্ট করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ "কেশব ধৃতমীনশরীর" এই অংশটিতে অর্ধমাগধী রীতির প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাচীন সংগীতে একটি শব্দের পর পর তিন বার উচ্চারণ হলে তাকে বলা হত মাগধী পদ্ধতি এবং একটি শব্দের দ্বিরুক্তি ঘটলে তাকে বলা হত অর্ধমাগধী রীতি। যেমন —"দেবং রুদ্রং বন্দে" —এই কথাটি যদি "দেবং দেবং রুদ্রং রুদ্রং বন্দে" এই ভাবে গাওয়া হয়, তবে সেটি হল অর্ধমাগধী রীতি। কুম্ভকর্ণ

১. ত্রিষপি ধবলভেদেষু পূর্বার্ধমুদ্‌গ্রাহঃ উত্তরার্ধং ধ্রুবঃ আভোগঃ পৃথক্‌কর্তব্যঃ—
কল্লিনাথ। টীকা, সঙ্গীতরত্নাকর

"কেশব" শব্দটি দুবার উচ্চারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন—"গানবেলায়াং কেশব কেশব ইতি কীর্তনং দ্বিরুক্তিঃ ॥ অর্ধমাগধী রীতিঃ ॥"

দ্বিতীয় প্রবন্ধ—হরিবিজয়মঙ্গলাচার

গীতগোবিন্দের দ্বিতীয় গীত "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল···" প্রবন্ধটির নাম কুম্ভকর্ণ দিয়েছেন—হরিবিজয়মঙ্গলাচার। এটিতে জয়দেব গুর্জরীরাগ এবং নিঃসার তাল প্রয়োগ করেছিলেন; কুম্ভকর্ণ ললিত রাগ এবং লঘু আদিতাল যোজনা করেছেন। এই গানটিকে মঙ্গলনামক প্রবন্ধপর্যায়ের অন্তর্গত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের শেষ পদ— "শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি।" কুম্ভকর্ণ "মঙ্গল" নামক শব্দের উল্লেখে এটি যে "মঙ্গল" প্রবন্ধের অন্তর্গত ছিল, সেটিই বোঝাতে চেয়েছেন। শার্ঙ্গদেব সংগীতরত্নাকরে মঙ্গল প্রবন্ধের বর্ণনা দিয়েছেন—

কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ।
বিলম্বিতলয়ে গেয়ং মঙ্গলচ্ছন্দসাথ বা ॥

মঙ্গলপদযুক্ত মঙ্গলপ্রবন্ধ কৈশিকী বা বোট্টরাগ অবলম্বনে বিলম্বিত লয়ে অথবা মঙ্গলছন্দ অবলম্বনে গীত হয়। মঙ্গলপদ কি রকম হওয়া উচিত, সেটি বোঝাবার জন্য সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলছেন—"শঙ্খচক্রাব্জকোককৈরবাদিশংসিভিরিত্যর্থঃ"। মঙ্গলছন্দের লক্ষণ এবং উদাহরণ সঙ্গীতরত্নাকরে প্রদত্ত হয়েছে—

পঞ্চ চকারগণাঃ প্রতিপাদগতাশ্চে-
ন্মঙ্গলমাহুরিদং সুধিয়ঃ খলু বৃত্তম্ ॥

মঙ্গলনামক ছন্দ অনুসারে প্রতি পাদে পাঁচটি করে চ-গণের অস্তিত্ব থাকবে। সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়ী দুটি গুরুমাত্রার সন্নিবেশে একটি চ-গণ হয়। এই দুটি গুরুমাত্রাকে চারটি লঘুমাত্রায় ভেঙে নিলেও কোন দোষ হয় না। তা হলে এটি দাঁড়ায় এই রকম—

পঞ্চচ। কারগ। ণাঃ প্রতি। পাদগ। তাশ্চে।
ন্মঙ্গল। মাহুরি। দং সুধি। য়ঃ খলু। বৃত্তম্।

এই ভাবে প্রতি পাদে পাঁচটি চতুর্মাত্রিক গণ সম্পাদিত করে মঙ্গলছন্দের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কুম্ভকর্ণও এই সূত্রটিই উদ্ধৃত করেছেন।

মঙ্গলপ্রবন্ধ ছাড়া আরও একটি প্রবন্ধ ছিল, তার নাম "মঙ্গলাচার" প্রবন্ধ। কুম্ভকর্ণ মঙ্গলাচার প্রবন্ধে এই গীতের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি তাঁর সংগীতরাজ নামক গ্রন্থ থেকে মঙ্গলাচার প্রবন্ধের পরিচয় উদ্ধৃত করেছেন—

ছন্দসা মঙ্গলাখ্যেন খননং (?) গদ্যপদ্যয়োঃ।
আলাপশ্চ প্রতিপদং নানাগমকপেশলঃ ॥
ধ্রুবং প্রতিপদং রাগো ললিতস্তাল উচ্যতে।
আদিতালঃ স্বরাস্তেতাঃ প্রবন্ধে তে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
স হরিবিজয়াখ্যশ্চ মঙ্গলাচার উচ্যতে।

হরিবিজয়মঙ্গলাচার নামক প্রবন্ধ মঙ্গলছন্দে গদ্য এবং পদ্যের সংমিশ্রণে বিরচিত। এর প্রতি পদে আলাপের অনুষ্ঠান এবং নানাপ্রকার গমকের প্রয়োগ হয়। প্রতি পদে ধ্রুবের আবৃত্তি হয়ে থাকে। গীতটি ললিত রাগে আদিতালে গাওয়া হয়। এতে স্বরানুষ্ঠানও কর্তব্য।

আলাপের অনুষ্ঠানের নিমিত্তই কুম্ভকর্ণ প্রতি পদের শেষে একটি "এ"-কার যোগ করেছেন এবং এই "এ"কারটিকে নির্দেশ করে বলেছেন—"এ"-কারাদ্যালাপো জ্ঞেয়ঃ॥ প্রতি পদেই "জয় জয় দেব হরে"—এই ধ্রুবটি যোজিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধের শেষ পদ—"মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি জয় জয় দেব হরে।" মঙ্গল শব্দের তাৎপর্য পূর্বেই বলা হয়েছে। "উজ্জ্বল" শব্দ সম্বন্ধে কুম্ভকর্ণ বলছেন—"রম্যগানাদ্যখিলৈর্গীতগুণৈর্যুক্তং ভীতশঙ্কিতাদিদোষরহিতম্।" সংগীতরত্নাকরে এই গুণটিকে বলা হয়েছে "ছবিমান" বা দীপ্তিসম্পন্ন গীতক্রিয়া। কণ্ঠের গুণে অনেক সময় সংগীত উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। টীকাকার সিংহভূপাল এই শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলছেন—যতশ্চ শব্দে জ্যোতিঃ প্রতীয়তে।

কুম্ভকর্ণ বলছেন—শ্রিতকমলাকুচেত্যাদি মঙ্গলং নাম ছন্দঃ। পূর্বে মঙ্গল ছন্দের বিষয় বলা হয়েছে। এই গানটি উক্ত ছন্দে এই ভাবে বিন্যস্ত হবে—

শ্রিত কম। লা—কু চ। ম ন্ ড ল। ধৃ ত কু ন্। ড ল এ —। এই ভাবে এতে পাঁচটি চগণের প্রয়োগ হয়। ছন্দপূর্তির পরে শেষের এ-কারটি আরও দীর্ঘায়িত করে আলাপের নিয়মে গাওয়া হত।

পরবর্তী "পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভ······" এবং "বসন্তে বাসন্তী···" এই দুটি শ্লোকে জয়দেব কোন বিশেষ সুর সংযোগ করেন নি। কুম্ভকর্ণ এই দুটিতে বসন্ত রাগ প্রয়োগ করেছেন।

তৃতীয় প্রবন্ধ—মাধবোৎসবকমলাকর

গীতগোবিন্দের "ললিতলবঙ্গলতা···" এই তৃতীয় প্রবন্ধটিতে জয়দেব বসন্তরাগ এবং যতিতাল যোজিত করেছিলেন। কুম্ভ যতিতালের বদলে ঝম্পাতালের প্রয়োগ করেছেন। এই প্রবন্ধের তিনি নাম দিয়েছেন—মাধবোৎসবকমলাকর। এই গীতের বর্ণনা উদ্ধৃত করছি—

রচিতং গদ্যপদ্যাদ্যৈর্বসন্তে পার্থিবোৎসবে।
বসন্তরাগে ঝম্পাখ্যতালে মধ্যলয়াঞ্চিতে॥
গলমালপ্তিভূয়িষ্ঠঃ পূর্ণকল্পঃ প্রকীর্তিতঃ।
পূর্তৌ পুনস্তেন পাটস্বরাঞ্চিতবিরাজিতঃ॥
মাধবোৎসবকমলাকরনামা প্রবন্ধরাট্॥
ইতি মাধবোৎসবকমলাকরনামা তৃতীয়ঃ প্রবন্ধঃ॥

কুম্ভকর্ণের টীকা অনুসারে জানা যাচ্ছে, প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রথমেই ধ্রুব অংশটি এক বার গাওয়া হত। এ ক্ষেত্রেও "বিহরতি হরিরিহ···" এই পদটি প্রথমে আচরণ করবার নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে। প্রথমে ধ্রুব এবং তার পর তিনটি পদ অনুষ্ঠিত হবার পর—"মদনমহীপতিকনক-দণ্ডরুচি…" এই পদের পূর্বে কিঞ্চিৎ আলাপ যোজনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি শেষ হচ্ছে "শ্রীজয়দেবভণিতম্…" এই পদে। এইখানে তেনকের অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে। তার পরে পাট অর্থাৎ মৃদঙ্গবাদ্যের বোল উচ্চারণ এবং অতঃপর স্বরাচরণ নির্দিষ্ট হয়েছে।

শেষ পদের টীকায় কুম্ভকর্ণ একবার গুর্জরীরাগের উল্লেখ করেছেন। এই অংশে তিনি গুর্জরীরাগ প্রয়োগ করেছেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। ঝম্পাতাল ছাড়া লয় নামক একটি ছন্দের উল্লেখও তিনি করেছেন। গুর্জরীরাগ এবং লয়তাল আংশিকভাবে প্রযুক্ত হলেও গানটি প্রধানতঃ বসন্তরাগে ঝম্পাতালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চতুর্থ প্রবন্ধ—সামোদদামোদর ভ্রমরপদ

"চন্দনচর্চিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী…"—এইটি চতুর্থ প্রবন্ধ। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের নাম "সামোদদামোদর," এর সঙ্গে মিলিয়ে কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন—সামোদদামোদর ভ্রমরপদ। এই প্রবন্ধের যে লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, সেটি উদ্ধৃত হল :—

যত্র স্যাৎগুর্জরীরাগস্তালো ঝম্পেতি ভাগশঃ।
যথাশোভং প্রয়োগোঽপি গদ্যপদ্যাঙ্কিতান্তরঃ॥
আভোগান্তে স্বরাঃ পাটাঃ পুনঃ পদ্যানি কানিচিৎ।
সামোদদামোদরাখ্যঃ প্রবন্ধো ভ্রমরঃ পদম্॥
ইতি সামোদদামোদরভ্রমরপদনামা চতুর্থঃ প্রবন্ধঃ॥

এই গীতটিতে জয়দেব কর্তৃক নির্দিষ্ট রামকিরী রাগ এবং যতি তালের পরিবর্তে কুম্ভকর্ণ গুর্জরীরাগ এবং ঝম্পা তাল প্রয়োগ করেছেন। প্রবন্ধের অন্তরভাগে গদ্য এবং পদ্যের যোজনা করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কুম্ভকর্ণের বর্ণনা অনুসারে অনুমান হয়, স্থানে স্থানে "প্রয়োগ" নামক গীতক্রিয়ার অনুষ্ঠান হত। "যথাশোভং প্রয়োগোঽপি গদ্য-পদ্যাঙ্কিতান্তরঃ"—এই বাক্যের অর্থ এই হতে পারে যে, গীতের অন্তরভাগে শোভনভাবে গদ্য এবং পদ্যের সন্নিবেশ করা হত। অথবা "প্রয়োগোঽপি"—এই শব্দে "প্রয়োগ" নামক একটি রূপবন্ধের সন্নিবেশ করা হয়েছে, এই অনুমানও অসংগত নয়। "প্রয়োগ" শব্দের অর্থ আলাপের মত সংগীতাচরণ। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে বলছেন—আলাপোগমকালাপ্তির-ক্ষরৈর্বর্জিতা মতা। সৈব প্রয়োগশব্দেন শার্ঙ্গদেবেন কীর্তিতা॥ অক্ষরবর্জিত গমকবিশিষ্ট স্বরের আলাপকে বলে "প্রয়োগ"। ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখা গেছে যে, কুম্ভকর্ণ গীতের স্থানে স্থানে এই প্রকার আলাপের অবকাশ রেখেছেন। অতএব এ ক্ষেত্রেও "প্রয়োগ" শব্দ আলাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—এ অনুমান অসংগত নয়।

কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধে আভোগের পরে স্বর এবং পাটানুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন। "শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্"—এই শেষ পদটির পরে তিনি টীকায় বলছেন—"অত্র স্বরা ঋষভাদ্যা পাটাঃ," অর্থাৎ এই স্থানে যে স্বরানুষ্ঠান বা সর্গম বিধেয়, সেটি

ঋষভ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। গুর্জরী রাগের গ্রহ (যে স্বর প্রারম্ভে উচ্চারিত হয়) এবং অংশ (প্রধান) স্বর হচ্ছে ঋষভ—এই কারণেই কুম্ভ এই স্বরটির বিশেষ উল্লেখ করেছেন।[১] স্বরানুষ্ঠানের পর পাটানুষ্ঠান এবং তৎপরে গীতশেষে পদ্যাংশের আবৃত্তি বিধেয়।

কুম্ভকর্ণ আভোগাংশের টীকায় "লয়" নামক একটি ছন্দের উল্লেখ করেছেন। এর লক্ষণ দিয়েছেন—মুনিষগণৈর্লয়মামনন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ। তদুক্তং ছন্দশ্চূড়ামণৌ চিলয় ইতি॥ সঙ্গীত-রত্নাকর অনুযায়ী এই তালে পর পর একটি গুরু, একটি লঘু, তিনটি প্লুত, একটি গুরু এবং তিনটি দ্রুত মাত্রার সমাবেশ নির্ধারিত হয়েছে।[২]

"ভ্রমরপদ" শব্দটির তাৎপর্য বোঝা দুঃসাধ্য। তবে সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথের[৩] বিবৃতি অনুসারে জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ গায়ক গোপালনায়ক "রাগকদম্বক" শ্রেণীর অন্তর্গত ভ্রমর নামক এক প্রকার গীতানুষ্ঠানে পারদর্শী ছিলেন। এই প্রবন্ধে বিবিধ রাগ এবং তালের প্রয়োগ হত।

অক্লেশকেশব নামক দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে শ্লোকটি আছে, জয়দেব তাতে কোন স্বর নির্দেশ করেন নি। কুম্ভকর্ণ এই শ্লোকটিতে ধন্নাসী রাগ এবং বর্ণযতি তাল প্রয়োগ করেছেন। টীকার প্রারম্ভে তিনি বলছেন—

ধন্নাসীরাগেণ গীয়তে॥

ভুবনেশপাদকমলং প্রণম্য কুম্ভো নৃপতিরতিবিমলম্।

জয়দেবরচিতমাতুং যুনক্তি যুক্তেন ধাতুনা গাতুম্॥

জয়দেবরচিত "মাতু" অর্থে জয়দেবরচিত পদ। সংগীতশাস্ত্রানুসারে গীতের বাক্যাংশকে মাতু বলে এবং উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ—এই কলিগুলকে বলে "ধাতু"।

এই গীতটিতে কুম্ভকর্ণ বর্ণযতি তাল প্রয়োগ করেছেন। বর্ণযতি তালের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন—"লঘুশ্চৈকো দ্রুতদ্বয়ম্" অর্থাৎ একটি লঘু এবং দুটি দ্রুতমাত্রার সংযোগে বর্ণযতি তাল সম্পূর্ণ হচ্ছে। রত্নাকরের মতে বর্ণযতি তাল—"লৌ দৌ বর্ণযতির্ভবেৎ"। অর্থাৎ, দুটি লঘু এবং দুটি দ্রুতের সহযোগে বর্ণযতি তাল রচিত হয়। কুম্ভ রত্নাকরনির্দিষ্ট বর্ণযতি তাল অনুসরণ করেন নি।

পঞ্চম প্রবন্ধ—মধুরিপুরত্নকণ্ঠিকা

"সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনি···" কুম্ভকর্ণের "মধুরিপুরত্নকণ্ঠিকা" নামক পঞ্চম প্রবন্ধ। এই গীতটিতে জয়দেব-প্রযুক্ত গুর্জরীরাগ এবং যতিতালের পরিবর্তে কুম্ভকর্ণ ধন্নাসিকা রাগ এবং বর্ণযতিতাল প্রয়োগ করেছেন। এই প্রবন্ধের বর্ণনায় তিনি বলেছেন :—

১. গুর্জরিকামান্তা রিগ্রহাংশা মধ্যমভাক্।
রিতারা রিধভূয়িষ্ঠা শৃঙ্গারে তাড়িতা মতা। সঙ্গীতরত্নাকর

২. গলৌ প্‌ত্রয়ং বক্রঃ প্‌তোবিন্দুত্রয়ং লয়েঃ, সঙ্গীতরত্নাকর, পঞ্চমস্তালাধ্যায়ঃ

৩. সঙ্গীতরত্নাকর, প্রবন্ধাধ্যায়—কল্লিনাথের টীকা পৃ. ২৮৩ অ্যাডায়ার সংস্করণ

রাগো ধন্নাসিকা যত্র তালো বর্ণযতিঃ স্মৃতঃ।
চম্পূবন্ধপ্রয়োগান্তে গমকানেকবিস্তরঃ॥
তদন্তে স্যুঃ স্বরান্তেনাঃ পাটাঃ শুচিরসাঙ্কিতাঃ।
প্রবন্ধোঽয়ং মুররিপোঃ পুরস্তাদ্রত্নকণ্ঠিকা॥

এই লক্ষণ থেকে মনে হয়, এই সব গীতে বিস্তারেরও বেশ সুযোগ ছিল। চম্পূর উল্লেখে এই সকল গীতে কিছু গদ্যাংশ যোজিত হত বলে মনে হয়; কেন না, গদ্যাংশ এবং পদ্যাংশ মিলিয়েই চম্পূ প্রবন্ধ প্রস্তুত হত। এই গীতের ভণিতা-অংশে প্রয়োগ বা আলাপ এবং তেনক (মঙ্গলোচ্চারণ), তালের বোল প্রভৃতি যোজনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি গানের শেষে স্বর-তাল প্রভৃতির সহযোগে তাকে উজ্জ্বল করে গানটি জমিয়ে তোলা হত। ভণিতা-অংশটি লয় নামক ছন্দে গান করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও অনেক ক্ষেত্রে ভণিতাটি উক্ত ছন্দেই গীত হয়েছে। এর পরের শ্লোকটিতে ভৈরব রাগ প্রযুক্ত হয়েছে। জয়দেব এই শ্লোকটির জন্য কোনও রাগ নির্দেশ করেন নি।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ—অক্লেশকেশবকুঞ্জরতিলক

পরবর্তী গীত "নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্…" কুম্ভকর্ণের "অক্লেশ-কেশবকুঞ্জরতিলক" নামক ষষ্ঠ প্রবন্ধ। জয়দেবপ্রদত্ত সুর ছিল মালব রাগ (কুম্ভ এটিকে "মালব-গৌড়" উদ্ধৃত করেছেন) এবং তাল একতালী। কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধে ভৈরবরাগ এবং বর্ণযতিতাল প্রয়োগ করেছেন। তাঁর সঙ্গীতরাজ নামক গ্রন্থ থেকে এই প্রবন্ধের লক্ষণ উদ্ধৃত হয়েছে :—

গীতৌ ভৈরবরাগেণ তালে বর্ণযতৌ যথা।
আভোগান্তাস্থিতৈঃ পাটৈঃ স্বরৈঃ পদ্যাঙ্কিতস্ততঃ॥
অক্লেশকেশবাদিশ্চ কুঞ্জরতিলকাভিধঃ।
ইতি অক্লেশকেশবকুঞ্জরতিলকনামা ষষ্ঠপ্রবন্ধঃ॥

এ ক্ষেত্রেও আভোগ অর্থাৎ "শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্…" এই পদের পরে পাট এবং স্বর উচ্চারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পদটিতেও লয় নামক ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতেও সুর যোজনা করা হয়েছে, তবে "সর্বত্র স্থিতলয়া গীতিঃ।"

সপ্তম প্রবন্ধ—মুগ্ধমধুসূদনহংসক্রীড়

কুম্ভকর্ণ গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোকটি গৌড়কৃতি রাগে গাইবার নির্দেশ দিয়েছেন। জয়দেব এই শ্লোকে কোন সুর অর্পণ করেন নি। প্রথম দুটি শ্লোকের পর সপ্তম প্রবন্ধ "মামিয়ং চলিতা…" এই গীতটিতেও গৌড়কৃতি রাগই যোজনা করা হয়েছে। জয়দেব এই প্রবন্ধে গুর্জরীরাগ প্রদান করেছিলেন। তিনি এর সঙ্গে যতিতাল যুক্ত করে-

ছিলেন, কুম্ভ তার বদলে প্রয়োগ করেছেন প্রতিমণ্ঠ তাল। সর্গের নামের সঙ্গে মিলিয়ে এই প্রবন্ধের নামকরণ হয়েছে "মুগ্ধমধুসূদনহংসক্রীড়" প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের আভোগ অংশ হচ্ছে—"বর্ণিতং জয়দেবকেন হরিরিদং প্রবণেন। কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন।" এই পদটির পরে পাট ও স্বরানুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়েছে। বাকি পদগুলি পদ্যাংশ হলেও সুরেই আবৃত্তি করা হত বলে মনে হয়।

অষ্টম প্রবন্ধ—হরিবল্লভ-অশোকপল্লব

চতুর্থ সর্গের প্রথম গান "নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্..." কুম্ভকর্ণের "হরিবল্লভ-অশোকপল্লব" নামক অষ্টম প্রবন্ধ। কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন—

প্রতিমণ্ঠতালেন রাগে দেশাক্ষসংজ্ঞিতে।
পদাৎ তুর্যাক্ষরৈর্যুক্তো পদাৎ সংগমতাস্তথা॥

এই শ্লোকে "পদাৎ তুর্যাক্ষরৈর্যুক্তো পদাৎ সংগমতাস্তথা"—এই কথাটির প্রকৃত অর্থ বোঝা কঠিন। তুর্যাক্ষর অর্থে চারটি অক্ষরের সমষ্টিগত তালের একটি খণ্ড বোঝানো হয়েছে বলে মনে হয় এবং উভয় চরণই সমান ভাবে গাওয়া হবে—বোধ করি, এই রকম ইঙ্গিতই করা হয়েছে। প্রতিমণ্ঠ তাল ষণ্মাত্রিক। এর বিন্যাস হচ্ছে পর পর দুটি লঘু, দুটি গুরু এবং দুটি লঘু। কিন্তু, এই দুটি গুরুকে ভেঙে চারটি লঘুতে পরিণত করলেই এটি অষ্টমাত্রিকে রূপান্তরিত হয়। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি ভাবে এটিকে দেখান হয়েছে, এ যুগে সেটি লিখে বোঝানো অসম্ভব। এই প্রবন্ধটি অবশ্য চতুর্মাত্রিক ছন্দেই বিন্যস্ত রয়েছে। যথা—

নিন্দতি। চন্দন। মিন্দুকি। রণমনু। বিন্দতি। খেদম। ধীরম্। ০০০০।
ব্যালনি। লয়মিল। নেনগ। রলমিব। কলয়তি। মলয়স। মীরম্। ০০০০।

এর পরে বলা হয়েছে :—

আকারোপচিতালাপগমকাকুলবিগ্রহঃ।
আভোগস্তেনকৈঃ পাটৈঃ প্রচুরৈরতিপেশলঃ॥
হরিবল্লভপূর্বোঽয়মশোকপল্লবঃ স্মৃতঃ॥
ইতি হরিবল্লভ-অশোকপল্লবনামাষ্টমঃ প্রবন্ধঃ॥

"আকারোপচিতালাপ" এই কথাটির অর্থ এই যে, আলাপটি "আ—" এই স্বর ধরে করতে হবে। উপরোক্ত শ্লোকের যে তালাংশ বিন্দুচিহ্নে প্রদর্শিত হয়েছে, সেই সব স্থানেই সম্ভবতঃ এই ভাবে গেয়ে তালপূর্তি করা হত।

এই প্রবন্ধে জয়দেব কর্ণাট রাগ এবং একতালী তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ তার বদলে দেশাক্ষ রাগ (দেশাখ্য ?) এবং প্রতিমণ্ঠ তাল প্রয়োগ করেছেন। যথানিয়মে "সা বিরহে তব দীনা" এই ধ্রুবপদটি আচরণ করে এই প্রবন্ধটি আরম্ভ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের আভোগ অংশটিতে বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতিসখীবচনং পঠনীয়ম্॥

এই শ্লোকের "নটনীয়ম্" শব্দ সম্পর্কে কুম্ভকর্ণ টীকায় বলেছেন—নটশব্দেন নাট্যস্যাভিনয়প্রাধান্যাদভিনয়ো বিবক্ষিতঃ। অথবা নটনীয়মিত্যাস্বাদনীয়ম্। রসনীয়মিতি যাবৎ। নাট্যশব্দো রসে মুখ্যঃ ইতি ভারতীয়ে। কিম্ভূতমিদম্। সখীমধিকৃত্য বর্তমানম্। তর্হি হরিবিরহাকুলবল্লবযুবত্যা রাধায়াঃ সখ্যা বচনং পঠনীয়ম্। জয়দেবভণিতেষ্বিদমেব সারমিত্যর্থঃ। এ ক্ষেত্রে নটনীয় শব্দটির অর্থ পাঠকালে চিত্তে আস্বাদনীয় বা রসনীয়, এরূপ করাই সমীচীন। কিন্তু গীতগোবিন্দ নাট্যরূপে অভিনীত হওয়ার প্রসিদ্ধি থাকাতে অভিনয় বা সাক্ষাৎ নটনও বিবক্ষিত হতে পারে। তবে কুম্ভকর্ণ পঠনীয় ভাবটিই গ্রহণ করেছেন।

এই আভোগ অংশে যথারীতি তেন এবং পাট প্রচুর পরিমাণে এবং অতি পেশল ভাবে অর্থাৎ অতি কোমল এবং মনোরম ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

নবম প্রবন্ধ—স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়

"স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্..." কুম্ভকর্ণের "স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়" নামক নবম প্রবন্ধ। এটি জয়দেবপ্রদত্ত দেশাখ্য রাগ এবং একতালী তালের পরিবর্তে কুম্ভকর্তৃক মালবশ্রী রাগে এবং নিঃসারুকতালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। টীকার শেষাংশে বলা হয়েছে—"বাগ্‌গেয়কারনামাঙ্কিতপদস্তেনসন্ততিঃ। ততঃ পাটাঃ পদানি স্যুঃ পঞ্চষাণি রসোঽত্র যঃ।" বাগ্‌গেয়কার বলতে গাতার নাম বোঝায়। এ ক্ষেত্রে এটি জয়দেবের ভণিতাযুক্ত পদ বোঝাচ্ছে। এটি আভোগ অংশ এবং যথারীতি এখানে তেন এবং পাট অনুষ্ঠান যোজনা করা হয়েছে। "পঞ্চষ" শব্দের অর্থ হচ্ছে পঞ্চ বা ষষ্ঠ পরিমাণ ভাগ। পাঁচটি-ছটি পদও এতদ্দ্বারা বোঝা যেতে পারে। আভোগের পরে যে পদসংখ্যা গাওয়া হবে, সেটি যেন পাঁচ কিম্বা ছয়টি পদের মধ্যে নির্দিষ্ট থাকে, সেটাই এই পঞ্চষ শব্দে বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আভোগের পর আরও পাঁচটি শ্লোক বা পদ গেয়ে সর্গটি শেষ হচ্ছে।

কুম্ভকর্ণ তদীয় সঙ্গীতরাজ নামক গ্রন্থ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন :—

মালবশ্রীঃ স্মৃতো রাগস্তালো নিঃসারুসংজ্ঞকঃ।
বাগ্‌গেগয়কারনামাঙ্কিতপদস্তেন সন্ততিঃ॥
ততঃ পাটাঃ পদানি স্যুঃ পঞ্চষাণি রসোঽত্র যঃ।
শৃঙ্গারো বাসুদেবস্য ক্রীড়নং রাসকাদিভিঃ॥
ছন্দোঽপি রাসকো জ্ঞেয়ং স্বেচ্ছয়া বা কৃতং ভবেৎ।
স্নিগ্ধমধুসূদনোঽয়ং রাসাবলয়নামকঃ॥
প্রবন্ধঃ পৃথিবীভর্ত্রা প্রবন্ধঃ প্রীতয়ে হরেঃ।
ইতি স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়নামক নবমঃ প্রবন্ধঃ॥

এইখানে "রাসাবলয়" শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রাসাবলয় বা "রাসবলয়" হচ্ছে সূড় নামক প্রবন্ধগোষ্ঠীর একটি রূপ। এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সে কালে গীতগোবিন্দ সূড় শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। কুম্ভকর্ণ এই নবম প্রবন্ধটি রাসবলয় শ্রেণীর গীতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাসবলয় প্রবন্ধ রাসক বা আদি তালে রচিত হত। কুম্ভকর্ণ পূর্বে গানটি নিঃসারু তালে গেয়, এইরকম নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু গীতটি রাসবলয় প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করায় এটি যে রাসকতালে গাওয়া যেতে পারে, সেটিও স্বীকার করেছেন। শার্ঙ্গদেবের মতানুসারে ছ-গণ বা তিনটি গুরু মাত্রায় নিবদ্ধ রাসকপ্রবন্ধের নাম রাসবলয়।

"প্রবন্ধঃ পৃথিবীভর্ত্রা প্রবন্ধঃ প্রীতয়ে হরেঃ" এই চরণটি কুম্ভকর্ণ নিজের সম্বন্ধে আরোপ করেছেন। অর্থাৎ, পৃথিবীর ভর্তা মহারাজ কুম্ভ হরির প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ একটি প্রবন্ধ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধ করেছেন।

দশম প্রবন্ধ—হরিসমুদয়গরুড়পদ

পঞ্চম সর্গের "বহতি মলয়সমীরে · " গীতটি কুম্ভকর্ণের হরিসমুদয়গরুড়পদ নামক দশম প্রবন্ধ। জয়দেব এই গানে দেশবরাড়ী রাগ এবং রূপক তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ প্রয়োগ করেছেন কেদাররাগ এবং নিসারু তাল। কবিনামাঙ্কিত পদের পর স্বল্পতর পাট অনুষ্ঠান কর্তব্য। সঙ্গীতরাজ থেকে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে :—

নিঃসারুতালরচিতা রাগে কেদারসংজ্ঞকে।
কবিনামাঙ্কিতপদাৎ পাটৈঃ স্বল্পতরৈশ্চিতঃ॥
ততঃ পদ্যং বিলাসে সোল্লাসতে জগতীপতেঃ।
ইত্থং হরিসমুদয়াৎ গরুড়িপদ সংজ্ঞকঃ॥
প্রবন্ধঃ পৃথিবীভর্ত্রা হরিভক্তেন বর্ণিতঃ।
ইতি হরিসমুদয়গরুড়পদনামা দশমঃ প্রবন্ধঃ॥

একাদশ প্রবন্ধ

একাদশ সংখ্যক প্রবন্ধ "রতিসুখসারে গতমতিসারে···" এটিও পূর্বের মতই গাইতে হবে কুম্ভকর্ণ আলাদা করে এর কোন বর্ণনা দেন নি; কেবল বলেছেন—গীতিপূর্বোক্তবৎ।

দ্বাদশ প্রবন্ধ—ধন্যবৈকুণ্ঠকুঙ্কুম

ষষ্ঠ সর্গে "পশ্যতি দিশি দিশি·· " গীতটি কুম্ভকর্ণের "ধন্যবৈকুণ্ঠকুঙ্কুম" নামক দ্বাদশ প্রবন্ধ। অপরাপর গ্রন্থে "ধন্যবৈকুণ্ঠ" স্থলে "ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ" দেখা যায়। কুম্ভকর্ণ "ধন্যবৈকুণ্ঠ" আখ্যাটিরই সমর্থন করেছেন। এই প্রবন্ধ জয়দেব গোণ্ডকিরি রাগে রূপক তালে রচনা করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ এটিকে রূপায়িত করেছেন মালবগৌড় রাগে এবং অড্ড তালে। সঙ্গীতরাজ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে :—

মালবীয়ঃ স্মৃতো গৌড়ো রাগস্তালোঽড্ডতালকঃ।
শৃঙ্গারো বিপ্রলম্ভাখ্যো রসো দেবাদিবর্ণনম্ ॥
পদসন্ততিতস্তেনাঃ পাটাঃ স্বরসমুচ্চয়ঃ।
ততঃ পদ্যানি যত্র স্যুর্লয়মধ্যমমানতঃ ॥
স প্রবন্ধবরো জ্ঞেয়ো ধন্যবৈকুণ্ঠকুঙ্কুমঃ ॥

এই প্রবন্ধের প্রতি পদের সঙ্গেই তেনক, পাট এবং স্বরানুষ্ঠান হত বলে মনে হয়। গানটির পরে যে পদ্যাংশ আছে, সেটিও মধ্য লয়ে গীত হত।

ত্রয়োদশ প্রবন্ধ—স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়

সপ্তম সর্গের প্রথম গীত "কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং···" এইটি "স্নিগ্ধমধুসূদন-রাসবলয়" নামক ত্রয়োদশ প্রবন্ধ। চতুর্থ সর্গের "স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্···" এই গীতটিও উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট প্রবন্ধ। তথাপি এখানে কিছু প্রভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে রাগ-স্থানগৌড় এবং তাল বর্ণযতি। জয়দেব এই গানটিতে মালব রাগ এবং যতি তাল প্রয়োগ করেছিলেন। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন :—

রাগঃ স্যাৎ স্থানগৌড়াখ্যস্তালো বর্ণযতী রসঃ।
শৃঙ্গারো বিপ্রলম্ভাখ্যঃ প্রমদা মদনাকুলা ॥
পক্ষনামাবলেঃ পাটা গুম্ফিতা যত্র গীতকে।
স্নিগ্ধমধুসূদনোঽয়ং রাসাবলয়নামকঃ।
প্রবন্ধঃ পৃথিবীভর্ত্রা প্রবন্ধঃ প্রীতয়ে হরেঃ ॥
ইতি স্নিগ্ধমধুসূদনোঽয়ং রাসাবলয়নামা প্রবন্ধস্ত্রয়োদশঃ ॥

এই শ্লোকে "পক্ষনামাবলি" শব্দের অর্থ স্পষ্ট বোঝা গেল না।

চতুর্দশ প্রবন্ধ—হরিরমিতচম্পকশেখর

সপ্তম সর্গের দ্বিতীয় গীত "স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা···" কুম্ভকর্ণের "হরিরমিত-চম্পকশেখর" নামক চতুর্দশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গানটিতে বসন্ত রাগ এবং একতাল যোজনা করেছিলেন। কুম্ভ এটিতে শ্রীরাগ এবং দ্রুতমঠক তাল প্রয়োগ করেছেন। এই সংগীতে পদগুলির সঙ্গে পাট, স্বর এবং তেনকের অনুষ্ঠান করা হ'ত। এ ছাড়া মাঝে মাঝে প্রয়োগ বা গমকযুক্ত আলাপের মত কাজও করা হ'ত। সঙ্গীতরাজ নামক গ্রন্থ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে :—

শ্রীরাগো যত্র রাগঃ স্যাত্তালস্তু দ্রুতমঠকঃ।
বর্ণনং বাসুদেবস্য রতিস্তদ্ব্যত্যয়ে স্ত্রিয়াঃ ॥
পদেভ্যঃ পাটসন্তানং স্বরাস্তেনাস্তথৈব চ।
প্রয়োগশ্চ ভবেৎ যত্র স প্রবন্ধবরঃ স্মৃতঃ ॥

হরিরমিতচম্পকবর্ণেভ্যঃ শেখরাভিধঃ ॥
ইতি হরিরমিতচম্পকশেখরনামা চতুর্দশঃ প্রবন্ধঃ ॥

সালগসূড়পর্যায়ভুক্ত ধ্রুবগীতির "শেখর" এবং "চন্দ্রশেখর" নামক প্রকারভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গানটি উক্ত পর্যায়ের অন্তর্গত হওয়াও বিচিত্র নয়।

পঞ্চদশ প্রবন্ধ—হরিরসমন্মথতিলক

সপ্তম সর্গের তৃতীয় গীত—"সমুদিতমদনে রমণীবদনে…" কুম্ভকর্ণের "হরিরসমন্মথতিলক" নামক পঞ্চদশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গানটিতে গুর্জরী রাগ এবং একতালী তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ এটিতে মল্লার রাগ এবং দ্রুতমঠ তাল প্রদান করেছেন। এই গীতটি গাইবার রীতি একই প্রকার অর্থাৎ যথাক্রমে স্বরাবৃত্তি, পাট এবং তেনকের অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়েছে। গানটি দ্রুতলয়ে গেয়। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে এর পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে :—

দ্রুতমঠেণ তালেন দ্রুতেনৈব লয়েন চ।
মল্লারে রসরাজে স্যাৎ পদানাং সন্ততেঃ পুনঃ ॥
স্বরগ্রামস্তথা পাটাস্তেনা অপি যথাক্রমম্।
হরিরসমন্মথাদ্যস্তিলকাখ্যঃ প্রবন্ধরাট্ ॥
ইতি হরিরসমন্মথতিলকনামা পঞ্চদশঃ প্রবন্ধঃ ॥

তিলকনামক ধ্রুবগীতির একটি প্রকারভেদও পাওয়া যায়।

ষোড়শ প্রবন্ধ—নারায়ণমদনায়াস

সপ্তম সর্গের চতুর্থ গীত—"অনিলতরলকুবলয়নয়নেন…" কুম্ভকর্ণের "নারায়ণমদনায়াস" নামক ষোড়শ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গীতটি দেশবরাড়ী রাগে এবং রূপক তালে রচনা করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ এটিতে বরাটি (বরাড়ী) রাগ এবং বর্ণযতি তাল প্রয়োগ করেছেন। সঙ্গীতরাজ থেকে এই প্রবন্ধেব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে :—

রাগো বরাটিকা যত্র তালো বর্ণযতিস্তথা।
পদানি স্বেচ্ছয়ালাপভূষিতানি যথাদ্যুতি ॥
ততঃ স্বরাশ্চ পাটাশ্চ ততঃ পদ্যানি কানিচিৎ।
ইতি নারায়ণপদান্মদনায়াসনামকঃ ॥
প্রবন্ধঃ ক্ষিতিনাথেন লোকনাথস্য বর্ণিতঃ ॥
ইতি নারায়ণমদনায়াসনামা ষোড়শঃ প্রবন্ধঃ ॥

এই প্রবন্ধে ইচ্ছামত পদগুলিতে আলাপ ও প্রয়োগ আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যথানিয়মে স্বর, পাট এবং পদ্যাদির অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে "শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন। প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন"—এই আভোগ অংশের পর আরও চারটি শ্লোকের রাগসহযোগে আবৃত্তিকেই পদ্যানুষ্ঠান বলে ধরতে হবে। "প্রবন্ধঃ ক্ষিতিনাথেন

লোকনাথস্য বর্ণিতঃ"—এই কথাটিতে "ক্ষিতিনাথ" শব্দটি মহারাজ কুম্ভকর্ণ নিজের প্রতি প্রয়োগ করেছেন এবং "লোকনাথ" শব্দটি নারায়ণ বা বিষ্ণু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেন না, প্রবন্ধটির নামই হচ্ছে "নারায়ণমদনায়াস"। সমগ্র কথাটির অর্থ হচ্ছে এই যে, ক্ষিতিনাথ কুম্ভকর্ণকর্তৃক লোকনাথ নারায়ণবিষয়ক প্রবন্ধটি বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তদশ প্রবন্ধ—লক্ষ্মীপতিরত্নাবলী

অষ্টম সর্গের নাম বিলক্ষলক্ষ্মীপতি। কুম্ভকর্ণ এই সর্গের "রজনীজনিতগুরুজাগর···" গীতটির নাম দিয়েছেন—"লক্ষ্মীপতিরত্নাবলী"। এইটি সপ্তদশ প্রবন্ধ। জয়দেব এটি বেঁধেছিলেন ভৈরবী রাগে এবং যতি তালে। কুম্ভকর্ণ প্রয়োগ করেছেন মেঘ রাগ এবং বর্ণযতি তাল। তদীয় সঙ্গীতরাজ থেকে এই প্রবন্ধের পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে :—

তালো বর্ণযতির্মেঘরাগে দেবাদিবর্ণনম্ ॥
বিপ্রলম্ভাখ্যশৃঙ্গারো রসঃ করুণবেদনম্ ॥
কবিনামাঙ্কিতপদপ্রান্তে পাটস্বরাবলিঃ।
দ্বিত্রাণ্যথ পদানি স্যুরিতি লক্ষ্মীপতেঃ পুরঃ ॥
রত্নাবলীপ্রবন্ধোঽয়ং নিবদ্ধঃ কুম্ভভূভুজা।
ইতি লক্ষ্মীপতিরত্নাবলীনামা সপ্তদশঃ প্রবন্ধঃ ॥

এই প্রবন্ধের ভণিতাযুক্ত আভোগ অর্থাৎ "শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্। শৃণোতু সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্ ॥—এই অংশের পর পাট এবং স্বরের অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে। এর পরে এই সর্গে আরও দুটি শ্লোক বা পদ রয়েছে। এই কারণেই কুম্ভকর্ণ বলছেন "দ্বিত্রাণ্যথ পদানি স্যুঃ"।

অষ্টাদশ প্রবন্ধ—অমন্দমুকুন্দ

নবম সর্গের নাম—মুগ্ধমুকুন্দ। কুম্ভকর্ণ এই সর্গের "হরিরভিসরতি বহতি মধুপবনে···" প্রবন্ধটির নাম দিয়েছেন—"অমন্দমুকুন্দ"। এটি অষ্টাদশ প্রবন্ধ। জয়দেবপ্রদত্ত সুর হচ্ছে গুর্জরী (পাঠভেদে রামকিরি), তাল যতি। কুম্ভকর্ণ অর্পণ করেছেন নটরাগ এবং তৃতীয় তাল। এর পরিচয়ও সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে :—

নট্টরাগস্তৃতীয়াখ্যস্তালো মধ্যে কচিৎ কচিৎ।
পদানাং শোভয়ালাপগুম্ফনাং গানহেতুকাম্ ॥
অন্তে পাটাঃ স্বরাস্তেনান্তদন্তে পদ্যগুম্ফনং।
পদ্যামন্দমুকুন্দাখ্যমকরন্দাভিধানবৎ ॥
প্রবন্ধঃ প্রীতয়ে গীতঃ শ্রীপতেঃ কুম্ভভূভুজা ॥
ইতি শ্রীঅমন্দমুকুন্দোনামাষ্টাদশঃ প্রবন্ধঃ ॥

এই প্রবন্ধেও পদগুলির মধ্যে কখনো কখনো আলাপের আচরণ নির্দিষ্ট হয়েছে। আভোগের

অন্তে অর্থাৎ জয়দেবের ভণিতাযুক্ত পদের পরে পাট, স্বর, তেন প্রভৃতির অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়েছে। এর পরে কয়েকটি পদ্য বা শ্লোক গ্রন্থিত হবে, এমন কথাও বলা হয়েছে। এই সর্গে গীতটির পরে তিনটি শ্লোক গ্রন্থিত হয়েছে।

এই সব গীতের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি গীতের শেষের দিকে বাজনার বোল, স্বরাবৃত্তি প্রভৃতি যোগ করে গানটিকে বেশ জমিয়ে তোলা হত; তার পরে আবার সুরসহযোগে শেষের কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করে ধীরভাবে সমগ্র সর্গটির গায়ন সমাপ্ত করা হত।

অতঃপর কুম্ভ বলছেন—"যদি কৌতুকিনো গানে সঙ্গীতে চাতুরী যদি। রসিকাঃ কুম্ভকর্ণস্য শৃণ্বন্তু বুধসত্তমাঃ ॥" এর সঙ্গে প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকটি স্মরণীয়। এই শ্লোকে জয়দেব বলছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকথাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥

একোনবিংশ প্রবন্ধ—চতুরচতুর্ভুজরাগরাজিচন্দ্রোদ্যোত

দশম সর্গের নাম চতুর্ভুজ। এই সর্গের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী…" গানটির নাম দেওয়া হয়েছে—"চতুরচতুর্ভুজরাগরাজিচন্দ্রোদ্যোত"। এইটি একোনবিংশ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের "প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্। সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥" এই অংশটুকু ধ্রুব। যথানিয়মে এইটি প্রথমে গেয়ে গানটি ধরতে হবে এবং প্রতি পদের পরেও এটি আবৃত্তি করতে হবে। জয়দেব এই গীতের সুর দিয়েছিলেন দেশবরাড়ী এবং তাল যোজনা করেছিলেন অষ্টতালী। কুম্ভকর্ণ বর্ণযতি তাল প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তিনি ক্রমান্বয়ে আঠারোটি রাগের গুম্ফন করে এই গীতটিতে বৈচিত্র্য প্রদান করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলছেন—"ললিতাপি পদ্যরচনা ন ধাতুযোগাদৃতে বিভাতি শুভা। ইতি কুম্ভকর্ণনৃপতির্গায়তি তাং গীতগোবিন্দে।" লালিত্য-গুণযুক্ত পদ্য স্বতই গীতধর্মী—তাকে ধাতু বা কলিতে ভাগ করে সঙ্গীতে রূপায়িত না করলে যেন মন ভরে না। এই কারণে নির্দিষ্ট গীতগুলি ছাড়া অপর কবিতাগুলিকেও কুম্ভকর্ণ গীতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের পরিচয় দিচ্ছেন :—

তালো বর্ণযতী রাগাঃ ক্রমাদষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
মধ্যমাদিশ্চ ললিতো বসন্তো গুর্জরী তথা ॥
ধানসী ভৈরবো গোণ্ডকৃতির্দেশাক্ষিকাপি চ।
মালবশ্রীশ্চ কেদারমালবীয়াদিগৌণ্ডকৌ ॥
স্থানগৌণ্ডশ্চ শ্রীরাগো মল্লারশ্চ বরাটিকা।
মেঘরাগশ্চ ভদ্রাবদ্ধোরণী নিয়তা ইমে ॥

যাবদ্রাগং পদানি স্যুঃ প্রান্তে পাটস্বরাণি তু।
কচিৎ কচিৎ গতালাপভূষিতানি যথারুচি ॥
মিথঃ প্রিয়োক্তিসম্ভারবিপ্রলম্ভরসানি চ।
যত্র স্যাৎ স প্রবন্ধোঽয়ং রাগরাজিবিরাজিতঃ ॥
ইতি চতুরচতুর্ভুজরাগরাজিচন্দ্রোদ্যোতনামা একোনবিংশঃ প্রবন্ধঃ ॥

এই বর্ণনায় অষ্টাদশ রাগের কথা বলা হলেও ষোলটি রাগের পরিচয়ই বিশেষরূপে জানা যায়। বাকি দুটি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই ষোলটি রাগ হচ্ছে—মধ্যমাদি, ললিত, বসন্ত, গুর্জরী, ধানসী, ভৈরব, গোণ্ডকৃতি, দেশাক্ষ, মালবশ্রী, কেদার, মালবগৌণ্ডক, স্থানগৌণ্ড, শ্রী, মহ্লার, বরাটিকা, মেঘ। অপর দুটি রাগের একটি সম্ভবত "ভদ্রাবং" এবং অপরটি "ধোরণী"। ধোরণী—এই নামটি ২২ সংখ্যক প্রবন্ধে পাওয়া যাচ্ছে। এই দুটি রাগ খুবই স্বল্পপরিচিত।

এই প্রবন্ধেও যথারীতি পাট, স্বর, আলাপ প্রভৃতির অবকাশ রাখা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকগুলি স্থিতলয়ে গান করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই গীত থেকেই কুম্ভকর্ণ-পরিকল্পিত গীতগোবিন্দ প্রবন্ধের শেষাংশ নানা বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এটিতে বহু রাগের গুম্ফন করা হয়েছে—এর পরবর্তী গীতটিতে বহু তালের বিচিত্র সংযোগ সংঘটিত হয়েছে।

বিংশতি প্রবন্ধ—শ্রীহরিতালরাজিজলধরবিলসিত

একাদশ সর্গের "বিরচিতচাটুবচনরচনং…" গীতটির নাম দেওয়া হয়েছে "শ্রীহরিতাল-রাজিজলধরবিলসিত" প্রবন্ধ। জয়দেব এটিতে বসন্ত রাগ এবং যতি তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ নন্দ নামক একটি রাগ প্রয়োগ করেছেন। আগের প্রবন্ধটিতে বহু রাগ মিশ্রণের জন্য তার নামের মধ্যে "রাগরাজি" শব্দের উল্লেখ ছিল, এই প্রবন্ধে বহু তাল সংযোজনার জন্য এই নামের সঙ্গে "তালরাজি" শব্দের উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থ থেকে এর পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে :—

আদিতালঃ প্রথমতঃ প্রতিমণ্ঠস্ততঃ পরম্।
চতুর্মাত্রাঽম্বমঠশ্চ তুর্যঃ স্যাদড্ডতালকঃ ॥
তালো বর্ণযতিঃ পশ্চান্নবমাত্রিকমঠকঃ।
নিঃসারুশ্চ তথা ঝম্পা দ্রুতমঠশ্চ রূপকঃ ॥
প্রতিতালস্ত্রিপুটক একতালীতি সংজ্ঞয়া।
এয়োদশ ক্রমাৎ তালাঃ প্রতিতালং পদানি চ ॥
যথা শাতালগুিঘুঞ্জি তাবস্ত্যেব ততঃ পরম্।
কাহলী তুণ্ডকিন্নৌ চ ভুক্তা চ শৃঙ্গশঙ্খকৌ ॥

পটহশ্চ হুড়ুক্কং চ মুরজঃ করটাপি চ।
রুঞ্জা চ ডমরুঢক্কা পাটা এতৎসমুদ্ভবাঃ॥
নিঃসারৌ পটহো ঢক্কা মর্দলস্ত্রিবলী তথা।
করটেতি তথৈতস্যাং প্রধানাক্ষরযোজনা॥
একতাল্যা ডক্কলী চ ত্রিবলী দুন্দুভিস্তথা।
ঘটশ্চতুর্বর্ণ্যকঃ স্যাদধিকা পাটসন্ততিঃ॥
প্রতিতালং প্রয়োগোঽপি রাগো নন্দো নিগদ্যতে।
শৃঙ্গারো বিপ্রলম্ভাখ্যো রস উত্তমনায়কঃ॥
দূতীসংবাদকথনং নায়িকায়ামিহেষ্যতে।
এতৎ স্যাৎ লক্ষণং যচ্চ তালরাজিরসঃ স্মৃতঃ॥
প্রবন্ধঃ কুম্ভভূপেন হরিপ্রবণচেতসা॥
ইতি শ্রীহরিতালরাজিজলধরবিলসিতনামা বিংশতিতমঃ প্রবন্ধঃ

পদগুলিতে ক্রমান্বয়ে তেরটি তাল যোজিত হয়েছে। তালগুলি হচ্ছে—আদি, প্রতিমণ্ঠ, চতুর্মাত্রাযুক্ত মণ্ঠ, অড্ড, বর্ণযতি, নবমাত্রিক মণ্ঠ, নিঃসারুক, ঝম্পা, দ্রুতমণ্ঠ, রূপক, প্রতিতাল, ত্রিপুটক এবং একতালী। এর মধ্যে যেখানে শোভা পায়, সেখানে রাগালাপ যোজনা করবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

গীতশেষে বিবিধ যন্ত্রসহযোগে বিচিত্র তালের সমারোহ সৃষ্টি করা হয়েছে। যন্ত্রাদির মধ্যে বংশীজাতীয় বাদ্য হচ্ছে—কাহলী, তুণ্ডকিনী, শৃঙ্গ এবং শঙ্খ। চর্মবাদ্য—পটহ, হুড়ুক্কা, মুরজ, করটা, রুঞ্জা (রুঞ্জা), ডমরু, ঢক্কা, ঘট, ত্রিবলী এবং দুন্দুভি। প্রথমে কাহলী, তুণ্ডকিনী, শৃঙ্গ এবং শঙ্খের সঙ্গে পটহ, হুড়ুক্কা, মুরজ, করটা, রুঞ্জা এবং ডমরু পাটাক্ষর সমেত বাজাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে "কাহলীতুণ্ডকিন্যৌ চ ভুক্তা চ শৃঙ্গশঙ্খকৌ"—এই লাইনে "ভুক্তা" শব্দটি "মুক্তা" হবে বলে মনে হয়। "ভুক্তা" নামক কোন বাদ্য নেই। শৃঙ্গ ও শঙ্খ সম্বন্ধে "মুক্তা" শব্দটি প্রযোজ্য। কেন না, যখন সবগুলি ছিদ্র থেকে আঙুল তুলে অর্থাৎ মুক্তভাবে বাজানো হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে "মুক্তা"। এ স্থলে শৃঙ্গ এবং শঙ্খের আওয়াজ সঙ্কুচিত না করে মুক্তভাবে প্রকাশ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পর নিঃসারুক তাল অনুসারে পটহ, ঢক্কা, মর্দল, ত্রিবলী এবং করটা—এই বাদ্যগুলি বাজবে।

এখানে "প্রধানাক্ষরযোজনা" শব্দটির একটি তাৎপর্য আছে। বোল্লাবণী নামক এক প্রকার পটহবাদ্যবিধিতে প্রধানাক্ষরযোজনার নিয়ম ছিল। পটহজাতীয় এক একটি বাদ্যের এক একটি প্রধান স্বর আছে, সেটি অক্ষর সহযোগে বোঝানো হয়। যেমন পটহের দেং দেং ধ্বনিটি তার প্রধান স্বর। এই আওয়াজটির বারম্বার ঘোষণাকে বলে প্রধানাক্ষর-যোজনা। এই রকম হুড়ুক্কাযোগে ঝেং ঝেং ধ্বনি, ঢক্কা বা মর্দলে থোং থোং ধ্বনি, ত্রিবলীতে দোং দোং এবং করটায় টেম্ টেম্ ধ্বনির বারম্বার প্রয়োগকেই বলা হয় প্রধানাক্ষরযোজনা[১]। এ ক্ষেত্রে মহারাজ কুম্ভকর্ণ এই প্রক্রিয়াটির প্রয়োগ করেছেন।

১. সঙ্গীতরত্নাকর, তালাধ্যায় পৃ. ৪১১, শ্লোক ১০৮, অ্যাডায়ার সংস্করণ

অতঃপর একতালী তাল অবলম্বনে ঢক্কী, ত্রিবলী, দুন্দুভি এবং ঘটবাদ্য বাজানো হবে। "ঘটশ্চতুর্বর্ণ্যাকঃ" বলতে সম্ভবত এখানে চার শ্রেণীর ঘটবাদকের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি শ্রেণী হচ্ছে—বাদক, মুখরী, প্রতিমুখরী এবং গীতানুগ[১]। অথবা শুদ্ধ, কূট, কূটমিশ্র এবং খণ্ডপাট[২]—এইগুলিও চতুর্বর্ণ্য অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। শাস্ত্রানুসারে মর্দলে যে সব পাটবর্ণের অনুষ্ঠান করা হয়, ঘটবাদ্যেও সেগুলি প্রযোজ্য। এই উপলক্ষে শার্ঙ্গদেব বলছেন—"কথিতাঃ পাটবর্ণা যে মর্দলে তে ঘটে মতাঃ"[৩]।

একবিংশ প্রবন্ধ

"মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে···" গানটি একবিংশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই প্রবন্ধের রাগ নির্দেশ করেছেন—দেশবরাড়ী এবং তাল রূপক। কুম্ভ কেবলমাত্র বরাড়ী রাগেরই উল্লেখ করেছেন। নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত রসিকপ্রিয়া টীকা-সমন্বিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হয়েছে—"রাগমঠতালাভ্যাং" "রাগাড়বতালাভ্যাং" ইতি পাঠৌ। এর মধ্যে একটি যে মঠতাল, সেটি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আড়ব নামক তালের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা গেল না। এই নামের কোন তাল যদি না থাকে, তবে এটি অড্ড-তালেরই অপভ্রংশ বলে মনে করি। এই প্রবন্ধের সঙ্গীতাংশের বিস্তারিত কোন পরিচয় কুম্ভ দেন নি, কেমলমাত্র এইটুকু বলেছেন যে, এই অষ্টপদীতে উদ্‌গ্রাহ অপেক্ষা ধ্রুবেরই বাহুল্য অধিক। এর সঙ্গে এও বলছেন—"তত্রাপি চ প্রতিপদমন্তিমং, খণ্ডং পদান্তরাপেক্ষয়া নবং নবমেতি বোদ্ধব্যম্" অর্থাৎ তথাপি প্রতি পদের অন্তিম খণ্ড পদান্তর অপেক্ষা নতুনভাবে রচিত হবে। এই ভাবে প্রতি পদেরই এক একটি অভিনবত্ব থাকবে এবং বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হবে।

দ্বাবিংশ প্রবন্ধ—সানন্দগোবিন্দরাগশ্রেণীকুসুমাভরণ

একাদশ সর্গের "রাধাবদনবিলোকন···" এই গীতটি হচ্ছে কুম্ভকর্ণের সানন্দগোবিন্দরাগ-শ্রেণীকুসুমাভরণ নামক দ্বাবিংশ প্রবন্ধ। এই সর্গটির নাম "সানন্দদামোদর"। এর সঙ্গে প্রবন্ধের নামেরও মিল রাখা হয়েছে। জয়দেব এই গীতে বরাটী এবং যতি তালের প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ এই প্রবন্ধে রাগ এবং তালের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন। ইতিপূর্বে দুটি প্রবন্ধে ভিন্নভাবে বহু রাগ এবং বহু তালের সমাবেশ ঘটেছে। এই প্রবন্ধটিতে কুম্ভ বিভিন্ন রাগ এবং বিভিন্ন তালের একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কুম্ভকর্ণ এই প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন—

১. সঙ্গীতরত্নাকর—পৃ. ৪৫৯ শ্লোক ১০৩৯,
২. " —পৃ. ৪৫৭ শ্লোক ১০৩৫, ১০৩৬
৩. " —পৃ. ৪৭২ শ্লোক ১০৮৬, অ্যাডায়ার সংস্করণ

ক্রমেণ নট্টকেদারশ্রীরাগস্থানগৌড়কাঃ।
ধোরণী মালবীয়শ্চ বরাটী মেঘরাগকঃ।
মালবশ্রীর্দেবশাখো গৌণ্ডকৃচ্চাথ ভৈরবী।
ধন্নাসিকা বসন্তশ্চ গুর্জরী চ মহ্লারকঃ॥
ললিতঃ সপ্তদশমো রাগাস্তাবন্তি চ ক্রমাৎ।
পদানি তেষু তালাঃ স্যুরিতস্তন্নাম কীর্ত্যতে॥
আদ্যত্রিসপ্তদশমদ্বাদশো দ্রুতমণ্ঠকাঃ।
দ্বিতীয়ে নবমে চৈকাদশে চৈব ত্রয়োদশে॥
পদে পঞ্চদশে সপ্তদশে রূপক ঈরিতঃ।
চতুর্থে প্রতি তালব্যা দ্রুতালঃ পঞ্চমে স্মৃতঃ॥
ত্রিপুটঃ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ স্যাদ্‌দ্রুতপ্রতিমণ্ঠকঃ।
চতুর্দশে ষোড়শে চ ভদ্রঃ স্যাৎ প্রতিতালকম্॥
মধ্যমাদৌ পুনর্মুক্তিঃ শৃঙ্গারঃ স্যাভিলাষয়োঃ।
স্ত্রীপুংসয়োরুত্তমস্য নায়কস্যোপবর্ণনম্॥
কৈশিকী রীতিমাশ্রিত্য পদানাং স্বস্বনামতা।
ছন্দঃ স্বেচ্ছাবিরচিতং রূপকে যত্র দৃশ্যতে॥
স রাগশ্রেণিনামায়ং প্রীতিকৃৎকমলাপতেঃ।
ইতি সানন্দগোবিন্দরাগশ্রেণিকুসুমাভরণ নামা
দ্বাবিংশতিতমঃ প্রবন্ধঃ॥

এই প্রবন্ধের প্রতি পদ অনুসারে ক্রমান্বয়ে সতেরটি রাগ প্রযুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে কিন্তু ষোলটি পদ রয়েছে। কুম্ভকর্ণের প্রদর্শিত রীতি অনুসারে ধ্রুব অংশটি প্রবন্ধের প্রথমে আচরণ করতে হয়। এই হিসাবে আর একটি বেশী ধ্রুব যোজিত হয়ে সতেরটি পদে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হচ্ছে। উপরোক্ত শ্লোক অনুসারে কোন্ পদে কোন্ রাগ এবং কোন্ তাল যোজিত হয়েছে, সেটি নিম্নোক্তরূপে দেখান গেল :—

			রাগ	তাল
১।	ধ্রুব।	হরিমেকরসং···	নট্ট	দ্রুতমণ্ঠক
২।	পদ।	রাধাবদন···	কেদার	রূপক
৩।	ধ্রুব।	হরিমেকরসং···	শ্রী	দ্রুতমণ্ঠক
৪।	পদ।	হারমমলতর···	স্থানগৌড়	প্রতিতাল
৫।	ধ্রুব।	হরিমেকরসং···	ধোরণী	দ্রুতাল (দ্বিতাল বা দ্বিতীয় তাল ?)
৬।	পদ।	শ্যামলমৃদুল···	মালব	ত্রিপুট
৭।	ধ্রুব।	হরিমেকরসং···	বরাটী	দ্রুতমণ্ঠক
৮।	পদ।	তরলদৃগঞ্চল···	মেঘ	ত্রিপুট

			রাগ	তাল
৯।	ধ্রুব।	হরিমেকরসং···	মালবশ্রী	রূপক
১০।	পদ।	বদনকমল···	দেবশাখ	দ্রুতমণ্ঠক
১১।	ধ্রুব।	হরিমেকরসং···	গৌণ্ডকৃতি	রূপক
১২।	পদ।	শশিকিরণ···	ভৈরবী	দ্রুতমণ্ঠক
১৩।	ধ্রুব।	হরিমেকরসং···	ধন্নাসিকা	রূপক
১৪।	পদ।	বিপুলপুলকভব···	বসন্ত	দ্রুতপ্রতিমণ্ঠক
১৫।	ধ্রুব।	হরিমেকরসং···	গুর্জরী	রূপক
১৬।	পদ।	শ্রীজয়দেব···	মহ্লার	প্রতিতাল
১৭।	ধ্রুব।	হরিমেকরসং···	ললিত	রূপক

কুম্ভকর্ণ বলেছেন—গানটির পুনর্মুক্তি হবে মধ্যমাদি রাগে। সম্ভবতঃ এর অর্থ এই যে, প্রবন্ধের পরবর্তী শ্লোকগুলি মধ্যমাদি রাগ আশ্রয় করে গাইতে হবে। উক্ত প্রবন্ধে যে তালসমূহ কুম্ভকর্ণ নির্দেশ করেছেন, সেগুলিই যে কেবলমাত্র প্রয়োগ করা উদ্দেশ্য, এমন নয়। তিনি বলছেন, রূপকের মত গীতে শিল্পী ইচ্ছামত রাগ তাল পরিবর্তন করে নূতনত্ব সৃষ্টি করতে পারবেন। এই "রূপক"[১] একটি বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীত। এতে পদ, কলির বিন্যাস, তাল প্রভৃতি ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করে নূতন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হত।

দ্বাদশ সর্গে গীতগোবিন্দ কাব্যের পরিসমাপ্তি হয়েছে। এই সর্গে বাকি ছয়টি প্রবন্ধ যোজিত হয়েছে।

ত্রয়োবিংশ প্রবন্ধ—মধুরিপুমোদবিদ্যাধরলীলা

দ্বাদশ সর্গের প্রথম প্রবন্ধ "কিসলয়শয়নতলে···" কুম্ভকর্ণের "মধুরিপুমোদবিদ্যাধরলীলা" নামক ত্রয়োদশ প্রবন্ধ। জয়দেব এই প্রবন্ধটি বিভাস রাগ এবং একতালী তালে রচনা করেছিলেন। কুম্ভ এটিতে দেবশাল রাগ প্রয়োগ করেছেন ; তাল যোজনা করেছেন দুটি—বর্ণযতি এবং প্রতিতাল। এই প্রবন্ধের পরিচয় :—

পদানাং দশকং যত্র তালে বর্ণযতৌ ভবেৎ।
ধ্রুবং প্রতিপদং গেয়ং কবিনামাঙ্কিতাৎ পদাৎ ॥
গীতালাপান্তথাশব্দং প্রতিতালে ততঃ পরম্।
পাটাস্তেনাঃ স্বরাশ্চৈব শৃঙ্গারো রস উত্তমঃ ॥
দেবশাখাভিধো রাগঃ প্রবন্ধে সম্প্রদৃশ্যতে।
শ্রীবিদ্যাধরলীলাখ্যঃ শ্রীপতিপ্রীতিকারকঃ ॥
ইতি মধুরিপুমোদবিদ্যাধরলীলা নাম ত্রয়োবিংশঃ প্রবন্ধঃ ॥

১. সঙ্গীতরত্নাকর, প্রবন্ধাধ্যায় শ্লোক ৩৩১-৩৫, পৃ. ৩১৯-২০

এই প্রবন্ধটিতেও পূর্বের মত ধ্রুবসমেত সতেরটি পদ আছে। এর মধ্যে প্রথম দশটি পদ বর্ণযতি তালে গাইতে হবে। পরবর্তী পদগুলি প্রতিতালে গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিতালে আসবার পূর্বে আলাপসংযোগ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে যথাবিধি পাট এবং তেনক আচরণ বিধেয়।

এর পরবর্তী চারটি শ্লোকের প্রত্যেকটিকে কুম্ভকর্ণ এক একটি প্রবন্ধে পরিণত করেছেন। এই গীতগুলির কোন ধ্রুব নেই। আসলে এইগুলি রূপকশ্রেণীর অন্তর্গত। জয়দেব এই শ্লোকগুলিতে কোন রাগ নির্দেশ করেন নি।

চতুর্বিংশ প্রবন্ধ—সুরতারম্ভচন্দ্রহাস

"প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ…" এই শ্লোকটি কুম্ভকর্ণের "সুরতচন্দ্রহাস" নামক চতুর্বিংশ প্রবন্ধ। এই শ্লোকে দেবশাখ রাগ এবং জয়মঙ্গল তাল প্রয়োগ করা হয়েছে। কুম্ভকর্ণ এর বর্ণনা দিয়েছেন :—

জয়মঙ্গলতালেন পদ্যং শৃঙ্গারনির্ভরম্।
গীতাঃ পাটাঃ স্বরাস্তেনা উচ্যন্তে যত্র রূপকে ॥
দেবশাখাভিধে রাগে সুরতারম্ভনামতঃ।
চন্দ্রহাসপ্রবন্ধোঽয়ং প্রবন্ধঃ প্রীতিকৃন্দ্ধরেঃ॥
ইতি সুরতারম্ভচন্দ্রহাসনামা চতুর্বিংশপ্রবন্ধঃ ॥

পূর্বোক্ত রূপকের মত এ ক্ষেত্রেও গীতাংশ, পাট, স্বর, তেন প্রভৃতি ইচ্ছামত সাজিয়ে গাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ—কামিনীহাস

তার পরের শ্লোক—"দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ…" কুম্ভের "কামিনীহাস" নামক পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ। এই গীতটিতে গৌড়ীরাগ এবং বিজয়ানন্দ তাল প্রয়োগ করা হয়েছে। এতেও পদ্য, পাট, স্বর এবং তেন সংযোগ করা হয়েছে। এর বর্ণনা :—

বিজয়ানন্দতালেন গৌড়ীরাগে বিরচ্যতে।
পদ্যং পাটাঃ স্বরাস্তেনা লীলা নায়কসম্ভবা ॥
শৃঙ্গারকৈশিকী রীতিঃ কামতৃপ্তিপুরঃসরঃ।
কামিনীহাসনামায়ং প্রবন্ধঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
ইতি কামতৃপ্তিকামিনীহাসনামা পঞ্চবিংশতিতমঃ প্রবন্ধঃ ॥

ষড়্‌বিংশ প্রবন্ধ—পৌরুষরসপ্রেমবিলাস

পরের শ্লোক—"বামাঙ্কে (অথবা মারাঙ্কে) রতিকেলিসংকুল…" কুম্ভকর্ণের "পৌরুষরস-প্রেমবিলাস" নামক ষড়্‌বিংশ প্রবন্ধ। এটি কর্ণাটবঙ্গাল রাগ এবং জয়শ্রী তালে গেয়। এই গীতেও যথারীতি পদ্য, পাট, স্বর এবং তেন সংযোজিত হয়েছে। এর পরিচয় :—
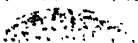
জয়শ্রীসংজ্ঞতালেন পদ্যং পাটাঃ স্বরাস্তথা।
স্তেনাশ্চ যত্র বধ্যন্তে সম্ভোগে রস উত্তমে॥
রাগে কর্পটবঙ্গালে (কর্ণাটবঙ্গালে ?) স পৌরুষরসাৎ পরঃ।
প্রেম্ণা বিলাসনামায়ং প্রবন্ধো মাধবপ্রিয়ঃ॥
ইতি পৌরুষরসপ্রেমবিলাসনামা ষড়্‌বিংশঃ প্রবন্ধঃ॥

সপ্তবিংশ প্রবন্ধ—কামাদ্ভুতাভিনবমৃগাঙ্কলেখা

পরের শ্লোক—"তস্যাঃ পটলপাণিজাঙ্কিতমুরো···" কুম্ভকর্ণের "কামাদ্ভুতাভিনবমৃগাঙ্কলেখা" নামক সপ্তবিংশ প্রবন্ধ। এটিতে মরুক্বতি রাগ এবং যতি তাল প্রযুক্ত হয়েছে। এতেও পদ্য, পাট, স্বর এবং তেন প্রযুক্ত হয়েছে। তেন অংশের পর আলাপও সংযোজিত হয়েছে। এর বর্ণনা :—

যতিতালেন তালেন পদ্যং পাটস্বরাস্তথা।
স্তেনাস্তদন্ত আলাপঃ শৃঙ্গারঃ প্রেমনির্ভরঃ॥
রাগো মরুক্বতির্যত্র স প্রবন্ধো নিগদ্যতে।
কামাদ্ভুতাভিনবতা মৃগাঙ্কলেখাভিধানতঃ॥
ইতি কামাদ্ভুতাভিনবমৃগাঙ্কলেখাভিধঃ সপ্তবিংশঃ প্রবন্ধঃ॥

পরবর্তী আরও দুটি শ্লোক "ব্যাকোশ (অথবা ব্যালোলঃ) কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ···" এবং "ঈষন্মীলিতদৃষ্টি···" প্রবন্ধে পরিণত না হলেও সুরে রূপায়িত হয়েছে ; কুম্ভকর্ণ টীকায় বলছেন—"স্থিতলয়ং গানম্"।

অষ্টবিংশ প্রবন্ধ—শ্রীসুপ্রীতপীতাম্বরতালশ্রেণী

অতঃপর যে গীতটি আছে, এইটিই গীতগোবিন্দের শেষ প্রবন্ধ। জয়দেব এই গীতে রামকিরী রাগ এবং যতি তাল প্রয়োগ করেছিলেন। কুম্ভ গোণ্ড রাগ এবং বহুতাল সংযোজিত করেছেন।

"কুরু যদুনন্দন···" এই অষ্টবিংশতিতম প্রবন্ধের নাম—"শ্রীসুপ্রীতপীতাম্বরতালশ্রেণী"। জয়দেব দ্বাদশ সর্গের নাম দিয়েছিলেন—"সুপ্রীতপীতাম্বর"। এই নামের সঙ্গে মিলিয়ে উক্ত প্রবন্ধের নামকরণ করা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে তালরাজি প্রবন্ধের পরিচয় পেয়েছি, কুম্ভকর্ণ এটির আখ্যা দিচ্ছেন তালশ্রেণী। এর বর্ণনা :—

আদিতালাস্তথা পঞ্চ হরবক্ত্র সমুদ্ভবাঃ।
প্রতিমণ্ঠশ্চতুর্মাত্রো মণ্ঠৈশ্চৈবাড্ডতালকঃ॥
তালো বর্ণযতিশ্চৈব জয়মঙ্গলসংজ্ঞিতঃ।
বিজয়নানন্দনামা চ জয়শ্রীসংজ্ঞকঃ পরঃ॥

প্রতিতালং পদাদি স্যুঃ পাঠাস্তদ্বুভয়ং তথা।
মধ্যে মধ্যে যথাশোভালপ্তিযুক্তির্বিশেষবৎ ॥
বিশেষতো বর্ণযতৌ যদা[১] শ্রীসংজ্ঞিকোঽপি চ।
তেনকাঃ স্যুঃ পদস্থানে প্রতিতালেন বেশ্যতে ॥
মুক্তিপাদা[২]—ক্ষরৈর্যুক্তৈরালাপেন পুরস্কৃতৈঃ।
পাদান্তেব ষোড়শ বৈ তালা একোনবিংশতিঃ ॥
গোণ্ডঃ স্যাদ্দেশতালাদিরাগঃ সর্বপদাশ্রয়ঃ।
ধীরোদাত্তগুণৈর্যুক্তো বর্ণ্য উত্তমনায়কঃ ॥
ছন্দঃ স্যাৎ স্বেচ্ছয়া বন্ধং সমানাদিগুণা দৃশঃ ॥
ইতি শ্রীসুপ্রীতপীতাম্বরতালশ্রেণীনামা অষ্ট বিংশঃ প্রবন্ধঃ ॥

এই প্রবন্ধে প্রতিপদে প্রযুক্ত পর পর ন'টি তালের উল্লেখ করা হয়েছে—আদি, পঞ্চ, প্রতিমঠ, অড্ড, বর্ণযতি, জয়মঙ্গল, বিজয়ানন্দ, জয়শ্রী। প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে পাট আচরিত হবে। মধ্যে মধ্যে শোভন ভাবে আলাপ যোজিত হবে। বিশেষ করে বর্ণযতি এবং জয়শ্রী তালযুক্ত পদের সঙ্গে তেনক অনুষ্ঠিত হবে। পরিশেষে পাটাক্ষর আচরণের পর কিঞ্চিৎ আলাপ অনুষ্ঠানপূর্বক প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি হবে। কুম্ভকর্ণ বলছেন, সবশুদ্ধ ষোলটি পদ এবং উনিশটি তাল এতে যোজিত হবে। প্রতিপদের শেষে ধ্রুবাবৃত্তি ধরলে এতে ষোলটি পদ হয়। উনিশটি তালের মধ্যে ন'টি উল্লিখিত হয়েছে, বাকিগুলি সম্ভবত শিল্পীর ইচ্ছানুসারে প্রযুক্ত হবে, কেন না, কুম্ভকর্ণ এও বলছেন যে, গোণ্ডরাগটি সর্বপদাশ্রিত হলেও বিবিধ দেশী তাল বিভিন্ন পদে প্রযুক্ত হবে। শিল্পীর ইচ্ছানুসারেই যে ছন্দ প্রবর্তিত হবে, এ কথাও তিনি এই বর্ণনায় জানিয়ে দিয়েছেন।

এই গীতের পর যে কটি শ্লোক আছে, তার মধ্যে—"পর্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণা…"এই শ্লোকটি নির্ণয়সাগর-প্রকাশিত কুম্ভের গীতগোবিন্দ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া "ইত্থং কেলিততীর্বিহৃত্য…"এই শেষ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য রয়েছে—অয়ং শ্লোকঃ প্রক্ষিপ্ত ইতি ভাতি। আদর্শপুস্তকান্তরেষ্বদর্শনাৎ।

রসিকপ্রিয়া টীকায় বর্ণিত "রতিসুখসারে…" এবং "মঞ্জুতর কুঞ্জতল…"এই দুটি প্রবন্ধ ব্যতীত আর সবগুলিরই এক একটি নাম পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গীতরাজ গ্রন্থের যে অংশটি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তার ভূমিকায় (পৃ. L III) উক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধ-বিষয়ক অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়বস্তুর নমুনাস্বরূপ কুম্ভবিরচিত গীতগোবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধের নাম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে "হরিশরণকদলীপত্র" এবং "তালরাগার্ণবমুরারিমঙ্গলকুসুম" এই দুইটি প্রবন্ধের নাম পাওয়া যায়। যদিও এই নাম দুটি রসিকপ্রিয়া টীকায় পাওয়া যায় না, তথাপি অনুমান হয়, এই নাম দুটিই উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে যোজিত হয়েছিল।

১. "যদাশ্রীসংজ্ঞিকোঽপি" এইটি "জয়শ্রীসংজ্ঞিকেঽপি" হলে যথার্থবোধক হয়

২. "মুক্তিপাদা" স্থানে "মুক্তিপাটা" হলে যথার্থবোধক হয়

কুম্ভকর্ণ রসিকপ্রিয়া টীকায় যে সংগীতের পরিচয় প্রদান করেছেন, তা থেকে প্রাচীন প্রবন্ধগায়নরীতি কুম্ভের সময়েও অনেক পরিমাণে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। সে যুগের শাস্ত্রবর্ণিত প্রবন্ধরূপের একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা কুম্ভকর্ণপ্রবর্তিত গীতরূপ থেকে পাচ্ছি —এই কারণে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের দিক্ থেকেও রসিকপ্রিয়া টীকা অত্যন্ত মূল্যবান্। তবে, এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, যে অষ্টাবিংশ প্রবন্ধের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি একেবারেই তাঁর নিজস্ব পরিকল্পিত এবং কেবলমাত্র গীতগোবিন্দ গীতিনাট্যেই প্রযোজ্য। কিন্তু তা হলেও সে কালে প্রবন্ধসংগীতে সাধারণভাবে যে রীতিগুলি অনুসৃত হত, যে ষড়ঙ্গের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির পরিচয়ও কুম্ভবর্ণিত গীত থেকে চমৎকারভাবে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ ছাড়া রূপক নামক সংগীতের পরিচয়ও এই গীতগুলি থেকে পাওয়া যায়। বস্তুত পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রচলিত খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে রচিত গীতিনাট্যের এটি একটি দুর্লভ উদাহরণ। কুম্ভকর্ণ যে ভাবে গীতগোবিন্দ গীতিনাট্য প্রস্তুত করেছেন, তাতে তাঁর উত্তম সংগীতপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি প্রবন্ধেই তিনি নূতনত্ব আনতে চেয়েছেন। রাগ, তাল এবং বাদ্যের নানাপ্রকার সমন্বয়ের পরিচয় আমরা তাঁর গীতবিন্যাস থেকে পাই। মধ্যযুগের সংগীতশিল্পের দিক্ থেকে এটি একটি বিশিষ্ট কীর্তি।

রসিকপ্রিয়া টীকা অনুসারে
জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধে জয়দেব এবং কুম্ভকর্ণ প্রযুক্ত রাগ এবং তালের তালিকা

প্রবন্ধ	জয়দেব প্রদত্ত রাগ	কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত রাগ	জয়দেব প্রদত্ত তাল	কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত তাল	কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত প্রবন্ধ নাম	সর্গ
১। প্রলয়পয়োধিজলে…	মালব	মধ্যমাদি	রূপক	আদি	দশাবতারকীর্তিধবল	১ম
২। শ্রিতকমলাকুচ…	গুর্জরী	ললিত	নিঃসার	লঘু-আদি	হরিবিজয়মঙ্গলাচার	১ম
৩। ললিতলবঙ্গলতা…	বসন্ত	বসন্ত অথবা গুর্জরী	যতি	ঝম্পা	মাধবোৎসবকমলাকর	১ম
৪। চন্দনচর্চিতনীলকলেবর…	রামকিরি	গুর্জরী	যতি	ঝম্পা	সামোদদামোদরভ্রমরপদ	১ম
৫। সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনি…	গুর্জরী	ধন্নাসিকা	যতি	বর্ণযতি	মধুরিপুরত্নকণ্ঠিকা	২য়
৬। নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং…	মালব পাঠভেদে মালবগৌড়	ভৈরব	একতালী	বর্ণযতি	অক্লেশকেশবকুঞ্জরতিলক	২য়
৭। মামিয়ংচলিতা…	গুর্জরী	গৌড়কৃতি	যতি	প্রতিমঠ	মুগ্ধমধুসূদনহংসক্রীড়	৩য়
৮। নিন্দতিচন্দন…	কর্ণাট	দেশাক্ষ বা দেশাখ্য	একতালী	প্রতিমঠ	হরিবল্লভ অশোকপল্লব	৪র্থ

প্রবন্ধ	জয়দেব প্রদত্ত রাগ	কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত রাগ	জয়দেব প্রদত্ত তাল	কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত তাল	কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত প্রবন্ধনাম	সর্গ
৯। স্তনবিনিহিতমপি…	দেশাখ্য	মালবশ্রী	একতালী	নিঃসারুক	স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়	৪
১০। বহতিমলয়…	দেশবরাড়ী	কেদার	রূপক	নিঃসারুক	হরিসমুদয়গরুড়পদ	৫ম
১১। রতিসুখসারে…	গুর্জরী	কেদার	একতালী	নিঃসারুক	×	৫
১২। পশ্যতিদিশিদিশি…	গোণ্ডকিরী	মালবগৌড়	রূপক	অড্ড	ধন্যবৈকুণ্ঠকুঙ্কুম	৬ষ্ঠ
১৩। কথিতসময়েঽপি…	মালব	স্থানগৌড়	যতি	বর্ণযতি	স্নিগ্ধমধুসূদনরাসাবলয়	৭ম
১৪। স্মরসমরোচিত…	বসন্ত	শ্রীরাগ	একতালী	দ্রুতমঠ	হরিরমিতচম্পকশেখর	৭ম
১৫। সমুদিতমদনে…	গুর্জরী	মহ্লার	একতালী	দ্রুতমঠ	হরিরসমন্মথতিলক	৭ম
১৬। অনিলতরলকুবলয়…	দেশবরাড়ী	বরাটী	রূপক	বর্ণযতি	নারায়ণমদনায়াস	৭ম
১৭। রজনীজনিতগুরু…	ভৈরবী	মেঘ	যতি	বর্ণযতি	লক্ষ্মীপতিরত্নাবলী	৮
১৮। হরিরভিসরতি…	গুর্জরী পাঠভেদে রামকিরি	নট্ট	যতি	তৃতীয়তাল	অমন্দমুকুন্দ	৯ম
১৯। বদসি যদি…	দেশবরাড়ী	মধ্যমাদি ললিত গুর্জরী ধানসী ভৈরব গোণ্ডকৃতি দেশাক্ষ মালবশ্রী কেদার মালবগৌণ্ডক স্থানগৌণ্ড শ্রীরাগ মহ্লার বরাটিকা মেঘ ভত্রাবৎ ধোরণী	অষ্টতালী	বর্ণযতি	চতুরচতুর্ভুজরাগরাজি-চন্দ্রোদ্যোত	১০ম
২০। বিরচিতচাটুবচন…	বসন্ত	নন্দ	যতি	আদি প্রতিমঠ চতুর্মাত্রিক মঠ অড্ড বর্ণযতি নবমাত্রিক মঠ নিঃসারুক ঝম্পা দ্রুতমঠ রূপক প্রতিতাল ত্রিপুটক একতালী	শ্রীহরিতালরাজিজলধর-বিলম্বিত	১১শ

মহারাজ কুম্ভকর্ণ-পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ

প্রবন্ধ	জয়দেব প্রদত্ত রাগ	কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত রাগ	জয়দেব প্রদত্ত তাল	কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত তাল	কুম্ভকর্ণ প্রদত্ত প্রবন্ধ নাম	সর্গ
২১। মঞ্জুতরকুঞ্জতল…	দেশবরাড়ী	বরাড়ী	রূপক পাঠভেদে মঠ বা আড়ব	—	×	১১শ
২২। রাধাবদন…	বরাটী	নট্ট কেদার শ্রী স্থানগৌড় ধোরণী মালব বরাটী মেঘ মালবশ্রী দেবশাখ গৌণ্ডকৃতি ভৈরবী ধন্নাসিকা বসন্ত গুর্জরী মহ্লার ললিত	যতি	দ্রুতমঠক রূপক প্রতিতাল দ্রুতাল (দ্বিতীয় তাল) ত্রিপুট দ্রুতপ্রতিমঠক	সানন্দগোবিন্দরাগশ্রেণী-কুসুমাভরণ	.১শ
২৩। কিশলয় শয়ন তলে…	বিভাস	দেবশাখ	একতালী	বর্ণযতি প্রতিতাল	মধুরিপুমোদবিদ্যাধরলীলা	১২শ
২৪। প্রত্যূহপুলাকুরেণ…	×	দেবশাখ	×	জয়মঙ্গল	সুরতারম্ভ চন্দ্রহাস	১২শ
২৫। দোর্ভ্যাংসযমিত…	×	গৌড়ী	×	বিজয়ানন্দ	কামিনীহাস	১২শ
২৬। বামাঙ্কে (মারাঙ্কে) রতিকেলি…	×	কর্ণাটবঙ্গাল	×	জয়শ্রী	পৌরুষরসপ্রেমবিলাস	১২শ
২৭। তস্যাপাটলপাণি…	×	মরুকৃতি	×	যতি	কামাদ্ভুতাভিনবমৃগাঙ্কলেখা	১২শ
২৮। কুরুযদুনন্দন…	রামকিরী	গোণ্ড	যতি	আদি পঞ্চ প্রতিমঠ চতুর্মাত্রিকমঠ অড্ড বর্ণযতি জয়মঙ্গল বিজয়ানন্দ জয়শ্রী	সুশ্রীতপীতাম্বর	১২শ

আচার্য যদুনাথ সরকার

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার

সুপরিণত বয়সে ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের তিরোধান ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার একটি যুগের অবসান। সমগ্র জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট কীর্তিসৌধ নির্মাণ করে গেলেন, আমরা তার এতই নিকটবর্তী যে সে কৃতিত্বের যথোচিত মূল্যায়ন বোধ করি ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের সাধ্যাতীত। তাঁর প্রধান আলোচ্যবস্তু ছিল ভারতে মোগল শাসনের শেষ অধ্যায়। গবেষক-জীবনের প্রারম্ভেই তিনি এই বিষয়টি নির্বাচন করেন এবং এই সংক্রান্ত তাঁর ইংরাজী ভাষায় লিখিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন শীর্ষক শেষ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

"The study of the Mughal Empire which I began with my *India of Aurangzeb; Statistics, Topography and Roads* (printed in 1901), has come to an end with the extinction of that empire which is the subject-matter of the present volume. The events of nearly half the reign of Shah Jahan and the whole of Aurangzib's are covered in my *History of Aurangzib* in five volumes with a supplementary work *Shivaji and His Times*. Then follows W. Irvine's *Later Mughals* (1707-1738) in two volumes edited and continued by me, and lastly this *Fall of the Mughal Empire* (1738-1803) in four volumes."

ঐতিহাসিক নিজেই এখানে তাঁর গবেষণার মূল ধারাটি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ যদিও প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি আওরংজীবের রাজত্বকাল (এবং প্রসঙ্গতঃ শিবাজীর জীবনী) এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আওরংজীব—পরবর্তী মোগল সাম্রাজ্যবিষয়ক গ্রন্থগুলিই তাঁর ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দ্বারা সম্পাদিত ও পরিবর্ধিত উইলিয়ম আরভিন রচিত *Later Mughals* শীর্ষক দুই খণ্ড গ্রন্থও এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে মূল রচনা তাঁর না হ'লেও সম্পাদনায় কৃতিত্ব পূর্ণমাত্রায় তাঁর। আর্‌ভিনের অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ডে তিনটি নূতন অধ্যায়ও তাঁকে সংযোজন করতে হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যদুনাথের গবেষণাক্ষেত্রের দেশগত পরিধি সমগ্র ভারতবর্ষ ও কালগত পরিধি আওরংজীবের জন্ম (১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মধ্যে সম্পাদিত সর্জি অঞ্জনগাঁওএর সন্ধিচুক্তি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

যদুনাথের প্রধান গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তুর কিছু বিস্তারিত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *India of Aurangzib* নামক গ্রন্থে তিনি মুখ্যতঃ মোগল শাসনকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ, রাজস্বসংক্রান্ত তথ্যাবলী, পথঘাট ইত্যাদি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁকে প্রধানতঃ তিনখানি মূল ফার্সী আকরগ্রন্থ ব্যবহার করতে হয়েছিল, তা হ'ল যথাক্রমে সুজন রায় রচিত 'খুলাসাতু-ৎ-

তওয়ারিখ্’ (রচনাকাল ১৬৯৫ থেকে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে); রায় চতর মান কায়ৎ রচিত "চাহার্ গুলসান্" (রচনাকাল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ); এবং আওরংজীবের সমকালীন সরকারী রাজস্ববিবরণ 'দস্তুর-উল্-আমল্'। কেবল মাত্র আওরংজীবের রাজত্বকালীন বিবরণই যদুনাথ এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন নি। আকবরের রাজত্বকাল থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মোগলশাসনসংক্রান্ত বহু প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির সমাবেশ এবং আকবর ও আওরংজীবের যুগদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য। ভূমিকাস্বরূপ প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে লেখক তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদির স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় ভাগে 'খুলাসাতু-ৎ তওয়ারিখ্’ এবং 'চাহার্ গুলসান্' শীর্ষক ফার্সী গ্রন্থদ্বয়ের অংশবিশেষের ইংরাজী অনুবাদ সংযোজন করেছেন। মোগল-যুগ সম্পর্কে গবেষণাকে যদুনাথ আরও অগ্রসর করে নিয়ে গেলেন তাঁর পরবর্তী সুবিখ্যাত গ্রন্থ *History of Aurangzib*-এ। পাঁচ খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে আওরংজীবের জন্ম থেকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত তাঁর জীবনের এবং ভারত-ইতিহাসের ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। এই দুই খণ্ড মুখ্যতঃ সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালীন ইতিহাস। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসীমা তাঁর শেষ জীবনের গুরুতর পীড়া ও তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সংঘর্ষের উদ্যোগপর্ব। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু উত্তরাধিকার যুদ্ধ, আওরংজীবের বিজয়লাভ ও সিংহাসনারোহণ। সুতরাং এই দুটি খণ্ডকে সম্রাট আওরংজীবের শাসনকালীন ইতিহাসের ভূমিকাস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। আওরংজীবের রাজত্বকাল, পরবর্তী তিন খণ্ডের মুখ্য আলোচ্যবস্তু। গ্রন্থকার এই যুগকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: ১৬৫৮-১৬৮১ (যে সময়ে আওরংজীবের শাসন ছিল প্রধানতঃ উত্তর-ভারত-কেন্দ্রিক); এবং ১৬৮১-১৭০৭ (আওরংজীবের মৃত্যু অবধি রাজত্বের অবশিষ্ট কাল, যখন দক্ষিণভারত-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি প্রবল হয়ে দেখা দেওয়ায় তাঁকে দাক্ষিণাত্যেই বসবাস করতে হয়)। শেষ অংশকে ঐতিহাসিক আরও দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: ১৬৮১-১৬৮৯ (যে কয়েক বৎসরের মধ্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং সাময়িকভাবে মারাঠা শক্তিকে জয় করে আওরংজীব সমগ্র দক্ষিণ ভারতে নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন); এবং ১৬৮৯-১৭০৭ (আওরংজীবের শেষ আঠারো বৎসরকাল, যখন তাঁর চোখের সামনে ধীরে ধীরে বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল এবং পরিপূর্ণ ব্যর্থতাবোধ নিয়েই সম্রাটকে পৃথিবী পরিত্যাগ করতে হল)। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে যথাক্রমে আওরংজীবের রাজত্বকালীন ভারত ইতিহাসের উপরিউক্ত অধ্যায়গুলির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বিশাল গ্রন্থ রচনা করবার জন্য লেখককে নির্ভর করতে হয়েছে প্রধানতঃ বিভিন্ন ভাষায় রচিত সমসাময়িক উপাদানের উপর। মোগল যুগের রাজভাষা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকভাষা ফার্সীতে রচিত সমসাময়িক সরকারী ও বেসরকারী ইতিবৃত্ত, ফরমান, চিঠিপত্র, দলিল, দস্তাবেজ ইত্যাদি তাঁর রচনার প্রধান উপকরণ।

এর পরিমাণ বিপুল। ভারতবর্ষ ও ইউরোপের বহু স্থান থেকে বহু পরিশ্রমে তাঁকে এ সমূহের সন্ধান ও সংগ্রহ করতে হয়েছে। তা ছাড়া মারাঠী, হিন্দী, প্রাচীন রাজস্থানী, অসমীয়া, ফরাসী, পর্তুগীজ ও ইংরাজী ভাষায় সঞ্চিত উপকরণও তাঁকে নানা স্থানে ব্যবহার করতে হয়েছে। মোগল যুগের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে যদুনাথের দৃষ্টি স্বভাবতঃ মারাঠা জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে মারাঠা রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। মোগল-মারাঠা সংঘর্ষের মধ্য থেকেই মারাঠা রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং সেই অভ্যুদয়ের বিচিত্র ইতিহাসের নায়ক আওরংজীবের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শিবাজী। প্রসঙ্গতঃ তাই যদুনাথকে তাঁর *History of Aurangzib*-এ শিবাজী ও মারাঠা জাতীয় বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়েছিল। ভোঁসলেদের প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য-নীতি এবং পিতার জীবদ্দশায় আওরংজীবের প্রথম বার দাক্ষিণাত্য শাসনের (১৬৩৬—১৬৪৪) ইতিহাস বর্ণনাকালে। আওরংজীবের দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসনকালে (১৬৫২—১৬৫৭) শিবাজীর সঙ্গে মোগল রাষ্ট্রের প্রথম স্বল্পকালস্থায়ী সংঘর্ষ এবং সন্ধি ঘটে। প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে এর আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিরোধ দীর্ঘকালব্যাপী মোগল-মারাঠা সংঘর্ষের সূচনা মাত্র। শিবাজীর অভ্যুত্থান, মারাঠা রাষ্ট্রের সংগঠন, শম্ভূজীর শাসনে মারাঠা শক্তির অধোগতি এবং সাময়িক পতন প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে উল্লিখিত গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (প্রধানতঃ অধ্যায় ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪ এবং ৪৮)। কিন্তু মারাঠা রাষ্ট্র সাময়িক ভাবে মোগল-কবলিত হলেও মারাঠাশক্তি নিঃশেষিত হল না। আওরংজীবকে জীবনের শেষ আঠারো বৎসর মারাঠা জাতির সংঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণকে বশীভূত করবার আশা মোগল রাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। মোগল-মারাঠা সম্পর্কের এই অধ্যায়ের আলোচনা ঐতিহাসিক করেছেন *History of Aurangzib*-এর পঞ্চম খণ্ডে (অধ্যায় ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫ এবং ৫৭)। এই উপলক্ষ্যে মারাঠা ইতিহাসের যে সকল উপাদান তিনি সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন করেছিলেন তার দ্বারা তিনি *Shivaji and His Times* শীর্ষক শিবাজীর একখানি স্বতন্ত্র প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেন। এর জন্য তাঁকে সমসাময়িক ফার্সী ইতিবৃত্ত, মারাঠী বখর, শকাবলী ও কাগজপত্র, ডিঙ্গল (বা প্রাচীন রাজস্থানী) ভাষায় লিখিত পত্রাদি, সংস্কৃত ও হিন্দী কাব্যাদি এবং ইংরেজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় রক্ষিত সমসাময়িক উপকরণের সাহায্য নিতে হয়েছিল। *History of Aurangzib*-এর চতুর্থ খণ্ডের সঙ্গে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অনেকাংশে মিল থাকলেও শিবাজী ও সমসাময়িক মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত প্রচুর অতিরিক্ত তথ্যের সমাবেশ এতে করা হয়েছে। বইখানিকে যদুনাথের প্রধান আলোচ্য মোগল ইতিহাসের ধারার অন্তর্গত বলেই মনে করা যায়। আওরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) থেকে নাদিরশাহের উত্তর-ভারত অভিযান (১৭৩৯) পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের ক্রম-অধোগতির ইতিবৃত্তের রচয়িতা যদুনাথ স্বয়ং নন। উইলিয়ম আরভিনের *Later Mughals* শীর্ষক

গ্রন্থের দুটি খণ্ডে এই যুগের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থরচনার সঙ্গে যদুনাথের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আরভিন্ তাঁর রচনা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত মোগল ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করবেন। কিন্তু ১৭৩৮ পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি তাঁর প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর নিজের ভাষায়—

"With the disappearance of the Sayyid brothers the story attains a sort of dramatic completeness and I decide to suspend at this point my contributions on the history of the later Mughals. There is reason to believe that a completion of my original intention is beyond my remaining strength. I planned on too large a scale and it is hardly likely now that I shall be able to do much more....the first draft for the years 1721 to 1738 is written....I have read and translated and made notes for another twenty years ending about 1759 or 1760. The preliminary work for the period 1759-1803 has not been begun." —*Later Mughals* Vol. II p. 101 footnote.

তাঁর লিখিত অংশের সবটুকুর পুনরালোচনা ও সংশোধন করে যাবার অবকাশও তিনি পান নি। সম্পাদক হিসাবে এ কাজ যদুনাথকেই করতে হয়েছিল। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন—

"His own corrections stop with page 188 of his manuscript of the second part of Muhammad Shah's reign i.e. February 1725 and from this point to the last phase that he wrote (viz. p. 863, dealing with April 1738) the draft is unrevised, incomplete and with many things left doubtful for future verification, correction and completion and rearrangement of the narrative and sifting of evidence. The last portion requires considerable labour on the editor's part. The narrative as sketched by Irvine has to be reconstructed, completed and checked by a close reference to the original, Persian sources. Besides an entirely new class of documents—the Marathi letters and reports—which have seen light since 1898 and which were unknown to Irvine, have to be woven into the text, because of the very important part played by the Marathas in the affairs of the Delhi Empire from 1728 onwards.—*Later Mughals*, Vol. I p. xxviii.

তাছাড়া নাদিরশাহের আক্রমণের বিবরণ (১৭৩৯) এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে আরভিনের রচনাকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রূপ দেওয়ার কৃতিত্বও সম্পূর্ণ সম্পাদকের। দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ (নাদিরশাহের অভ্যুত্থান ও ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অবস্থা), দ্বাদশ (নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ) ও ত্রয়োদশ (নাদিরশাহের সাময়িক ভাবে দিল্লী অধিকার ও প্রত্যাবর্তন) অধ্যায়গুলি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব রচনা। সুতরাং যদুনাথ স্বয়ং *Later Mughals* গ্রন্থের লেখক না হলেও তাঁর নিজস্ব ঐতিহাসিক গবেষণাধারার মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নাদিরশাহের ভারত-ত্যাগের কাল থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল শাসনের অবলুপ্তি পর্যন্ত চৌষট্টি বৎসরের ইতিহাস যদুনাথের *Fall of the Mughal Empire* শীর্ষক চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থের বিষয়বস্তু। নাদিরশাহের প্রত্যাবর্তনের পরে মুহম্মদশাহের রাজত্বের অবশিষ্ট ভাগ থেকে (১৭৩৯) দ্বিতীয় আলমগিরের সিংহাসনারোহণ কাল (১৭৫৪) পর্যন্ত ইতিহাস প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে এই আলোচনা অগ্রসর হয়েছে নজীব্‌উদ্দৌলার মৃত্যু এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের দিল্লী

অধিকার (জানুয়ারী ১৭৭২) পর্যন্ত ; তৃতীয় খণ্ডে প্রধানতঃ ১৭৭২ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠা প্রতিপত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বকালীন ইতিহাস বিবৃত করা হয়েছে ; মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ইংরেজ-মারাঠার সংগ্রাম, পরিশেষ ইংরেজ-শক্তির জয়লাভ এবং নামেমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ (১৭৮৮-১৮০৩) শেষ খণ্ডের আলোচ্য বস্তু। সমকালীন ফার্সী ও মারাঠী বিবরণ, দলিলপত্রাদি, হিন্দী ইতিবৃত্তমূলক কাব্য এবং ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় রক্ষিত উপকরণের সাহায্যে এই বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

মোগলযুগের শেষ দুই শতাব্দীর ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যতীত যদুনাথ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইংরাজী এবং বাংলা ভাষায় তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধও নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ সবের বিস্তারিত পরিচয় দেবার স্থান বর্তমান নিবন্ধে নেই এবং সম্ভবতঃ তার প্রয়োজনও নেই। কেননা ঐতিহাসিক যদুনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপরিকথিত মোগলযুগের শেষ অধ্যায় বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে। তাঁর অন্যান্য রচনা তাঁর প্রধান কীর্তির পরিপূরক এবং মুখ্যতঃ সেই হিসাবেই সেগুলির সার্থকতা। কৌতূহলী পাঠক স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত যদুনাথের রচনাপঞ্জীতে এই সমূহের প্রায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাবেন। লক্ষ্য করবার বিষয় তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বৃহৎ পটভূমিকার উপর রচিত ঐতিহাসিক রচনা প্রায় কিছুই নেই। এগুলি প্রচুর গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল সন্দেহ নেই, কিন্তু এক্ষেত্রে গবেষণার প্রকৃতি ভিন্ন। তাঁর অপ্রধান গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির মধ্যে দুটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। কতগুলি মোগল-কালীন ভারত ইতিহাসের কোনও একটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করেছে (যেমন মোগলশাসন সংক্রান্ত ইংরাজী গ্রন্থ *Mughal Administration* ; অথবা মোগল ও মারাঠা ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধ-সমষ্টি *Studies in Mughal India, Studies in Aurangzib's Reign* এবং *House of Shivaji*, প্রভৃতি ; অন্যগুলি সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রের, প্রধানতঃ মূল ঐতিহাসিক উপাদানের প্রামাণ্য সংস্করণ বা অনুবাদ (যেমন চৈতন্য-চরিতামৃতের ইংরাজী অনুবাদ *Chaitanya's Life and Teachings* ; আওরংজীবের সমসাময়িক হামিদ্‌উদ্দিন খাঁ লিখিত ফার্সী গ্রন্থ আহ্‌কম্‌-ই আলমগিরির প্রামাণ্য সংস্করণ এবং তার ইংরাজী অনুবাদ *Anecdotes of Aurangzib* ; মুস্তাদ খাঁ সংকলিত আওরংজীবের রাজত্বকালীন সমসাময়িক আকর গ্রন্থ মাসির-ই-আলম্‌গিরির ইংরাজী অনুবাদ ; পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা দরবারের ইংরাজ রেসিডেণ্টগণ কর্তৃক প্রেরিত বিবরণের *Poona Residency Correspondence* শীর্ষক সংস্করণের প্রথম অষ্টম ও চতুর্দশ খণ্ডের সম্পাদনা, ইত্যাদি)। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *India of Aurangzib*কেও এই শ্রেণীতে ফেলা যায় যদিও তিনি স্বয়ং তাঁর মূল ইতিহাস-সাধনার ধারার মধ্যে তার স্থান নির্দেশ করেছেন। এই দুই শ্রেণীর রচনার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গেলে বলতে হয়,

প্রথমগুলি তাঁর মূল গবেষণা-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিকের বা সমস্যারই বিশেষ আলোচনা ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতররূপে পুরাতত্ত্বের লক্ষণ-মণ্ডিত।

ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও মানবজ্ঞানের এই বিভাগদ্বয় অভিন্ন নয়। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, তার নির্বাচন, বিশ্লেষণ, কালনির্ণয়, সম্পাদন, তালিকাকরণ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট এই সকল প্রচেষ্টা নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। পুরাতত্ত্ববিদের কাজ যেখানে শেষ, বলা যেতে পারে, তাঁর কর্তব্যের সেখানে আরম্ভ। স্ব-নির্বাচিত দেশকালের অন্তর্গত জাগতিক ঘটনাপুঞ্জকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমষ্টি হিসাবে বিচার না করে, সেগুলির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটি পারস্পরিক যোগসূত্র ও একটি কার্যকারণশৃঙ্খলা আবিষ্কারের চেষ্টাই ঐতিহাসিকের প্রধান লক্ষ্য। কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী বা যুক্তিক্রম এই উদ্দেশ্যসাধনের সর্বোত্তম উপায়, সে প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর থাকতে পারে কিন্তু মূল লক্ষ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ অল্প। সুতরাং জ্ঞানচর্চার এই দুই ক্ষেত্রেই পরিশ্রম ও মননশীলতার প্রয়োজন অত্যধিক হলেও ঐতিহাসিকের পক্ষে উন্নততর বিচারবুদ্ধি এবং গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি যে নিতান্ত অপরিহার্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি, ইতিহাস বস্তুনির্ভর বলেই, তার পক্ষে পুরাতত্ত্বের সাহায্য ব্যতীত অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। বস্তুপরিচয়ে এতটুকু ছিদ্র থাকলে যে কোনও ঐতিহাসিকের কীর্তির বনিয়াদ শিথিল হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই দেখা যায় তাঁদের ইতিহাস-সাধনা আরম্ভ করবার পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার ও আলোচনার কাজে রত হতে হয়েছে, সে কাজে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকুক আর নাই থাকুক। পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় ভারতে এ প্রয়োজন আরও অধিক এই জন্য যে স্বতন্ত্রভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুরাতত্ত্ব উদ্ধার ও আলোচনার কাজে আমাদের দেশ অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর। যদুনাথ ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাঁর আজীবন ইতিহাস-সাধনার পাশাপাশি পুরাতত্ত্বালোচনার সমান্তরাল ধারাটিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত। এই কাজের দুরূহতা সম্পর্কে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *The India of Aurangzib* এর ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"The path of the Indian antiquarian is, moreover beset with peculiar difficulties. It is seldom that the requisite materials are all accessible to him. He has to settle the texts of his authorities, few of which have been printed and fewer still edited. He is expected to correct and identify wrongly spelt proper names though he has often no second manuscript to collate with the one lying before him. Then again he can expect very little help from brother-antiquarians because the field is large and the labourers few. Pandits and Maulavis are of little assistance except in throwing light on the grammar or explaining the probable meaning of the text. They are ignorant of historical criticism ; the usual materials on which the antiquarian works being obscure books and not classics, they are never studied as text-books or even read for pleasure by our Pandits and Maulavis. The historical student in India is thrown almost on his own resources....To expect perfection

in such a branch of study is hardly more reasonable than to ask a goldsmith to give a proof of his professional skill by prospecting for gold, digging the mine extracting and refining the ore and then making the ornament."—p. ix.

গবেষক জীবনের আরম্ভে এই বিপুল বাধার সম্মুখীন তাঁকে স্বয়ং হতে হয়েছিল বলেই তিনি ইতিহাসের সহিত আজীবন অবিশ্রাম পুরাবৃত্তের চর্চাও করে গিয়েছেন। পুরাতাত্ত্বিক রূপে তাঁর কীর্তির পরিমাণ নিঃসন্দেহে বিপুল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে, যদুনাথের স্বাভাবিক প্রবণতা পুরাতত্ত্বের প্রতি নয়, ইতিহাসের প্রতি। তাঁর প্রতিভার সার্থকতম পরিচয় বহন করছে তাঁর ঐতিহাসিক রচনাবলী। ইতিহাস-সাধনার কীর্তিসৌধ নির্মাণে সহায়ক রূপেই তাঁর নিকট পুরাবৃত্তের মূল্য। পুরাতাত্ত্বিক হিসাবে তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর অপেক্ষা বৃহত্তর পণ্ডিত হয়তো তাঁর সমকালে বিরল নন। কিন্তু নিজক্ষেত্রে ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

যদুনাথের প্রধান ইতিহাস গ্রন্থগুলিকে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করলে আমরা যা পাই তা হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস। আওরংজীব থেকে দ্বিতীয় শাহ্ আলম পর্যন্ত মোগল রাষ্ট্র বিবর্তনকে কেন্দ্র করেই তাঁর মূল রচনার কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের আরম্ভকাল পর্যন্ত মারাঠা শক্তির উত্থান পতনের ইতিহাসও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। দিল্লী রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন হয়েছে, আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনার সীমা লেখক কোনও খানে তার অধিক সম্প্রসারিত করেন নি। আওরংজীবের সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় এই প্রণালীর প্রয়োগ তাঁর পক্ষে নিতান্ত কষ্টসাধ্য হয়নি, কেননা তখন পর্য্যন্ত মোগল শাসনতান্ত্রিক ঐক্য সারা দেশে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আওরংজীবের পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রবন্ধন প্রায় অবলুপ্ত হওয়াতে ভারতবর্ষ কতগুলি বিবদমান স্বতন্ত্র আঞ্চলিক শক্তির সমষ্টিতে পরিণত হয়। এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিহীন যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নেও যে উপরিউক্ত পরিকল্পনা ও রচনাপদ্ধতি কত সার্থকভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে *Fall of the Mughal Empire* গ্রন্থে যদুনাথ তা দেখিয়েছেন। আলোচনার মূল সূত্রটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর নিজের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"Such a long survey always on the basis of original sources in many languages, could be completed only by the rigid exclusion of those provinces of India which had broken away from the Mughal Empire and also by ignoring events not directly related to the fate of that empire such as the Anglo French rivalry for the domination of India and the dynastic struggles in the provinces that had renounced the suzerainty of Delhi."

মুখ্যতঃ দিল্লী সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে বসে নিজ রচনা-পরিধিকে এই ভাবে সীমাবদ্ধ না করে ঐতিহাসিকের গত্যন্তর ছিলনা। অন্যথা প্রতিপদে দিশাহারা হয়ে প্রাদেশিক ইতিহাসের খুঁটিনাটির মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। পরিকল্পনার এই সামঞ্জস্যবোধ

ও সংযম ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের বিশেষত্ব। অষ্টাদশ শতকীয় ভারতবর্ষের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যে রাষ্ট্রীয় সংহতির একটি মূল সূত্র আছে এবং তা অবলম্বন করে যে সমগ্র দেশের প্রামাণ্য রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব যদুনাথই প্রথম তা দেখালেন। অথচ সমগ্রভাবে তাঁর রচনা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপর যে পরিমাণ আলোকপাত করেছে তা বিস্ময়কর। আওরংজীবের রাজত্বকালীন উত্তর ভারতে রাজপুতানা, পঞ্জাব গুজরাত কাশ্মীর বাঙলা আসাম, মধ্যভারতের মালোয়া বুন্দেলখণ্ড গণ্ডোয়ানা, দক্ষিণভারতের বিজাপুর গোলকোণ্ডা এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস তাঁর দানে সমৃদ্ধ। অষ্টাদশ শতকের মোগল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গেও বাঙলা বিহার উড়িষ্যা অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, ভরতপুর রাজপুতানা পঞ্জাব মালোয়া বিভিন্ন মারাঠা রাষ্ট্র প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন করেছেন তা পরবর্তী গবেষকগণের কাজের বিশেষ সহায়ক হয়েছে। যদুনাথ সংগৃহীত তথ্যের প্রাথমিক সহায়তা এবং তাঁর গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা না পেলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকীয় প্রাদেশিক ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার গতিবেগ অপেক্ষাকৃত মন্থর হয়ে পড়তো, একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সামরিক ইতিহাসের রচয়িতা হিসাবেও যদুনাথ অদ্বিতীয়। তাঁর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণও যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা পড়লে মনে হয় সেটুকু যেন তাঁদের রচনায় অবান্তর তথ্য, সে বিবরণ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র যুদ্ধের তারিখ ও ফলাফল উল্লেখ করে দিলেও মূল রচনার অঙ্গহানি ঘটতো না। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান বিবর্তন ও অবক্ষয়ের সঙ্গে যুদ্ধের যে গূঢ় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে সে তত্ত্ব এদেশে যদুনাথের রচনাতে প্রথম সুস্পষ্ট-ভাবে পাওয়া গেল। সামরিক ইতিহাসে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যই এর একমাত্র কারণ নয়। ঐতিহাসিক ঘটনা-স্রোতের চলমান প্রবাহের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি যুদ্ধ বিবরণ এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করেছেন, যে তা তাঁর সমগ্র রচনাকে বিন্দুমাত্র ভারাক্রান্ত না করে, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর রচনা থেকে সুবিখ্যাত তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের বিবরণটিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে *Fall of the Mughal Empire vol. ii p. 298-372*। ভারতবর্ষের আধুনিক ঐতিহাসিক সাহিত্যে এর তুলনা নেই। অন্যত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসর বর্ণনাতেও এ বিষয়ে তাঁর স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট, যথা ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মাত ও সামুগড়ের যুদ্ধ—*History of Aurangzib, vol. ii p 348-71 ; 381-405* ; ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের খাজোয়ার যুদ্ধ এবং দেওরাইএর যুদ্ধ—*Ibid pp. 475-96 ; 907-17)* ; ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকারকল্পে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ—*History of Bengal, Dacca University, vol. ii pp. 473-76;* ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সুবিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ—*Ibid pp. 487-97*, ইত্যাদি। ভারতবর্ষের একটি স্বতন্ত্র ধারাবাহিক সামরিক ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা যদুনাথের ছিল এবং ***Military History of India*** শীর্ষক এর কয়েকটি অধ্যায় ***Hindusthan Standard***

পত্রিকায় প্রকাশিত ও হয়েছিল। এই গ্রন্থ তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারলে যুদ্ধবিদ্যার ইতিহাস নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হত।

রচনার সর্বতোমুখী মূলানুগতা ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিকের প্রথম কর্তব্য ইতিহাসের মূল উপাদানগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারবিশ্লেষণপূর্বক তথ্য নিষ্কাশন। এই কাজে তাঁকে সাধারণতঃ দুটি বড় বাধা অতিক্রম করতে হয়, তার একটি বাহ্য, অপরটি আভ্যন্তরীণ। প্রথমতঃ নানা ভাষার আধারে সঞ্চিত উপকরণগুলিকে আয়ত্ত করতে হলে গভীর ও ব্যাপক ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে এ কথা তো বিশেষভাবেই প্রযোজ্য, কেননা ভারত সর্বযুগেই বহুভাষার দেশ। দ্বিতীয়তঃ মূল উপাদান হতে আহৃত তথ্যপুঞ্জ পূর্ণমাত্রায় আমাদের মনোগত সংস্কার বিশ্বাসাদির অনুকূল না হ'তেও পারে; সে ক্ষেত্রে সেগুলিকে বর্জন করে তথ্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী সত্যপথে চলবার জন্য যে মনোবলের প্রয়োজন, অল্পসংখ্যক লোকেরই তা আছে। যদুনাথ এই দুটি বাধাই সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর ভাষাজ্ঞান ছিল সুবিস্তীর্ণ এবং মন ছিল সংস্কারবর্জিত নির্মম সত্য-সন্ধানী। নিজের গবেষণার জন্য, ফার্সী, মারাঠী, প্রাচীন রাজস্থানী, অসমীয়া, কিঞ্চিৎ সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় রক্ষিত মূল উপাদান পাঠ করে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ নিয়ে কারবার করেন নি। এতগুলি ভাষা আয়ত্ত করবার জন্য তাঁকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ এ যুগে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এমন অক্লান্ত সাধনায় নিজেকে গবেষণাকার্যের জন্য প্রস্তুত করবার দৃষ্টান্ত বোধ করি দ্বিতীয় নেই। তেমনি পরিশ্রমলব্ধ তথ্য ব্যবহার করবার সময়ে তিনি যে কঠোর আপসহীন সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন তাও অতুলনীয়। ভাবাবেগ, পূর্বসংস্কার প্রভৃতি কিছুই তাঁর নিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। এ বিষয়ে নিজমত তিনি একটি বাঙলা প্রবন্ধে এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: "এ দেশে সবচেয়ে বেশী আবশ্যক মনের উন্মুক্ততা, অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের সমস্ত সংস্কারগুলি বর্জন করিয়া একেবারে সাদাসিদা মন লইয়া অতীতের ঘটনাগুলির সত্যস্বরূপ বাহির করিবার প্রবৃত্তি এবং তাহার জন্য সমাজের সমস্ত দণ্ড ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া"।[১] তাঁর এই নির্ভীক সত্যানুসন্ধান এদেশে অনেকের সংস্কারে আঘাত করেছে এবং ফলে অনেক সময়ে তাঁকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মুসলমান পণ্ডিতমহল থেকে ইসলাম—বিরোধিতা ও মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিকমণ্ডলী থেকে মোগল-পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ যুগপৎ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে, তিনি বিচলিত হন নি। জাতীয় আন্দোলন-জনিত ভাবাবেগের জোয়ারে যখন অযোগ্য ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে মহাপুরুষের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার ঢেউ উঠেছিল, যদুনাথ তার কঠোর প্রতিবাদ করেন। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করতে

১. "ইতিহাস এক মহাযোগ"—ইতিহাস, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা পৃ. ৩

তাঁর দ্বিধাবোধ দেখা যায় নি। সিরাজ উদ্দৌলাকে দেশপ্রেমিক নায়ক ঘোষণা করবার জন্য সুভাষচন্দ্রের উপর তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। কল্হণের মতে আদর্শ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত হবে অকারণ বিদ্বেষ ও অহেতুক অনুরাগ বিবর্জিত। এই আদর্শের পূর্ণ রূপায়ন মানুষে সম্ভব কিনা সন্দেহ, কিন্তু মানুষ নিজ সাধনায় এর কতটা নিকটবর্তী হতে পারে যদুনাথ তার উদাহরণ।

যদুনাথের ঐতিহাসিক গবেষণার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর ভৌগোলিক তথ্য-নিষ্ঠা। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় একটি দেশের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যে অসম্ভব তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাই বস্তুপরিচয় সম্পূর্ণ করবার জন্য তিনি বর্ণিত ঘটনাস্থলসমূহ পরিদর্শন করবার সুযোগ কখনও ত্যাগ করেন নি। সমগ্র দেশের ভূসংস্থান সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞান এ যুগে অন্য কোনও ভারতীয় ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।[১] ভৌগোলিক তথ্যের সামান্যতম খুঁটিনাটিও তাঁর অবহেলার বস্তু ছিল না এবং আকরগ্রন্থে উল্লিখিত ক্ষুদ্রতম গ্রামটিরও অবস্থান নির্ণয়ে তাঁর একান্ত আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখা যেত। এই সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ দেশ-পরিচয়ের ফলেই তাঁর রচিত ইতিহাস এত বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভৌগোলিক জ্ঞানের সর্বাধিক নিপুণ ব্যবহার তিনি করেছেন তাঁর যুদ্ধবর্ণনায়, যার ফলে উভয় পক্ষের সৈন্যসংস্থান ও সৈন্য চালনার প্রতিটি ধাপ যেন পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। জনৈক ফরাসী মনীষী বলেছিলেন, গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে (প্রত্যক্ষ না দেখে) দূর থেকে কাজ করতে গেলে কখনও কখনও গ্রন্থাগারকে দেশ বলে ভুল করবার আশঙ্কা থাকে (A travailler loin de l'objet de ses e'tudes on risque de prendre quelquefois une bibliotheque pour l'equivalent d'un pays)। যদুনাথ সে ভুল করেন নি।

যদুনাথের ঐতিহাসিক রচনার বিশিষ্ট সম্পদ তার অসামান্য প্রসাদগুণের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে বর্তমান নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সারবত্তা ও প্রাণবত্তার এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ এ যুগে অন্য কোনও ভারতীয় ঐতিহাসিকের লিখনশৈলীতে দেখা যায় না। বাঙলা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর প্রধান গ্রন্থসমূহ ইংরাজীতে রচিত (যদিও তাঁর সমগ্র বাঙলার রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়!) সুতরাং রচনারীতি বলতে আমাদের প্রধানতঃ তাঁর ইংরাজী রচনারীতিরই বিচার করতে হবে। তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, পরবর্তীকালে সে বিষয়ে অধ্যাপনাও করেছেন। এই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বৃথা যায় নি, প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্বহেতু তাঁর রচিত ইতিহাস, স্বরূপ অবিকৃত রেখেও সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এ কথা আমাদের দেশের অতি অল্পসংখ্যক ঐতিহাসিকের রচনা সম্পর্কেই বলা যায়। তথ্যের ভারে এঁদের অনেকেরই রচনা নীরস এবং মন্থরগতি। কিন্তু এ বিষয়ে যদুনাথ ছিলেন সজাগ শিল্পী।

১. এ বিষয়ে যদুনাথের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে তুলনীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী। তাঁর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় ভৌগোলিক তথ্য যথেষ্ট সম্মান পেয়েছে।

তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাসকে প্রকাশভঙ্গীর ঐশ্বর্যে সাহিত্যিক মহিমমণ্ডিত করে তুলবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে করতেন না। জার্মান-পণ্ডিতগণের নীরস গুরুগম্ভীর রচনাপ্রণালী তাঁর মনঃপূত ছিল না।

ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের কীর্তির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মাঝে মাঝে হয়ে থাকে যে তিনি আজীবন কেবলমাত্র রাজবৃত্তান্ত ও রণবৃত্তান্ত আশ্রয় করে ইতিহাস সাধনা করে গিয়েছেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করেন নি। আপাতদৃষ্টিতে এই অভিযোগ সত্য বলে মনে হলেও এ বিষয়ে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ অভিযোগটি ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত। কোনও মনীষীর আজীবন সাধনার ফলে আমরা কি পেয়েছি সেইটুকুই বড় কথা, কি পাই নি তার হিসাব মিলানো বোধ হয় সব সময়েই খানিকটা নিরর্থক। যদুনাথ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস এত সবিস্তারে এবং নিখুঁত ভাবে আলোচনা কবেছেন যে, পরবর্তী গবেষকগণের সেক্ষেত্রে আর বিশেষ কিছু করবার নেই। তা ভিন্ন তিনি পুরাতাত্ত্বিক হিসাবে গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতীয় মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, অনুবাদ, আলোচনা ইত্যাদি কাজের দ্বারা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের প্রাথমিক অসুবিধা দূর করে গবেষণার পথ যে ভাবে সুগম করে দিয়েছেন, তা আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক জীবনের পক্ষে এ যে কি বিরাট দান তা ধারণা করাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি নিজে তাঁর কীর্তির অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর *Fall of the Mughal Empire* গ্রন্থের শেষ খণ্ডের ভূমিকায় স্পষ্ট বলেছেন—

"A more serious defect is that social and economic history of this long stretch of time has been crowded out of this present series..."

সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনৈতিক তথ্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগীয় তথ্য সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যে পদ্ধতি আধুনিক জগতে ক্রমশঃ সমাদৃত হচ্ছে, সে সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ছিল। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা শ্রীনীহাররঞ্জন রায়-প্রণীত 'বাঙালীর ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি গ্রন্থকারের অভিনব উদ্যমকে যে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন, তা তাঁর উদার মনের প্রগতিশীলতারই পরিচায়ক। স্বীয় সাধনার দ্বারা তিনি এই দুই শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসের পূর্ণ রূপ উদ্‌ঘাটিত করে এই জাতীয় অন্যান্য গবেষণার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে গিয়েছেন এই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

যদুনাথকে অনেক সময়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। এই তুলনা স্বভাবতঃ মনে আসে এই জন্য যে, গিবন ও যদুনাথ দুজনেই বিভিন্ন কালের দুটি বিরাট সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস রচনা করেছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে নিজ নিজ বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই দুই মহা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পার্থক্য ছিল। গিবন ছিলেন প্রাচীন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির একান্ত ভক্ত এবং রোমক সাম্রাজ্য তাঁর

নিকটে ছিল মানব-সভ্যতার এক মহান কীর্তি (solid fabric of human greatness)। কি ভাবে নানা প্রতিকূল ও বর্বর শক্তির আঘাতে এবং খ্রীষ্টধর্মের ক্রমবিস্তারমান প্রভাবের ফলে, এই গৌরবময় সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল তাই ছিল তাঁর আলোচ্য বিষয়। নিজের রচিত ইতিহাস সম্পর্কে তাই তিনি বলতে পেরেছেন, "I have described the triumph of barbarism and religion." কিন্তু মোগল সাম্রাজ্য ও মোগল যুগ সম্পর্কে যদুনাথের এই সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল না। কর্ণাটকের রাজা শ্রীরঙ্গ রায়ালের সঙ্গে শাহজাহান ও আওরংজীবের শঠতাপূর্ণ আচরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই বলেছেন,—

"To the historian whose eyes are not dazzled by the Peacock Throne, the Taj Mahal and other examples of outward glitter, this episode (with many others of the same kind) proves that the Mughal empire was only a thinly veiled system of brigandage. It explains why the Indian princes, no less than the Indian people so readily accepted England's suzerainty.[১]

মধ্যযুগে ভারতে স্থাপিত ইসলামীয় রাষ্ট্র এদেশকে উত্তরোত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের পথে পরিচালিত করেছে, এই ছিল তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।[২] আওরংজীবের চরিত্রে নানা প্রশংসনীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল সংকীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার প্রতীক রূপে ইতিহাসে তাঁর আবির্ভাব। কালের স্রোতকে রুদ্ধ করবার জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রয়াসের মধ্যে হয়তো বা ট্র্যাজেডির মহনীয়তা আছে, কিন্তু শোচনীয় ব্যর্থতা তার অনিবার্য পরিণতি। তার পর ? মধ্যযুগের তমিস্রার অবসানে নূতন যুগের প্রভাতকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন ঐতিহাসিক তাঁর ইতিহাসের সর্বশেষ খণ্ডে। ভাবতে ব্রিটীশ-শক্তির অভ্যুদয়ে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারালাম বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে মনের মুক্তি ঘটল সেটাই বড় কথা। ব্রিটীশ-শাসিত ভারতে উনবিংশ শতকে আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের শুরু Fall of the Mughal Empire. Vol. IV pp. 346-50। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় প্রাচীন রোমানগণের কীর্তি সম্পর্কে গিবনের যেমন সশ্রদ্ধ উচ্ছ্বাস ছিল,[৩] মোগলযুগ সম্পর্কে সেই জাতীয় শ্রদ্ধাবোধের অধিকারী যদুনাথ ছিলেন না। মধ্যযুগের রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যদুনাথের উপরিউক্ত মূল সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ্য কি না সে আলোচনার বর্তমানে কোনও প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষে ইসলামীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ফলে লাভ বা ক্ষতি কোনটির পরিমাণ বেশী হয়েছে, সে সম্পর্কে ভিন্ন মত এবং আলোচনা প্রণালীর অস্তিত্ব আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের শুধু মনে রাখা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর বাহ্য সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে গিবন এবং যদুনাথের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করলে উভয়ের কীর্তিকেই ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

১. History of Aurangzib ii, p. 226.
২. History of Aurangzib iii, pp. 248-79 ; v pp. 436-96.
৩. 'My temper is not very susceptible of enthusiasm and the enthusiasm which I do not feel, I have ever scorned to affect. But.. I can never forget nor express the strong emotions which agitated my mind as I approached and entered the *eternal city*."—Gibbon *Miscellaneous Works*—vol. i, pp. 194-96.

আচার্য্য যদুনাথের বাংলা রচনাবলী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক আচার্য্য যদুনাথের 'অষ্টসপ্ততিতম বর্ষ পরিপূর্ত্তি উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা'-কালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার—সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনাপঞ্জী ও মানপত্র" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯)। এই পুস্তিকায় প্রকাশিত বাংলা রচনাপঞ্জী পূর্ণতর করিয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত Sir Jadunath Sarkar Commemoration Volume এর প্রথম ভাগে (১৯৫৭) প্রকাশ করেন, ইহাতে ১৩৬০ পর্য্যন্ত প্রকাশিত রচনাদির তালিকা যোগ হইয়াছে। 'ইতিহাস' পত্রের অষ্টম খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রচনাপঞ্জী পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, 'ইতিহাস'-পত্রে প্রকাশিত রচনাবলীর সূচী তাহাতে যুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সূচী এই তিনটির সূচীর সমাহার; অপিচ, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ইতিপূর্ব্বে অনুল্লিখিত কয়েকটি রচনা এই সূচীভুক্ত করিয়াছেন।—পত্রিকাধ্যক্ষ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

রচিত গ্রন্থ ও পুস্তিকা

১. পাটনার কথা। ১৩২৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের বাঁকিপুর অধিবেশনে পঠিত বক্তৃতা। পৃ. ১৬।

২. ২৫ বার্ষিক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ও সম্মেলন। ১৩৩৪, পৃ. ৮।

৩. শিবাজী। (নভেম্বর ১৯২৯)। পৃ. ২৬৪।

৪. মারাঠা জাতীয় বিকাশ (সরল কাহিনী)। আষাঢ় ১৩৪৩ (ইং ১৯৩৬)। পৃ. ৪৮। সূচী: মারাঠা জাতির অভ্যুদয়, শিবাজী, শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা, মহারাষ্ট্র সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী।

৫. আচার্য্যের অভিভাষণ। ১৩৫৭, পৃ. ৮।

সম্পাদিত গ্রন্থ

সিয়ার-উল্-মুতাখ্খরীন্: অনুবাদক গৌরসুন্দর মিত্র। কার্ত্তিক ১৩২২ (ইং ১৯১৫)। পৃ. ৪০ (অসম্পূর্ণ)।

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা

১৩০২	বৈশাখ	'সুহৃদ্'	হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা ৮১ বৎসর পূর্ব্বে'
১৩১১	কার্ত্তিক	'প্রবাসী'	আওরঙ্গজিবের আদি লীলা
১৩১২	আষাঢ়	'নবনূর'	সাধু-বচন

১৩১২	অগ্রহায়ণ	‘প্রবাসী’	কবি-বচন-সুধা
	পৌষ	‘প্রবাসী’	চাটগাঁ ও জলদস্যুগণ
	মাঘ	‘নবনূর’	একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর
১৩১৩	জ্যৈষ্ঠ	‘প্রবাসী’	শায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ অধিকার
	অগ্রহায়ণ	‘প্রবাসী’	শাহজাহানের রাজ্যনাশ
		‘প্রবাসী’	“সোণার তরী”র ব্যাখ্যা
১৩১৪	আষাঢ়	‘ভারত-মহিলা’	সতি-উন্-নিসা
	ভাদ্র	‘প্রবাসী’	দুই রকম কবি—হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
১৩১৫	ভাদ্র	‘প্রবাসী’	সিয়ার-উল্-মুতাখ্‌খরীন্
	আশ্বিন	‘প্রবাসী’	খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর
১৩১৬	ফাল্গুন	‘প্রবাসী’	মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ
		‘প্রবাসী’	বঙ্গভাষীদের জন্য বিহারে কলেজ স্থাপন[১]
১৩১৭	মাঘ	‘প্রবাসী’	বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য
	২য় সংখ্যা	‘রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’	মালদহ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ
১৩১৮	আশ্বিন	‘প্রবাসী’	বাদশাহী গল্প
	অগ্রহায়ণ	‘জাহ্নবী’	৺রজনীকান্ত সেন
১৩২০	শ্রাবণ	‘প্রবাসী’	পূর্ব্ব-বঙ্গ[৩]
১৩২১	কার্ত্তিক	‘প্রবাসী’	মুর্শিদ কুলী খাঁর অভ্যুদয়
১৩২২	বৈশাখ	‘প্রবাসী’	বর্দ্ধমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণ[৪]
	শ্রাবণ	‘প্রবাসী’	বাঙ্গালার ইতিহাস[৫]
১৩২৩	বৈশাখ	‘মানসী ও মর্মবাণী’	আওরাংজীবের পরিবারবর্গ
	আষাঢ়-শ্রাবণ	‘ভারতবর্ষ’	উইলিয়ম আর্ভিন, আই. সি. এস.
	মাঘ	‘প্রবাসী’	পাটনায় প্রাচীন চিত্র
	ফাল্গুন	‘ভারতবর্ষ’	পাটনার কথা[৬]
১৩২৪	আষাঢ়	‘প্রবাসী’	প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গ-সাহিত্য
	শ্রাবণ	‘প্রবাসী’	বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ
	ভাদ্র	‘ভারতবর্ষ’	‘বাঙ্গলার বেগম’[৭]
১৩২৬	আশ্বিন	‘প্রবাসী’	প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ[৮]
	কার্ত্তিক	‘প্রবাসী’	মুসলমান আমলের ভারতশিল্প
	অগ্রহায়ণ	‘ভারতবর্ষ’	রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি
	চৈত্র	‘ভারতবর্ষ’	মুঘল ভারতেতিহাসের লুপ্ত উপাদান

৩২৭	কার্ত্তিক	'প্রবাসী'	প্রতাপাদিত্যের পতন[৯]
	নিদাঘ সংখ্যা	'প্রভাতী'	নূতনের মধ্যে পুরাতনের প্রকাশ
৩২৮	বৈশাখ	'ভারতবর্ষ'	অরাজক দিল্লী (১৭৪৯-৮৮)
	আষাঢ়	'প্রবাসী'	প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্রী[১০]
	শ্রাবণ	'প্রবাসী'	বোকাইনগর কেল্লা ও উস্‌মান
	আশ্বিন	'প্রবাসী'	আওরংজীব ও মন্দিরধ্বংস ঐতিহাসিক সত্য কি ?
		'প্রবাসী'	কেজো রসায়নের ওয়ার্কশপ
	অগ্রহায়ণ	'প্রবাসী'	বঙ্গের শেষ পাঠান বীর
	মাঘ	'শিক্ষক'	শিক্ষার আলোচনা কেন আবশ্যক ?
	নিদাঘ সংখ্যা	'প্রভাতী'	দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
	শীত সংখ্যা	'প্রভাতী'	আওরংজীবের রাজত্বের হিন্দু ঐতিহাসিক
৩২৯	বৈশাখ	'প্রভাতী'	বাঙ্গলার একখানি প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার
	আষাঢ়	'ভারতবর্ষ'	আওরংজীবের সাতারা-অবরোধ
	ভাদ্র	'প্রবাসী'	বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন
	ভাদ্র	'প্রভাতী'	ভারতের ঐশ্বর্য্য
	পৌষ	'প্রভাতী'	ঐতিহাসিক ভীমসেন
	ফাল্গুন	'প্রবাসী'	বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী
১৩৩০	পৌষ	'প্রভাতী'	সম্রাট শাহ্‌জাহানের দৈনন্দিন জীবন
	মাঘ	'প্রভাতী'	মুঘল শাহ্‌জাদার শিক্ষা
১৩৩৩	বৈশাখ	'প্রবাসী'	কুমার দারার বেদান্ত চর্চা
১৩৩৫	চৈত্র	'প্রবাসী'	মহারাষ্ট্র দেশ বা মারাঠা জাতি[১১]
১৩৩৬	বৈশাখ	'প্রবাসী'	শিবাজীর অভ্যুদয়
	জ্যৈষ্ঠ	'প্রবাসী'	শিবাজী ও আফজল খাঁ
	আষাঢ়	'প্রবাসী'	শিবাজী ও মুঘল-শক্তির সংঘর্ষ
	শ্রাবণ	'প্রবাসী'	শিবাজী ও আওরংজীব
	ভাদ্র	'প্রবাসী'	চতুরে চতুরে : শিবাজী ও আওরংজীবের সাক্ষাৎ
	আশ্বিন	'প্রবাসী'	শিবাজীর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন
	কার্ত্তিক	'প্রবাসী'	শিবাজীর দক্ষিণ বিজয়
	অগ্রহায়ণ-পৌষ	'প্রবাসী'	পিতাপুত্রে
১৩৩৭	বৈশাখ	'প্রবাসী'	আওরংজীবের জীবন-নাট্য
	শ্রাবণ	'প্রবাসী'	নাদির শাহের অভ্যুদয়
	আশ্বিন	'প্রবাসী'	ভারতে মুসলমান

১৩৩৭	চৈত্র	'প্রবাসী'	বঙ্গে বর্গী
	চৈত্র	'উত্তরা'	ভাষণ[11]
১৩৩৮	বৈশাখ-আষাঢ়	'প্রবাসী'	বর্গীর হাঙ্গামা
	জ্যৈষ্ঠ	'ভারতবর্ষ'	বিদ্যাসাগর
১৩৩৯	পৌষ	'ভারতবর্ষ'	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'[10]
	মাঘ	'বঙ্গশ্রী'	মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস
	চৈত্র	'বঙ্গশ্রী'	মারাঠা সৌভাগ্য-সূর্য্যের অবসান
১৩৪০	শ্রাবণ	'ভারতবর্ষ'	নবীন বঙ্গের জীবন-প্রভাতের দৃশ্য[14]
১৩৪১	জ্যৈষ্ঠ	'ভারতবর্ষ'	জাতীয় নাটকের বিকাশ[15]
	কার্তিক-পৌষ	'বুলবুল'	ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব[16]
	পৌষ	'ভারতবর্ষ'	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'[17]
১৩৪২	৭ অগ্রহায়ণ	'দেশ'	বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণীমন্দির
	মাঘ	'নূতন পত্রিকা'	ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ কি ?
	১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খ্রীঃ
	২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী[17]
	১ চৈত্র	'দেশ'	মহারাজ দিব্য ও ভীম
	২ চৈত্র	'আনন্দবাজার পত্রিকা'	দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস[18]
১৩৪৩	১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	মারাঠা জাতির অভ্যুদয়[19]
			শিবাজী[12]
			শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা[19]
	৩০ আশ্বিন	'এডুকেশন গেজেট'	বঙ্গের বাহিরে শক্তিপূজা
১৩৪৪	আষাঢ়	'ভারতবর্ষ'	বেকার
	আষাঢ়	'মাসিক বসুমতী'	বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ
১৩৪৫	আষাঢ়	'শনিবারের চিঠি'	বঙ্কিম প্রতিভা
	আশ্বিন	'অলকা'	যুগধর্ম্ম ও সাহিত্য[20]
	১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	মুঘল ভারতের ঐতিহাসিকগণ
	২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ ১)
১৩৪৬	২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ(২)
১৩৪৭	১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা
	৪র্থ সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা
১৩৪৮	আশ্বিন	'শনিবারের চিঠি'	রবীন্দ্রনাথের একটি দান
	পৌষ	'প্রবাসী'	মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর স্মৃতি

১৩৪৯	১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩৫০	৩য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি
১৩৫১	১ম-২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ?
	চৈত্র	'প্রবাসী'	আকবরের আমল
১৩৫২	মাঘ	'প্রবাসী'	আর্য্যা নিবেদিতার নারী আদর্শ
		'প্রবাসী'	গবেষণার প্রণালী
	ফাল্গুন-চৈত্র	'প্রবাসী'	পত্রাবলী
১৩৫৪	আশ্বিন	'প্রবাসী'	স্বাধীনতার উষায় চিন্তা (১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭)
১৩৫৫	আশ্বিন	'প্রবাসী'	দেশের ভবিষ্যৎ
	কার্ত্তিক	'প্রাচী', শান্তিপুর	বাহিরের জগৎকে বাঙ্গলার দান
	পৌষ	'প্রবাসী'	আমার জীবনের তন্ত্র
	চৈত্র	'প্রবাসী'	বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিহাসের সাধনা[২১]
১৩৫৭	ভাদ্র	'ইতিহাস'	ইতিহাস এক মহাদেশ
	ফাল্গুন	'প্রবাসী'	বাংলায় ঐতিহাসিক গবেষণার সমস্যা[২২]
১৩৫৮	অগ্রহায়ণ	'ইতিহাস'	আওরঙ্গজেব-মুর্শীদকুলী পত্রালাপ (আহ্‌কাম-ই-আলমগিরির রামপুর নবাবের ফার্সী হস্তলিপি হইতে অনূদিত)
১৩৫৯	জ্যৈষ্ঠ	'প্রবাসী'	বাংলার সমাজ-জীবন সমস্যা
	ভাদ্র	'ইতিহাস'	১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে পর্তুগীজ
১৩৬০	শারদীয় সংখ্যা	'উষা'	খ্রীস্টান সম্প্রদায় সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ
১৩৬২	ভাদ্র	'প্রবাসী'	বাঙালীর অগ্রগতির পথ
	মাঘ	'প্রবাসী'	রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত
	চৈত্র	'প্রবাসী'	পদ্য আর গদ্য
১৩৬৩	আষাঢ়	'প্রবাসী'	বুদ্ধের কীর্ত্তি

বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত রচনা

১৩১৬	ফাল্গুন	ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য বিবরণ—মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ	
১৩৩৯	আশ্বিন	'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখামালা' ২য় খণ্ড	শিবাজী ও জয়সিংহ
১৩৪২	আষাঢ়	'রজত জয়ন্তী'	আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ

১৩৪৩	আশ্বিন	চন্দননগর সাহিত্য-সম্মেলনের কার্যবিবরণ	ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ
১৩৪৫	আশ্বিন	'বঙ্কিম প্রতিভা'	বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ

ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থ

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	পৌষ	১৩১৯
প্রতাপসিংহ ॥ তৃতীয় সংস্করণ	সতীশচন্দ্র মিত্র	মে	১৯২৭
মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	আষাঢ়	১৩২৬
জহান্-আরা	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্যৈষ্ঠ	১৩২৭
শিবাজী মহারাজ	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ফাল্গুন	১৩৩৫
ওমর খৈয়াম	সুরেশচন্দ্র নন্দী	ভাদ্র	১৩৩৬
আনন্দমঠ	পরিষৎ-সংস্করণ	আষাঢ়	১৩৪৫
দুর্গেশনন্দিনী	পরিষৎ-সংস্করণ	পৌষ	১৩৪৫
দেবী চৌধুরাণী	পরিষৎ-সংস্করণ	ভাদ্র	১৩৪৬
রাজসিংহ	পরিষৎ-সংস্করণ	শ্রাবণ	১৩৪৭
ছেলেদের বাবর	বাণী গুপ্ত	বৈশাখ	১৩৫২
সীতারাম ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ	পরিষৎ-সংস্করণ	ফাল্গুন	১৩৫২
বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ	রেজাউল করিম	মে	১৯৪৪
বাঙ্গালীর ইতিহাস	নীহাররঞ্জন রায়	আশ্বিন	১৩৫৬
প্রাচীন কলিকাতা	হরিহর শেঠ	ভাদ্র	১৩৫৯

---

১ ১৩৬৫, অগ্রহায়ণ 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।

২ মথুরানাথ সিংহের নামে প্রকাশিত।

৩ যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিত 'ঢাকার ইতিহাস'-এর সমালোচনা।

৪ ১৩৫৫, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।

৫ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রথম ভাগ-এর সমালোচনা।

৬ ইহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকা সংখ্যক ১ দ্রষ্টব্য।

৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলার বেগম' (২য় সংস্করণ)-এর সমালোচনা।

৮ ১৩৫৫, আষাঢ় 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।

৯ ১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।

১০ ১৩৫৫, আষাঢ় 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।

১১ ইহা এবং পরবর্তী সাতটি প্রবন্ধ কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া 'শিবাজী' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১২ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের নবম (আগ্রা) অধিবেশনের মূল সভাপতির ভাষণ।

১৩ সংবাদপত্রে সেকালের কথা [১ম খণ্ড] সমালোচনা।

মোগল পাঠান	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	আষাঢ়	১৩৫৯
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ	সরলাবালা সরকার	ভাদ্র	১৩৬৩
ভারতের মুক্তিসন্ধানী	যোগেশচন্দ্র বাগল	ফেব্রুয়ারি	১৯৫৮
ভগবৎ প্রসঙ্গ	হরিশচন্দ্র সিংহ	আগস্ট	১৯৫৮

১৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' [২য় খণ্ড] সমালোচনা।

১৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে'র সমালোচনা।

১৬ কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার উদ্বোধন বক্তৃতা।

১৭ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' [৩য় খণ্ড] সমালোচনা।

১৮ রঞ্জন-পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস'-এর সমালোচনা।

১৯ এই চারিটি প্রবন্ধই মারাঠা জাতীয় বিকাশ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২০ ১৩৬৫, আষাঢ় 'ষষ্টি-মধু'তে পুনর্মুদ্রিত।

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে।

২১ মাঘ ১৩৫৫ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বর্দ্ধনা সভায় আচার্য্যের ভাষণ। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৫৫, ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

২২ বঙ্গীয় ইতিহাস-পরিষৎ কর্তৃক ১৩৫৭ অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত সম্বর্দ্ধনার উত্তরে। পুস্তিকা সংখ্যক ৫ দ্রষ্টব্য।

আচার্য যদুনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল সভাপতিরূপে এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব করিয়াছেন আচার্য যদুনাথ সরকার[১]; সহকারী সভাপতিরূপেও তিনি বহু বৎসর[২] এই পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন; সহকারী সভাপতিরূপে প্রথম নির্বাচন মফস্বলবাসিরূপে 'নামমাত্র' হইলেও পরবর্তীকালে তিনি ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন 'পালাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ' করেন তখন তাহা নামমাত্র ছিল না।

আর, এই দীর্ঘকালে সমালোচনাভাজন হইবার যতই কারণ ঘটুক, পরিষদের পক্ষে এই সময়টা গৌরব করিবারও অন্যতম কাল। বিশেষতঃ, যদি স্মরণ রাখা যায় যে, পরিষদের সূচনায় ও প্রথম পর্বে উহার সেবা যে অনেকের মনে দেশসেবা ও স্বদেশীব্রত-পালনের সমার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে জন্য পরিষদের উদ্দেশ্য, "বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন"-কর্মে বিশেষভাবে ব্রতী না হইয়াও অনেকে দেশানুরাগ-বশতঃ ইহার সেবক ও পোষক হইয়াছিলেন, সে ভাব কালের গতিতে সুচিরস্থায়ী হয় নাই; যদি এ কথা না ভুলি যে, রাষ্ট্রের বা বদান্য ব্যক্তির স্বতন্ত্র অর্থানুকূল্য ব্যতীত কেবল সদস্যদের মাসিক চাঁদায় এরূপ গবেষণা-প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা দূরে থাকুক, অস্তিত্ব রক্ষাই একরূপ অসম্ভব বলিয়া বিবেচ্য; যদি মনে রাখি যে এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল অর্থসংকট, যদুনাথ ও তাঁহার সহযোগিগণ পরিষদের কর্মভার গ্রহণ করিবার পূর্বে কি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল[৩] তবে শত ত্রুটি-বিচ্যুতি, অভিযোগের কারণ যদিও থাকে তবু তাঁহারা পরিষৎকে রক্ষা ও নূতন পথে পরিচালনার গৌরব দাবি করিতে পারেন।

যদুনাথের এই বয়ঃকনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণ করি। প্রধানতঃ এই শিষ্যের আগ্রহেই যদুনাথ দীর্ঘকাল পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং উপদেশ দ্বারা পরিষৎকে পরিচালিত করিয়াছেন। পরিষদের

১. সভাপতি—১৩৪২-৩, ১৩৪৭-৫১, ১৩৫৪

২. সহকারী সভাপতি—১৩২৫-৮, ১৩৩৪, ১৩৪১, ১৩৪৪-৬, ১৩৫২-৩, ১৩৫৫-৯, ১৩৬১-৫
বিশিষ্ট সদস্য—১৩৪৫

৩. "আমাদের বয়স্থ সদস্যদের স্মরণ থাকিবে, বারো বৎসর আগে পরিষদের আর্থিক অবস্থা কি ভীষণ শঙ্কাজনক ছিল, তখন কর্মচারীদের বেতন দু মাস করিয়া বাকী থাকিত, কাগজের দাম, দৈনিক খরচ ও প্রেসের দেনার জের চলিত; এর উপর স্থায়ী তহবিল হইতে সাময়িকভাবে ধার লইয়া তাহাতেও বাজার দেনায় আট হাজার টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল। দেনা শোধের পথ দেখা যাইত না, আট নয় হাজার টাকার উপর অনাদায়ী মাসিক চাঁদা খাতায় লেখা মাত্র ছিল। আর, আজ ক'বৎসর ধরিয়া সব কর্মচারীই ঠিক সময়ে বেতন পাইতেছেন, দুঃসময় দেখিয়া সকলকেই বেতন বৃদ্ধি, ভাতা এবং বোনাস দিয়া রক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তের কাজ পাওয়া যাইতেছে। স্থায়ী তহবিলের সব পূর্বঋণ শোধ করিয়া, ঐ তহবিল বাড়াইয়া ষোল হাজার করা হইয়াছে।"

—যদুনাথ সরকার, সভাপতির অভিভাষণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন

কার্যপরিচালনায় সুব্যবস্থা, এবং পরিষদের উপযোগী গ্রন্থ সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশে ব্রজেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁহার শক্তি ও সময় একরূপ সম্পূর্ণভাবেই নিয়োগ করিয়াছিলেন এ কথা অত্যুক্তি নয়। আচার্য যদুনাথের অভিজ্ঞতার সহিত শিষ্যের কর্মৈষণার শুভযোগের ফলেই তিনি অনন্যব্রত হইয়া পরিষদের সেবা করিতে পারিয়াছিলেন।

পরিষদের একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে আচার্য যদুনাথ বলিয়াছিলেন—

"আমরা এতদিন ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দিক দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ বঙ্গদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ভাষা অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে রাজাসন পাইয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নবীন যুগের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করা, নব্য-জ্ঞান-বিস্তার কার্য্যে বঙ্গ ভাষায় সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি করা। এ কাজ না করিতে পারিলে আমাদের এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব হইয়া থাকিবে, ইহার নামের সার্থকতা লোপ পাইবে।"

আচার্য যদুনাথের নেতৃত্বকালেই, নবীন যুগের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি না হউক, তাহা রক্ষা ও প্রচারের কর্তব্য পরিষৎ অনেকাংশে পালন করিয়াছেন; এই উদ্যোগ এখনও অব্যাহত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিক উপলক্ষে তাঁহার যাবতীয় বাংলা ও ইংরেজী রচনার সুসম্পাদিত, সুমুদ্রিত, পাঠভেদ সম্বলিত সংস্করণ প্রকাশ এই উদ্যোগের প্রথম ফল[৪]; আচার্য যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে আধুনিক যুগের কোনও বাঙালী লেখকের গ্রন্থাবলীর এরূপ সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই, সে বিষয়ে পরিষৎ পথপ্রদর্শক। তদবধি পরিষৎ অনুরূপ ব্যবস্থায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আরও অনেক কবি, নাট্যকার ও মনীষীর গ্রন্থাবলীর সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, ও করিতেছেন, যেমন দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, (কবিতা ও গান), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ভারতচন্দ্র, রামমোহন ও মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর নির্ভরযোগ্য সংস্করণও পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ও বিহারিলাল চক্রবর্তীর প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থের সুসম্পাদিত

৪. এই ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ পরিষদের পক্ষে বৈষয়িক উন্নতিরও কারণ হয়। ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব কর্ত্তৃক ১৩৪৫ সনে প্রদত্ত দশ হাজার টাকার একটি ফণ্ড হইতে ইহার অনেকগুলিই মুদ্রিত হয়—একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে যদুনাথ সরকার বলেন—"এই সাত বৎসরে পরিষদের কর্ম্মীদের পরিচালনায় ফণ্ডের মূলধন বাড়িয়া ১৩৮০০৲ হইয়াছে, এবং ফণ্ডের প্রকাশিত ২৬,০০০৲ দামের পুস্তক বিক্রয়ের জন্য মজুদ আছে—অর্থাৎ সমস্ত খরচ বাদে ফণ্ডের মূলধন প্রায় চারিগুণ হইয়াছে।"

বৎসরের শেষে মুদ্রিত ও প্রচারিত আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখা যাইবে ফণ্ডগুলি ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

সংস্করণও প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত মনোবিকলনতাত্ত্বিক গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন' গ্রন্থও পরিষৎ পুনঃপ্রচার করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটি গ্রন্থই সুসম্পাদিত হইয়া একাধারে সাধারণ পাঠক ও গবেষকের আনন্দের কারণ হইয়াছে।

এই তালিকা দীর্ঘ হইল ; সুখের বিষয়, ইহা দীর্ঘতর হইতে পারিত। গত কুড়ি-বাইশ বৎসরে পরিষৎ যে-সকল প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহা তাহার একাংশের তালিকা মাত্র। এই সময়ে পরিষদের কর্মিগণ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। এই কুড়ি-বাইশ বৎসরের উদ্‌যোগে উনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের, বহু প্রধান সাহিত্যিকের পরিচয় উজ্জ্বল হইয়াছে, পরিচয় লাভের সুযোগ হইয়াছে। পরিষদের যে আর্থিক অবস্থা তাহার ফলে অনেক কর্তব্য অসম্পন্ন থাকিলেও, যাহা হইয়াছে তাহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। ইহা সম্পূর্ণই যদুনাথের সভাপতিত্বকালে না হইলেও তাঁহার পরামর্শেই এ কাজ আরব্ধ হয়, তাঁহার সহযোগিগণ এই অর্থাভাবের মধ্যেও নিষ্ঠার দ্বারা কাজ বহু দূর অগ্রসর করিয়াছেন এবং এখনও অব্যাহত রাখিয়াছেন।

১৩৫৫ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অভিনন্দনের উত্তরে যদুনাথ প্রসঙ্গক্রমে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নেতৃত্বে পরিষৎ কোন্ পথে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"আমি যে এত বৎসর ধরে সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালনা করেছি, কর্মীদের দৈনিক কাজেও পরামর্শে অতি নিকটভাবে সঙ্গী হয়ে আমাদের চেষ্টাগুলি ফলপ্রদ করবার সাহায্য করেছি,এর মধ্যে আমার একটি লক্ষ্য লুকানো ছিল। সেটি আজ প্রকাশ করে বলব। আমরা জানি যে সভা-সমিতি সর্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না ; কারণ প্রতিভার জন্ম শুধু ভগবানের দয়ার উপরই নির্ভর করে, মানুষের পরিকল্পনা বা আয়োজনে হয় না। তবে আমরা কি করতে পারি? আমরা পারি—যেখানে প্রতিভা আগে থেকে জন্মেছে তার বিকাশে সাহায্য করতে, তাকে অকালে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, তাকে পরিচিত সমাজে সমাদৃত করতে। এই হ'ল পরিষদের পক্ষে সম্ভব কাজ, এ কাজ আমাদের আগেও অনেক সভা-সমিতি এবং গুণগ্রাহী ধনী লোক করে এসেছেন।

"কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালী সাহিত্য-কর্মীদের চেষ্টা একটা বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে দৃঢ় করে রাখা, যার ফলে বাঙালী-চরিত্রের এক দিক্‌কার অভাব পূরণ হবে এবং আমাদের এক শ্রেণীর কাজ স্থায়ী হয়ে থাকবে। এই অভিপ্রায়টি খুলে বলব।...

"প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কি ক'রে বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রণালী আনা যায়? এই কাজের জন্য চাই, ন্যায়ের তর্কের জন্য আবশ্যক তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার মস্তিষ্ক নয়,—যা শুষ্ক খড় কাটতে পারে, ভাবে উন্মত্ত বা

ভক্তিরসে অশ্রুসিক্ত শুষ্ক মস্তিষ্ক—যা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, তা নয়। এখন চাই—ধীর স্থির সংলগ্ন চিন্তাশক্তি; অসীম শ্রমশীলতা, পরীক্ষা না করে কোন কথা গ্রহণ করব না—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; সমস্ত উপকরণ একত্র ক'রে, সামঞ্জস্য ক'রে তার ভিতর থেকে সত্যের খাঁটি নির্য্যাস বের করব, এই মন্ত্রে দীক্ষা। অর্থাৎ এক কথায়, যাকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বলে। আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান যুগে এই কাজ আরম্ভ করেছে এবং তার এই প্রচেষ্টায় উপদেশ ও সাহায্য দিতে পেরে আমি চরিতার্থ হয়েছি।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে 'পরিষদের সেবা হইতে বিদায়' প্রার্থনা করিয়া তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আশা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি—

"আমাদের তরুণ আগ্রহশীল কর্ম্মী চাই।...প্রকৃত কর্ম্মিগণ তরুণ না হইলে প্রতিষ্ঠান পঙ্গু হইয়া ক্রমে মারা যায়। আমরা নানা বিভাগে শ্রমী, সজাগ, স্বার্থত্যাগী, যুবক সাহিত্য-সেবক চাই। আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, দীনেশচন্দ্র ও চিন্তাহরণ, সকলেই পরিণতবয়স্ক, বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন। ইঁহাদের স্থান লইবার মত লোক কোথায় তৈয়ারী হইতেছে, আমি ত দেখিলাম না।...সকলের উপর চাই সদস্যগণের মধ্যে সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের স্পৃহা, সমবেত চেষ্টা করিবার আগ্রহ, প্রকৃত সাহিত্যসেবীর মনোবৃত্তি। ইহার অভাবে কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানও বন্ধ্যা হইয়া যায়, কালের কঠোর শাসনে প্রাণ হারায়। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ স্থিরবুদ্ধি কর্ম্মঠ সেবকগণ পাইব, এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছি। ইহাই আমার বিদায়-প্রার্থনা।"

এই প্রার্থনা সফল হইবে কি না, তাহার উপরেই পরিষদের ভবিষ্যৎ সার্থকতা নির্ভর করিয়া আছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণী-মন্দির

যদুনাথ সরকার

কলিকাতা শহরে বাঙ্গালীর নিজস্ব কত বড় একটি সৃষ্টি আছে তাহা অনেকেই জানেন না। আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের একটি বিশেষত্ব; ইহার মত দীর্ঘায়ু ও বহুলকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠান ভারতের আর কোন প্রদেশে নাই। অনেকে ভাবেন যে, এই পরিষৎ একটি সাহিত্য-সভা বিশেষ, এখানে শুধু মাসে মাসে প্রবন্ধ পাঠ হয়। কেহ বা মনে করেন যে, এটা পুস্তক প্রকাশের জন্য গঠিত কমিটী মাত্র। অনেকের আবার ধারণা, এ দেশীয় অনেক সমিতির মত ইহারও কাজ বৎসরে একদিন বিজ্ঞাপন দিয়া অধিবেশন করিয়া, বাকী ৩৬৪ দিন ঘুমাইয়া থাকা, কিন্তু এর কোনটিই সত্য নহে। আমাদের পরিষৎ এই সব শ্রেণীর সমিতি হইতে অনেক পৃথক এবং অনেক বৃহত্তর। ইহার অতীত কার্য্য এবং বর্ত্তমান বিভাগগুলির আলোচনা করিলেই ইহার প্রকৃত স্বরূপ এবং জাতীয় জীবনে উপকারিতা স্পষ্ট বুঝা যাইবে, অনেকের ভ্রমও দূর হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকের এবং হস্তলিখিত পুথির এত বৃহৎ ও সর্ব্বাঙ্গীণ সংগ্রহ ভারতের আর কোনও স্থানে নাই। ফলতঃ আমাদের প্রাদেশিক ভাষার অভিব্যক্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে যদি কেহ চর্চ্চা করিতে চান, তবে তাঁহাকে এই পরিষদের পুস্তকাগারে শ্রম করা ভিন্ন উপায় নাই। আর, আমাদের সংস্কৃত পুথির সংগ্রহ ও বহুমূল্য অঙ্গসবগুলি দানে পাওয়া। এমন কতকগুলি অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থ এখানে আছে যাহার দ্বিতীয় ভারতের অন্যত্র একখানি পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য-ইতিহাসেও যাঁহারা মৌলিক গবেষণা করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে আমাদের পরিষদে একবার আসা আবশ্যক।

পরিষদ-মন্দিরের পশ্চিমাংশে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-ভবনে অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি, অনুশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটি দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে এবং পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে কলিকাতায় নিজস্ব বলিয়া যদি কোন যাদুঘর থাকে, তবে তাহা ইহাই, কারণ চৌরঙ্গীর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, তাঁহারা একদিনে হুকুম দিয়া উহা দিল্লীতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারেন। বাঙ্গালীর যদি নিজের প্রদেশে সাধারণের সম্পত্তি করিয়া কোন প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন রাখিতে চান, তবে তাহা রমেশভবনে অথবা রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়ামে দান করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে যে কত অধিক সংখ্যক এবং অনেকস্থলে দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য মুদ্রিত বাঙ্গলা ইংরেজী সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহা অনেকেই জানেন না। আমাদের মফঃস্বলবাসী সদস্যগণও অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, এই গ্রন্থাগার হইতে দু-তরফা ডাকব্যয়

দিয়া বই ধার লইবার অধিকার তাঁহাদের আছে। অবশ্য, এইরূপ অবস্থার জন্ম আমরা (পরিষদের কার্য্য-কর্ত্তারা) অনেকটা দায়ী, কারণ আমরা এই সব পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত করিতে বিলম্ব করিতেছি, মফঃস্বলে এমন কি কলিকাতার সদস্যগণ এইরূপে এক মহাজ্ঞান ভাণ্ডার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছেন।

কিন্তু উত্তর কলিকাতায় এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া এত বড় লাইব্রেরী আর একটিও নাই, এখানে প্রত্যহ বৈকালে প্রায় দেড়শ' পাঠক আসিয়া পুস্তক পড়েন; ইঁহাদিগের কিছুই দিতে হয় না। তবে ঘরে বই লইয়া যাইতে হইলে সদস্য হওয়া চাই। কেহ যেন মনে না করেন যে "সাহিত্য-পরিষৎ" নামের সার্থকতার জন্য আমরা শুধু বাঙ্গলার ভাষাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব অথবা প্রাচীন গ্রন্থমাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্র বাদ দিয়াছি। তাহা নহে, ইংরেজীতে নব্য বিজ্ঞান ছাড়া আর সব বিভাগেরই অনেক মূল্যবান বই এখানে আছে! আমাদের পূর্ব্ব সংগ্রহ বাদে চারিটি মহাপুরুষের বিখ্যাত বাছা বাছা গ্রন্থসংগ্রহ পরিষদ-ভবনে আশ্রয় পাইয়াছে, যথা—৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, ৺কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। এগুলির তালিকা রচিত হইয়াছে। তাহা মুদ্রিত করিবার চেষ্টায় আছি।

একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (৮৯৪ খ্রীঃ) শোভাবাজার রাজবংশীয় স্বর্গগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আলয়ে, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতি-সাধন এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং বিবিধ বিজ্ঞানসম্পর্কিত গবেষণাও পরিষৎ তাহার অনুসন্ধান এবং আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়া লইয়াছে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষৎ যে-যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণ এখানে দিতেছি ;—

(ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—প্রতিষ্ঠাবধি পরিষৎ এই নামে যে ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে চল্লিশ বৎসরে বাঙ্গালার চিন্তাশীল শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখনী-প্রসূত দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং গ্রাম্য ও প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক মৌলিক গবেষণামূলক বহু অমূল্য প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। বিদ্বদ্বর্গ-সঙ্কলিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও পত্রিকার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে।

(খ) গ্রন্থ প্রকাশ—পরিষৎ যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্যে বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও তাঁহার পদাবলী, বিবিধ পৌরাণিক গ্রন্থ ও শূণ্যপুরাণাদি, মঙ্গলকাব্য, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী, প্রস্তর ও তাম্রশাসন সম্পর্কিত লেখমালা, সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,

রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি পণ্ডিত ও মনীষীগণের সম্পাদনে তিরাশিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানির আবিষ্কারের সম্মান কোন কোন সম্পাদকের প্রাপ্য। সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক কলিকাতা, ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সাদরে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

(গ) পরিষদ্ গ্রন্থাগার—এই গ্রন্থাগার কেবল পরিষদের নিজস্ব সঞ্চয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় নাই। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাগার, অক্ষয় দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব গ্রন্থাগার ছাড়া সাহিত্য সভা ও বান্ধব লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু গ্রন্থাগারও পরিষদের অঙ্গীভূত হওয়ায় এই গ্রন্থাগার ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসঞ্চয়ে পরিণত হইয়াছে। শুধু বাঙ্গালা নয়, ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবি, ফার্সী, ল্যাটিন, গ্রীক, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কাব্যসাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থরাজি এই সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাগারে সকল শ্রেণীর পুস্তক সংখ্যা ৫০,০০০-এর উর্দ্ধে। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণাকারিগণকে পুস্তক পাঠের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। বহু প্রথম মুদ্রিত ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা পুস্তক এবং সাময়িক পত্রের বিপুল সংগ্রহ এই গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং অন্যান্য সংগ্রহের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে।

(ঘ) পাঠাগার—এক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ব্যতীত পরিষদের পাঠাগারের প্রাত্যহিক পাঠক-সংখ্যা ভারতবর্ষের যে কোন পাঠাগারের পাঠক-সংখ্যাকে নিঃসন্দেহে অতিক্রম করে। সদস্য এবং পাঠকগণের নিকট প্রত্যহ শতাধিক গ্রন্থের আদান প্রদান হয়। প্রত্যহ দেড় শতের অধিক পাঠক পাঠাগারে বসিয়া সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি পাঠ করে।

(ঙ) পুথিশালা—পুথিশালায় বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফার্সী, তিব্বতী (টেঙ্গুর ও কেঙ্গুর), উড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির মধ্যে পাঁচ ছয় শত বৎসরের পুরাতন পুথিও আছে। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লালগোলার মহারাজ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, সেওড়াফুলির রাজবাটী, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী প্রভৃতি বহু মনীষী ও সাহিত্য-প্রেমিকেরা ইহাতে পুথি দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর পুথির সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার দাঁড়াইয়াছে। কোন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুথি, বিশিষ্ট পণ্ডিত দ্বারা সম্পাদনান্তে প্রকাশ করা হইয়াছে। কতকগুলি বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত পুথির তালিকা প্রকাশিত হইতেছে।

(চ) চিত্রশালা—পরিষদের প্রথম সভাপতি ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত 'রমেশ-ভবনে'র (চিত্রশালা) সংগ্রহে প্রাচীন মুদ্রা, মূর্ত্তি, চিত্র, তাম্রশাসন, দলিল প্রভৃতি বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য আছে। তন্মধ্যে ধাতু নির্ম্মিত তিনটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কবি হেমচন্দ্র প্রভৃতির হস্তলিপি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং 'রবীন্দ্র-সংগ্রহ' ইহার অন্তর্গত। উপরন্তু,

(ছ) পরিষদ-মন্দিরে প্রায় সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মূর্ত্তি ও চিত্র সংরক্ষিত

আছে। ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতির মূর্ত্তি ও রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মর-মূর্ত্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফলতঃ যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব সৃষ্টি, গৌরবের প্রতিষ্ঠান। এই জন্যই ইহার জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত এই পরিষৎ অনেক সুধী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অর্থ, সময় ও স্নেহ লাভ করিয়া আসিয়াছে; অসংখ্য পণ্ডিত প্রত্যহ অবৈতনিক পরিশ্রম করিয়া ইহার কার্য্য সফল করিয়া দিয়াছেন। ধনী অক্লান্ত ভাবে ধন দিয়াছেন। জ্ঞানী জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন, আর দরিদ্রতম বাণীর সন্তানও দেশ-সেবায় এই মন্দিরে নিজের সময় ও শক্তি অঞ্জলি দিয়াছেন।

বাঙ্গালী জাতি ইহাকে নিজ সঙ্ঘ-শক্তি দ্বারা বলীয়ান করিয়া তুলুন ইহাই কামনা।

'দেশ', ৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া আচার্য যদুনাথ পরিষৎকে নানাভাবে সুগঠিত করিয়া তুলিবার জন্য যেমন উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন তেমনি সাধারণের সমক্ষেও পরিষদের পরিচয় উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই লেখাটি সংকলিত হইল। এই রচনা প্রকাশের পরে তাঁহার সভাপতিত্বকালে পরিষদের যে-সকল উন্নতি হইয়াছে অন্যত্র সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত পরিষৎ-পরিচয়-রূপে এই রচনাটির উপযোগিতা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

স্মৃতিসভা

অনুরূপা দেবী

বিগত ৫ আষাঢ় ১৩৬৫, ২০ জুন ১৯৫৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আহ্বানে স্বর্গীয়া অনুরূপা দেবীর স্মরণে রমেশ-ভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি অনুরূপা দেবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যার্ঘ্য দান করিলে সভার কার্য আরম্ভ হয়।

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী অনুরূপা দেবীর সম্বন্ধে এই সভায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, ১৩৬৫ শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"এই সময়ের লেখিকাদের সাহিত্য-সাধনার কথা বলতে গেলে যা মনে পড়ে তা হচ্ছে তাঁদের সেই সেকালের সংস্কার কত বাধা কত বিধিনিষেধময় তাঁদের জীবন যাত্রার কথা। যাঁদের পিতামহীদের যুগে সংস্কার ছিল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। বৈধব্যের আতঙ্ক ত কম কথা নয়, মেয়েরা ভয়ে ও পাড়ায় যেতে চাইতেন না, গুরুজনরাও যেতে দিতেন না। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র দেড়'শ বছর আগেই এই সংস্কার ছিল। অবশ্য অনুরূপা দেবীর যুগের অনেক আগের কথা বলছি। কিন্তু এ সংস্কার সেদিনেও ছিল এবং নিরক্ষর নারীতে অন্তঃপুর ভরা ছিল যা অল্পবিস্তর আমরাও দেখেছি; আর বিয়ের বয়সেরও অনেক বিধিনিষেধ ছিল। আট-দশ বছর বয়সের মধ্যেই যেন ঐ ব্যাপারটি চুকিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়, এই মনোভাব। লেখাপড়ায় বৈধব্যভয়ের সংস্কারটা যদি-বা এড়ানো গিয়েছিল কিন্তু বিয়ের বয়সের নিয়মের বাধা সেদিনেও ছিল। সুতরাং 'কন্যাকাল'টি মাত্র দশ বছরে শেষ করে বধূ-জীবনের সীমানায় এসে পড়তে হ'ত। তারই মাঝে মাঝে কেউ কেউ যে ভাবে হোক কিছু লেখাপড়া শিখতেন, চর্চাও করতেন। কিন্তু সে চর্চা নিন্দনীয় ছিল বলে তা করতে হ'ত সঙ্গোপনে।…

"অনুরূপা দেবীরও বিয়ে হয় দশ বছর বয়সে। বিখ্যাত পণ্ডিত লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতামহ ছিলেন। লেখাপড়া বাল্যেই কিছু শিখেছিলেন। কিন্তু সে শৈশবের শিক্ষা, পরিপূর্ণ মানুষের শিক্ষা নয়। কাজেই মনে হয় কন্যা ও বধূ-জীবনের নানা কর্তব্য ও কাজ কর্মের মাঝে, গৃহ-জীবনের পানসাজা ভাঁড়ারঘরের কাজ, ভাই-বোন, দেবর-ননদ সমাযুক্ত দুটি বৃহৎ পরিবারের কত ছোট বড় সংস্কার ও কাজের মাঝে তিনি নিজের চেষ্টায় আরও লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং লেখার চর্চা শুরু করেছিলেন।

"সেই চর্চার ফলে কোথাও কোথাও কয়েকটা ছোট গল্প ও অন্য লেখার পর একটি উপন্যাস বেরল স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী'তে 'পোষ্যপুত্র' নামে এবং পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। লেখিকা প্রথম কয়েক সংখ্যায় নাম দেন- নি, পরে যখন

নাম দিলেন তখন লোকে বিশ্বাস করতে চায় না মেয়েদের লেখা। তাতে নামটিও তখনকার সর্বসাধারণের মত নয়। ঝরঝরে চমৎকার ভাষায় লেখা, কল্পনাও নিজস্ব, রচনাভঙ্গীও পরিচ্ছন্ন, আদর্শের ধারাও নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে এনেছে। সে সময়ে এমন লেখা নিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর পর দুজন এসেছিলেন—অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী। দুজনেই সমসাময়িক এবং উভয়ে পরম বন্ধুত্বসূত্রেও আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যাহোক, অনেকেই বললেন, এ লেখা নারীর ছদ্মনামে পুরুষের। সেটাও তাঁর অন্যতম প্রশংসাপত্রই বলা চলে। তাঁর লেখা পান্‌সে, জলো বা একঘেয়ে মেয়েলি লেখার মত নয়।

"একবার দেখেছি—'বসুমতী'র 'দেবী আসরে' তাঁর একটি সম্বর্দ্ধনা সভায়। বহু মহিলা এসেছিলেন। চমৎকার নিরহঙ্কার সৌজন্যময় ব্যবহার যেমন বাড়ীতে, তেমনি সভাতেও। প্রায় সব লেখিকাকেই চিনতেন। কারো নামে, কাউকে বা ব্যক্তিগতভাবে। সেদিনের সভায় সকলের সঙ্গেই মধুর সহজ সৌজন্যে ও স্নেহে আলাপ করলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব জ্ঞান ও সামাজিকতায় এঁরা পক্ষপাতী। সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর চরিত্রের স্নেহমধুর দিকটির কথা মনে থাকবে।"

"এর পরে তাঁর বহু লেখা—'বাগ্‌দত্তা,' 'মন্ত্রশক্তি,' 'মা,' 'মহানিশা,' 'রামগড়,' 'ত্রিবেণী প্রভৃতি উপন্যাস "ভারতী," "ভারতবর্ষ," এবং অন্যান্য নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখার পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি স্বনামধন্যা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' প্রকাশিত হওয়ার পর নারী-রচিত সাহিত্যের ইতিহাসে আজও তিনি প্রধানতম ও বিশিষ্ট লেখিকা হয়ে আছেন।…"

"শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় বললেন, 'অনুরূপা দেবীর সাহিত্য জীবন তাঁর পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদর্শের ভাষ্য'… তা খুবই সত্য মনে হল। তাই হয়ত জীবনের শেষ দিকে তাঁর সাহিত্য খানিক প্রচারধর্মীও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর প্রথম-জীবনের খ্যাতি আজও অম্লান হয়ে আছে সাহিত্যক্ষেত্রে। তিনি এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদর্শবাদে কারও অনুসরণ বা অনুকরণ করেন নি। সাহিত্য, জ্ঞান, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বে অনুরূপা দেবী যে অটল অনমনীয় চরিত্রের মানুষ ছিলেন, সে যুগটা শেষ হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।"

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অনুরূপা দেবীর সহিত নানা বিষয়ে তাঁহার আলোচনার কথা বিবৃত করেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস অনুরূপা দেবীর সাহিত্যপ্রতিভার আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি 'সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অসমীচীন হয় নাই। সমাজের সহিত সাহিত্যকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়া তিনি মনে করিতেন, সাহিত্যের সূত্রে আনন্দ-দানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পথনির্দেশের কর্তব্যভারও এইজন্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যদুনাথ সরকার

বিগত ৬ আষাঢ় ১৩৬৫, ২১ জুন ১৯৫৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে আচার্য যদুনাথ সরকারের স্মরণে রমেশ-ভবনে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়।

পরিষদের সভাপতি শ্রীসুশীলকুমার দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি আচার্যদেবের প্রতিকৃতিকে মাল্যার্ঘ্য দান করিলে সভার কার্য আরম্ভ হয়।

আচার্য যদুনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ যে বক্তৃতা দেন নিম্নে তাহার সারাংশ মুদ্রিত হইল—

"আচার্য যদুনাথ সরকার বাল্যকালে তাঁর পিতার গ্রন্থাগারে মনোযোগ সহকারে ইতিহাসের বই পড়তেন। তাঁর পিতা ইতিহাস ও সাহিত্যের অনেক মূল্যবান বই সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থাগারেই যদুনাথের মনে ইতিহাস-প্রীতির বীজ উপ্ত হয়।

"আচার্য যদুনাথ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের ভারতের ইতিহাস রচনা করেছেন। কি অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁকে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। দুই শতাব্দীব্যাপী ভারত ইতিহাসের অজ্ঞাত ও দুর্লভ তথ্য ও উপকরণ তিনি ফার্সী পুঁথিপত্র, রাজস্থানী নথিপত্র, পর্তুগীজ দলিল, ইংরাজ-কুঠির নথিপত্র, মরাঠী বখর ও পত্রাবলী, ফরাসী ভাষায় লেখা ব্যক্তিগত স্মৃতিচিত্র, প্যারিসের Bibliotheque Nationale ও ভারতের সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্রসমূহ থেকে সংগ্রহ করেছেন। দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর তিনি যেভাবে Insha-i-Haft Anjuman গ্রন্থটি উদ্ধার করেছিলেন, তা বিস্ময়কর।

"যদুনাথের বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাসের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে না দেখা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। গভীর নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি একের পর এক ঘটনাবলী সাজিয়েছেন, একটি বিষয়ে মতামত দেওয়ার পূর্বে তাঁকে কত পুথিপত্র পাঠ করতে হয়েছে এবং এমন কি একটি স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য তাঁকে কতবার Survey of Indiaর বিভিন্ন মানচিত্র পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাস কেবলমাত্র বিভিন্ন ঘটনার তথ্যপঞ্জী নয়, তথ্য যেমন নির্ভুল হওয়া দরকার, তেমনি তাকে মনোজ্ঞকরে প্রকাশ করতে হবে। যদুনাথের রচনারীতি ছিল অতি প্রাঞ্জল। তাঁর রচনায় ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও রচনাশৈলী এ দুয়ের অপূর্ব মিলন লক্ষ্য করা যায়।

"তথ্য যাতে নির্ভুল হয় সে বিষয়ে যদুনাথ সদা সতর্ক ছিলেন। তিনি একেবারে আকর-গ্রন্থ ও নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিটি ঘটনা ও সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, এ কারণে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে ভারত-ইতিহাসের মুঘল ও মারাঠা যুগের গবেষণার ক্ষেত্রে আচার্য যদুনাথ আপন আসনে দীর্ঘকাল স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।"

শ্রীসজনীকান্ত দাস বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত আচার্য যদুনাথের সম্পর্ক, ও তাঁহার বাংলা রচনার বিশিষ্ট সাহিত্যগুণের বিষয় আলোচনা করেন।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

স্বরলিপি

পুরাতন যে-সকল গান বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্, কিন্তু যাহার সুর এখন সেরূপ সুপ্রচারিত নহে, আধুনিক যুগের প্রধান কবিদের রচিত যে-সকল গান এখন বিস্মৃতপ্রায়, সে-সকল গানের স্বরলিপি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের প্রযত্ন করা হইবে। বর্তমান সংখ্যায় বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর রচিত গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইল।—সঙ্গীত শ্রবণে ও রচনায় তরুণ বয়স হইতেই বিহারিলালের অনুরাগ ছিল। নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিয়াছেন—"বিহারিলাল বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, এবং যাত্রা পাঁচালী বা কবির গানের কথা শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁদের সঙ্গীতশ্রবণসাধ পরিতৃপ্ত করিতেন।··· ভাবী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, বাটীতে আসিয়া সেগুলিকে স্বরলয়ে পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতেন এবং গীতের কোন অংশ বিস্মৃত হইলে তাহা নিজেই পূরণ করিয়া লইতেন। এইরূপ পররচিত গীতের অংশ পূরণ করিতে করিতে ক্রমে তিনি আপনি গীত রচনা আরম্ভ করেন।"[১]

রবীন্দ্রনাথ বালকবয়সের স্মৃতি-বিবরণে বিহারিলাল প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"[বিহারীলাল] ভাবে ভোর হইয়া [আমাকে] কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার সুর খুব বেশি ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না—যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্‌গদকণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে—'বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে,'[২] 'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে'[২] তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।[৩]

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী-রচিত গানের যে স্বরলিপি প্রকাশিত হইল তাহা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা-দেবী চৌধুরাণীর পুরাতন গান ও স্বরলিপির সংগ্রহ-পুস্তক হইতে গৃহীত। এই গান তিনি বাল্যকালে বাড়িতে শুনিয়াছেন এইরূপ বলিয়াছেন, সুর কাহার দেওয়া নিশ্চিত জানেন না। রবীন্দ্রনাথের হওয়া বিচিত্র নয়।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরাদেবী গানের যে কথা দিয়াছেন তাহার সহিত বিহারিলালের গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠের সামান্য পার্থক্য লক্ষণীয়।—পত্রিকাধ্যক্ষ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১. প্রবাস, ফেব্রুয়ারি ১৯০০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৫ সংখ্যায় উদ্ধৃত।

২. বিহারিলাল-রচিত গান।

স্মৃতি, "সাহিত্যের সঙ্গী" অধ্যায়।

১

কীর্তন। দাদ্‌রা

পাগল মানুষ চেনা যায়
ও তার হাস হাসি মুখশশী, খুসি ফোটে চেহারায়॥
সদাশিব সদানন্দ সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন পর;
ও সে জানে না দুনিয়াদারি, ভালোবাসে দুনিয়ায়॥
আপন ভাবে আপনি মগন,
ও তার ঢুলু ঢুলু ঢোলে দু নয়ন,
ও সে কি যেন মধুর বাঁশি সদাই শুনিতে পায়॥

কথা। বিহারীলাল চক্রবর্তী   স্বরলিপি। শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

। গা গা -সা II { গা গা -া । রা রা -গরা I সা -া -া। (গা গা -সা) } I
পা গ ল্ মা নু ষ্ চে না ০০ যা ০ য়্ পা গ ল্

। -া সা সা I { রা মা -া । পা পা -া I পা দপা -ণা । দা পা -া } I
০ ও তার্ হা সি ০ হা সি ০ মু খ০ ০ শ শী ০

I মা পা -া । পণা দা -পা I মপা গা -া । গমা -পা -া I -া -া -া ।
খু সি ০ ফো টে ০ চে০ হা ০ রা০ ০ ০ ০ ০ য়্

। গা গা -সা II
"পা গ ল্"

। -া -া -া II { সা রা -মা । মা -া -া I মা গমা -পা । পা -মা পা I
০ ০ ০ স দা ০ শি ০ ব্ স দা০ ০ ন ন্ দ

I গা গা -া । মা মা -া I পা -া -া । মা পা -া I
স র ০ ল অ ন্ ত ০ র্ কে হ ০

I গা গা -মা । গা রা -গরা I সা -া -া । (-া -া -া) } I -া পা ধা I
না হি ০ আ প ০ন্ প ০ র্ ০ ০ ০ ০ ও সে

I { ধা র্সা -া । নর্সা -র্রা র্সা I না না -র্সনা । ধা ধনধা -পা } I
জা নে ০ না০ ০ দু নি য়া ০০ দা রি০ ০

I পা ধা -া । পধা -না ধা I পা পমা -গা । গমা -পা -া I
ভা লো ০ বা০ ০ সে দু নি০ ০ য়া০ ০ ০

I -া -া -া । পা পা -সা II
০ ০ য়্ "পা গ ল্"

। -া -া -া II { সা রা -মা । মা মা -া I গা গা -া । পা মা -া I
০ ০ ০ আ প ন্ ভা বে ০ আ প ০ নি ম ০

I পা -া -া । -া পা মা I মা মা -ধা । পা পা -া I
গ ০ ০ ন্ ও তার্ ঢু লু ০ ঢু লু ০

I মা মা -া । গমা -পা মা I মপমা -গা -া । (-া -া -া) } I -া পা ধা I
ঢো লে ০ ডু০ ০ ব য়০ ০ ন্ ০ ০ ০ ০ ও সে

I { ধা র্সা -া । নর্সা -র্রা র্সা I না না -র্সনা । ধা ধনধা -পা } I
কি যে ০ ন০ ০ ম ধু র ০ ০ বাঁ শি০ ০

I পা ধা -া । পধা -না ধা I পা পমা -গা । গমপা -া -া I
স দা ০ ই০ ০ শু নি তে০ ০ পা০০ ০ ০

I -া -া -া । গা গা -সা II II
০ ০ য়্ "পা গ ল্"

২

পুরবী। দাদ্‌রা

গাছে ফুল শোভা যেমন, হয় কি তেমন গাঁথলে মালা,
গলায় দিয়ে থানেক মজা, শেষকালেতে হেলাফেলা ॥
কোথা সে সৌরভ সুখ,
কোথা সে প্রফুল্ল মুখ,
সে অধরে রসভরে, ভ্রমরে করে না খেলা ॥

II { । । গা । পা পা -া I পক্ষা পা -ক্ষনা । ধা পা -ক্ষপা I
গা ছে ফু ল্ শো ভা ০০ যে ম ০ন্

॥

I ক্ষগা -মা গা । ঋা সা -া I সন্‌া -সন্‌া সা । রা গা -া } I
হ য়্ কি তে ম ন্ গাঁ ০থ্ লে মা লা ০

I -া -া গা । { গা পা ধা I ধা সা -া । না ধপা -া I (-া -ক্ষপা গা)} ।
০ ০ গ লায়্ দি য়ে থা নে ক্ ম জা ০ ০ ০ ০ গ

I পা -ক্ষা পা । ক্ষপা -ধা পা I গা গঋা -গা । ঋা সা -া I
শে ষ্ কা লে০ ০ তে হে লা০ ০ ফে লা ০

I সন্‌া -সন্‌া সা । রা গা -া II
গাঁ ০থ্ লে মা লা ০

II -া -া { গা । গা পা ধা I ধা র্সা -নর্সর্া । র্সা সা -া I
০ ০ কো থা সে সৌ র ভ ০০০ সু খ ০

I -া -া র্সা । না ধা ধা I ধা পধা -নর্সা । নধা নাঃ -ধঃ I
০ ০ কো থা সে প্র ফুল্ ল০ ০০ মু০ খ ০

I -পা -ক্ষপা }{ গপা । পা পা পা I ক্ষা পা -ক্ষনা । ধা পা -ক্ষপা I
০ ০০ সে০ অ ধ রে র স ০০ ভ রে ০০

I -গা -া } গা । ক্ষা ধা পা I গা গঋা -গা । ঋা গা -া I
০ ০ ভ্র ম রে ক রে না০ ০ খে লা ০

I সন্‌া -সন্‌া সা । রা গা -া II II
গাঁ ০থ্ লে মা লা ০

'খেলা' উচ্চারণ : খ্যালা

স্বীকৃতি

আচার্য যদুনাথ সরকারের প্রতিকৃতির ব্লক বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ অনুগ্রহপূর্বক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

কবি রজনীকান্ত সেনের প্রতিকৃতির ব্লক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বর্তমান সংখ্যার মলাটে ব্যবহৃত নকশাগুলি শিল্পী শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত বিনাব্যয়ে আঁকিয়া দিয়াছেন।

ইঁহারা সকলেই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

সংশোধনী

পৃ. ৭০ হইবে : ১৩৫৯ ভাদ্র 'ইতিহাস' ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে পর্তুগীজ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়

১৩৬০ শারদীয় সংখ্যা 'উষা' সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ

পৃ. ৭২ : ২০ সংখ্যক পাদটীকার নিচের পঙ্ক্তি বর্জনীয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চতুঃষষ্টিতম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

পরিষদের বিগত বার্ষিক অধিবেশন ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্যসেবী ও সদস্য পরলোকগমন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি।

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং আলোচ্য বর্ষের সহকারী সভাপতি আচার্য্য যদুনাথ সরকার বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ তারিখে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল তিনি পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩২৫ সালে প্রথমবার তিনি সহকারী সভাপতিপদে ও ১৩৪২ সালে প্রথমবার সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। সেই সময় হইতে বিভিন্ন সময়ে সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪২ সালে নানাকারণে পরিষদের অবস্থা যখন নৈরাশ্যজনক হইয়া উঠে, তখন সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া তিনি পরিষদের উন্নতিমূলক অনেক কার্য্যের পত্তন করেন ও পরবর্তী দশ এগার বৎসরকাল তাঁহারই নেতৃত্বে পরিষদের সর্ব্ববিভাগে উন্নতি ঘটে। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে সমস্ত নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ কার্য্যের ধারা নূতন খাতে বহাইয়া দিয়া পরিষদের নবজীবন সঞ্চারে সহায়ক হন, নিঃসন্দেহে তাঁহারা তাঁহার উৎসাহে ও দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত হইয়াছিলেন। বিগত ৬ই আষাঢ় একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া পরিষৎ তাঁহার পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথ রায়—বহুদিন পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন। পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত করান। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক আছে।

জিতেন্দ্রনাথ বসু—প্রায় ৩০ বৎসরকাল নানাভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বহুবৎসর ধরিয়া তিনি পরিষদের সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অনুরূপা দেবী—সাধারণ সদস্য হিসাবে পরিষদে যোগদান করেন। পরে তিনি অন্যতম সহকারী সভানেত্রীর পদে নির্বাচিত হন। বিগত ৫ই আষাঢ় একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—রাজসাহী কলেজে কার্য্যকালে রংপুর শাখা-পরিষদের মাধ্যমে পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন। পরিষদের দর্শন-শাখার সদস্য হিসাবে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। ১৩৪৭।৪৮ বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিষদের সহিত যোগাযোগ রাখিতে না পারিলেও তিনি সর্ব্বদা পরিষদের মঙ্গল চিন্তা করিতেন। পরিষদের সদস্য ও বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বিজয়েন্দ্রনাথ শীল বিগত ১লা শ্রাবণ দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিজয়েন্দ্রবাবু মাঝে মাঝে পুস্তকাদি দিয়া

পরিষৎকে সহায়তা করিয়াছেন। এই সকল সদস্যের বিয়োগে পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

আনন্দ-সংবাদ: পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চীন সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় সাহিত্যিকগণের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে চীনদেশে গিয়া বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। পরে রুশ-সরকারের আমন্ত্রণে এশিয়ান ও আফ্রিকান রাইটার্স কনফারেন্সের বিষয় সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে ভারতীয় সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিত্ব করিতে মস্কো গিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং বর্ত্তমানে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ও চিকাগো ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন বিষয়ক বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ড° শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও সদস্য ড° শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দ্বয় আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়াছেন। ড° শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন অসুস্থ হইয়া বর্তমানে লণ্ডনে আছেন। তিনি সুস্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করুন ইহা কামনা করিতেছি।

পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণ।

বান্ধব: রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্ট সদস্য: যদুনাথ সরকার (মৃত্যু ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫) ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন-সদস্য: একত্রিশজন—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২। ড° শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৩। ড° শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৪। ড° শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৫। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৬। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ৭। শ্রীহরিহর শেঠ, ৮। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ৯। শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, ১০। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১১। ড° শ্রীরঘুবীর সিং, ১২। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৩। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১৪। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৫। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ১৬। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৭। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ১৮। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, ২০। শ্রীত্রিদিবেশ বসু, ২১। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ২২। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, ২৩। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ২৪। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন, ২৬। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭। শ্রীসুধাকান্ত দে, ২৮। শ্রীবিভূভূষণ চৌধুরী, ২৯। শ্রীঅজিত বসু, ৩০। শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী ও ৩১। শ্রীআর্থার হিউজ।

অধ্যাপক সদস্য: বর্ষশেষে ৮ জন।

সহায়ক সদস্য: বর্ষশেষে ৬ জন।

সাধারণ সদস্য : কলিকাতাবাসী ৭২৩ জন, মফঃস্বলবাসী ৪৭ জন, মোট ৭৭০ জন।

আলোচ্য বর্ষে ৩ জন মফঃস্বলবাসী সহ মোট ১৮৩ জন পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন। দীর্ঘকাল চাঁদা বাকী পড়ায় বর্ষশেষে ৯৩ জনের নাম সদস্য তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৪৪ জন সাধারণ সদস্য, পদত্যাগ করিয়াছেন।

চতুঃষষ্টিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণ

সভাপতি : ড° শ্রীসুশীলকুমার দে ; **সহকারী সভাপতিগণ :** শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, যদুনাথ সরকার, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও ড° শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; **সম্পাদক :** শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, **সহকারী সম্পাদকগণ :** শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; **চিত্রশালাধ্যক্ষ :** শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ; **গ্রন্থাধ্যক্ষ :** শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ; **পত্রিকাধ্যক্ষ :** শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ; **পুথিশালাধ্যক্ষ :** শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ; **কোষাধ্যক্ষ :** শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ।

কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ : (সদস্যগণ পক্ষে) শ্রীআমিনুর রহমান, রেভাঃ এ. দোতেন, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টচার্য্য, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীসুশীল রায়। (শাখাপরিষৎ পক্ষে) শ্রীঅতুল্য-চরণ দে, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, শ্রীমানিকলাল সিংহ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। (পৌরসভার প্রতিনিধি) ডাঃ কানাইলাল দাস।

পরিষদের বিবিধ কার্য্যকলাপের বিবরণ : ১। পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের সহায়তার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্যবর্ষেও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শাখাসমিতি ও চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, ছাপাখানা, গ্রন্থপ্রকাশ, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সকল সমিতির উদ্যমশীলতার উপর পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার নির্ভর করিতেছে, আগামী বর্ষে পরিষৎ এই সমিতিগুলিকে আরও সক্রিয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন।

২। নিয়মাবলী-সংশোধন উপসমিতি কয়েক বৎসরের চেষ্টার পর আলোচ্য বর্ষে নিয়মাবলীর সংশোধন কাজ শেষ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে। যথাসময়ে সংশোধিত নিয়মাবলী পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করা হইবে।

৩। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষদের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছে :

(ক) **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়**

(১) বিদ্যাসাগর বক্তৃতা সমিতি : ড° শ্রীসুশীলকুমার দে।

(২) সরোজিনী পদক সমিতি : শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(৩) লীলাদেবী পুরস্কার সমিতি : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(খ) **নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন, আমেদাবাদ—**

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গ) **বঙ্কিম-সংগ্রহশালা, নৈহাটি**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(ঘ) **ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন (গ্রন্থপ্রকাশ শাখা)**

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

৪। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার শতবার্ষিকী প্রদর্শনী"তে পরিষদের সংগ্রহভুক্ত পুস্তক ও প্রত্নবস্তু ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। আলোচ্যবর্ষে পরিষদের স্থায়ী কর্ম্মচারীদের সকলেরই বেতন কিছু কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পরিষদের বিশেষ বিশেষ অধিবেশন নিম্নলিখিত মত অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষদের অধিবেশন

১। **৬৩ বার্ষিক অধিবেশন** : ২২ শ্রাবণ ১৩৬৪ ;

২। **প্রথম মাসিক অধিবেশন** : ২২ ভাদ্র ১৩৬৪ ;

৩। **দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন** : ৪ আশ্বিন ১৩৬৪ ;

৪। **তৃতীয় মাসিক অধিবেশন** : ১৬ কার্ত্তিক ১৩৬৪ ;

৫। **চতুর্থ মাসিক অধিবেশন** : ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ ;

৬। **পঞ্চম মাসিক অধিবেশন** : ২৭ পৌষ ১৩৬৪ ;

৭। **ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন** : ২৫ মাঘ ১৩৬৪ ;

৮। **সপ্তম মাসিক অধিবেশন** : ২৪ ফাল্গুন ১৩৬৪ ;

৯। **অষ্টম মাসিক অধিবেশন** : ২২ চৈত্র ১৩৬৪ ;

১০। **বিশেষ অধিবেশন** (অনুরূপা দেবীর মৃত্যুতে শোকসভা) ৫ আষাঢ় ১৩৬৫ ;

১১। **বিশেষ অধিবেশন** (ড° যদুনাথ সরকারের মৃত্যুতে শোকসভা) ৬ আষাঢ় ১৩৬৫ ;

১২। **কবি মধুসূদন দত্তের সমাধি স্তম্ভে মাল্যদান অনুষ্ঠান** : ১৪ আষাঢ় ১৩৬৫।

গ্রন্থপ্রকাশ : (ক) পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে সাহিত্য-সাধক চরিতমালার ১।২০।৪৫।৭০।৭৩ সংখ্যক পুস্তকগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী ও

বাশুলীমঙ্গল গ্রন্থখানির মুদ্রণের কার্য্য বর্ষমধ্যে শেষ না হইলেও তাহার মুদ্রণ এখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

(খ) ঝাড়গ্রাম তহবিল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও মধুসূদনের "শর্ম্মিষ্ঠা" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ চলিতেছে।

(গ) লালগোলা তহবিল হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুণর্মুদ্রণ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার: আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে ৪৭৪৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হওয়ায় সাধারণ তহবিল হইতে ঋণ লইতে হইয়াছে। এই ব্যবস্থা চলিতে পারে না বলিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আগামী বৎসর হইতে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬৪ ভাগ দুইটি যুগ্মসংখ্যায় আলোচ্যবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩৬; প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১১; বিষয় এইরূপ: মঙ্গলকাব্য ১, ভাষাতত্ত্ব ১, ইতিহাস ১, পুথির বিবরণ ২, বিবিধ ৬।

পত্রিকা প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে যে বারশত টাকা পাওয়া যায়, তাহাতে পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। সেই জন্য পরিষদের অন্য আয়ের উপর নির্ভর না করিয়া পত্রিকা কি উপায়ে আপন ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবে সে বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি চিন্তা করিতেছেন।

গ্রন্থাগার: (ক) পরিষদের গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অর্থসাহায্য করিয়াছেন, তাহার দ্বারা গড্‌রেজ এণ্ড বয়েস্ কোম্পানীর নিকট হইতে ২৪ প্রস্ত বিশেষ ধরণের ইস্পাতের পুস্তকাধার ক্রয়ে ১১,৯৭৮·৫৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ঐগুলি ভালো করিয়া সাজাইয়া রাখিবার জন্য রমেশ ভবনে কিছু ভাঙা গড়ার কাজে মিস্ত্রি ও অন্যান্য খরচ বাবদ ঐ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকা লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সরকার এই খাতে যে ১৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা প্রায় সমস্তই খরচ হইয়াছে—উপরন্তু আরও কিছু ব্যয় হইতেছে। আগামী বৎসরের উদ্‌বৃত্তপত্রে এই হিসাব দেখান হইবে।

(খ) কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশবনের পরামর্শে তাঁহারই নির্ব্বাচিত কর্ম্মীদিগের সহায়তায় পরিষদের বিদ্যাসাগর সংগ্রহের অন্তর্গত ইংরাজী ও বাঙলা পুস্তকের পরিচয়মূলক কার্ড প্রস্তুত হইতেছে। পরিষদের সাধারণ পুস্তক সংগ্রহের জন্য অনুরূপ কার্ড তৈয়ারী ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ করিবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মীকে মাসিক বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কাজ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে, সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ হাজার কার্ড প্রস্তুত হইয়াছে ও এই সংক্রান্ত খাতাগুলিতে তাহার অধিক সংখ্যক তোলা হইয়াছে। কার্ডগুলি সাজাইয়া রাখিবার জন্য ইস্পাতের Card Index Cabinet (৬টি) ক্রয় করা হইয়াছে এবং কাঠের ক্যাবিনেটও তৈয়ারী করা হইতেছে।

পরিষদ্ গ্রন্থাগার বৃহস্পতিবার ও ছুটির দিন ব্যতিরেকে প্রত্যহ ১টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা

পর্য্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯০জন পাঠক, পাঠিকা ও গবেষক পরিষদ্ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ গ্রন্থাগারে মোট ৬৩০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৪৫ খানি ক্রীত ও ২৮৫ খানি উপহার-প্রাপ্ত। পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে ৬ খানি দৈনিক, ১১ খানি সাপ্তাহিক ও ৩৪ খানি বিবিধ পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে।

শাখা-পরিষৎ ঃ আলোচ্য বর্ষে ভাগলপুর, মেদিনীপুর, শিলং, বিষ্ণুপুর ও নৈহাটি শাখার অধিবেশনাদি হইয়াছে। নূতন কোন শাখা স্থাপিত হয় নাই।

পুথিশালা ঃ আলোচ্যবর্ষে কোন পুথি সংগ্রহ করা যায় নাই। বর্ষশেষে পরিষদের সংগ্রহভুক্ত পুথির সংখ্যা পূর্ব বৎসরের মোট সংখ্যা ৬০৫৪ খানিই আছে।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত আলোচ্যবর্ষেও পরিষদের সংগ্রহভুক্ত পুথির মধ্যে ৩৩০ খানির (১০০১-১৩৩০) বিবরণমূলক তালিকা পরিষৎ-পত্রিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। এই বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সমগ্র বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

চিত্রশালা ঃ পরিষদের চিত্রশালার সংগ্রহগুলি নূতন ভাবে বিন্যস্ত এবং সেগুলিকে উপযুক্ত ভাবে প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার সংগ্রহভুক্ত বিশেষ বিশেষ মূল্যবান দ্রব্যাদি পরিষদ্ ভবনের দ্বিতলের প্রশস্ততর ও অধিকতর আলোকিত অংশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা হইতেছে। পরিষদের সংগ্রহভুক্ত সমস্ত প্রত্নবস্ত পরিষদ্ ভবনে সাজাইয়া রাখিবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। সেই জন্য রমেশভবনের একতলার হলে ও বারান্দায় ভারী ওজনের মূর্ত্তিগুলি রাখা হইবে স্থির হইয়াছে।

চকদীঘি হইতে প্রাপ্ত ও পূর্ব্বেকার সংগ্রহভুক্ত বহু দ্রব্যাদি এতাবৎ নম্বর করিয়া নিয়ম-মাফিক সেগুলির পরিচয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। এই কাজ ব্যয়সাপেক্ষ। পরিষদের সামান্য আয় হইতে এই বৃহৎ ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ সাহায্য পাইবার চেষ্টা চলিতেছে। পরিষদ ভবনের দ্বিতলে চিত্রশালার দ্রব্যাদি বিন্যস্ত করিতে পরিষৎ আলোচ্যবর্ষে ২৩৫৯.৭২ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আগামী বৎসরে বাহির হইতে সাহায্য লাভ না পাওয়া পর্য্যন্ত, পরিষৎকে এই খাতে আরও কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

আর্থিক অবস্থা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবৎসর নিয়মিত এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে না হইলেও, প্রতিবৎসরের হিসাবে কয়েকটি বিশেষ কাজের জন্য কিছু অর্থ পরিষৎকে দান করিয়া থাকেন। কিন্তু চারিটি প্রধান বিভাগ সহ, সদস্যশ্রেণীর যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া সাধারণের ব্যবহারার্থে পরিষদের সাধারণ পাঠাগার খোলা রাখিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, কেবলমাত্র সদস্যগণের চাঁদা ও পুস্তক বিক্রয়ের অনিশ্চিত আয়ের দ্বারা সঙ্কলন করা সম্ভবপর নহে। এই অবস্থার আশু পরিবর্ত্তন না করিতে

পারিলে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগকে সুচারুরূপে পরিচালনা করা অসম্ভব। পরিষদের গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠানে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় পরিষদের দৈনন্দিন কার্য্য-পরিচালনায় অর্থাভাবের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য পরিষদের কর্তৃপক্ষকে প্রায় সকল সময়েই চিন্তিত থাকিতে হইয়াছে; আজও হইতেছে। চলতি খরচের জন্য অচিরাৎ কোন বাঁধা আয়ের বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে এই মূল্যবৃদ্ধির দিনে অদূর ভবিষ্যতে পরিষৎকে সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই অবস্থার সম্মুখীন হইতে যাহাতে না হয় এই জন্য পরিষৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও দেশের ধনী ও গুণী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় বিবরণে মোটের উপর কিছু লাভ দেখা গেলেও সাধারণ তহবিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় কিছু অধিক বলিয়া মনে হইবে। আলোচ্য বর্ষের শেষার্দ্ধে পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ কতকগুলি পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ করায় সেগুলির মুদ্রণ বর্ষের মধ্যে শেষ হইতে পারে নাই। সাধারণ তহবিল হইতে যে পরিমাণ অর্থ অধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হইবে, তাহা ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত পুস্তকগুলির বিক্রয় মূল্য হইতে উদ্ধার হইয়া কিছু লাভ হইবে বলিয়া ভরসা করিতেছি।

পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং পুথি ও চিত্রশালায় যে অমূল্য সম্পদ সংরক্ষিত হইয়া আছে, তাহা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া রাখার জন্য ও উৎসাহী গবেষকদিগকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দিবার জন্য এখনই অন্ততঃ একলক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই কার্য্যের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছি ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যাহাতে কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়, সে বিষয়েও তৎপর হইয়াছি। দেশের ধনী ও গুণী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ সাহায্যের চেষ্টা চলিতেছে, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষৎকে তাঁহাদের নিয়মিত বাৎসরিক সাহায্য (পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশের জন্য বারো শত টাকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য দুই হাজার টাকা) মোট ৩২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ ভবন ও রমেশ ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। এতব্যতীত গ্রন্থক্রয় বাবদ পৌরপ্রতিষ্ঠান সাতশত পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন তাহা ১৩৬৪ সালের প্রথমার্দ্ধের দিকে পাওয়া পাওয়া গিয়াছে। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীহেমরঞ্জন বসু কার্য্যনির্বাহক সমিতির জন্য সভ্য নির্ব্বাচন ও বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রদত্ত ভোট পত্র পরীক্ষা করিয়া উহার ফলাফল নির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীসরলকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষদের হিসাবাদি সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকে এবং পরিষদের অন্যান্য হিতৈষী, যাঁহারা আরও নানা ভাবে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, কার্য্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহার : অনেকের ধারণা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শুধু কয়েকটি সৌধের সমষ্টি ও পুথিপত্রের প্রাণহীন সংগ্রহশালা মাত্র। কিন্তু যিনি সহানুভূতিশীল সত্যসন্ধী, তিনি পরিষদের অজেয় প্রাণশক্তির পরিচয় নিশ্চয় পাইবেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় কখনও অনুকূল অবস্থায় শক্তি লাভ করিয়া, কখনও ঘটনা বিপর্য্যয়ে প্রতিকূল অবস্থায় একান্ত আত্মনির্ভর করিয়া পরিষৎ আজও তাহার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহার প্রাণের প্রকাশ শুধু তাহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আবদ্ধ নাই, বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহকরূপে তাহার স্থান আজ গুণীসমাজে স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্র সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্‌লা ও বাঙ্‌লার বাহিরের প্রায় প্রত্যেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অভিমত শ্রদ্ধার সহিত কামনা করিয়া থাকেন এবং পরিষদের আশীর্ব্বাদ লাভ বাঙালী সাহিত্যিকের নিকট শ্রেষ্ঠ সম্মান।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবন হইতে কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ও সেখান হইতে সার্কুলার রোডের বর্ত্তমান নিজগৃহে আগমন এবং সেই গৃহের সঙ্গে রমেশ ভবনের প্রথমতল ও ক্রমশঃ দ্বিতল নির্ম্মাণ পরিষদের অদম্য প্রাণশক্তির সহজ অভিব্যক্তি মাত্র। পরিষৎ তাহার দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে যাহা কল্যাণকর তাহা গ্রহণ করিয়াছে ও যাহা অশিব তাহা বর্জন করিয়াছে। পরিষদের সংগ্রহগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দানে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এখানেও একটি প্রাণশক্তি দাতা ও গৃহীতার অজ্ঞাতে কাজ করিয়াছে। আশা করা যায়, দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত এই প্রাণশক্তি পরিষৎকে সঞ্জীবিত রাখিবে। পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থগুলি বাঙ্‌লা সাহিত্যের গবেষকদের নিকট আজ প্রায় অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে বিশেষ ভাবধারার অধিকারী মনীষীদের চেষ্টায়, বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুযোগ লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। বাঙ্‌লার জনচিত্ত নানাকারণে আজ বিপর্য্যস্ত। কিন্তু আমরা নিঃসংশয় যে, বাঙ্‌লার নাড়ীর সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের যোগ আছে এবং এই প্রতিষ্ঠান রক্ষা পাইলে বাঙ্‌লার সংস্কৃতিও নব নব রূপে বিকশিত হইবে। এই কারণে দেশের মানুষের প্রতিনিধি বর্ত্তমান শাসক সম্প্রদায়ের নিকট সর্ব্বপ্রকারের সহায়তা ও সহানুভূতি পরিষৎ কামনা করিতেছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ক্রীত পুস্তকের তালিকা

দুনিয়া দেখছি (কল্যাণী প্রামাণিক), চীন থেকে ভারত (রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য), জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী, উকিলের ডায়েরি, (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়), ছোট্ট রামায়ণ (উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী), জগদানন্দ পদাবলী (ধীরানন্দ ঠাকুর), গৌরাঙ্গ বিজয়, মনসা বিজয়, কীর্ত্তি বিলাস (যোগেন্দ্রচন্দ্র) চর্য্যাগীতি পদাবলী, বিচিত্র সাহিত্য-১, ভাষার ইতিবৃত্ত, (সুকুমার সেন) ধূসর পাণ্ডুলিপি, রূপসী বাংলা (জীবনানন্দ দাশ), সাগর থেকে ফেরা (প্রেমেন্দ্র মিত্র) বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার (হেমেন্দ্রকুমার রায়), সাহিত্য-বীক্ষা (নীরেন্দ্রনাথ রায়), সমকালীন সাহিত্য (নারায়ণ চৌধুরী), সাহিত্য-বিচার (মোহিতলাল মজুমদার), রবীন্দ্র বিচিত্রা (প্রমথনাথ বিশী), রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য), বাংলার নাটক ও নাট্যশালা (শচীন সেনগুপ্ত), রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা, নাটক ও নাটকীয়ত্ব (সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য), আধুনিক বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা (কল্যাণনাথ দত্ত), অভিযান, জলসাঘর, সন্দীপন পাঠশালা (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), দৃষ্টি প্রদীপ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়), নয়ান বৌ, কদম, মানস মিছিল, (বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়), জলে-ডাঙায় (মুজতবা আলী), বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা-১ (ভূদেব চৌধুরী), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-১ (বিনয় ঘোষ), কাব্যমালঞ্চ (যতীন্দ্রমোহন বাগচী), বাংলা সাহিত্য (মনোমোহন ঘোষ), লৌহকপাট ১।২ (জরাসন্ধ), উজ্জ্বলা (বনফুল), পদসঞ্চার, অসিধারা (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), নীলাঞ্জন (সরোজ রায়চৌধুরী), বিচারপতি, পোষ্যপুত্র (অনুরূপা দেবী), বন্যা (সীতা দেবী), হিমালয়ের মহাতীর্থে, পঞ্চমা (প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়), চরিত্রহীন, স্বামী, বিপ্রদাস, দত্তা, ছবি, শরৎ সাহিত্য সম্ভার ৩।৫ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), বহুব্রীহি, মরুতীর্থ হিংলাজ, শুভায় ভবতু, উদ্ধারণপুরের ঘাট (অবধূত), মায়ামৃগ (নীহাররঞ্জন গুপ্ত), পলাশের নেশা (সুবোধ ঘোষ), বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি (যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়), জঙ্গল (দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী), প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান, লাজুকলতা, পরাধীন প্রেম (মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়), বহ্নি-পতঙ্গ (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (মণি বাগচি), শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ (গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী), ভক্ত কবীর (উপেন্দ্রনাথ দাস), গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব (উমা রায়), নেহেরু ও পররাষ্ট্র নীতি (অনাদিনাথ পাল), পৃথিবীর ইতিহাস (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়), রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র (মদনমোহন গোস্বামী), হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান (পঞ্চানন ঘোষাল), দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন (দুর্গাচরণ রায়), এণ্টনী ফিরিঙ্গী (মদন বন্দ্যোপাধ্যায়), বৈভাষিক দর্শন (অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য), সমাজ ও শিশু-শিক্ষা (প্রতিভা গুপ্ত), স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (সরলাবালা সরকার), শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (হুমায়ুন কবীর), ইঙ্গিত (শীতাংশু মৈত্র)।

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

শ্রীকে. বি. জিন্দাল: Hist. of Hindi Literature; **বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ:** সাহিত্য পাঠের ভূমিকা, বাংলার ভূমি ব্যবস্থা, গীতাঞ্জলি (নাগরী), স্বরবিতান (১—নাগরী), চিঠিপত্র (৬ষ্ঠ), প্রাকৃত-সাহিত্য, হিমাদ্রী, ইতিহাসের মুক্তি, স্বরবিতান (৪৮।৫২—৫৫), গীতবিতান—৩, অ্যান্টিবায়োটিক; **Readers Digest London:** Readers Digest vol. IV; **শ্রীবাসুদেব মাইতি:** মহানগরীর নারী, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী; **শ্রীজপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব:** ব্রহ্মচর্য্য সাধন, ভক্তি-সূত্রম্, সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি, প্রার্থনা শতক, শ্রীপদ্যাবলী, বৈষ্ণব বিবৃতি, সম্বন্ধ নির্ণয়, সাংখ্যদর্শন, সাংখ্যসূত্রম্, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, সামবেদ সংহিতা ১—৯, শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ সংহিতা, অথর্ব্ববেদ সংহিতা, শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্, শ্রীমদ্ভাগবতম্. শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, বেদান্তদর্শন, বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, বেদান্ত দর্শনম্, পঞ্চদশী, গৌড়ীয় সমাজতত্ত্বের সারতত্ত্ব, প্রশ্নোপনিষৎ, সারার্ণব, বশীকরণ, মানবতত্ত্ব, গীতা, শ্রীমদভাগবতম্, শ্রীআনন্দমীমাংসা, Ananda Kr. Bose, মহারাণী শরৎসুন্দরী, বিষ্ণুপূজা, শ্রীশ্যামানন্দ চরিত, পঞ্চপ্রদীপ, ঈশ্বরোপাসনা, জ্ঞানের বিকৃতি, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালভট্ট, কাশীবাস, জীবন আত্মানন, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কল্পলতিকা, ভক্তিযোগ, ব্রহ্মবিদ্যা সাহিত্য সংহিতা, শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী, মাধুকরী (১৩৩০-৩১), অভিধান (রামকমল সেন), ফলিত জ্যোতিষ ১।২ খণ্ড, সামর্থকোষ (অ-স), গৃহস্থ (৩), আর্য্যাবর্ত্ত ৩য় খণ্ড, অলৌকিক রহস্য (৩); **শ্রীসুশীলকুমার দে:** পরমাণু জগৎ, সাংখ্য ও যোগ, যা দেখেছি, সপ্তপদী, ও-পারের আলো, জীবন অনুভূতি, নিঃসঙ্গ, On Our Perjudices, অর্ঘ্যপুট, মহাত্মা লালন ফকির, অরবিন্দ রবীন্দ্র, Studies in Beng. Lit., আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারা, আড়াই হাজার বছরের বাঙ্গালী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকথা, জীবন নদী, বিপ্লবী নারী, গীতা ধ্যান; **শ্রীকুমারেশ ঘোষ:** ম্যানিয়া, নতুন মিছিল; **শ্রীসুশীলকুমার সেন:** নামাচার্য্য শ্রীরামদাস; **শ্রীনিখিল সেন:** পুরনো বই; **বেঙ্গলী একাডেমী—ঢাকা:** লায়লী মজনু; **শ্রীগোপালদাস তুলসীদাস:** The Complete Prophecies of Nostradams; **শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর:** পুষ্পমেঘ; **ভারত সরকার:** রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ পঞ্জিকা; **শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন:** অন্নপূর্ণামঙ্গল; **শ্রীরাণু ভৌমিক:** গোধূলিবাসর; **শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়:** আমি; **শ্রীভিক্ষু মহামণ্ডল:** প্রবজিতের ব্রতরাশি; **শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়:** তারাপীঠ ভৈরব; **শ্রীহরিদাস নামানন্দ:** বৃন্দাবন ভ্রমণ লীলা; **শ্রীসেরাপিয়া ভট্টাচার্য্য:** Through Smoke; **শ্রীনির্ম্মলকুমার সরকার:** পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি; **শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল:** গান্ধীজির স্মরণে, কিশোর চাষীর আপন কথা, তারাপীঠ ভৈরব, জলপ্লাবনে ভূগোল, নব্যবিজ্ঞান, রাজা উজিরের কথা, বিনোবা, জনতার কোলাহল, শিক্ষাবিজ্ঞান, ছোটদের বুদ্ধ, নিঃসঙ্গ,

পাথেয়, সৌরকন্যা ; **শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু :** শিল্পী হেমেন্দ্র মজুমদার ; **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ :** গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ১।২ ; **ওরিয়েন্ট বুক কোং :** কি লিখি, শিশু পরিবেশ, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ; **এ. মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ :** কাণ্টের দর্শন, পদার্থের স্বরূপ, হেগেলের দার্শনিক মতবাদ ; **শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস :** ভারত প্রেমকথা ; **সাহিত্য সংসদ :** সংসদ বাংলা অভিধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; **নববিধান ব্রাহ্মসমাজ :** শাক্যমুনি চরিত ; **রঞ্জন পাবলিশিং হাউস :** হর্ষচরিত, ক্ষুধার্ত্ত পৃথিবী, পথবাসী গীতি দীপালি, পরীক্ষিৎ, ধর্ম্মঘট, ইতিহাসের নাটক, শিকার কাহিনী, যাদের গায়ে জোর আছে, মহারাজ নন্দকুমার, শরৎ পরিচয়, অঙ্কুর, অনেক স্বর্গ, উর্বশী বিদায়, কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, গান্ধীচরিত, কবীর বাণী, শূন্য প্রান্তরের গান, মিতার জন্য রোমাণ্টিক কবিতা, গাঁয়ের মাটির গান, চলতি পথের গান ; **শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য :** হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত ; **শ্রীঅরুন্ধতী ঘোষ :** গীতিকা ; **শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ :** পুরুষ রমণীয়ম্, চণ্ডতাণ্ডবম্ ; **শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য :** কিশোর ; **শ্রীকাত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত :** হরিপুরুষ জগবন্ধু ; **শ্রীগোপীনাথ নন্দী :** জনতার কোলাহল ; **বি. কে. দত্তগুপ্ত :** শ্রাদ্ধপ্রদীপ ; **শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী :** পয়ারে সাংখ্য দর্শন, বাংলা সাহিত্যের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা ; থামাও রক্তপাত, পি-ডব্লিউ-ডি, কি ছিল কি হল, একতারা, সিঁথির সিঁদুর, প্রাণের দাবী, শক্তির মন্ত্র, রীতিমত নাটক ; **শ্রীলতিকা দেবী :** শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম, শ্রীশ্রীনারদ পঞ্চ রাত্রম, শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম, শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ১।২, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম, পদ্মপুরাণম, গরুড় পুরাণম, কূর্ম্মপুরাণম, বামন পুরাণম, মার্কণ্ডেয় পুরাণম, সাধন সমর ২।৩, মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম, ঋগ্বেদ ভাষ্যম, প্রশ্নোপনিষদ, ন্যায়দর্শন, কাব্য মীমংসা, যোগাশাস্ত্র, বৈদিক গবেষণা, অমরকোষ, দায়ভাগ, অম্বষ্টতত্ত্বকৌমুদী, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, জাতিতত্ত্ব বারিধি, বাংলার সারস্বত ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী নামের অর্থ কি, হিমালয়ের মহাতীর্থে, অবধূত ও যোগিসঙ্গ, মুক্ত পুরুষ প্রসঙ্গ, Rajniti Ratnakar, Yogodarsan, Social Problems, Angkar Park, Champa, Malayas, Tobacco, সংসদ বাংলা অভিধান, চলন্তিকা, The Political Philosophers, The Social Philosophers, The Speculative Philosophers, Philosophers of Science, কাব্যবিতান, সায়ম, বুলবুল, কাব্য পরিমিতি, অম্বপালী, মৃচ্ছকটিক, ওমর খৈয়াম, রামচরিত, প্রাচীন প্রাচী, শনিবারের চিঠি ১৩৬১-৬৩ (বৈশাখ-চৈত্র), মাসিক বসুমতী ১৩৬১-৬৩ (খুচরা সংখ্যা), বসুমতী রজতজয়ন্তী, নরনারীর যৌনবোধ, কামসূত্রম, দেশ শারদীয়া (৫৪।৫৫।৫৬। ৬০।৬৩ বঙ্গাব্দ), আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া (৫২।৫৪।৫৫।৬০।৬২), Hindusthan Standard 1956, যুগান্তর (৫৮।৬০।৬২।৬৩), আনন্দবাজার পত্রিকা দোলসংখ্যা ৫৩।৫৪। ৫৫।৬০ ; **শ্রীনারায়ণ চৌধুরী :** মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার ; **শ্রীপুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় :** সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (১-৫৩) ; **সিগনেট প্রেস :** পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১-৩ খণ্ড), পারাবার, বনলতা সেন, এলিয়টের কবিতা, অর্কেস্ট্রা, পঁচিশ বছরের প্রেমের

কবিতা, শিল্পায়ণ, বিশ্বরহস্য, বুড়ো আংলা, ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, কবিতার কথা, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সাহিত্য চর্চা, নীলনির্জন, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, প্রতিধ্বনি, কুমায়ুনের মানুষ-খেকো বাঘ, শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প ; **শ্রীঅমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য :** সত্যের পথে ; **শ্রীদীপককুমার সেন :** প্রভাত ; **শ্রীমিহিরকুমার দাস :** নাম-চয়নিকা ; **শ্রীযোগিলাল হালদার :** রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন ; **U.S.S.R. :** Living in U.S.S.R., Ereedom in U.S.S.R. ; **শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা :** দেবতার ভাষা ; **Smithsonian Inst. :** Music of Acoma ; **সাহিত্য একাডেমী :** Indian Lit. Vol. I. ; **ভারত সরকার :** A laymans Guide to the Indian Company Law ; **U. S. I. S. :** Webster's Geographical Dictionarry ; **শ্রীতমোনাশ মুখোপাধ্যায় :** কাব্য কাহিনী ; **শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য :** অপুর বিজয়া ; **শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী :** নাট্যকার ; **শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল :** হিন্দু সাহিত্যে প্রেম, চিকিৎসা সোপান, পথের কথা, আন্টিবায়োটিক; গাথা সপ্তসতী, কিরণাবলী, পঞ্জিকা সহ, পরমাত্ম তত্ত্ব, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ; **শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত :** আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ; **শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী :** ছায়ালোক ; **ডাঃ বলরাম পাত্র :** সমর্থ কোষ ৩ খণ্ড, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, মনুসংহিতা, মহাভারত, ব্রজসুন্দর মিত্র ; **জাতীয় গ্রন্থাগার :** সুধাকর গ্রন্থাবলী ২।৩।৪, শ্রীশ্রীমায়ের কথা (২), স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ; **অরুণাচল মিশন :** অরুণাচল বাণী ; **শ্রীরামকুমার ভুবালকা :** হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস ; **শ্রীব্রজনন্দন সিংহ :** মীরা ; **Nautical Almanac Office :** The American Ephemeris 1959 ; **শ্রীরামনাথ ঝাঁ :** অভিজ্ঞান শকুন্তলা (নাগরী) ; **Sorab R. Batliboy :** Spiritual Understanding of Life ; **শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী :** Memoirs of a Poly Histor ; **শ্রীমৃণালকান্তি বসু :** শান্তির সন্ধানে ; **প. ব. প্রদেশ কংগ্রেস :** মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার ; **শ্রীপ্রেমময় দাশগুপ্ত :** ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায় ; **ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার :** শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু মহিমা ।

১৩৬৪ বঙ্গাব্দের নির্ব্বাচিত পরিষদের সাধারণ-সদস্য তালিকা

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি—৬।বি, এস্টন রোড, কলিকাতা-২০, ২। শ্রীরমেশচন্দ্র পোদ্দার—২৫, বিজয় বসু রোড, কলিকাতা-২০, ৩। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—১২৫, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু—আগরপাড়া, ২৪ পরগণা, ৫। শ্রীবিশ্বপতি সেন—১৫৭।২এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬, ৬। শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী—৬৮।৩, পটারী রোড, কলিকাতা-১৫, ৭। শ্রীননী ধর—৬ এণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৯, ৮। শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—ঘোলা, দোলতলা, ২৪ পরগণা, ৯। শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র—২৭, রামানন্দ চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ১০। শ্রীভবতোষ দত্ত—১২১।জি, রায় বাহাদুর রোড, কলিকাতা-৩৪, ১১। শ্রীকৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়—পি, ২৯।এ, অনাথনাথ দেব লেন, কলিকাতা-৩৭, ১২। শ্রীঅমিতাভ বসু—৮০।১।৩, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ১৩। শ্রীব্রহ্মানন্দ—২৬, বটতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭, ১৪। শ্রীসুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—৩২, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬, ১৫। শ্রীঅধীরকুমার সাহা—৬৪, অধরচন্দ্র দাস লেন, কলিকাতা-৪, ১৬। শ্রীসরোজ বিশ্বাস—২৬, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১১, ১৭। শ্রীরেখা ঘোষ—৭০, ডব্লু-ডি-পার্ক, ইছাপুর, ২৪ পরগণা, ১৮। শ্রীহিরণ্ময় চৌধুরী—১৩৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১৯। বনানী মনসুর—৩।বি, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯, ২০। শ্রীসুন্দর ঘোষাল—৬৬, রাজকৃষ্ণ ঘোষাল রোড, কলিকাতা-৩১, ২১। শ্রীঅমিয়া ভট্টাচার্য্য—১।সি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলিকাতা, ২২। শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৪, আর. কে. ঘোষাল রোড, কলিকাতা-৩১, ২৩। শ্রীঋতেন্দ্রনাথ সাহা—১০, বৈঠকখানা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-৯, ২৪। শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩১, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা-৯, ২৫। শ্রীরণজিৎকুমার রায়—৪৬।৩, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা, ২৬। শ্রীবিনিতা সেন—টি১৫৪।বি, রেলওয়ে কলোনী, বেলগাছিয়া-৩৭, ২৭। শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ—৯।৬।ই, পিয়ারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬, ২৮। শ্রীঅনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়—২।ডি, ঘোষাল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯, ২৯। লাইব্রেরীয়ান, হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি, যুক্তরাষ্ট্র, ৩০। শ্রীসমীরেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী—১, মন্মথনাথ গাঙ্গুলী লেন, কলিকাতা-২, ৩১। শ্রীঅমরনাথ ঢোল—২৯, নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৩৫, ৩২। শ্রীতৃষ্ণা সাহা—৪৫।১।বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৩৩। শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী—বড়িশা, কলিকাতা-৮, ৩৪। অঞ্জলি বসু—১২।বি, রাজেন্দ্রলালা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৩৫। শ্রীহরিপদ দত্ত—১৩, গ্রাণ্ট লেন, কলিকাতা-১২, ৩৬। শ্রীপ্রতিমা প্রামাণিক—২২০, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, ৩৭। শ্রীসৌম্যেন দে—৭২ মাথলা গভর্ণমেণ্ট কলোনী, হুগলী, ৩৮। শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস—৬, কংগ্রেস একজিবিশন রোড, কলিকাতা-১৭, ৩৯। শ্রীপুষ্প দত্ত—১৩,

মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪, ৪০। শ্রীনিখিলকান্ত চট্টোপাধ্যায়—৬৩এ, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ৪১। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ঘোষ—১, কামারডাঙ্গা রোড, কলিকাতা-১৫, ৪২। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র হালদার—২৩।১এ, জেলিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৪৩। শ্রীশশী রায়—২০৪।৫, রসা রোড (সাউথ) সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-৩৩, ৪৪। শ্রীদয়াময় সাধুখাঁ—৩।১৩, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪, ৪৫। শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—২, দুর্গাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩, ৪৬। শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায়—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১, ৪৭। শ্রীঅমিয়া মজুমদার—২৯।এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৩, ৪৮। শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—তামলি পাড়া, হুগলী, ৪৯। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাইন—৮।১এ, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ৫০। শ্রীতপতী দেব চৌধুরী—ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, ৫১। শ্রীশীতাংশু-কুমার বসু—১৪, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৫২। শ্রীবি করনেশ—বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-৯, ৫৩। শ্রীরামেন্দু দত্ত—৮২।এ, বেলতলা রোড, কলিকাতা-২৬, ৫৪। শ্রীপ্রতিমা মুখোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ৫৫। শ্রীকরবী বসু—১২, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা-৪, ৫৬। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বাগ—৩২।৪, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৫৭। শ্রীরবীন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত--পি ২৬বি, মতিঝিল, কলিকাতা-২৮, ৫৮। শ্রীছবি মুস্তফী—৩, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা-৬, ৫৯। শ্রীহারাণচন্দ্র রায়—৫০।১, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯, ৬০। শ্রীরেবা মুখার্জী—৪ তারক বসু লেন, কলিকাতা-২, ৬১। শ্রীসুরেশ-চন্দ্র সেন—২০৩ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-৩৫, ৬২। শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বারাসাত, ২৪ পরগণা, ৬৩। শ্রীশিপ্রা চক্রবর্ত্তী—২১, চণ্ডীবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৬৪। শ্রীশ্যামলকুমার সিংহ রায়—১৮, যুগোলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা, ৬৫। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—১০, রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ৬৬। শ্রীমাণিকলাল মুখোপাপাধ্যায়—১, হেষ্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১, ৬৭। শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী—৫ গাঙ্গুলিপাড়া লেন, কলিকাতা-২, ৬৮। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চাকলাদার—খানপাড়া রোড, কলিকাতা।২৮, ৬৯। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—আগরপাড়া, ২৪ পরগণা, ৭০। শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়—৯৯।১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিঃ, ৭১। শ্রীশঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায়—৭, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা-৩, ৭২। শ্রীপ্রতিমা বিশ্বাস—৫২।২৫, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৩৬, ৭৩। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ নিয়োগী—১৫৩।৩এল, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ৭৪। শ্রীযামিনীকান্ত শাসমল—৪, গঙ্গাধর বাবু লেন, কলিকাতা-১২, ৭৫। শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ধর—ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা, ৭৬। শ্রীকিশোর সিংহ—ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা, ৭৭। শ্রীউৎপল ভাদুড়ী—৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৮। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ কুণ্ডু—২৯, সাহিত্য-পরিষৎ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৭৯। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ—২৩।২, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮০। শ্রীরমা চৌধুরী—৩, ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮১। শ্রীশ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়—১০৮, বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮২। শ্রীজ্যোৎস্না গুপ্তা—স্টেশন রোড, বারাসাত, ২৪ পরগণা, ৮৩। শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত—১৩৩, প্রফুল্ল নগর বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা, ৮৪। শ্রীগোপালকুমার ভাদুড়ী—

৪১, জাগ্রত পল্লী, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা, ৮৫। শ্রীমীরা পাল—পি৫, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮৬। শ্রীসুধাকর সর্বাধিকারী—শাঁখরাইল, হাওড়া, ৮৭। শ্রীভারতী সেন—৬৯।১, সারপেন-টাইন লেন, কলিকাতা-১৪, ৮৮। শ্রীনীলিমা মণ্ডল—৭১বি, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ৮৯। শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—১৬৪, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১ ৯০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহ—৪, মন্মথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৭, ৯১। শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—কদমতলা, হাওড়া, ৯২। শ্রীসোমেন বসু—২৩বি, বেথুন রো, কলিকাতা-৬, ৯৩। শ্রীশিখা চট্টোপাধ্যায়—২।২এ, ফকির দে লেন, কলিকাতা-১২ ৯৪। শ্রীপ্রণবকুমার রায়—১৭, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা-৪, ৯৫। শ্রীবৈদ্যনাথ দে—৪৮, হিদারাম ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ৯৬। শ্রীশিবানী সরকার—১৮।বি, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪ ৯৭। শ্রীঅনুরাধা সেনগুপ্ত—পি৫৫, সি-আই-টি রোড, কলিকাতা, ৯৮। শ্রীগীতা বসু—রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া, ৯৯। শ্রীপুলিনবিহারী দাস—২৮৮।বি, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১০০। শ্রীবিমলেন্দু দাস—১২৪, নেতাজী কলোনী, কলিকাতা-৩৬, ১০১। শ্রীশতদল ঘোষ—১৭।এফ, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা, ১০২। শ্রীতুষ্টচরণ চক্রবর্ত্তী—বন্দীপুর, হুগলী, ১০৩। শ্রীলীলা রায়—৫।৩এ, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০, ১০৪। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরদার—৪৭, মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা, ১০৫। শ্রীরমাপ্রসাদ ঘোষ—২১।এ, অ্যান্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৯, ১০৬। শ্রীকমলেশ ঘোষ—৯৯।১।এম, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ১০৭। শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৪।১।৭, তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা-৩১, ১০৮। শ্রীরেবা সরকার—পি১০৬।ই, নিউ আলীপুর, কলিকাতা-৩৩, ১০৯। শ্রীরোহিনীরঞ্জন চৌধুরী—৩০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ১১১। শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়—৮৩।বি, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ১১১। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক—৬।১, ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন স্ট্রীট, কলিকাতা, ১১২। শ্রীবিশ্বনাথ লাহিড়ী—২৭, মহারাজ নন্দকুমার রোড, কলিকাতা, ১১৩। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৪৩, কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৬, ১১৪। শ্রীমীরা গুহ—১১৮, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, ১১৫। শ্রীপত্রলেখা দেবী—২৪, শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-২, ১১৬। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী—১৯।এস।১।১এক্স, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭, ১১৭। শ্রীসুধা বসু—২৯, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯, ১১৮। শ্রীকৃষ্ণা ঘোষ দস্তিদার—৫।৪এল, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০, ১১৯। শ্রীপরিতোষ দাস—৯০।২সি, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৩০, ১২০। শ্রীসুনীতেন্দ্রমোহন ঠাকুর—১৭৭।এ, সি. সি. ও. এস, কলিকাতা-২ ১২১। শ্রীপশুপতি দে—৭, শ্রীমানীপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৬, ১২২। শ্রীসুবোধ রায় চৌধুরী—২।১, রাস বাগান লেন, কলিকাতা, ১২৩। শ্রীনমিতা বসু মজুমদার—৫।১ডি, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা, ১২৪। শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—সুভাষনগর, মেদিনীপুর, ১২৫। শ্রীবন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়—৩১, ষষ্ঠীতলা রোড, কলিকাতা-১১, ১২৬। শ্রীঅর্চ্চনাদেবী মুখার্জ্জী—১।সি, প্যারী রো, কলিকাতা, ১২৭। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার—৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৬, ১২৮। শ্রীঅর্চ্চনা গাঙ্গুলী—পি ২২, নারিকেলডাঙ্গা মেন

রোড, কলিকাতা-১১, ১২৯। শ্রীপুষ্প চক্রবর্ত্তী—২৮।৪এ, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩, ১৩০। শ্রীশঙ্করকুমার রায়চৌধুরী—১২।২, হরিপাল লেন, কলিকাতা-৬, ১৩১। শ্রীনিবেদিতা সেনগুপ্তা—৩এফ, খাসমহল রোড, কলি-৬, ১৩২। শ্রীঅজয়হৃদয় মিত্র—১৪৩, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলিকাতা-১০, ১৩৩। শ্রীবলের ক্লিঙ্গ—১৪, সদর স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৪। শ্রীসুভাষকুমার মিত্র, ১৮১।৬ডি, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১৩৫। শ্রীগীতা সেনগুপ্তা—৫৮, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১৩৬। শ্রীইউরি সোরোজভ—১৪, সদর স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৭। শ্রীসত্যজিত দাস—পি৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা, ১৩৮। শ্রীচণ্ডীচরণ চৌধুরী—১।বি, হালদার বাগান লেন, কলি-৪, ১৩৯। শ্রীহাসি সিংহ—৩।বি, গোরাচাঁদ বসু রোড, কলিকাতা-২৬ ১৪০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস—২৮, এস. আর. দাস রোড, কলিকাতা-২৬, ১৪১। শ্রীমানিকলাল পালিত—১৩৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১৪২। শ্রীছবিরাণী সরকার—৮০।১২।এ, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৪৩। শ্রীছায়া সান্যাল—৩, চৌধুরীপাড়া প্রথম বাই লেন, হাওড়া, ১৪৪। শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায়—৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা, ১৪৫। শ্রীঅজিতকুমার কুণ্ডু—৩৭।১এ, সিমলা রোড, কলিকাতা, ১৪৬। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ—রমনা, ঢাকা, ১৪৭। শ্রীশিবরাণী গাঙ্গুলী—১৫৫।৮।এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১৪৮। শ্রীজগদ্বন্ধু মিশ্র—১।এ, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা, ১৪৯। শ্রীসুহাসকুসুম মজুমদার—৬১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৫০। শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ গুহ—২৬, গোপাল বসু লেন, কলিকাতা-৯, ১৫১। শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ—১২, নীরোদবিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা, ১৫২। শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, —৮, উজির চৌধুরী রোড, কলিকাতা-৪, ১৫৩। শ্রীঅর্চ্চনা সেন—৫১।এ, হিদারাম ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১৫৪। শ্রীঅনন্তলাল মিত্র—৩৯।১১, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭, ১৫৫। শ্রীরত্না গঙ্গোপাধ্যায়—২৬, ক্রীক রো, কলিকাতা-১৪, ১৫৬। শ্রীকালাচাঁদ সাহা—৮১।১সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১৫৭। শ্রীসবিতা ভৌমিক—১১১, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-৯, ১৫৮। শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—১৩৩, আপার সার্কুলার রোড, কলি-৬, ১৫৯। শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার—১৯০, বি. টি. রোড, কলি-৩৫, ১৬০। শ্রীশীতাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়—১০, হরিপদ দত্ত লেন, কলিকাতা-৬, ১৬১। শ্রীশচী বিশ্বাস—২৫৫, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া, ১৬২। শ্রীসুধীরকুমার দে—৬৮।৭এ, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৬৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু—৪৫।১বি, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা-৪, ১৬৪। শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত—বারাসাত, ২৪ পরগণা, ১৬৫। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সিংহ—৯, ওল্ড পোস্ট আফিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১, ১৬৬। শ্রীবিজিতকুমার দত্ত—সি. আই. টি. বিল্ডিং কলি-৭ ১৬৭। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাইন—১০০, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১৬৮। শ্রীভবেশচন্দ্র ঘোষ—ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, ১৬৯। শ্রীদেবব্রত ভৌমিক—১২৪।২।১।১, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১৭০। শ্রীসুজাতা গুহরায়—৩৪, চক্রবেড়িয়া লেন, কলিকাতা, ১৭১। শ্রীসুশীলকুমার বসু—১৪১।এ।১এ, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা। ১৭২। শ্রীঅমল

চক্রবর্ত্তী—৩।বি, লালাবাগান রোড, কলিকাতা-৬, ১৭৩। শ্রীইরা সান্যাল—২।বি, রাখাল মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫, ১৭৪। শ্রীসুকুমার মিত্র—১৫।১বি, রঘুনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১৭৫। শ্রীদীনেশকুমার পালিত—২৪।১, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ১৭৬। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাইতি—৯০, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৭৭। শ্রীনিখিলরঞ্জন দে—২৪৭।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬, ১৭৮। শ্রীবলাই মজুমদার—৪৬, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-১১, ১৭৯। শ্রীমায়া মল্লিক—১৩১।১, বি. কে পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫, ১৮০। শ্রীকৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য—সোদপুর, ২৪ পরগণা, ১৮১। শ্রীপ্রণব গাঙ্গুলী—৩১৩।বি আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৫, ১৮২। শ্রীঅমিতাভ ঘোষ মজুমদার—১৫, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা, ১৮৩। শ্রীঅমূল্যধন শ্রীমানী—১৩।বি, যোগীপাড়া বাই লেন, কলিকাতা, ১৮৪। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—১৯৫, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ১৮৫। শ্রীগীতা ভাদুড়ী—১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০, ১৮৬। শ্রীবিনোদবিহারী শীল—১৯, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৮৭। শ্রীঅমলেন্দু দে—৮।সি, দরগা রোড, কলিকাতা-১৭, ১৮৮। শ্রীনৃত্যলাল বসাক—৮৯।বি, নবকৃষ্ণ ঘোষাল রোড, কলিকাতা-৩১, ১৮৯। শ্রীপার্শ্বনাথ দে—২৩১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, ১৯০। শ্রীনীলিমা ইব্রাহিম—১১৮, সত্যেন্দ্র দাস রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা, ১৯১। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—৭৪, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ১৯২। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন—২০৩, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-৩৫, ১৯৩। শ্রীজয়গোপাল বসু—২২৮।এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, ১৯৪। শ্রীসুরভী রায় চৌধুরী—১৫৭।২বি, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬।

পঞ্চষষ্টিতম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের তালিকা

সভাপতি : শ্রীসুশীলকুমার দে—১৯।এ, চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪।

সহকারী সভাপতি : শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ—৪২, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪; শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—২৮।৩। বি, সাহানগর রোড, কলিকাতা-২৬; শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—পি ২৫৬, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯; শ্রীনরেন্দ্র দেব—৭২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯; শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু—৩৭।এ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩; শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—গোলকুঠি, আদমপুর, ভাগলপুর, বিহার; শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—২২৭।২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০; শ্রীসজনীকান্ত দাস—৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭।

সম্পাদক : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পি, ৭০ সি. সি. ও. এস. কলিকাতা-২।

সহকারী সম্পাদক : শ্রীকুমারেশ ঘোষ—৪৫।এ, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীত্রিদিবনাথ রায়—১৭।এ, শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, দমদম, কলিকাতা-৩০ ; শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী—১৭।এস।১।১ এক্স, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭ ; শ্রীপ্রবোধকুমার দাস—৭।১, ঈশ্বরঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬।

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত—২৬, পীতাম্বর ঘটক লেন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭।

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীপুলিনবিহারী সেন—৫৪।বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯।

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪।১, ভূপেন্দ্রবসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪।

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী—৩০২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯।

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ—৫৯, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২।

কাঃ নিঃ সঃ সদস্য : শ্রীঅমল হোম—১৬৯।বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ; শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—১২৮।১২, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬ ; শ্রীআমিনুর রহমান—৪৫, দিলখুসা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭ ; শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—৩৩।৫।১ সি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ ; রেভাঃ ফাদার এ দোতেন—সেণ্ট জোসেফ চার্চ, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা ; শ্রীকামিনীকুমার কর রায়—৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ ; শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৫০।৮০।সি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪ ; শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য—৩৫, স্কটস লেন, কলিকাতা-৯ ; শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০ ; শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—৩০২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত—৯ই, যোগোদ্যান লেন, কলিকাতা-১১ ; শ্রীমনোমোহন ঘোষ—৯২।এ, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ কলিকাতা-৪ ; শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল—৪০।বি, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-১১ ; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীলীলামোহন সিংহরায়—১।১।এ, উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ; শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—৪৩, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়—৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা—৭, নন্দলাল বোস লেন, কলিকাতা-৩ ; শ্রীসুশীল রায়—১৩।বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯।

শাখা-পরিষৎ পক্ষে : শ্রীঅতুল্যচরণ দে—পঞ্চাননতলা, নৈহাটী, ২৪ পরগণা ; শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়—পি-৮, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০ ; শ্রীমাণিকলাল সিংহ—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ ; শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—মোক্ষদা কুটীর, আটগাঁও, গৌহাটী, আসাম।

পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি : শ্রীকানাইলাল দাস—৫৫।বি, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

Editor of "The Friend of India" &c

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

'কোলস্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্ট অঙ্কিত চিত্র
লিথোগ্রাফিক স্কেচেস অব দি পাবলিক ক্যারেক্টার্স
অব ক্যালকাটা ১৮৩৭-৪০' গ্রন্থ হইতে

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৬৫

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

শ্রীসজনীকান্ত দাস

"বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" বা নীহারিকা-যুগের ইতিহাস ৪৫ হইতে ৪৭ বর্ষের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ধারাবাহিক ভাবে লিখিয়াছিলাম। ৫১ বর্ষের ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় ওই ইতিহাসেরই ধারা ধরিয়া "ফেলিক্স কেরী" লিখি। সুদীর্ঘ পনের বৎসর কাল পরে শ্রীরামপুর মিশন গোষ্ঠীতে ফেলিক্স কেরীর অনুজ কর্মী রেভারেণ্ড ডক্টর জোশুয়া মার্শম্যানের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র জনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সম্পর্কের কাহিনী শুনাইতে বসিয়াছি। জনের কীর্তি-কথা লিখিত না হইলে মহাত্মা উইলিয়ম কেরী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের এবং তৎপ্রবর্তিত বাংলা গদ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ফেলিক্স কেরী উইলিয়ম কেরীর আত্মজ হইলেও তাঁহার প্রকৃতি পিতৃ-অনুসারী ছিল না। পিতা ছিলেন সদা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, ধর্মনিষ্ঠ কর্মী পুরুষ, পুত্রের স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন খামখেয়ালী কবি। উচ্ছৃঙ্খলতা, উদাসীনতা ও ভোগলিপ্সার মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। জন ক্লার্ক মার্শম্যানই ছিলেন উইলিয়ম কেরীর যথার্থ মানসপুত্র; কর্মযোগী কেরীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তৎকৃত কর্ম ও কীর্তিসম্ভারের বিপুলতা সত্ত্বেও তদনুপাতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ, অন্তরালবর্তী থাকিয়া কর্মানুষ্ঠানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিন-তিনখানি পত্র-পত্রিকার সহিত সম্পাদক হিসাবে তাঁহার নাম যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কদাচিৎ আত্মপ্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের অপর কর্মী ও সাধকদের সম্বন্ধে তিনি বিস্তর লিখিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের সম্যক্ পরিচয় অবগত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিবার লোক, তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে বিশেষ কেহ ছিলেন না। গ্রন্থাকারে তাঁহার কোনও বিস্তৃত জীবনী এতাবৎ কালও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর (৮ জুলাই, ১৮৭৭) পর 'জার্নাল অব দি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি', 'টাইমস্‌', 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ', 'অ্যানুয়াল রেজিষ্টার', 'ল টাইমস্‌' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের শোকসংবাদে[১] তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাহা যথেষ্ট নয়। অবশ্য

১ 'ডিক্‌সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'তে "জি. সি. বি." প্রদত্ত তালিকা এই :

"Times, 10 July 1877, p. 4; Illustrated London News, 28 July 1877, p. 98, with portrait; Journal of the Royal Asiatic Society. 1878, 8 vo, vol. x. Annual Report pp xi-xii; Hunter's Gazetteer of India., article "Serampur"; Annual Register, 1877, p. 154; Law Times, 1877, LXIII. 201."

সুবিখ্যাত 'ডি. এন. বি.' বা 'ডিক্‌সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি' তাঁহাকে এক "কলম" স্থান দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; জে. জে. হিগিনবোথামের 'মেন হুম ইণ্ডিয়া হ্যাজ নোন' গ্রন্থের ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের "সাপ্লিমেণ্ট" খণ্ডের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় 'ডি. এন. বি.'তে প্রকাশিত 'জি. সি. বি.'র লেখাটিই সামান্য অদল-বদল করিয়া মুদ্রিত[২] হইয়াছে; সি. ই. বাকল্যাণ্ডও তাঁহার 'ডিক্‌সনারী অব ইণ্ডিয়ান বায়োগ্রাফি'তে (১৯০৬) জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে (পৃঃ ২৭৬) আধ "কলমের"ও একটু বেশি স্থান দিয়াছেন। পরবর্তী কালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে তাঁহার 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার' (১৯১৯) গ্রন্থের ২৪৫-২৪৯ পৃষ্ঠায় জনের বাংলা বইগুলির বিস্তৃত তালিকা দেওয়ার প্রয়াস করিয়াছেন। এই বইখানি ছাড়া অন্য কুত্রাপি বাংলা-সাহিত্যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের দান সম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই। উনিশ শতকের ও বর্তমান কালের অন্যান্য বাংলা গদ্য সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থে জন মার্শম্যান সম্বন্ধে এত সামান্য আলোচনা আছে যে তাহা উল্লেখযোগ্য নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, জন ক্লার্ক মার্শম্যান স্বয়ং ইংরেজীতে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বৃহৎ 'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অব কেরী, মার্শম্যান অ্যাণ্ড ওয়ার্ড' (১৮৫৯) গ্রন্থে অনেক সুযোগ সত্ত্বেও নিজেকে জাহির করেন নাই। ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কেরী-বংশের এস. পিয়ার্স কেরী ১৯২৩ সনে লণ্ডনের হডার অ্যাণ্ড স্টটন লিমিটেড প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ 'উইলিয়ম কেরী'তে। ১৯৩৪ সনে লণ্ডনের দি কেরী প্রেস-প্রকাশিত পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণে আমরা দেখিতেছি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনেকখানি স্থান পাইয়াছেন। এখন পর্যন্ত তাঁহাকে সর্বাধিক সম্মান দেখাইয়াছেন তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র পরবর্তী সম্পাদক[৩] জর্জ স্মিথ। তাঁহার 'টুয়েলভ ইণ্ডিয়ান স্টেটসমেন' (১৮৯৭) গ্রন্থের কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী নবম অধ্যায়ে তিনি জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জীবন, চরিত্র ও কীর্তি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জন মার্শম্যানের কর্মবহুল জীবনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সম্পর্কিত, উপরোক্ত রচনাগুলিতে অবহেলিত, অংশটুকুই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

জীবনী

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তারিখে ইংলণ্ডের ব্রিস্টলের অন্তঃপাতী ব্রড্‌মিডে স্থানীয় ছোট একটি স্কুলের সত্ত্বভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জোশুয়া মার্শম্যানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন ক্লার্কের জন্ম

এতদ্‌ব্যতীত, লুই জেনিংস এম. পি. সম্পাদিত 'দি নিউইয়র্ক টাইম্‌স'-এর ১৮৭৭ সনের জুলাই সংখ্যায় জন ক্লার্ক মার্শম্যানের তিরোধান সম্পর্কে তাঁহার জীবনীসম্বলিত একটি সুন্দর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

২ G. C. B.ই Higginbootham-এর উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন।

৩ জন ক্লার্ক মার্শম্যান—১৮৩৫ সনের ১লা জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৮৫২ পর্যন্ত ১৭ বৎসর ইহার সম্পাদনা করেন; পরবর্তী সম্পাদক জনের ভাগিনেয় মেরিডিথ টাউনসেণ্ড ১৮৫২ হইতে ১৮৫৯ সন পর্যন্ত এবং তাঁহার পরেই জর্জ স্মিথ ১৮৫৯ হইতে ১৮৭৫ সন পর্যন্ত সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হয়। মাতা হ্যানা আদর্শ সহধর্মিণী ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণী ছিলেন। পূর্ব-ভারতবর্ষের 'ধর্মহীন অজ্ঞান' মানুষদের মধ্যে ধর্ম ও জ্ঞান বিতরণের সদুদ্দেশ্য লইয়া, কেট্‌রিঙের ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন মণ্ডলীভুক্ত হইয়া ১৭৯৯ সনের শেষ ভাগে সস্ত্রীক সপুত্র জোশুয়া মার্শম্যান পূর্বসূরি উইলিয়ম কেরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন উইলিয়ম ওয়াড প্রমুখ তিন জন মিশনরি। জাহাজ কলিকাতা পৌঁছিলে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের চর সন্দেহে তাঁহাদিগকে কলিকাতার মাটিতে পদার্পণ করিতে দেওয়া হয় না। তাঁহারা ১৩ই অক্টোবর তারিখে ডেনিশ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে অবতরণ করেন। বালক জনের বয়স সে দিন পাঁচ বৎসর দুই মাস পূর্ণ হইতে পাঁচ দিন বাকি ছিল। উইলিয়ম কেরী অচিরাৎ মালদহের বৈষয়িক ও ঐশ্বরিক সর্ববিধ কার্য পরিত্যাগ করিয়া নবাগত ধর্মভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরামপুরে মিলিত হন এবং শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ও ভারতের, তথা পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য ভাষায় ধর্মগ্রন্থ বাইবেল প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই। সুবিখ্যাত কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ডের কীর্তির আরম্ভও এইখানেই। জনেরও শিক্ষারম্ভ শ্রীরামপুরে, এই ত্রয়ীর কাছে। উইলিয়ম কেরী ও পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের পাণ্ডিত্য, উইলিয়ম ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলাবোধ এবং আট বছরের অগ্রজ ফেলিক্স কেরীর বাংলাভাষা-জ্ঞান বালক জনকে ধীরে ধীরে শিক্ষিত ও মিশনের কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে থাকে। সেই সঙ্গে মাতা হ্যানার ধর্মবিশ্বাস ও মিশনের কাজে আত্মত্যাগের আদর্শ জনকে একজন দৃঢ়চেতা, কর্মনিষ্ঠ, ত্যাগী মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। হ্যানার সম্বন্ধে জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন: "আধুনিক কালের প্রথম নারী-মিশনরির জীবনী এখনও লিখিত হইবার অপেক্ষায় আছে। তাঁহার দীর্ঘ ভারতীয় জীবনের আটচল্লিশ বৎসরের প্রায় প্রত্যেক দিবসটিই তিনি বাংলা দেশের বালিকা ও নারীদিগকে খ্রীষ্টীয় আদর্শে ভাল ও শিক্ষিত করিবার কাজে ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীরামপুর ভ্রাতৃসংঘকে বরাবর সেই গার্হস্থ্য আরাম ও শান্তি যোগাইয়াছেন, যাহার অভাব ঘটিলে এই কর্মব্যস্ত মানুষেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার অর্ধেকও সম্পাদন করিতে পারিতেন না।"

১৮১২ সনে মাত্র সতের বৎসর বয়সেই জন পুরাপুরি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮১৯ সনে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে মিশন-ভ্রাতৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। তৎপূর্বেই ১৮১৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে উইলিয়ম ওয়ার্ড স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে ইংলণ্ড যাত্রা করিলে মিশনের ছাপাখানার তত্ত্বাবধান ও বৈষয়িক কার্য-পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।[৪] ইংরেজী ও ভারতীয় বিবিধ ভাষায় প্রভূত জ্ঞান সত্ত্বেও ১৮২২ সনের গোড়ায় ইউরোপীয় ক্লাসিকস্‌ বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি ইটালি ও গ্রীস যাত্রা করেন। ১৮২৩ সনের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরে কলেরা রোগে উইলিয়ম ওয়ার্ডের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটায়

৪ বয়সে অগ্রজ বিক্ষিপ্তচিত্ত ফেলিক্স ১৮১৮ সনের গোড়ায় আরাকানের অরণ্য হইতে ওয়ার্ড কর্তৃক শ্রীরামপুরে নীত হওয়ার পর আপনাকে অন্তরালে রাখিতেই ভালবাসিতেন।

উইলিয়ম কেরী জনকে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসেন। সে দিন হইতে ১৮৫২ সনে ভারতবর্ষের কাছে চিরবিদায় লইয়া স্বদেশযাত্রা পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি ভারতবর্ষে বিচিত্র কর্মময় জীবন যাপন করেন।

তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১. প্রবর্তক-ত্রয়ী কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদন ও পরিচালনভার সম্পূর্ণ গ্রহণ। এই কার্যে নবাগত (১৮২১) জন ম্যাক তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন।

২. ১৮১৮ সনে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনরি কলেজের পরিচালন ও আথিক দায়িত্বভার সম্পূর্ণ গ্রহণ।

৩. শ্রীরামপুরে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন ও পরিচালন।

৪. ১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ ও ১৮৫২ সনে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত উক্ত পত্র পরিচালন।

৫. ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ-প্রণয়ন।

৬. ইংরেজী ও বাংলায় সরকারী আইন সঙ্কলন।

৭. সুন্দরবন অঞ্চলে খ্রীষ্টীয়ান উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

৮. উইলিয়ম কেরীর পরে সরকারের বাংলা অনুবাদকের পদ গ্রহণ।

১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে যুবক উইলিয়ম ইয়েটস্ সদ্য বিলাত হইতে আসিয়া শ্রীরামপুরের মিশন-গোষ্ঠীভুক্ত হন; ১৮১৭ সনের ২৫ আগস্ট আসেন মূল ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল পীয়ার্সের পুত্র উইলিয়ম পীয়ার্স। কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জীবনীকার ইউস্টেস কেরীর সহিত মিলিত হইয়া ১৮১৭ সনেই ইহারা প্রতিষ্ঠাতাত্রয়ী, বিশেষ করিয়া জোশুয়া মার্শম্যানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বিলাতের কমিটির সমর্থনে ১৮১৮ সনের গোড়ায় শ্রীরামপুর ছাড়িয়া কলিকাতার এণ্টালি অঞ্চলে স্বতন্ত্র ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন স্থাপন করেন। বিলাতের এবং শ্রীরামপুরের মিশন-গোষ্ঠীর মধ্যে ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কলহের প্রধান কারণ, শ্রীরামপুর ত্রয়ীর ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তি লইয়া। ত্রয়ীর নানামুখী উপার্জনে এবং বন্ধু ও ভক্তজনের দানে শ্রীরামপুর সোসাইটির সম্পত্তি বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছিল। তরুণ বিদ্রোহীরা এই সম্পত্তিকে মূল ব্যাপ্‌টিস্ট সমিতির সম্পত্তিরূপে গণ্য করিতে চাহিতেছিলেন। অপরের অর্জিত বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে এই অন্যায় দাবী ত্রয়ী সমর্থন করিলেন না। তাঁহাদের অবর্তমানে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার কাহাতে বর্তিবে, এই প্রশ্ন উঠে। ত্রয়ী জন ক্লার্ক মার্শম্যানের কর্মক্ষমতার উপর আস্থা জ্ঞাপন করেন। বিদ্রোহীরা মার্শম্যান-গোষ্ঠী-বিরোধী। এই কলহের তুষানল দীর্ঘ বার বৎসর ধিকিধিকি জ্বলিয়া ১৮৩০ সনে নির্বাপিত হয়। উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠাতাত্রয়ী বিলাতের

মূল সমিতি-নিয়োজিত ট্রাষ্টিদের হাতে সমস্ত সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে তুলিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যান লেখেন, "সম্পত্তির অধিকার অর্জনে কোনও মানুষকে অধিক আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই—সম্পত্তি বর্জন করিয়া এই প্রবীণেরা যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

কর্মবীর জন ক্লার্ক শেষ পর্যন্ত প্রবীণ ত্রয়ীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন স্বোপার্জিত অর্থে সমিতির অক্ষম ট্রাষ্টিদের নিকট হইতে এই সম্পত্তি পুনঃ ক্রয় করিয়া। জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন :

"...and it fell to him [J. C. M.] to buy back, out of his own earnings, the mission property, which they had created and surrendered with almost quixotic generosity. Before his death he made over the famous college and the properties, thus twice his own, to a new generation of the society, and all with a quiet, albeit righteously proud, reticence, which concealed the nobilty of his action. Left sole representative of the Brotherhood and undertaking its enormous responsibilities, John Clark Marshman created the income necessary to meet them by his literary labours—his paper mill, the first in India ; his educational and law text books and his official salary as Government trans'ator. In all this he became an expert oriental scholar, mastering Chinese like his father, as well as Sanskrit and Persian. The Bengali language and literature he followed Carey in almost creating, his knowledge and style surpassing that of the Bengalis themselves, with two exceptions"

অর্থাৎ "যে মিশন সম্পত্তি তাঁহারা [কেরী-মার্শম্যান ওয়ার্ড] অর্জন ও প্রায়-উন্মাদ-উদারতায় বর্জন করিয়াছিলেন, স্বোপার্জিত অর্থে তাহা পুনঃক্রয়ের দায়িত্ব তাঁহার [জন ক্লার্ক মার্শম্যান] উপর পড়ে। এবং তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই প্রসিদ্ধ কলেজ ও সমস্ত সম্পত্তি, যাহা দুই-দুই বার এই ভাবে তাঁহার নিজস্ব হয়, পরবর্তী নূতন বংশধরদের দ্বারা স্থাপিত সমিতির হস্তে ন্যস্ত করেন। তাঁহার এই নীরব সংযত দানের অন্তরালে হয় ত সঙ্গতভাবেই তাঁহার গর্বিত মনোভাব একটু ছিল, কিন্তু তাঁহার কার্যের মহত্ত্বও সেই সঙ্গে গোপন ছিল। ভ্রাতৃগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া এবং তাঁহাদের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করিতেন—তাঁহার সাহিত্যকর্ম, তাঁহার কাগজ-কল—যাহা ভারতে প্রথম কাগজ-কল, তাঁহার স্কুল-কলেজ-পাঠ্য ও আইন পুস্তকাবলী এবং গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক হিসাবে তাঁহার সরকারী বেতনের দ্বারা। এই কর্মযোগে তিনি প্রাচ্য-পাণ্ডিত্যে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার মত চীনাভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষাতেও কম দক্ষতা অর্জন করেন নাই। উইলিয়ম কেরীর মত তাঁহাকেও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একজন স্রষ্টা বলা চলে। এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার রচনারীতি মাত্র দুই জন ছাড়া সকল বাঙালীকে অতিক্রম করিয়াছিল।"

জর্জ স্মিথ সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের কথা ভাবিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত ইহা বলাও প্রয়োজন যে, জনের উৎসর্গীকৃত কলেজ আজ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেছে। মূল সমিতির সহিত এই বিচ্ছেদের পর জন প্রকাশ্যতঃ

ধর্মপ্রচারকের কাজে ইস্তফা দিয়া বৈষয়িক কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য ইহার পরেও ভারতে খ্রীষ্টমহিমা প্রচারের কোনও সুযোগই তিনি ত্যাগ করেন নাই। শ্রীরামপুরের অসহায় মিশন-গোষ্ঠীকে প্রতিপালন করিবার জন্যই তাঁহাকে পারমার্থিক জীবন ত্যাগ করিয়া আর্থিক জীবন যাপন করিতে হয়। এই সময়ে তিনি প্রচুর উপার্জন করিলেও নিজে মাসিক মাত্র দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া, বাকি সমস্ত টাকা কলেজ ও শ্রীরামপুর সমিতির জন্য দান করিতেন। ভারতবর্ষীয়দের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। তিনি পরবর্তী জীবনে বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন—"Education must in India precede Christianity."—"ভারতকে খ্রীষ্টধর্ম দেওয়ার পূর্বে জ্ঞান দান করিতে হইবে।" তিনি নিজে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তজ্জন্যই প্রাণপাত করেন।

অনুবাদক ও 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে'র সম্পাদক হিসাবে সরকারের সহিত যুক্ত হওয়াতে ভারতবর্ষে অবস্থানের শেষ কয়েক বৎসর (১৮৪০—১৮৫২) জনকে সাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। 'সরকারের দালাল' তাঁহার নামের বিশেষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীরামপুর কলেজের ও মিশনের কর্তৃত্বভার ত্যাগ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে সুখী ছিলেন না, তদুপরি এই নিন্দা কুৎসায় তিক্তবিরক্ত হইয়া ১৮৫২ সনে তিনি পিতা ও পিতৃবন্ধুদের স্বেচ্ছানির্বাচিত স্বদেশ এবং নিজের তিপ্পান্ন বৎসরের কর্মস্থল ভারতবর্ষ চিরতরে ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে জীবনের শেষ পাদ তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণেই ব্যয়িত করেন। ভারতবাসীর শিক্ষা, কৃষি ও বনসম্পদ্, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ের উন্নতি বিধান এই কালে তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বদেশে তিনি কীর্তির উপযুক্ত (সামান্য সি. এস. আই. উপাধি ছাড়া) সম্মান লাভ করেন নাই। বারংবার ভারতের কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া তিনি কৃতকার্য হন নাই, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলেও তাঁহার স্থান হয় নাই। ভারতীয় রেলওয়ের হিসাব-বিভাগের একজন কর্মী হিসাবেই তিনি প্রিয় ভারতবর্ষের সহিত শেষ প্রত্যক্ষ যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থ (সবগুলিই ভারত সংক্রান্ত) ও পুস্তিকাগুলি এই কালেই রচিত ও প্রকাশিত হয়।[৫] তালিকা রচনাপঞ্জীতে দ্রষ্টব্য।

৫ "In England, however, he was not recognised ; he failed after four sharp contests, in entering Parliament ; Sir Charles Wood, unaware of his special official merit, his great capacity for managing the details of finance, refused him a seat in the Indian Council, and though his services to education were, at the instigation of Lord Lawrence, tardily recognised by the Companionship of the Star of India [1868] he was compelled to occupy himself in the affairs of the East India Railway, where, as chairman of the committee of audit, he rendered most efficient, but of course unrecognised service, and in writing books like his 'History of India' and the 'Lives of Carey, Marshman and Ward.'—"Supplement to 'Men whom India has known,' 1878, p. 59.

জে. জে. হিগিনবোথাম জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন :

> "To the last he remained always an Indian, caring principally for the fortunes of the great empire he had helped to guide, and lending the aid of his apparently endless knowledge to anyone who consulted him, and who knew enough to know when he was obtaining fresh material. He was finishing, when he died, a complete series of biographies of the Viceroys, a work which will now scarcely appear. He rarely spoke of his fixed ideas, however, turning them over in his mind for himself, just as in earlier years he had turned over and concealed his knowledge, till of all who knew Mr. Marshman, probably not three were aware that he had given years to Chinese, that he had read intelligently all the great Sanscrit poems, and that he once knew Persian as thoroughly as most diplomatists know French."

অর্থাৎ, "জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে সর্বদা একজন ভারতীয় বলিয়াই জ্ঞান করিতেন ; যে মহান্ সাম্রাজ্যের তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাহারই কল্যাণ তাঁহার প্রধান কাম্য ছিল ; যে কোনও জিজ্ঞাসু, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও বিষয়ের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হইয়া তাঁহার কাছে নূতন উপকরণের সন্ধানে যাইত, তিনি তখনই তাহার নিকট তাঁহার অসীম জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ চরিতমালা রচনা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটায় তাহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়াছে। তিনি শেষ জীবনে নিজের দৃঢ় মতামতের কথা কদাচিৎ প্রকাশ্যতঃ বলিতেন, নিজের মনে মনেই সেগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিতেন। এই অভ্যাস তাঁহার প্রথম জীবনের। তখন যে জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা মনে মনেই রাখিতেন। তাঁহার মন্ত্রগুপ্তি এমনই নিখুঁত ছিল যে, তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মাত্র দুই তিন জনই জানিতেন যে, তিনি কয়েক বৎসরের চেষ্টায় চীনা ভাষা শিখিয়াছেন, সংস্কৃত মহাকাব্যসমূহ পড়িয়া বুঝিয়াছেন এবং পররাষ্ট্রবিদ্‌দের ফরাসী ভাষায় যেরূপ দক্ষতা অর্জন করিতে হয়, পারসিক ভাষায় সেইরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।"

তাঁহার এই মন্ত্রগুপ্তির আর একটি প্রমাণ এই যে, শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে তিনি এককালীন ও মাসে মাসে (সরকারী অনুবাদকের মাসিক এক হাজার টাকা বেতনের সবটাই) যাহা দান করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ যে কয়েক লক্ষ টাকা, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পরমাত্মীয়েরাই সে কথা প্রথম অবগত হইয়া বিস্ময়বোধ করেন।

তিরাশী বৎসরের পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া ১৮৭৭ সনের ৮ই জুলাই তারিখে লণ্ডনের কেনসিংটন পল্লীতে, রেডক্লিফ স্কোয়ার নর্থে ভারতবন্ধু এই কর্মী পুরুষের মৃত্যু হয়।

রচনাপঞ্জী

ইংরেজী

জন মার্শম্যান সব্যসাচী, ইংরেজী ও বাংলায় ডাইনে-বাঁয়ে লিখিতে পারিতেন। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার সহিত তাঁহার সম্পর্ক তাঁহার ইংরেজী রচনার সহিতও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলিয়া জীবৎকালে প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী পুস্তক ও পুস্তিকাগুলির কালানুক্রমিক তালিকা সর্বাগ্রে দিতেছি :

1. Reply of J. C. Marshman to the Attack of J. S. Buckingham on the Serampore Missionaries, 1826.
2. Guide book for Moonsiffs, Sudder Ameens and Principal Sudder Ameens, containing all the Rules necessary for the conduct of suits in their Courts, 1832.
3. Guide to Revenue Regulations of the Presidencies of Bengal and Agra. 2 vols, Serampore, 1835.
4. Outline of the History of Bengal, 1840 (?), 5th Edn. 1844.
5. The History of India from Remote Antiquity to the Accession of the Mogul Dynasty, 1842.

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'য় জনের মাত্র এই ইতিহাসখানির উল্লেখ আছে।

6. A Guide to the Civil Law of the Presidency of Fort William containing all the unrepealed Regulations, Acts, Constructions and Circular Orders of Government. To which is prefixed an epitome of every Enactment and Rule, corrected to the 31st December 1841, Serampore, 1842. Pp. XLIII, 540.

জে. জে. মুর ১৮৩৫-৩৬ সনে দুই খণ্ডে ইহার উর্দ্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন।

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা' একাদশ সংস্করণ, ভ্যলুম ১৭, পৃঃ ৭৭৪-এ বলা হইয়াছে—"*Guide to the Civil Law* which before the work of Macaulay was the Civil Code of India."

7. The Darogah's Manual, comprising also the duties of Landholders in connection with the Police. Serampore, 1850. Pp. xx 328
8. How wars arise in India. Observations on Mr. Cobden's Pamphlet entitled 'The Origin of the Burmese War.' H. Allen & Co., London, 1853. Pp. 71.
9. Letter to John Bright, Esq. M. P. relating to the recent debates in Parliament on the India Question, H. Allen & Co., London, 1853. Pp. 53.

10. The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward. Embracing the History of the Serampore Mission. 2 vols. Pp. 511+527,...Longmans..., London, 1859.
11. Memoirs of Major-General Sir Henry Havelock, K. C. B. Pp. 462, London, 1860.
12. The History of India from the Earliest Period to the close of the Eighteenth Century. Part 1, 1863.
13. The History of India from the Earliest Period to the close of Lord Dalhousie's Administration. 3 vols, London, 1867.
14. Abridgement of the History of India—from the earliest period to the close of the East India Company's Govt, Pp. 544, Serampore, 1873.
15. History of India from the eartiest period to the close of the E. I. Company's Government. Abridgement from the Author's larger work, London and Edinburgh. 1876.

এতদ্‌ব্যতীত কয়েকটি খ্রীষ্টধর্মপ্রচারমূলক পুস্তিকাও জন ক্লার্ক মার্শম্যান রচনা করিয়াছিলেন। মার্ডকের তালিকায় ('Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India···' by John Murdoch, 1870) ইংরেজী বাংলায় প্রচারিত পুস্তিকার নাম আছে, যথা 'Jagannath' by G. C. M. ৮ পৃষ্ঠা ১৮২৯।

এই তালিকায় (২) ও (৩) এর মাঝখানে আর একটি বই বসিবে যাহাকে একটু স্বতন্ত্র করিতে হইতেছে। ইহা ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষায় লিখিত। বইখানির নাম :

16. Brief Survey of History (পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ) Pt I. from the creation to the beginning of the Christian Era. Translated by J. C. Marshman, English & Bengali. Pp. 6+513. Serampore 1833.

তাঁহার ইংরেজী আইন বইগুলি (2, 3, 6, 7) বিশেষ করিয়া 'গাইড টু সিভিল ল···' ও 'দারোগাজ ম্যানুয়েল' বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। এই গুলির বঙ্গানুবাদও তিনি স্বয়ং করিয়াছিলেন। হিগিনবোথাম বলিয়াছেন :

"[He] published a series of law books, one of which the 'Guide to the Civil Law' was for many years the Civil Code of India, and was probably the most profitable law book ever published."

4 নং বই "Outline of the History of Bengal' সম্বন্ধে 'ডিকসনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'তে লেখা হইয়াছে : "the first, and for years the only history of Bengal." এই বিশেষণ অতিরঞ্জিত। কারণ, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (১৮০০-১৮০৬) ও ইংলণ্ডের হেলিবেরি কলেজের (১৮০৭-১৮২৭) পার্সিয়ান ভাষার অধ্যাপক চার্লস

স্টুয়ার্ট (Charles Stewart, 1761-1837) ১৮১৩ সনে তাঁহার সুবিখ্যাত 'দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ফ্রম দি ফার্স্ট মাহামাডান ইনভেশন আনটিল ১৭৫৭' প্রকাশ করেন। স্টুয়ার্টের বাংলার ইতিহাসও কম প্রসিদ্ধ নয়। তবে মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাসকে অনুবাদ ও অনুসরণের দ্বারা বাংলা দেশের যাবতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে প্রচার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গোবিন্দচন্দ্র সেন, রেভারেণ্ড ডক্টর জন ওয়েঙ্গার প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার খ্যাতি সমধিক বৃদ্ধি করেন। উল্লেখযোগ্য তিনখানি অনুবাদ এই :

১। বাঙ্গালার ইতিহাস। [জে, সি, মার্শম্যানের ইংরাজী হইতে অনূদিত]

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ৩৩৭। কলিকাতা ১৮৪০।

ইহাতে ১২০৩ সনে বঙ্গদেশে মুসলমান আক্রমণ হইতে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। ১৮৩৯ সনে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনে গোবিন্দচন্দ্র মার্শম্যান অবলম্বনে ভারতবর্ষের ও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তাহা ৩২ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

আমরা ১৮৪০ সনের ৭ই মার্চের 'সমাচার দর্পণে' 'জ্ঞানান্বেষণ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত সংবাদটি পাইতেছি : "আমরা শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কৃত মার্সমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের অনুবাদগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। অস্মদ্দেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল ..। [জ্ঞানান্বেষণ]"

লং সাহেব গোবিন্দচন্দ্রের ভাষার দুরূহতার নিন্দা করিয়াছেন।

২। বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ।

সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের অধিকার পর্যন্ত।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংকলিত। পৃঃ ২+১৪৪, কলিকাতা [সং ১৯০৪] ১৮৪৮।

"বিজ্ঞাপন" :—"বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্বক সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কোনও কোনও বিষয় আবশ্যকবোধে গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলন পূর্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে।...শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।"

ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' এমনই নূতনত্বসম্পন্ন হইয়া উঠে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক ও পরীক্ষক মেজর জি. টি. মার্শাল মার্শম্যানের ইতিহাসের বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদের আক্ষরিক ইংরেজী অনুবাদ করিয়া স্বয়ং মার্শম্যানের সমর্থনে 'এ গাইড টু বেঙ্গল' টীকাটিপ্পনী সহ রচনা করেন। বঙ্গীয় সরকার ১৮৫০ সনে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

৩। বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত। শ্রীযুক্ত মার্শমান সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। পৃ ২৮৪, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৫৩।

জন ওয়েঙ্গার এই অনুবাদ করিয়াছেন।

মার্শম্যানের ভারতবর্ষের ইংরেজী ইতিহাস অবলম্বনে গোবিন্দচন্দ্র সেন, গোপাললাল

মিত্র, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস [জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া' হইতে অনূদিত] শ্রীগোপাললাল মিত্র। পৃ ৮+২০১+১১, কলিকাতা ১৮৪০।

এইচ. এস. জারেট (মেজর) ১৮৮০ সনে মার্শম্যানের হিন্দুরাজত্ব অংশ হিন্দুস্থানী অনুবাদে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

16 নং পুস্তক 'Brief Survey of History'র পরবর্তী ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। মার্শম্যানের নিজকৃত বঙ্গানুবাদ সত্ত্বেও প্রখ্যাত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্যের নির্দেশে কলিকাতা "সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের কতিপয় সুশিক্ষিত ছাত্র…মার্শম্যান-বিরচিত 'ব্রিফ সার্ভে অব হিস্ট্রি' নামক ইংরেজী পুস্তক যথাক্ষর অনুবাদ" করেন। ১৮৬২ সনে এই গ্রন্থ "ইতিবৃত্তসার। ১ম ভাগ। সৃষ্টি অবধি খ্রীষ্টিয় শকের প্রারম্ভ পর্যন্ত। মার্শম্যান বিরচিত 'ব্রিফ সার্ভে অব হিস্ট্রি'র অনুবাদ।" এই নামে কলিকাতা গৌড়ীয় প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৩৫।

10 সংখ্যক গ্রন্থ 'The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward" ১৮৮০ সনে মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক সংক্ষেপে বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া 'আদর্শচরিত, কিম্বা কেরি, ওয়ার্ড, এবং মার্শম্যান চরিত।' নামে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে বাহির হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৫৩।

মার্শম্যান সার জন উইলিয়ম কে (Kaye) প্রতিষ্ঠিত (১৮৪৪) 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের প্রথম পনের ভ্যলুমে (সাড়ে সাত বৎসর) ভারত ও বঙ্গদেশ সম্পর্কিত দশটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে। প্রবন্ধগুলির তালিকা এখানে প্রকাশ করিলাম।

	Vol.	No	
1.	I.	2	Lord William Bentinck's Administration.
2.	II.	3	Sir W. H. Macnaghten.
3.	II.	4	Macfarlane's 'Indian Empire.'
4.	III.	5	Bengal as it is.
5.	III.	6	Notes on the Left or Calcutta Bank of the Hooghly.
6.	IV.	8	Notes on the Right Bauk of the Hooghly.
7.	IX.	17	The Efficiency of Native Agency in Government Employ.
8.	XII.	23	Second Punjab War.
9.	XIII.	25	Annals of the Bengal Presidency for 1849.
10.	XV.	29	Annals of the Bengal Presidency for 1850.

ইহার মধ্যে 4, 5, 6, 9 ও 10 সংখ্যক প্রবন্ধগুলিকে বাংলা দেশের তদানীন্তন অবস্থা ও ভূগোল সম্পর্কে বিচিত্র তথ্যের আকর বলা যাইতে পারে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮৩৩ সনে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় ইংরেজীতে একটি ভূমিকা যোজনা করেন। ১৮২৬ সনে প্রকাশিত রেভারেণ্ড এফ. সি. জি. শ্রুটার (Schroeter) লিখিত 'A Dictionary of Bhotanta or Boutan Language' বইখানি সম্পাদন করেন জন মার্শম্যান।

বাংলা

বাংলা রচনাপঞ্জী প্রস্তুতির অসুবিধা ঘটাইয়া গিয়াছেন মার্শম্যান নিজে। অনেকগুলি পুস্তকের আখ্যাপত্রে তিনি নিজের নাম যোজনা করেন নাই। 'সমাচার দর্পণে'র ব্রজেন্দ্রনাথ-কৃত সংকলন 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দুই খণ্ড ও লঙের ক্যাটালগ দুইটি এবং মার্ডকের ক্যাটালগ তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া যে সামান্য তথ্য পাইয়াছি, তাহার সহিত নেতি-নেতি-পদ্ধতির বিচার যোগ করিয়া বাংলা রচনাপঞ্জীটি খাড়া করিতে হইয়াছে। ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়। আইনের দুইটি বই, ক্ষেত্রবাগান সংক্রান্ত একটি দুই খণ্ডে, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই খণ্ড, 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ', ইংরেজী-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজী অভিধান দুইটি, আইনের অভিধান একটি—এই আটখানিতে মাত্র তাঁহার নাম সংযোজিত আছে। সেগুলির কালানুক্রমিক তালিকা এইরূপ :

১. A Dictionary of the Bengalee Language, abridged from Dr. William Carey's 'Dictionary' in three volumes by J, C. Marshman Vol. I, Bengalee and English ; 1827 pp 531.

২. ঐ Vol. II English and Bengalee, 1828 pp. 440.

"The former volume of this Work was an abridgement of Dr. Carey's valuable Dictionary in three Volumes Quarto. In the present Volume, the Editor has simply to acknowledge the valuable assistance he has received from Dr. Carey in the revision of the sheets as they passed through the press ; and to take upon himself all responsibility for the inperfections of the Work. Serampore, Dec. 10, 1828."

John. C. Marshman."

দুইখানিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩. "ভারতবর্ষের ইতিহাস। অর্থাৎ কোম্পানী বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইশ হেষ্টিংসের রাজশাসনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়েরদের কৃত তাবদ্বিবরণ।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত।

১ম বালম পৃ. ৩৭৪

ঐ ২য় বালম পৃ. ৩৯১

[দুই খণ্ডই] শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত। সন ১৮৩১ সাল।"

'সমাচার দর্পণে'র সংবাদে প্রকাশ, টাইটেল পেজে লেখকের নাম সহ এই গ্রন্থ ১৮৩২ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে বাহির হইয়াছিল।

৪. Agri-Horticultural Transactions—ক্ষেত্রবাগান বিবরণ [বিজ্ঞান ?] দুই খণ্ডে। ১ম খণ্ড ১৮৩১, ২য় খণ্ড ১৮৩৬। দুই খণ্ডে ৭৩০ পৃষ্ঠা।

এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃত ব্যয়ে মার্শম্যানকে দিয়া এই অনুবাদ প্রস্তুত করান। ইহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও স্থানে বিভিন্ন কৃষি-দ্রব্যের উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্য ও নির্দেশ আছে। তন্মধ্যে তুলা, সেগুন (teak), চা, কফি, ইক্ষু, চাল, এরারুট, গুটিপোকা, তামাক, আলু ও পীচের চাষ উল্লেখযোগ্য।

৫. "পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ। অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি খ্রীষ্টীয়ান শকের আরম্ভ পর্যন্ত।"

Brief Survey of History Pt. I from the Creation to the Beginning of the Christian Era. Translated by John C. Marshman, English and Bengali. পৃ. ৬+৫১৩। শ্রীরামপুর ১৮৩৩।

৬. "দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ অর্থাৎ যে সকল আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রভৃতি ইং ১৭৯৩ সাল লাং ১৮৪৩ সাল হইয়াছে তাহা।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত। দুই বালম। [পৃ. ৪০০+৩৮৫] শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল। ১৮৪৩ সাল।"

৭. দারোগারদের কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ। পৃ. ১৮+৩৯৫। শ্রীরামপুর ১৮৫১।

৮. ব্যবস্থাবিধান [A Dictionary of Law Terms by John Clark Marshman] ১৮৫১।

জন রবিনসনের 'ডিকশনারি অব ল অ্যাণ্ড আদার টার্মস' (১৮৬০) এই বইখানিরই পূর্ণতর পরিণতি।

ইহা ছাড়া আরও চারিখানি পুস্তকের সন্ধান পাইতেছি, যাহার লেখক আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ১৮২২ সনে মূল ইংলণ্ডীয় সমিতির সঙ্গে হঠাৎ বিচ্ছেদে শ্রীরামপুর গোষ্ঠীকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হয়। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড তিন জনেই তখন বৃদ্ধ। ফেলিক্স কেরী মৃত। যে তরুণ উৎসাহী দল ১৮১৭ সনের পূর্বে শ্রীরামপুরে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মতান্তর-প্রসূত কলহে বিচ্ছিন্ন হইয়া কলিকাতায় স্বতন্ত্র মিশন, স্বতন্ত্র গীর্জা ও স্বতন্ত্র ছাপাখানা স্থাপন করিয়া ও স্কুল বুক সোসাইটির সহিত যুক্ত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। ফেলিক্স, ইয়েটস, পীয়ার্স, লসনের অভাবে শ্রীরামপুর কানা হইয়া গিয়াছে বলা চলে। কর্মক্ষম দুই জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন—জন ম্যাক ও জন ক্লার্ক। নূতন উৎসাহে কলেজ ও স্কুল চলিতেছে, নূতন পাঠ্য পুস্তক প্রয়োজন। ম্যাক গ্রীক, লাটিন ও কেমিষ্ট্রির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লইয়া আছেন, স্কুলপাঠ্য প্রাথমিক ও সাধারণ জ্ঞানের বহি রচনার ভার মার্শম্যানকেই লইতে হইয়াছে। সেইগুলি হইতেছে :

৯। "সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।
সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গলা ভাষায় তর্জমা করা গেল। তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গলা। [দুই ভাগ, মোট ৯৫টি ইতিহাস, ২৩৯ পৃ.]
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮২৯।"

বইখানির ইংরেজী নাম 'Anecdotes of Virtue and Valour.' ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত মাসিক 'দিগ্দর্শনে'র জন্য মার্শম্যানকে পাশ্চাত্ত্য উৎস হইতে এই সকল "অ্যানেকডোট" সংগ্রহ করিতে হইয়াছে ও মাসে মাসে "ইতিহাস" নামে 'দিগ্দর্শনে'র পৃষ্ঠা পূরণার্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। সেই সংগ্রহ দীর্ঘ এগার বৎসর পরে কাজে লাগান হইল। মার্শম্যানের ইচ্ছা ছিল, এই সংগ্রহ চারি খণ্ডে বাহির করিবেন।

'সমাচার দর্পণে'র ১৮২৯ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখের একটি বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি :

"সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস। গত ১ আগস্ট তারিখে সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসের প্রথম ভাগ শ্রীরামপুরে প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকের এক পৃষ্ঠে আসল ইঙ্গরেজী এবং তাহার সম্মুখ পৃষ্ঠে বাঙ্গলা তর্জমা আছে। তাহা চারি ভাগে সমাপ্ত হইবে প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১৲ টাকা।"

১৮৩০ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে :

"এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।...সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস বাঙ্গলা ও ইংরেজী তাহার দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ১ টাকা।"

পূর্বে বিজ্ঞাপিত ৩য় ও ৪র্থ ভাগ আর বাহির হয় নাই।

১৮৬৮ সনে জর্জ স্মিথ বিলাত-প্রবাসী মার্শম্যানকে তাঁহার বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক কীর্তির কথা জানিতে চাহিলে মার্শম্যান "not without a protest against intruding his own name" "নিজেকে জাহির করার বিপক্ষে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া" বলেন—

[মিশনের সেই দুঃসময়ে] "Dr. Marshman took charge of the department of labour, and I was employed in translating into Bengali the books used in the School. More than half a dozen of those treatises were brought into use before the year 1818." অর্থাৎ "খাটুনির [শ্রম বিভাগের] কাজের দায়িত্ব ডক্টর মার্শম্যান গ্রহণ করেন এবং আমি বিদ্যালয়-পাঠ্য বইগুলির বাংলা অনুবাদে নিযুক্ত হই। ১৮১৮ সনের পূর্বেই আধ ডজনেরও বেশি এই সকল বই চালু হইয়া যায়।"

ইহাদেরই দুইটি মুদ্রিত হয় ১৮৩৩-৩৪ সনে। সেগুলি এই।

'সমাচার দর্পণে' (১৩ মার্চ, ১৮৩৩) প্রকাশ—

১০। "মারিচ (Murray's) গ্রামার।—সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্বক প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ১৷৹ টাকা।"

এবং 'সমাচার দর্পণে' (১৯ জুলাই ১৮৩৪) প্রকাশ—

১১। "Just published at the Serampore Press : Part I of An Interlinear Translation of Esop's Fables in Bengalee and English. Price 4 annas."

দুইখানি পুস্তকই যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানকৃত, রেভারেণ্ড লং তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

আর কাহাকেও গ্রন্থকাররূপে চিহ্নিত করা যাইতেছে না বলিয়া আর একখানি গ্রন্থও জন মার্শম্যানের ভাগে পড়িতেছে। শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার 'বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরি' গ্রন্থের ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় সন্দেহ-দোলায়িতচিত্তে 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ও এই বইটিকে মার্শম্যানের পুস্তক-তালিকায় স্থান দিয়াছেন। পরবর্ত্তী সকল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার দ্বিধাহীনচিত্তে দে মহাশয়ের অনুমানকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সব শেষের এই বইখানি হইতেছে :

১২। "জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়। অর্থাৎ জ্যোতিষ পদার্থের ও পৃথিবীর আকৃতি ও নানা দেশ ও নদী ও পর্ব্বত ও রাজ্যাধিকার ও ঈশ্বরারাধনা ও বাণিজ্য ও লোকসংখ্যা ইত্যাদির বিবরণ।

লোকেরদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থে। বাঙ্গালি ভাষাতে তর্জ্জমা হইল। শ্রীরামপুরে দ্বিতীয় বার ছাপা হইল। সন ১৮১৯।" পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮১।

ইংরেজী টাইটেল—'Treatises of Astronomy and Geography Translated into Bengalee.'

১৮২২ সনে দিল্লীর টমসন সাহেব ইহার হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ কোথাও দেখিতে পাই নাই। কোনও পুরাতন পুস্তক-সংগ্রহের (ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) তালিকায় প্রথম সংস্করণের উল্লেখ নাই। ১৮১৮ সনের পূর্বে যে আধ ডজনের অধিক পুস্তক অনুবাদের উল্লেখ জন মার্শম্যান স্বয়ং করিয়াছেন (জর্জ স্মিথের নিকট), ইহা তাহারই একখানি হওয়া অসম্ভব নয়। এই পুস্তক বীজাকারে 'দিগ্দর্শনে'র পৃষ্ঠাতেও আত্মগোপন করিয়া আছে। 'দিগ্দর্শনে'র প্রধান লেখক এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ লেখকসংখ্যা তখন দুই জন, ফেলিক্স কেরী ও জন মার্শম্যান। ফেলিক্সের রচিত পুস্তকের তালিকা জন বহু বার বহু স্থলে প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়ে'র উল্লেখ নাই। নিজের কথা স্পষ্ট করিয়া তিনি কুত্রাপি বলেন নাই। 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ও 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে'র লেখকের নাম গোপনের সম্ভবতঃ ইহাই কারণ।

সাময়িকপত্র পরিচালন ও সম্পাদন

চারিটি সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের সহিত সম্পাদক হিসাবে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম যুক্ত হইয়া আছে : ১. দিগ্‌দর্শন, ২. সমাচারদর্পণ, ৩. ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (ইংরেজী), ৪. গবর্নমেণ্ট গেজেট। সে কালে পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশের রীতি ছিল না। 'গবর্নমেণ্ট গেজেট' দেখি নাই, তাহাতে জন মার্শম্যানের নাম মুদ্রিত হইত কি না জানি না, কিন্তু অন্য তিনখানিতে তাঁহার নাম মুদ্রিত দেখি নাই। পরবর্তী কালে পত্রান্তরের সহিত বাদানুবাদে 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদককে বার বার আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি :

১৮৩৪ সনের নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ডক্টর উইলিয়ম কেরীকে 'সমাচার দর্পণে'র "স্রষ্টা"র গৌরব দেওয়া হইলে ১৫ই নবেম্বরে 'সমাচার দর্পণে' জন মার্শম্যান লেখেন : "…এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে। তিনি লিখিয়াছেন, দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তর কেরী সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকৃত নহে। দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি, কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।" 'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশ প্রসঙ্গ জন মার্শম্যান তাঁহার ইংরেজী 'কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠায় ও জর্জ স্মিথের নিকট প্রদত্ত স্মৃতিকথায় ('Twelve Indian Statesmen') বিস্তারিত ভাবে দিয়াছেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রকাশ-প্রসঙ্গ মার্শম্যানের গ্রন্থের ১৬৪-৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'দিগ্‌দর্শন' ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহা নিঃসংশয়ে বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক মাসিক-পত্র। এই পত্রিকা পরিচালনায় ফেলিক্স কেরী ও জন মার্শম্যানের সমান কৃতিত্ব। বস্তুতঃ আরাকানের জঙ্গল হইতে পাকড়াও করিয়া আনা উদাসীন ফেলিক্সকে কাজের চাপে ফেলিয়া প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশ্যেই সহৃদয় উইলিয়ম ওয়ার্ড 'দিগ্‌দর্শনে'র পরিকল্পনা করেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাসেই ফেলিক্সের স্ফূর্তি ছিল, তিন বৎসর স্থায়ী ২৬ সংখ্যার 'দিগ্‌দর্শনে' (১৮১৮ এপ্রিল—১৮২১ ফেব্রুয়ারি) ফেলিক্স প্রচুর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেম্‌স মিলের সুবিখ্যাত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ('History of British India'-1817) প্রথমাংশের (১০০০ খ্রী. হইতে ১৭৫৬ খ্রী. পর্যন্ত) অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে দশম ভাগ (জানুয়ারি ১৮১৯) হইতে ২৬ ভাগ 'দিগ্‌দর্শনে' বাহির হয়। এই ইতিহাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহারই শেষাংশ "ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়েরদের রাজবিবরণ" অধ্যায় হইতে ১৮১৮ সন পর্যন্ত অনুবাদ করিয়া জন মার্শম্যান ১৮৩১ সনে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। 'দিগ্‌দর্শনে' জন ক্লার্ক মার্শম্যানের লেখাও প্রচুর। 'দিগ্‌দর্শনে'র সম্পাদক হিসাবে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম যদি প্রচারিতই হইয়া থাকে, কিছুই অন্যায় হয় নাই। তবে এ কথা আমাদের স্মরণ

রাখিতে হইবে যে, ১৮২১ সনে ফেলিক্সের কঠিন পীড়া ও ১৮২২ সনে তাঁহার মৃত্যু ঘটায় 'দিগ্দর্শন' প্রকাশ রহিত হইয়া যায়।

'সমাচার দর্পণ' সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র "ভূমিকা"য় ও 'বাংলা সাময়িক পত্রে' বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। গোড়ার দিকে জোশুয়া মার্শম্যান ও ওয়ার্ড যে ভাবেই ইহার সহিত যুক্ত থাকুন এবং গোড়ায় বিরোধী, পরে সমর্থক কেরী যতই আনুকূল্য করুন, আসলে এই পত্রিকা চালাইতেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতদের সহায়তায় যুবক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি নিজেও ইহাতে বড় কম লিখিতেন না। ১৮১৮ সনের ২৩ মে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর ১৮৪১ সনের ২৫ ডিসেম্বর মিশন গোষ্ঠীর পরিচালনায় ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশ পর্যন্ত জন ক্লার্ক মার্শম্যানই যে এই পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই সাড়ে তেইশ বৎসর কালে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক, সপ্তাহে দুই বার এবং ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক —বহু মূর্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা ভাষাকে সহজ, সরল, সর্বজনবোধ্য করিয়া ইহা যে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির পথ সুগম করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরেজী 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' মাসিকরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮১৮ সনের মে মাসে। প্রথম সংখ্যার গোড়ায় ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি 'প্রস্পেক্টাস' যোজিত হয়। তাহা পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রবীণ কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ডই ইহার সম্পাদন-দায়িত্ব লইয়াছিলেন। পরে অবশ্য একা জন মার্শম্যানের কাঁধে এই দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ১৮৫২ সনে তাঁহার বিলাতযাত্রা পর্যন্ত এই পত্রেরও নানা রূপান্তর হয়। এখনও 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রের শিরোনামায় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামে মাত্র বাঁচিয়া আছে।

'গবর্নমেণ্ট গেজেট' প্রসঙ্গ ব্রজেন্দ্রনাথের 'বাংলা সাময়িক পত্র' নূতন সংস্করণের (১৩৫৪, মাঘ) ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষা প্রসারের বৈদেশিক সহায়ক-মণ্ডলীর মধ্যে উইলিয়ম কেরী ও ফেলিক্স কেরীর পরেই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের তৃতীয় স্থান, শুধু বয়সে নয়, কৃতিত্বেও। তাঁহার 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ,' 'দেওয়ানি আইনের সংগ্রহ' বা 'দারোগার কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ' বাংলা ভাষাকে কতখানি সরল বা জটিল করিয়াছে, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও তাঁহার বাংলা-ইতিহাস গ্রন্থগুলি হইতেই প্রমাণ করা যায়, ১৮৩৪ সনের পূর্বে যাঁহারা বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, জন মার্শম্যান তাঁহাদের একজন, শিল্পী হয়ত নন, কিন্তু একনিষ্ঠ কর্মী। এই কর্মীই শিল্পী হইয়া উঠিয়াছেন 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠায়। আমি সেই ক্রমবিকাশ দেখাইতেই চেষ্টা করিতেছি।

যে লেখাকে নিঃসংশয়রূপে জন মার্শম্যানের সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা বলিয়া চিহ্নিত করিতে

পারি, তাহা হইতেছে ১৮৩৩ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণে'র প্রথম খসড়া, ১৮১৮ সনের জুন মাসের (তৃতীয় সংখ্যা) 'দিগ্দর্শনে' "খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষেপ বিবরণ" নামে প্রকাশিত হয়। তাহার আরম্ভটা এই :

"পৃথিবী প্রায় ছয় হাজার বৎসর নির্ম্মিতা হইয়াছে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যে কাল গত হইয়াছে সে কাল তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগ সৃষ্টি অবধি জলপ্লাবন পর্য্যন্ত ষোল শত ছাপ্পান্ন বৎসর। দ্বিতীয় জলপ্লাবনাবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত তেইশ শত আটচল্লিশ বৎসর। তৃতীয় খ্রীষ্টের সময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত আটার শত আটার বৎসর। এই মত ভাগে ভাগে কাল নির্দ্দিষ্ট করণের উপকার এই যে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি যে কর্ম্ম হইয়াছে সে সকল ক্রিয়া সময়ানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া মনে থাকে।

"ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। ঈশ্বর ছয় দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিলেন যেহেতুক তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। এই হেতুক ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরা সপ্তাহের এক দিবস সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিবে এবং সেই এক দিবসে ঈশ্বরের প্রতি আপন মনোনিবেশ করিবেক। তিনি দুইজনকে প্রথমে সৃষ্টি করিলেন এক পুরুষ ও এক স্ত্রী। সে দুইজন নিষ্পাপী। যে পর্য্যন্ত পাপ সেই স্ত্রীর মনে প্রবেশ না করিল সে পর্য্যন্ত ঐ দুই ব্যক্তি এদেন উদ্যানে পরম সুখে কালক্ষেপ করিল। পরে সে স্ত্রী ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপন স্বামিকে সেইরূপ করিতে প্রবৃত্তি দিল। সেই অবধি লোকেরা নিত্য পাপ করিতেছে এবং সতত সুখ চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সুখ কখন পায় না। পৃথিবীর প্রথম কালে লোকেরা যে পরম সুখে বাস করিত এই কিম্বদন্তী সকল জাতিমধ্যেই লোকপরম্পরাসিদ্ধা আছে। গ্রীকেরা সে সময়কে স্বর্ণময় করিয়া কহিত। হিন্দু লোকেরা সে সময়কে সত্যযুগ করিয়া কহে। পাপের সঙ্গে অযাথার্থ্য ও বধ ও মিথ্যা ও অন্য সকল কুক্রিয়া জগতে প্রবেশ করিল। আদমের দুই পুত্র ছিল কঈন ও হাবেল। হাবেল আপন ভ্রাতা হইতে যাথার্থিক ছিল সে নিমিত্তে তাহার ভ্রাতা তাহাকে সংহার করিল।"

জনের সম্মুখে বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার একটি মাত্র আদর্শ ছিল—১৮০৮ সনে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি'। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত "ইতিহাস" বলিতে ইহাই সর্বপ্রথম। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি জন মার্শম্যানের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তিনি তাঁহাকে সাহিত্যের "দিগ্‌গজ" ("Colossus") মনে করিতেন এবং তাঁহার 'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইম্‌স অব কেরী, মার্শম্যান অ্যাণ্ড ওয়ার্ড' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, "his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour." স্বয়ং উইলিয়ম কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা করিয়া বাংলা রচনার পাঠ লইতেন। তরুণ মার্শম্যানও মৃত্যুঞ্জয়েরই বিনীত ও ভক্ত ছাত্র ছিলেন।

'রাজাবলি'র আরম্ভটুকু উদ্ধৃত করিলেই শিষ্যের প্রাথমিক চেষ্টার সাফল্যের কারণ বুঝা যাইবে :

"ব্রহ্ম প্রভৃতি কীট পর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেরদের ভূর্লোকাদি সত্যালোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাস স্থানের ও অমৃত যব ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাবদ্ ভোগ্য বস্তু সকলের ও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার ও কল্প মন্বন্তর যুগাদিরূপ কাল বিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।

"পিতৃকল্পাদি ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণবশতঃ বর্ত্তমান শ্বেত-বারাহ কল্প যাইতেছে। একৈক কল্পেতে চতুর্দশ চতুর্দশ মনু হয় তাহাতে শ্বেতবারাহ কল্পের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু যাইতেছেন। একৈক মনুতে দুই শত চৌরাশি যুগ হয়। তাহার মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুতে একশত বার যুগের যুগ এই কলিযুগ যাইতেছে। ইহার পরিমাণ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। ইহার মধ্যে সতের শত ছাব্বিশ শকাব্দা পর্য্যন্ত [১৮০৪ খ্রীঃ] গত চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে'রও গোড়াপত্তন এই 'দিগ্দর্শনে'র চতুর্থ ভাগে অর্থাৎ ১৮১৮ সনের জুলাই সংখ্যায়। উহাতে প্রকাশিত "পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ" প্রবন্ধটিকে বাংলা ভাষার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বলা চলে। ইহার শেষ অংশ এইরূপ :

"এই পৃথিবী অতিশয় বড় এক বস্তু তাহার নিকটে এমত বড় আর কোন বস্তু নাই অতএব পৃথিবী চতুর্দিকস্থ ছোট ছোট বস্তুকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। যখন পৃথিবী হইতে কোন বস্তু উঠান যায় তাহাকে আকর্ষণের বিপরীতে উঠাইতে হয় এই কারণ উঠাইতে ভারি বোধ হয়। সে বস্তু যদি অতি বৃহৎ হয় তবে পৃথিবীর আকর্ষণে অধিকত্ব প্রযুক্ত অধিক ভার বোধ হয়।"

ইহাই 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' পুস্তকের (২য় সং, ১৮১৯) প্রথম ভাগ "জ্যোতিষ বিবরণে"র "আকর্ষণ বিষয়" নামক প্রথম নিবন্ধে এই রূপ লইয়াছে :

"সকল বস্তুতে যে ভারি বোধ হয় সেও আকর্ষণের শক্তিদ্বারা যেহেতুক পৃথিবী সকল বস্তুকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে সে আকর্ষণের বিপরীতে কোন বস্তু উঠাইতে হইলে সুতরাং ভারি বোধ হয়।"

মনে রাখিতে হইবে, এই সকল রচনার ঠিক দুই বৎসর পরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-রচনার অন্যতম প্রবর্তক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দুই বৎসর দুই মাস পরে 'বোধোদয়'-রচয়িতা ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। রামমোহন তখন সবে মাত্র 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসারে'র অনুবাদ প্রকাশান্তে উপনিষৎ-অনুবাদে হাত দিয়াছেন। ইহা স্মরণে রাখিলে এই বাংলা ভাষার প্রসারে এই সকল বৈদেশিক সাধকের কৃতিত্ব যে কতখানি, তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব।

ইহার পরেই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই খণ্ডের উল্লেখ করিতে হয়। গ্রন্থের নামপত্রে যদিও গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৩১ সাল মুদ্রিত আছে, আসলে কিন্তু ইহা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৬ সনে ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়াছিল। আত্মগোপন-

প্রয়াসী মার্শম্যান ইহাতে নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর এইটিতেই আমরা তাঁহার নাম সর্বপ্রথম মুদ্রিত দেখিতে পাই। এই কারণে, কেন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত (মুদ্রণের পাঁচ বৎসর পরে) স্বনাম জাহির করিতে হইয়াছিল, সে ইতিহাস জানা দরকার। সেই ইতিহাস অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান স্বয়ং কারণটি কৌতুক-ইঙ্গিতে বলিয়াছেন ১৮৩০ সনের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' "বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক" নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে। বাংলা রচনা মাত্র বার বৎসরের অনুশীলনে তিনি মনোগত অভিপ্রায় যথাযথ প্রকাশোপযোগী ভাষায় শুধু নহে, বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতেও কিরূপ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন, এই নিবন্ধটিই তাহার প্রমাণ।

"বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক।—লিটিরেরি গেজেট নামক সম্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত সংখ্যক পত্রে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন—পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জমা করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।

"··· তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংলণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধগম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন অতএব তদ্বিষয়ক আমারদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।···

"···অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি। তাহাতে ইংলণ্ডীয় নাম ও ইংলণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলা ভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোনও ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না। অবিকল সংস্কৃতানুযায়ী ভাষায় ইংলণ্ডদেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।

"অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার নিম্নভাগে লিখিয়াছেন যেহেতুক মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তর্জমা হইয়াছে তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় রীতি ও কথার বিন্যাসাদিতে অবিকল মিল আছে এবং বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা অগ্রগণ্য। ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তরজমা হইয়া ঐ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে। অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে।"

উপরের উদ্ধৃতি হইতে তিনটি তথ্য প্রকাশ পাইতেছে—১. 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' জেমস মিলের ইতিহাসের অনুবাদ, ২. ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আখ্যাপত্রহীন হইয়া বাহির হইয়াছিল এবং ৩. ইহা শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত 'মিসিনরি' সাহেবেরই রচিত। বস্তুতঃ বইটির প্রথম "বালম" নামপত্রহীন ভাবে যে ১৮২৬ সনের গোড়াতেই বাহির হইয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ মিলিতেছে ১৪ জানুয়ারি (১৮২৬) তারিখের 'সমাচার দর্পণে'। "শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় বাহির হইয়াছে" পুস্তক-তালিকায় এই 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র নাম রহিয়াছে।

কাশীপ্রসাদ ঘোষের বিচারে এই বইয়ের ভাষা ১৮৩০ সন পর্যন্ত "বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে অগ্রগণ্য।" ইহা জন ক্লার্ক মার্শম্যানের রচিত, তাহা জানিলে কাশীপ্রসাদ হয়ত সতর্ক হইতে পারিতেন। মিশনরি বাংলার উপর তাঁহার জাতক্রোধ ছিল। ভবিষ্যতে কোনও সমালোচক এইরূপ ভ্রমে না পড়েন, ইহা ভাবিয়াই জন তাঁহার রচিত-অনূদিত যাবতীয় পুস্তকে অতঃপর নিজের নাম প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৩১ সনেই 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই বালমে (Volume) তাঁহার নাম সংযুক্ত হয়। ১৮৩২ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে সম্পূর্ণ গ্রন্থ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নামাঙ্কিত হইয়া বাজারে বাহির হয়।

এই বইয়ের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি :

"ঐ দুর্ভাগ্য নবাব [সিরাজ-উদ্দৌলা] যুদ্ধের পব [২৩ জুন ১৭৫৭] রাত্রিতে আপন রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে তথাতে আর কোন মিত্র নাই অতএব ভবিতব্য বিষয়ে ভাবিত হইয়া সমস্ত দিবস রাজগৃহে থাকিলেন। সেই রাত্রিতে মীরজাফর মুরশেদাবাদে উপস্থিত হইলে সিরাজদ্দৌলার উপায়ান্তর চেষ্টা করণের আবশ্যকতা হইল অতএব তিনি কদর্য্য পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া এক প্রিয়তমা সৈরিনীকে [স্বৈরিণীকে] ও এক খোজাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দশ দণ্ডের সময় রাজগৃহের এক ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া নীচে নামিলেন এবং সুবা বেহারে গিয়া লা সাহেবের সহিত মিলনাশাতে ও সেখানকার অধ্যক্ষের সহায়তা প্রাপণাশাতে নৌকাযোগে বেহারের অভিমুখে গমন করিলেন। নাবিকেরা সমস্ত রাত্রি

দাঁড়ক্ষেপ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে প্রাতঃকালে রাজমহলের নীচে নৌকা লাগাইল অতএব সিরাজদ্দৌলা অগত্যা উত্তীর্ণ হইয়া এক বাগানে আশ্রয় লইলেন। তিনি পূর্বে এক ব্যক্তি সামান্য লোকের অপমান করিয়াছিলেন তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্থানে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন তাহাতে সে ব্যক্তি পূর্ব্ব রাগ স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজমহলের অধ্যক্ষকে সমাচার দিল এবং ঐ অধ্যক্ষ অবিলম্বে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া মুরশেদাবাদে মীরজাফরের নিকট প্রেরণ করিল এবং মীরজাফর তাহাকে আপন পুত্রের জিম্মাতে রাখিলেন। ঐ অতিশয় নিদ্দয় ও কঠিনস্বভাবক পুত্র রাত্রিযোগে তাঁহাকে সংহার করিল।" ১ম বালম, পৃ. ১৩১-৩২

মাত্র দুই-চারিটি শব্দ অদলবদল ও কয়েকটি যতিচিহ্ন যোগ করিয়া এই রচনাটিকে স্বচ্ছন্দে আধুনিক বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। জন বাংলা ভাষা কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই ইতিহাসটিই তাহার প্রমাণ। জেমস মিলের ইতিহাস ১৮১৭ সনে বাহির হয়। জন কিন্তু তাঁহার ইতিহাসের জের ১৮২৩ পর্যন্ত টানিয়াছেন। তাই মনে হয়, ওই সনেই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা শেষ করেন। জেমস মিলের অনুসরণ করিতে গিয়াই তাঁহার মনে ইংরেজীতে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের মৌলিক ইতিহাস রচনার বাসনা জন্মে এবং তাহাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে ১৮৪০ সনে (?) তাঁহার বিখ্যাত বাংলার ইতিহাস ও ১৮৪২ সনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের প্রকাশে।

'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসে'র (১৮২৯) অনেক রচনা তৎকালপ্রচলিত বহু পাঠ্য-পুস্তক-সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট হইয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছিল, যেমন দ্বিতীয় ভাগের ১৯৯-২০৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৮৬ সংখ্যক ইতিহাস "সর জন পর্সল"। একটি ছোট্ট ইতিহাস (৬৮ সংখ্যক) ভাষার নমুনাস্বরূপ দাখিল করিতেছি :

"ক্ষুদ্র বালকের উত্তর।

অতিশয় চতুর এক ক্ষুদ্র বালক এক জন পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে কহিলেন যে ঈশ্বর কোথায় ইহা কহিতে পারিলে আমি তোমাকে একটা কমলা নেবু পারিতোষিক দিব। শিশু উত্তর করিল যে ঈশ্বর যে স্থানে নাই মহাশয় এমত স্থান আমাকে দর্শাইয়া দিলে আমি মহাশয়কে দুইটা কমলা নেবু দিব।"

১৮১৮ সনে লিখিত 'ঈশপ'স ফেব্‌লস' (মুদ্রণ ১৮৩৪) হইতে ১৫ সংখ্যক গল্পটি এই :—

"মানুষ ও তাহার রাজহংস।

এক ব্যক্তির এক রাজহংস ছিল, সেই রাজহংস প্রতিদিন এক স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিত কিন্তু ঐ ব্যক্তি লোভী হইয়া ঐ রাজহংসের উদরে যে ধন আছে ভাবিয়াছিল, তাহা এককালে পাইবার নিমিত্ত হংসকে হত্যা করিতে নিশ্চয় করিল। পরে তাহা করিয়া কিছু পাইল না। এবং তাহাতে যে স্বর্ণডিম্ব প্রতিদিন পাইত, তাহাও হারাইল।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কথামালা'র আটত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৮৫৬—১৮১৮) এই রচনা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রিয় শিষ্য জন যে বাংলা ভাষার বিবিধ রচনারীতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কৃতিত্বের অনুপাতে বাংলা সাহিত্যে জনের খ্যাতি না হওয়ার প্রধান কারণ, তাঁহার পরবর্তী পলিটিক্যাল জীবন এবং তাঁহার সমসাময়িক বাঙালী লেখক ও সম্পাদকমণ্ডলীর অভ্যুত্থান ও স্বদেশ ও স্বসাহিত্য সম্পর্কে সচেতনতা।

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বাংলা রচনার বিশেষ মুনশিয়ানা 'সমাচার দর্পণ' (১৮ জুন, ১৮২৫) হইতে নীচের উদ্ধৃতিটি পড়িলেই উপলব্ধি হইবে। গদ্য রচনার চরম উৎকর্ষ হিউমারের প্রয়োগে। এই ব্যঙ্গব্যঞ্জনার্থক রচনাতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত—

"ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম্ম আর নাই। পৃথিবীর মধ্যে নানা লোকেরা নানা বিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশীকরণে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহ বা বৃক্ষমূলে বসিয়া নূতন নূতন কাব্য পাঠ করিতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেহ বা আপন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রথম বাক্যেতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেহ বা সমুদ্রতীরে বসিয়া তরঙ্গ দেখিতে পরমাপ্যায়িত হন আরো কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরম তুষ্ট হন কিন্তু উহার কোন সুখ ডেকসিয়ানরি করার তুল্য সুখ নয়।

"কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার তুল্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্ম্মে নাই। ডেকসিয়ানরিকর্ত্তারা বিদ্যার মজুর, তাঁহারা মালমশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে। যদি আমারদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পোনর বৎসর পর্য্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্য পক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ডেকসিয়ানরি করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সম্ভ্রম। উত্তম কোষকর্ত্তারা সত্য অমর হন, যত কাল পর্য্যন্ত ভাষা থাকে তত কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।"

এই মন্তব্য যদিও রামকমল সেনের অভিধান প্রসঙ্গে, আসলে কিন্তু ইহা তাঁহার নিজের সুখ ও দুঃখের কথা। তিনি তখন উইলিয়ম কেরীর বৃহৎ অভিধান হইতে বাংলা-ইংরেজী এবং স্বয়ং ইংরেজী-বাংলা অভিধান সংকলন করিতেছিলেন।

বাংলা ভাষায় ভারত-শাসক কোম্পানীর আইনগুলি বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারিত ও গ্রাহ্য হইয়াছিল প্রধানতঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সহজ সরল অনুবাদের সাহায্যে। এগ্রিকালচার-হর্টিকালচারও বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া জনপ্রিয় হইয়াছিল। এগুলি সাহিত্যের আওতায় আসে না বলিয়া মার্শম্যানের আইন ও বিজ্ঞান বিষয়ের কীর্তি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। তবে এ কথা আজ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ১৮৪০ সনের পূর্বে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ও

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারাচাঁদ দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও উদয়চাঁদ আঢ্য প্রভৃতির সঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যানও বাংলাভাষাকে সর্ববিধ কাজের এবং শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে কম সাহায্য করেন নাই।

১৮৩৪ সনের ৪ঠা জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষার উপর জনের অসাধারণ দখলের প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতেছি। চিন্তাশীলতা ও যুক্তির সহিত ভাষার সামঞ্জস্য বিধানেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষায় মৌলিক চিন্তার সূত্রপাত করেন মৃত্যুঞ্জয় ১৮০২ সনে তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসনে', প্রসার ঘটান রামমোহন ১৮১৫ সনে তাঁহার 'বেদান্ত গ্রন্থে' এবং পূর্ণ পরিণতি ঘটে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৪৩ সনে। মাঝখানে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের চিন্তাপ্রসূত রচনা এই পরিণতিতে প্রভূত সাহায্য করে। দৃষ্টান্তটি এই :

"বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারা আর কোন অক্ষর ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন ফোর্টউলিয়ম কালেজ স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ পণ্ডিতদিগকে জ্ঞাত করা যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কর্ম্ম দেওয়া যাইবে না! অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহারা এ অক্ষরে স্ব স্ব লিপ্যাদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্ত্তে দেবনাগর চলিত করণার্থ এক মহোদ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল। অতএব আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্ত্তে দেবনাগর অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান্ সাহেবলোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইংলণ্ডীয়েরদের যত প্রজা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই।"—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯

আজ এক শত পঁচিশ বৎসর পরেও বাঙালী পণ্ডিতদের দেবনাগর-অক্ষর-বিমুখতা প্রসঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মন্তব্য সমান প্রযোজ্য।

উপসংহার

ডক্টর জর্জ স্মিথ ১৮৯৭ সনে চার্লস গ্রান্ট, হেনরি লরেন্স, জন লরেন্স, জেমস উটরাম, ডোনাল্ড ম্যাকলাউড, হেনরি মেরিয়ন ডুরাণ্ড, কলিন ম্যাকেঞ্জি, হারবার্ট বি. এডওয়ার্ডস,

জন ক্লার্ক মার্শম্যান, হেনরি সামনার মেন, হেনরি র‍্যামসে ও চার্লস ইউ. অ্যাটকিসন, এই বারো জন ভারতীয় 'স্টেট্‌সম্যানে'র যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে জন মার্শম্যান প্রসঙ্গে এই ভূমিকা করেন :

"He was in some respects the most remarkable of them all. For more than fifty years he lived in India; for nearly three quarters of the century he sacrificed himself for the good of its peoples. He was the colleague and successor of the Serampore brotherhood, Carey, Ward and Joshua Marshman, his father. He founded and long edited the first Bengali and English weekly journals in India. He worked incessantly for the education of the people in their mother-tongue and in English. He did more than any other single pioneer for Indian railways telegraphic communication with England and forestry....While guiding the Administration and the public of India alike by his experienced pen from the days of Lord Hastings to those of the present Earl of Northbrook, he wrote *The History of India* (1867) which is still the best and must remain the most anthoritative for the British Period."

অর্থাৎ "কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহাকেই এই দলের (বারো জনের) মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। অর্ধশতাব্দীরও ঊর্ধ্বকাল তিনি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন, শতাব্দীর তিন পাদ তিনি নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া ভারতবাসীদের কল্যাণে নিযুক্ত ছিলেন, শ্রীরামপুরের ভ্রাতৃসংঘ—কেরী, ওয়ার্ড ও পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের তিনি সহকর্মী ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। ভারতবর্ষে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ও একটি ইংরেজী সংবাদপত্র সাপ্তাহিক তিনি প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল সম্পাদন করেন; মাতৃভাষায় ও ইংরেজীতে বাংলাদেশের লোকের শিক্ষাবিধানের জন্য তিনি অবিরত পরিশ্রম করেন। ভারতীয় রেলপথ[৬], ইংলণ্ডের সহিত টেলিগ্রাফিক সংযোগ এবং ভারতীয় বনসম্পদের জন্য তিনি একা যাহা করিয়াছিলেন, কোনও একজন প্রথম পথপ্রদর্শকের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় নাই। ...তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত লেখার দ্বারা (লর্ড হেস্টিংসের আমল হইতে বর্তমান লর্ড নর্থব্রুকের আমল পর্যন্ত) শাসক ও শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের পথনির্দেশ করিতে করিতে তিনি যে 'দি হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' (১৮৬৭) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজও পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস এবং চিরকাল সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস হইয়া থাকিবে।" জর্জ স্মিথ ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল পরিচালনায় জনের কৃতিত্বের কথা এই তালিকায় উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন।

এমন যে একনিষ্ঠ ভারতবন্ধু, ভারতবর্ষের মাটি তাঁহার শেষ আশ্রয় হয় নাই, ইহাই তাঁহার জীবনের সর্বাধিক ট্র্যাজেডি। গোড়ায় মাসিক এবং পরে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১৮৩৫

৬ ১৮৬৮ সনের 'দি কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রেলওয়ে সম্বন্ধে তিনি যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (Article II of No. 249, Vol. CXXXV) লিখিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ভারতীয় রেলওয়ের বহু সংস্কার সাধিত হয়।

সনের ১লা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হইতে যখন জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে রূপান্তরিত হয়, তখন সেই ১লা জানুয়ারির প্রথম সংখ্যায় তিনি তাঁহার প্রস্তাবনায় লেখেন, "The welfare of India, the country of our adoption though not of our birth, is the grand aim of our labour." "যে দেশে আমরা ভূমিষ্ঠ হই নাই,কিন্তু স্বভূমিরূপে যে দেশকে গ্রহণ করিয়াছি, সেই ভারতবর্ষের কল্যাণই আমাদের এই প্রচেষ্টার মহত্তম লক্ষ্য।" কিন্তু ভারতবর্ষের এই আত্মনিবেদিত সন্তান তাঁহার প্রিয়তম আবাসভূমি শ্রীরামপুরে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাঁহার পূজ্যপাদ পিতা জোশুয়া মার্শম্যান, স্নেহময়ী মাতা হ্যানা, সহোদরা সুসানা, প্রিয়তমা সহধর্মিণী মার্গারেট নোরা (মৃত্যু ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৪৩), দুই শিশুকন্যা সুসানা লিডিয়া ও রোজামণ্ড নোরা এবং শিশুপুত্র আর্থার যে পুণ্য মৃত্তিকায় সমাধিস্থ হইয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন; যে মৃত্তিকায় তাঁহার ইহলোকের গুরু পিতৃবন্ধু উইলিয়ম কেরী, দীর্ঘকালের সহকর্মী খুল্লতাততুল্য উইলিয়ম ওয়ার্ড, জ্যেষ্ঠাগ্রজসম ফেলিক্স কেরী এবং পরবর্তী জীবনের নিত্য সহচর অনুজ জন ম্যাক নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন; যে মাটির উপর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট কলেজ এখনও সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছে; যেখানে আজিও তাঁহার সাধের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ('স্টেটসম্যান') প্রতিদিন প্রাতে আত্মপ্রকাশ করে; সেখানে সেই মাটিতে তাঁহার সমাধির জন্য স্থান হয় নাই। এখনও গভীর বিচ্ছেদব্যথায় ইংলণ্ডের মাটিতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নশ্বর দেহাবশেষ যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, যে কোনও সহৃদয় মানুষ কান পাতিয়া শুনিলে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইবেন। মহাকবি মধুসূদনের মত তিনি যদি আপন সমাধিস্তম্ভের জন্য কোনও ছন্দোবদ্ধ পরিচয় লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধিগাত্রে এই কল্পিত পংক্তি কয়েকটি উৎকীর্ণ দেখিতে পাইতাম :

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে—
(মাতৃহীন শিশু যথা লভয়ে বিরাম
বিমাতার কোলে) হেথা মহানিদ্রাবৃত
মার্শম্যান-কুলোদ্ভব কর্মযোগী জন।
বঙ্গের শ্রীরামপুরে জাহ্নবীর তীরে
কর্মভূমি, জন্মভূমিসম; জন্মদাতা
ধীমান্ জোশুয়া নামে, মাতা হ্যানা সতী।

সংশোধন—৯০ পৃষ্ঠায় ২য় সংখ্যক ফুটনোটে "Higginbootham" স্থলে "Higginbotham" হইবে। ১০৪ পৃষ্ঠার নীচের দিক হইতে ৪র্থ পংক্তিতে "১৮১৮ সন পর্যন্ত" স্থলে "১৮১৭ সন পর্যন্ত" পড়িতে হইবে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির পুরাতন 'ক্যাটালগে' বাংলা পুস্তক-তালিকায় 'আগ্রিকলচরাল ও হর্টিকলচরাল সোসাইটির নিষ্পত্তি কার্য্যের বিবরণ পুস্তক। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরামপুর, ১৮৩৬' নামক বইখানির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ মার্শম্যানের 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণে'র ইহাই আসল নাম।—লেখক।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

পঞ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবীকে একটি বিশেষরূপে বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাই বাঙলার মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে। এই মঙ্গল-কাব্যগুলি বাঙলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ; কারণ, আমাদের মধ্যযুগের অন্যান্য যে-সব জাতীয় সাহিত্য রহিয়াছে তাহা অল্প-বিস্তর ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু মঙ্গল-কাব্য একমাত্র বাঙলা সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এই বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলি সংস্কৃত-পুরাণ হইতে অনেকাংশে পৃথক হইলেও কতকগুলি সাদৃশ্যও স্পষ্ট লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্যগুলির মধ্যে একটা প্রধান সাদৃশ্য এই, আমরা দেখি, পুরাণগুলিতে বিশেষ বিশেষ কালে উদ্ভূত এবং স্বীকৃত এবং ক্ষুদ্রাঞ্চলে বৃহদঞ্চলে প্রচলিত খ্যাত, অল্পখ্যাত এবং অখ্যাত বহু দেবীগণকে নানা কাহিনী বা দার্শনিক ব্যাখ্যার সাহায্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধা এবং দার্শনিক-শক্তিতত্ত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা এক মহাদেবীর সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সব দেবীই যে এক আদিশক্তিরই দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষ অবলম্বনে বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র পুরাণকারগণের সকল কাহিনী ও তত্ত্বব্যাখ্যার ভিতর দিয়া এই সত্যটিরই প্রকাশ ঘটিয়াছে। সংস্কৃতভাষায় যে চেষ্টা দেখিলাম পুরাণগুলির মধ্যে বাঙলা-ভাষায় তাহারই একটি নূতন চেষ্টা দেখিতে পাই মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে।

ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় বৈদেশিক বিজয়ের পরে অতি স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের উচ্চকোটিতে প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে একটি প্রবল আঘাত লাগিয়াছিল। ইহার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার পূরণ দেখিতে পাইলাম আবার অন্যভাবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপরে আঘাতের সুযোগ লইয়া লৌকিক ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য মাথা নাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পাইল। ভাষা-সাহিত্য যখন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল তখন তাহার রচয়িতা শ্রোতা এবং সমজদার দেখা দিতে লাগিল সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্য হইতে। সেই সুযোগে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যে-সকল দেব-দেবী ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলেন, নিম্নস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া অবজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারাও আস্তে আস্তে উপরের স্তরে ভাসিয়া উঠিয়া যতটা সম্ভব বিস্তার লাভের সুযোগ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সব দেব-দেবীকে অবলম্বন করিয়া আঞ্চলিক সমাজে যে-সকল কিংবদন্তী ও লৌকিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও ভাষা-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। ত্রয়োদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে সকল দেবী আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইয়াছে দুই ভাবে; প্রথমতঃ উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি লাভ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ

ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়া। ইহা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই বিশেষ বিশেষ দেবীগণের নিজস্ব শক্তির মহিমা জ্ঞাপন করিয়া, আর উচ্চকোটি নিম্নকোটি সর্বকোটিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতা যে মহাদেবী তাঁহার সহিত এই দেবীগণের অভিন্নতা সম্পাদন করিয়া। এই দুই দিকের চেষ্টাই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি মঙ্গল-কাব্যগুলিতে। সেখানে বিবিধ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ দেবীর অবাধ অনুগ্রহ-নিগ্রহের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবমহিমা তো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেই, পরন্তু দেবী যে শেষ পর্যন্ত আদিশক্তি মহাদেবীরই বিশেষ মূর্তিমাত্র, অতএব আদিশক্তি মহাদেবীর সহিত একান্তভাবে অভিন্না, এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই।

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, কি করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের আদিদেবী সৃষ্টিতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে আদি-শক্তিরূপে মহাদেবী পার্বতী চণ্ডিকার সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। এই পার্বতী চণ্ডিকাই মঙ্গল-কাব্যের যুগে দেবীরূপে সর্বকোটিতে এবং সর্বঅঞ্চলে স্বীকৃতা ছিলেন; তাই তিনিই মহাদেবী—তাঁহার সহিত অন্য সব দেবীগণকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা। মনসা-মঙ্গলের 'মনসা' দেবী যে কোনও প্রাচীন বহুপ্রচারিতা পৌরাণিক দেবী নহেন এ-কথা আজ আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; সর্পদেবীরূপে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসিদ্ধা একজন লৌকিক দেবী। মনসা-মঙ্গলে তাঁহার কত মহিমাই কতভাবে প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই দেবী 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে'[১] দেখি, চাঁদ সদাগরের সপ্ত পুত্র জিয়াইয়া এবং চৌদ্দ ডিঙা উদ্ধার করিয়া চম্পক নগরীতে ফিরিয়া আসিয়া বেহুলা যখন চাঁদ সদাগরকে একবার মাত্র মনসাকে পূজা দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল তখনও চাঁদ সদাগর বলিয়াছিল—

ধনে জনে কার্য নাই যাউক আর বার।
পদ্মা না পূজিব আমি কহিলাম সার॥

বেগতিক দেখিয়া তখন হর-জায়া চণ্ডীর নিজেকে আকাশ হইতে চাঁদ সদাগরকে ডাকিয়া দৈববাণী করিতে হইল—

পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর।
একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর॥
... ...
যেই জান ভগবতী সেই বিষহরি।
পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি॥

এই দৈববাণী শুনিয়াই চাঁদ সদাগরের সর্বদেবীতে 'এক' বুদ্ধি আসিল এবং সদাগর মনসা পূজায় স্বীকৃত হইল। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমদিকে একটি বিরাট অংশ জুড়িয়া

---

১. প্যারীমোহন দাশগুপ্তের সংস্করণ।

পদ্মবনে শিব-দুহিতা মনসার প্রতি চণ্ডীর বিমাতাজনোচিত যে অশেষ দুর্ব্যবহারের বর্ণনা করিয়াছেন এবং স্বভাবকোপনা সর্পদেবী মনসার চণ্ডীকে দংশনের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত পরবর্তী এই 'ঐক্যে'র কোনও সংগতি নাই। কিন্তু এই ঐক্য কোন সংগতি-জাত নহে, আদিশক্তির একত্ব সম্বন্ধে একটি দৃঢ়সংস্কারজাত। এই কারণেই দেখিতে পাই চাঁদ সদাগর যখন মনসার পূজা অন্তে মনসার স্তুতি করিতেছে তখন বলিতেছে—

নমোনমঃ জগৎমাতা সর্বসিদ্ধিদায়িনী।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি মোক্ষ তুমি বিশ্বজননী॥
তুমি জল তুমি স্থল চরাচরবন্দিনী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারিণী॥

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলেও[২] দেখিতে পাই চাঁদ সদাগর মনসার স্তবে বলিতেছে—

আদ্যাশক্তি সনাতনী মুক্তিপদ প্রদায়িনী
জগতপূজিতা তুমি জয়া।
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন হর মহেশের মন
আর কে বুঝিবে তব মায়া॥

কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মনসার কেতকবনে শিববীর্যে জন্ম; শিব-কন্যার সম্বন্ধে 'হর মহেশের মন' বলা সংগত নহে। কিন্তু সেই শিব-দুহিতা পরিচয় কি শুধু চাঁদ সদাগব ভুলিয়াছে? দেবী নিজেও ভুলিয়াছেন। নিজের পরিচয় দিয়া তিনি চাঁদ সদাগরকে বলিতেছেন—

আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আমি
শক্তিরূপা সভাকার মাতা।
মহেশের মহেশ্বরী মনোরূপা সুকুমারী
লক্ষ্মীরূপা নারায়ণ যথা॥

শুধু মনসাই যে মূল শক্তিরূপা হইয়া মহেশ্বরী হইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, শীতলা, ষষ্ঠী, কমলা, বাশুলী প্রভৃতি বাঙলাদেশে প্রচলিত সকল দেবীই মূলে শক্তিরূপা—সুতরাং মঙ্গল-কাব্যে তাঁহারা সকলেও মহেশ্বরী। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'ষষ্ঠী-মঙ্গলে'[৩] দেখিত পাই, আসলে ষষ্ঠীও দুর্গা; দুর্গা ষষ্ঠীরই নামভেদ মাত্র।

দুর্গা নামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ॥

ঐ কবি রচিত 'শীতলা-মঙ্গলে'[৪] ও শীতলার 'চৌতিশা' স্তব দেখিতে পাইতেছি। সেই স্তবে দেখি—

২. শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
৩. ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ৪. —ঐ

দুর্গা দুর্গা পারা দক্ষমক্ষ হারা
দুর্গতি রাখহ দীনেরে।
... ...
মস্তকমালিনী মুকুটধারিণী
মহিষমুণ্ডনাশিনী।
... ...
বিধিবিষ্ণু মায়া বিধি-বিষ্ণুপ্রিয়া
বরণময়ই বিষ্ণুধাতা।
সংখিনী শূলিনী সংকর গৃহিণী
শৈলসুতা শিবদাতা ॥

কবি কৃষ্ণ-রাম রচিত 'কমলা-মঙ্গলে'র প্রারম্ভে দেখিতে পাই কমলা ব্যাঘ্রভয়-নিবারিণী দেবী। দক্ষিণা রায়কেই আমরা ব্যাঘ্রের দেবতা জানি; কমলা লক্ষ্মী রূপেই কি করিয়া ব্যাঘ্রভয়-নিবারিণী হইলেন বোঝা যায় না।[৫] কিন্তু বিপন্ন 'সাধু' কর্তৃক এই কমলার বর্ণনায়ও দেখি—

সদাগর বলে রাজা শুন এই হিত।
লক্ষ্মীর চরণ ভাব হইয়া এক চিত ॥
সকলের শক্তি তিনি জগতের মাতা।
সত্বরে কহিনু রাজা এই সত্য কথা ॥

রাজাও কমলার স্তব করিয়া বলিলেন—

জগত জননী তুমি সনাতনী একা।
সদয় হইয়ে নিজ রূপ দিয়া দেখা ॥

৫. এ-বিষয়ে কতকগুলি লক্ষণীয় তথ্যের উল্লেখ করিতেছি। পূর্ববঙ্গে দেখিয়াছি, চৈত্র-সংক্রান্তির কিছুদিন পূর্বে গ্রামের লোক (সাধারণতঃ নিম্নজাতির) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাত্রিতে ভিক্ষায় বাহির হয়। এই ভিক্ষাকে বলা হয় 'কুলাইর ভিখ'; 'ঠাকুর কুলাই ভো' বলিয়া প্রথমে ও শেষে ধ্বনি করা হয়। এই গানের প্রথম ছড়াটি হইল—'আইলাম লো স্মরণে। লক্ষ্মীদেবীর বরণে ॥ লক্ষ্মীদেবী দিবেন বর। ধানে চাউলে ভরুক ঘর ॥' ইত্যাদি। পৌষে ফসল ঘরে তুলিবার পরে ইহা শস্যদেবী লক্ষ্মীর গান সন্দেহ নাই। এই লক্ষ্মী-বন্দনার পরই দেখিতে পাইতাম 'বারো বাঘের লেখাপড়ি', অর্থাৎ বারো রকমের বাঘের উল্লেখ করিয়া ছড়ায় তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা। পৌষের শীতের সময়েই সর্বত্র বাঘের ভয় দেখিতাম, এই সময়েই বাঘ বন ছাড়িয়া শিকারলোভে লোকালয়ে ঢুকিয়া পড়িত। শস্যরূপিণী লক্ষ্মী বা কমলার সহিত এইভাবেই কি ব্যাঘ্রের সম্পর্ক দেখা দিয়াছে?

সকল তোমার মায়া আর কার নয়।
প্রতিজ্ঞায় হারিনু সাধুর হইল জয়॥
... ...
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর যারে নিত্য পূজা করে।
তাহারে করিতে স্তব কোনজন পারে॥

অন্যত্রও দেখি—

কৃপাময়ী জগতি বিষ্ণুর জায়া।
যত দেখি সকলি ঐ জননীর মায়া॥
... ...
পরম ঈশ্বরী ইনি জগতের মা॥
... ...
নীলায় (লীলায়) অসুরকুল বধিয়ে প্রবল।
তাহাতে কোথায় আছে মনুষ্য সকল॥

এই কমলা-দেবীর স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করাইয়া যখন দেবীর পূজা দেওয়া হইল তখন—

এক শত ছাগ বলি বাছিয়া ধবল।
রুধির খর্পর ভরি ভকতি করিল॥

সুতরাং লক্ষ্মী হইলেও তিনি চণ্ডী-চামুণ্ডার সহিত ঐক্যে রক্ত-লোলুপা।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে দেবীকে প্রধান করিয়া পাইতেছি চণ্ডী মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে। চণ্ডী-মঙ্গলগুলির মধ্যে আমরা যে দেবীর সাক্ষাৎলাভ করিতেছি তাঁহার সাধারণ নাম মঙ্গল-চণ্ডিকা। এই মঙ্গল-চণ্ডিকা যে মূলে পৌরাণিক চণ্ডিকার সহিত অভিন্না নন, ইনি যে বাঙলাদেশের একজন লৌকিক দেবী এ-কথা পূর্বে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন।[৬] মঙ্গল-চণ্ডিকার পৌরাণিক চণ্ডিকার সহিত অভিন্নতালাভের ইতিহাসই দেখিতে পাই আমরা এই চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলিতে। মূলে দেবীর নাম মঙ্গল চণ্ডিকা ছিল না বলিয়াই মনে হয়, মূলে তিনি সম্ভবতঃ ছিলেন মঙ্গলা, বা সর্বমঙ্গলা বা অষ্টমঙ্গলা; উপপুরাণগুলির মধ্যেই তিনি মঙ্গল-চণ্ডী হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য পৌরাণিক চণ্ডিকা দেবীও বহুস্থলে মঙ্গলময়ী বলিয়া কীর্তিতা; মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যেই তাঁহাকে আমরা 'সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে' ও 'শিবে' বলিয়া সম্বোধিত হইতে দেখি; মঙ্গলময়ী এই অর্থে তাঁহার 'শিবা' বর্ণনা বহুবার দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ অর্গলা-স্তোত্রের মধ্যেও দেবীকে 'মঙ্গলা' বলা হইয়াছে। দেবীর 'মঙ্গলা' বা 'শিবা' নাম বা বিশেষণ অন্যান্য পুরাণেও পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি মনে হয় মঙ্গলাদেবী একজন স্থানীয় লৌকিকদেবী। দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, যাহার অনেকাংশই অর্বাচীন) প্রভৃতিতে

---

৬. এ-প্রসঙ্গে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

মঙ্গল-চণ্ডিকাদেবীর নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এইসব অর্বাচীন পুরাণ-উপপুরাণকারগণ দেবীর 'মঙ্গলা' নামের এতখানি প্রসিদ্ধির কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না; দেবী যে মঙ্গলকারিণী বলিয়া 'মঙ্গলা' এই সাধারণ এবং সহজ ব্যাখ্যা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তাহার পরে দেবীকে মঙ্গলবার, মঙ্গলগ্রহ, মঙ্গল দৈত্য, মঙ্গল নৃপতি, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নরগণ—সর্ববিধ মঙ্গলের সঙ্গেই যুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এ-বিষয়ে ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ[৭] এবং দেবী-ভাগবতে ঠিক একই বর্ণনা দেখিতে পাই। বেশ বোঝা যায় 'মঙ্গলা' নাম দেখিয়াই যেখানে যাহা মঙ্গল নামযুক্ত তাহার সহিতই দেবীর যোগ দেখান হইয়াছে।

আসলে 'মঙ্গলা' দেবী হইলেন বাঙলা দেশের মেয়েদের ব্রতের দেবী। পৌরাণিক দেবীগণ ব্যতীত আমাদের দেশে মেয়েদের ব্রতের বহু দেবী ছিলেন এবং এখনও আছেন। জ্যোতিষে মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্যা, ভ্রামরী, ভদ্রিকা, উল্কা, সিদ্ধি ও সঙ্কটা এই অষ্ট দেবীকে অষ্টযোগিনী বলা হইয়াছে।[৮] ইহার মধ্যে ভ্রামরীর মহাদেবীত্ব তো চণ্ডী-সপ্তসতীতেই স্বীকৃত। মঙ্গলার ব্রত এবং সঙ্কটার ব্রত এখন পর্যন্ত হিন্দু-নারীদের মধ্যে প্রচলিত। প্রতি মঙ্গলবারে উপবাস করিয়া মঙ্গলার ব্রত করিতে হয়। সঙ্কটার ব্রতও মেয়েরা উপবাস করিয়াই এখনও করিয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখন পর্যন্তও এই সকল দেবীদের কোনও পূজার প্রচলন নাই—মেয়েদের ব্রতেই তাঁহারা আরাধ্যা। এই সকল দেবীদের যোগিনী বলিবার তাৎপর্য এই মনে হয়, শাস্ত্রকারগণ ইঁহাদিগকে রমণীগণের ব্রতে বা অন্যভাবে আরাধিতা হইতে দেখিয়াছেন, অথচ মূল মহাদেবী দুর্গা বা চণ্ডীর সহিত অভিন্নত্বের মর্যাদা তখনও দিতে প্রস্তুত হন নাই, তাই ইঁহাদিগকে যোগিনী-জাতিভুক্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এই মঙ্গলা বা সর্বমঙ্গলা দেবীকে যে ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে ও দেবী-ভাগবতে 'যোষিতামিষ্টদেবতা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন।[৯] এই বর্ণনার ভিতর দিয়াই আসল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গলের ভিতরে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র[১০] মধ্যে এবং দ্বিজ রামদেব বিরচিত 'অভয়ামঙ্গলে'র[১১] মধ্যে আমরা মঙ্গল-চণ্ডী কর্তৃক মঙ্গল-দৈত্য বধের কাহিনী দেখিতে পাই। কিছু কিছু পুরাণ-উপপুরাণের মধ্যেই মঙ্গল দৈত্যের উল্লেখ রহিয়াছে এ কথার

৭. ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৪ অধ্যায়; দেবী ভাগবত, ৯।৪৭ অধ্যায়; দেবী-পুরাণ, ৪৫ ও ৫০ অধ্যায়।

৮. মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকা তথা।
উল্কা সিদ্ধিঃ সঙ্কটা চ যোগিন্যোঽষ্টাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥—শব্দ-কল্পদ্রুমে ধৃত।

৯. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সং, ৩৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা।

১০. শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ১১. ডক্টর আশুতোষ দাস সম্পাদিত।

উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। পুরাণ-উপপুরাণের সেই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়াই পূর্ববঙ্গের এই কবিদ্বয় মঙ্গল-দৈত্য বধের কাহিনী গড়িয়া লইয়াছেন। দেবী কর্তৃক দৈত্য-বধের কাহিনী-রচনায় কোনও অসুবিধা নাই, কারণ দৈত্য হইলেই সে একবার স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবতাগণকে নির্যাতিত করিবেই; নির্যাতিত দেবগণ শেষ অবধি অগতির গতি সর্বশক্তিময়ী দেবীর শরণ গ্রহণ করিবেনই এবং দেবীর তো দৈত্য বধ করিয়া অসহায় দেবগণকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছেই, অতএব দেবগণের শরণমাত্র দেবী আসিয়া মঙ্গল-দৈত্যকেও বধ করিলেন। মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনী রচনায় দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেবের মধ্যে ঐকমত্য রহিয়াছে। মুকুন্দরামের মধ্যে এই কাহিনী নাই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পারি যে ওড়িয়্যার শাক্ত কবি সারলা দাস তাঁহার বিলঙ্কা-রামায়ণ এবং চণ্ডী-পুরাণ কাব্যে বহুভাবে সর্বমঙ্গলার উল্লেখ করিয়াছেন; সর্বমঙ্গলা রূপেই যেন দেবীর প্রধান পরিচয়। কিন্তু এই সর্বমঙ্গলা যে মূলে একজন উপদেবী ছিলেন তাহা এই চণ্ডী-পুরাণের একটি কাহিনীতেই স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। 'চণ্ডী-পুরাণে'র শেষে দেখিতে পাই যে মহিষাসুরকে যখন দেবী কিছুতেই বধ করিতে পারিতেছিলেন না, তখন দুর্গার সহচারিণী মনোরমা দুর্গা দেবীকে বিবসনা কালীরূপ ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই উপদেশে বিবসনা কালীরূপ ধারণ করিয়া দুর্গা মহিষাসুর নিধন করিতে সমর্থা হইয়া-ছিলেন। দুর্গাকে এই উপদেশ দান করার জন্য এই সহচারিণী দেব-মনুষ্য সকলের সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকারিণী বলিয়া গৃহীতা হইলেন এবং দুর্গা বলিলেন—

সমস্ত সুলভ হেব তোর পরসাদে।
সর্বমঙ্গলা নাম তোহর হেউ হাদে॥

বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আমরা দুইটি উপাখ্যান দেখিতে পাই। একটি কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, অপরটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। ইহার মধ্যে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করিলেই আমরা যোষিৎগণ-সেবিতা সর্বমঙ্গলা বা মঙ্গলা দেবীর স্বরূপের অনেকখানি সন্ধান পাইব।

চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সমসাময়িক দুইজন কবি দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরামই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মুকুন্দরাম মাণিক দত্তের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন; এই মাণিক দত্তের চণ্ডী-মঙ্গলের যে সংস্করণটি মুদ্রিত আছে তাহার প্রাচীনত্ব এবং প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিজ মাধবের চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানে দেখিতে পাই, সপত্নী লহনা কর্তৃক বনে ছাগল চরাইবার কাজে নিয়োজিত হইয়া ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া পত্নী খুল্লনা গহন বনে ছাগল চরাইতেছিল, একটি ছাগল দেবীর চক্রান্তে হারাইয়া গেল। ত্রাসযুক্ত হইয়া খুল্লনা বনে ছাগল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। দেবীর লীলাসহচরী ছিলেন পদ্মা। বাঙলার সব মঙ্গল-কাব্যের মধ্যেই প্রত্যেক দেবীর একটি লীলাসহচরী দেখিতে পাই; ইনি মূল দেবীর সম্পদে-বিপদে পরামর্শদাত্রী এবং পূজাপ্রচারের সহায়কারিণী। চণ্ডী-মঙ্গলগুলিতে চণ্ডীর সহচরী দেখিতে

পাই পদ্মা ; মনসা-মঙ্গলগুলিতে মনসার সহচরী দেখি নেতা ধোপানী ; কমলা-মঙ্গলে কমলার সহচরী নীলাবতী ; সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে 'নিত্যা'র সহচরী (বা ডাকিনী) বাসুলী ; ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের সহচর এবং বুদ্ধিদাতা হইলেন উলুক। যাহা হোক, দেবী-সহচরী পদ্মা বনমধ্যে গিয়া জয়ধ্বনি (হুলুধ্বনি ?) দিয়া দেবীর ঘট পাতিয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিল ; খুলনা শব্দ শুনিয়া তাহার ছাগল ঐ দিকে মনে করিয়া অগ্রসর হইল, দেখিল পঞ্চকন্যা (পদ্মা-সহ ?) সেই বনে বসিয়া দেবীর পূজা করিতেছে। পঞ্চকন্যার মুখপাত্র পদ্মা খুলনাকে ভরসা দিল, বনে বসিয়া দেবীর পূজা করিলে সে তাহার হারানো ছাগল খুঁজিয়া পাইবে। খুলনা তখনই নদীর জলে স্নান করিয়া শুচিশুদ্ধ হইয়া পদ্মা-কথিত বিধানে দেবীর পূজা-অর্চা করিয়া দেবীর বর লাভ করিল। বন-মধ্যে বসিয়া পঞ্চ-কন্যার কথিত-বিধানে যে দেবীর পূজা-অর্চা তাহা কোনও পৌরাণিক দেবীর আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চা নয়—ইহা মেয়েলি ব্রত বলিয়াই মনে হয়। বাড়িতে বসিয়াও খুলনা ঘট পাতিয়া গোপনে দেবীর পূজা করিয়াছিল, শিব-উপাসক ধনপতি সদাগর লাথি মারিয়া সেই মেয়েলি দেবতার ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল।[১২]

মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা যে মূলে মেয়েলি ব্রত মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে সে কথাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরাম-রচিত ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের মধ্যে দেখিতে পাই, উপাখ্যান আরম্ভের প্রথমেই একেবারে স্পষ্টোক্তি—

স্ত্রীলোকের পূজা নৈতে চণ্ডী কৈল মতি।
পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা যুকতি ॥[১৩]

স্ত্রীলোক কর্তৃক পূজা প্রচারের মানসে স্বর্গ-নর্তকী রত্নমালাকে তালভঙ্গ-দোষে শাপ দিয়া দেবী যখন মর্ত্যে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন তখন রত্নমালাও স্পষ্ট বলিল—

ক্ষমহ আমার দোষ হও মোরে পরিতোষ
কৃপাময়ি কর অবধান।
অবনী-মণ্ডলে যাব তোমার কিঙ্করী হব
করাইব ব্রতের বিধান ॥

বনে খুল্লনার (মুকুন্দরাম খুল্লনা নামই ব্যবহার করিয়াছেন) ছাগল হারাইবার উপাখ্যানে মুকুন্দরামের বর্ণনায় দেখি বনে ছাগল খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রান্ত হইয়া খুল্লনা

১২. লক্ষ্য করিতে হইবে চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকাও এমনই লুকাইয়া ঘটে মনসার পূজা করিয়াছিল, শিব-উপাসক চাঁদ সদাগর লাথি মারিয়া সেই ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে দেবীর রোষে ধনপতি সদাগরের যে দশা হইয়াছিল, চাঁদ সদাগরেরও সেই দশা হইয়াছিল।

১৩. বঙ্গবাসী সংস্করণ।

তরুতলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, দেবী স্বপ্নে খুল্লনাকে ছাগল ফিরিয়া পাইবার জন্য দেবীর ব্রত করিবার উপদেশ দিলেন। তখন—

এমন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী।
নিজ ব্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী॥
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিল অন্তরে॥

ব্রতকারিণী দেবকন্যাগণ খুল্লনার নিকটে আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছিল—

আমরা ইন্দ্রের সুতা এ পাঁচ ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর ব্রত আইলাম অবনী॥
... ...
পূজিবে অম্বিকা প্রতি মঙ্গলবাসরে।
বিপদ্-সাগরে চণ্ডী হইবে কাণ্ডারে॥
... ...
এই ব্রত কৈলে তোমার আসিবেন পতি।
পতির প্রেমেতে তুমি হবে পুত্রবতী॥
লহনা জানিবে তোরে প্রাণের সমান।
হারাণ ছাগল পাবে ইথে নাহি আন॥

দেবী স্বয়ং খুল্লনাকে বলিয়াছেন—

অষ্টতণ্ডুল দূর্বা নিত্য নিরমিয়া।
পূজিও মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া॥

এইখানেই 'মঙ্গলা' পূজার স্বরূপ প্রকাশ, অষ্টতণ্ডুল দূর্বা দিয়া মঙ্গলবারে মেয়েরা মিলিয়া হুলুধ্বনি সহকারে দেবীর ব্রত করে। এই অষ্টধান্যদূর্বার 'মঙ্গলা' দেবীই 'অষ্টমঙ্গলা'; অষ্টমঙ্গলার গান যাঁহারাই রচনা করিয়াছেন তাঁহারাই আটদিন ধরিয়া গাহিবার মত পালা রচনা করিয়াছেন। দিনে (দুই বেলায়) দুইটি করিয়া পালা, আট দিনে মোট ষোলটি পালায় সব গান বিভক্ত। দেবী এখানে ব্রতের বিধান নির্দেশ করিয়া বলিলেন—

আরে ঝিয়ে খুল্লনা মাঙ্গিয়া লহ বর।
যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর॥

দেখা যাইতেছে যে খুল্লনা বনে ছাগল চরাইতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের ব্রত করিতে দেখিয়া ব্রত শিখিয়া আসিল। ঘরে বসিয়া প্রতি মঙ্গলবারে সে গোপনে এই সর্বমঙ্গলার ব্রত করিত। স্বামী ধনপতি সদাগর বাড়ি ফিরিয়া আসিলে খুল্লনার বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তেজিত করিবার মানসে সপত্নী লহনা সাধুকে গোপনে গিয়া বলিয়াছিল—

সদাগর, তোমায় আমায় আছে কিছু বিরল কথা।
তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ডাইনি কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা॥

হেম ঝারি জলগর্ভা উপরে দীঘল দূর্বা
অষ্ট শালিতণ্ডুল অন্তরে।
মস্তকে চন্দন চুয়া, কুঙ্কুম কস্তূরী গুয়া
পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে॥
আমায় নৈবেদ্য দধি ফল পুষ্প নানাবিধি
অগুরু চন্দন ধূপ ধুনা।
দিয়া জয় শঙ্খ-ধ্বনি বধূ পূজে একাকিনী
বন্ধুজনে করে কাণাঘুণা॥

বাঙলা দেশের ত্রয়োদশ চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে এই সব সদাগর বণিক-সম্প্রদায়ই সমাজপতি ছিলেন। আর ইঁহারা ছিলেন শৈব। চাঁদ সদাগর যেমন শূলপাণিকে ছাড়িয়া 'লঘুজাতি কানি'—অর্থাৎ সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূতা এ মনসা দেবীকে কিছুতেই পূজা করিতে চাহেন নাই, ধনপতি সদাগরও তেমনই সিংহলের বন্দীশালায় বসিয়া বলিয়াছিলেন—

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥

এই সমাজপতি শৈব সদাগরের নিকটে স্বীকৃতি লাভ করিতে মেয়েলি ব্রতের দেবী সর্বমঙ্গলাকে পৌরাণিক হর-গৃহিণী পার্বতী চণ্ডিকার সহিত এক এবং অভিন্না হইয়া উঠিতে হইয়াছে। মেয়েলি 'মঙ্গলা' দেবী চণ্ডিকার সহিত অভিন্না হইয়াই নাম গ্রহণ করিলেন 'মঙ্গল-চণ্ডিকা'। তৎকালীন সমাজ-ধর্মের মধ্যে সেই মেয়েলি লৌকিক ধর্মের যে ক্রমপ্রাধান্য লাভ তাহারই লৌকিক ইতিহাস মঙ্গলকাব্যের এই কাহিনীর মধ্যে নিহিত।

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী হইল কালকেতু ব্যাধের কাহিনী। আমরা আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাকে দ্বিতীয় কাহিনী বলিতেছি; চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলিতে এই কাহিনীই প্রথম কাহিনী। কালকেতু-কাহিনীর মধ্যে আবার দেখিতেছি, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ শতকে বাঙলা দেশের অতি মিশ্র-প্রকৃতির হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যাধ-জাতীয় আদিম জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত দেবীগণও কি করিয়া সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়া উচ্চস্তরে স্বীকৃতা চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্না হইয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া চণ্ডীদেবীর মর্ত্যে পূজা প্রচারের ইতিহাস দেখি না, সে ইতিহাস তো সংস্কৃতে লিখিত পুরাণগুলির মধ্যেই দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে দেখিতেছি নীচ ব্যাধ জাতির মধ্যে প্রচলিতা দেবীর মর্ত্যে পূজা-প্রচারের ইতিহাস। এই ইতিহাস আসলে বাঙলা দেশের একটা সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। বাঙলার রাঢ় অঞ্চল আজিও বহু প্রকারের আদিম-অধিবাসি-অধ্যুষিত। এই আদিম অধিবাসিগণের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। সেই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া বাঙলার জাতীয় জীবনের ভিতরে তাহারা যেমন যেমন অবিচ্ছেদ্য অংশ বা উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইতে লাগিল তাহাদের দেব-দেবীগণও

তেমনই উচ্চকোটি হিন্দুগণের দেব-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। সেই স্বীকৃতি লাভের ভিতর দিয়াই আদিম-অধিবাসিগণের দেব-দেবীও পৌরাণিক দেব-দেবীগণের সঙ্গে নানাভাবে অভিন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যানে সেই সমাজবিবর্তন ও তদনুচারী ধর্মবিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। কালকেতু রাঢ় অঞ্চলের একটি পশু-হিংসক অতি নীচ জাতির লোক; পুরুষানুক্রমে তাহাদের পুরুষেরা গভীর বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া তীর-ধনুক-পরশু দ্বারা পশু শিকার করিত, আর মেয়েরা সেই পশুর মাংস, চামড়া, নখ-দন্ত প্রভৃতি বাজারে বিক্রী করিত। এই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই-জাতীয় একটি ব্যাধের চিরকাল দরিদ্র থাকিবারই কথা; কিন্তু কালকেতু তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম—তাহার অমিত দেহশক্তি তাহাকে প্রচুর ধনেব বর দান করিল। ধন সম্পত্তির মালিক হইয়া সে বন্য প্রদেশের মধ্যেই রীতিমত নগর পত্তন করিয়া বসিল। শিয়রেই ছিল সামন্তরাজ, 'শিয়রে কলিঙ্গরাজা বড়ই দুবার' (মুকুন্দরাম); তিনি প্রথমে ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না; কি করিয়াই বা বরদাস্ত করেন—

পশু বধি ভ্রমে বন অকস্মাৎ পাইয়া ধন
গুজরাট হৈল হেমময়। (দ্বিজ রামদেব)

লঘুর এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত নিতান্তই অসহ্য; তাই প্রতিপত্তিশালী উদীয়মান ব্যাধসর্দার কালকেতুকে শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত বুঝিতে পারিলেন, অর্থনৈতিক পরিবর্তনহেতু এই যে সমাজ-পরিবর্তন ইহাকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতেই হইবে; তাই কালকেতুকে নানাভাবে বিপর্যস্ত এবং লাঞ্ছিত করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে একটা বনিবনা করিয়া লইতেই হইল।

কালকেতু অর্থলাভ করিয়াই সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই; প্রথমে সে বন কাটিয়া পত্তন করিল যে নগরের বর্ণহিন্দুসমাজ সে নগরের অধিবাসী হইতে স্বীকার করে নাই। তখন তাই মণ্ডলের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাকে 'কানে দিব কনক-কুণ্ডল' এই লোভ দেখাইতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়—আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার লোভ—

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চায চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
নাহিক বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ি নানা বাবে যত কড়ি
নাহি নিব গুজরাট বাসে॥[১৪]

১৪. কালকেতু উপাখ্যান, মুকুন্দরাম, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।

এদিকে কলিঙ্গ রাজ্যেও আকস্মিক প্লাবনের সুযোগ পাওয়া গেল; সেই সুযোগে বন কাটিয়া বাঘ তাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে ব্যাধের নেতৃত্বেই গুজরাট নগরের পত্তন হইয়া গেল।

চণ্ডীমঙ্গল-বর্ণিত কালুকেতু-প্রতিষ্ঠিত এই গুজরাট নগর এবং 'শিয়রে'র কলিঙ্গ-নগর সম্বন্ধে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই; ইহার সহিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ গুজরাট দেশ বা কলিঙ্গ দেশের কোনও যোগ নাই; উভয় দেশই যে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের কয়েকটি বন্য অঞ্চলকেই সাহিত্যে মহিমান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য কবিগণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুজরাট, কলিঙ্গ প্রভৃতি গালভরা নাম দিয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম বার বার এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে কলিঙ্গরাজ কংস নদীর তীরে দেবীর 'দেহারা' তুলিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের কবি দ্বিজ রামদেব কংস নদীর ভৌগোলিক তাৎপর্য না বুঝিতে পারিয়া ইহাকে 'কংস সরোবর' করিয়াছেন। এই কংস নদীর তীরেই কলিঙ্গরাজ মহাসমারোহে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। সুতরাং কলিঙ্গরাজ্য কংস নদীর অঞ্চলভূমি বলিয়া মনে হয়। আবার দেখি এই কংস নদীর তীরেই দেবী পশুগণের নিকটে দর্শন দিয়া পশুগণের (বন্য অধিবাসিগণের ?) পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম বলিয়াছেন 'বিজুবনে' পশুগণ দেবীর পূজা দিয়াছিল; এই বিজুবনও কংস নদীর তীরে। কালুকেতু যে গুজরাট নগর পত্তন করিলেন তাহা কলিঙ্গরাজ্য হইতে অতিশয় দূরবর্তী নহে; কারণ 'শিয়রে কলিঙ্গরাজ'। গুজরাট রাঢ়েরই একটি বন, 'বসাহ রাজ্য গুজরাট বন' (মুকুন্দরাম)। এই গুজরাটের বনের 'বড় বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাঙ্গিয়া' (মাধব) নূতন নূতন ঘর 'তোলাইয়া' যখন নগর পত্তন হইল তখন 'ইদিলপুর হোতে আইল প্রজা ষোল শয়ে' (মাধব); কালকেতু 'চণ্ডীপুরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন খানা গড় করিল চারিভিতে' (মাধব)। চণ্ডী-মঙ্গলের কবিগণের বর্ণনা পড়িলেই বেশ বোঝা যায় গুজরাট হইতে কলিঙ্গদেশ বেশি দূরবর্তী নহে। আমরা দেখিতে পাই, ভাঁড়ু দত্ত যেদিন কালকেতুর দরবারে অপমানিত হইল তাহার পরের দিনই—

মিথ্যাবাক্যে রমণীরে করিয়া প্রতীত।
বাড়ীর গোধার জলে ডুব দিলেক ত্বরিত॥
দেয়ানেতে যায়ে ভাঁড়ু মনে নাঞি হেলা।
চুরি করি লইলেক ফুল কাঁচাকলা॥
ভেট সজ্জা লয়ে ভাঁড়ু করি পরিপাটি।
বাড়ীর বার্ত্তা শাক তুলি বান্দিলেক আঁটি॥
বীরের খাসি লইয়া ভাঁড়ু দেয়ানেতে যায়ে।
তারকপুর সিঙ্গাপুর ত্বরায়ে এড়ায়ে॥
বিনোদপুর এড়াইয়া যায় চণ্ডীর হাট।
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট॥

ভেট সজ্জা থুইয়া ভাঁড়ু যায়ে একু ভাগে।
দণ্ড প্রণাম কৈল ভূপতির আগে॥ (দ্বিজ মাধব)

সকালবেলা পুকুর-জলে ডুবটি দিয়া কাঁচকলা-শাক প্রভৃতির ভেট লইয়া কালকেতুর দরবারে যাই বলিয়া ভাঁড়ু দত্ত একেবারে কলিঙ্গরাজার দরবারে গিয়া উপস্থিত হইল; এই কলিঙ্গরাজ্যেরও দূরবর্তী কোনও বিরাট রাজ্য হইবার কথা নহে; আর কাঁচকলা বাথুয়া শাকের ভেট লইয়াই যে রাজার দরবারে একেবারে সোজা গিয়া ওঠা যায় সে রাজারও পরিচয় মোটামুটি আঁচ করা কষ্টকর নয়। মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই—

দক্ষিণে বিজয়ীপুর বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সওয়াকোশ বাট॥
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত॥

ভাঁড়ু দত্ত যখন কলিঙ্গরাজকে গিয়া কালকেতুর খবর সব পৌঁছাইয়াছিল তখন সে বলিয়াছে—

দিন গোঁয়াও মিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোর খণ্ড না কর বিচার॥
কাননে বধিয়া পশু উপায় করিত বসু
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে।
কোটাল ভ্রমিয়া দেশ দেখুক বীরের বেশ
কালকেতু রাজা গুজরাটে॥ (মুকুন্দরাম)

ইহা পড়িলে মনে হয়, কালকেতু কলিঙ্গরাজেরই প্রজা; কলিঙ্গরাজেরই অধিকারভুক্ত বনে সে নীচ ব্যাধজাতিভুক্ত ছিল। সেই বন-প্রদেশে 'রাতারাতি বড়লোক' হইয়া সে যে কখন নিজেই আবার রীতিমত ভূম্যধিকারী হইয়া বসিয়াছে কলিঙ্গরাজ তাহা কিছুই টের পান নাই। সহসা টের পাইবার কথাও নহে—সমস্ত অঞ্চলটিই একটি বিরাট বন্য অঞ্চল, তাহার মধ্যে কে কখন বিত্তশালী এবং শক্তিশালী হইয়া কোন্ বনে বড় বড় গাছ কাটিয়া বাঘ মারিয়া নগর-পত্তন করে কেহ আসিয়া সংবাদ না দিলে কে তাহার সন্ধান রাখে?

আসলে বেশ বোঝা যাইতেছে, কলিঙ্গ গুজরাট সব দেশই হইল রাঢ়ভূমির কংস নদীর (বর্তমান কাঁসাই নদী) তীরবর্তী একটি প্রকাণ্ড বনাঞ্চল। এই বিরাট বনভূমিতে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আদিম জাতির ভিতরকার বীরগণ প্রবল হইয়া উঠিয়া বন কাটিয়া নগর-পত্তন করিয়াছেন, ইহাই এই অঞ্চলের সাধারণ ইতিহাস। এই নগর-পত্তন ব্যাপারে বর্ণহিন্দু-গণের প্রতিনিধিস্থানীয় সামন্তরাজগণ এবং আদিবাসিগণের প্রতিনিধিস্থানীয় বীরগণের মধ্যে সংঘর্ষ বহুবার দেখা দিয়াছে; সেই সংঘর্ষ ও মিলনের ভিতর দিয়াই ঐ অঞ্চলের মিশ্র সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র-জীবন ও ধর্ম-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিঙ্গরাজ যে তৎকালীন

বর্ণহিন্দুর প্রতিনিধিস্থানীয় একজন ক্ষুদ্র সামন্তরাজ তাহার পরিচয় তাঁহার রাজ-সভার বর্ণনার ভিতরেই আছে। কালকেতুকে ধরিয়া আনিতে কলিঙ্গরাজ লোক-লস্কর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; 'দিবা অবশেষে কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গ।' তখন—

বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল।
রাজার দক্ষিণে বৈসে বিজয় ঘোষাল॥
বামদিকে মহাপাত্র নরসিংহ দাস।
সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস॥
রাজার সভাতে বৈসে সুপণ্ডিত ঘটা।
পরিধান পীত-বাস ভাল-জুড়ি ফোঁটা॥ (মুকুন্দরাম)

ইহার ভিতর কোটাল বন্দী কালকেতুকে উপস্থিত করিলে কলিঙ্গরাজ বলিয়াছিলেন—

ছুত্যে না যুয়ায় বেটা অতি নীচ জাতি।
সভামাঝে বসিয়া কথার দেখ ভাতি॥
কোন্ সাধুজনে বধি নিলি বেটা ধন।
মোরে না কহিয়া বেটা কাটাইলি বন॥ (মুকুন্দরাম)

ভাঁড়ু দত্তও আসিয়া কলিঙ্গরাজের নিকটে যখন কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়াছিল তখনও কলিঙ্গরাজের জাত্যভিমান উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা দেখি—

নিবেদহুঁ নরনাথ কর অবধান।
রাজ্যেত বণিক হইল ব্যাধ বলবান॥
গোপতে সৃজিল পুরী গুজরাট নগরে।
ব্যধ-নন্দন হইয়া ছত্র ধরে শিরে॥ (মাধব)

এই বর্ণহিন্দু কলিঙ্গ ভূপতি-প্রতিষ্ঠিত বা পূজিত এক দেবীর কংসাই-অঞ্চলে প্রসিদ্ধি ছিল, এবং কংস নদীর তীরে দেবীর একটি প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল বলিয়া মনে করি। বর্ণহিন্দু-পূজিতা বলিয়া দেবী পৌরাণিক চণ্ডিকা বলিয়াই প্রসিদ্ধা ছিলেন। কালকেতু যে বন্য ব্যাধ জাতির প্রতিনিধি তাহাদের মধ্যেও তাহাদের নিজেদের এক দেবী ছিলেন; কালকেতুর সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি লাভের সঙ্গে এই দেবীও স্বাভাবিক ভাবেই কতকটা প্রচার লাভ করিলেন। কালকেতুর গুজরাট-নগরে যে সকল বর্ণহিন্দু বসতি স্থাপিত করিল তাহাদিগকে এই বন্যব্যাধ-পূজিতা বা বনের অধিবাসী 'পশু'গণ কর্তৃক পূজিতা দেবীকেই দেবী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল। পশুগণ-পূজিতা এবং কালকেতুর বরদাত্রী এই দেবী কে? সবগুলি চণ্ডী-মঙ্গলেই দেখিতে পাই, এই দেবী স্বর্ণ-গোধিকা রূপ ধারণ করিয়া বনে ব্যাধ কালকেতুর নিকটে ধরা দিয়াছিলেন। ব্যাধ কালকেতু মৃগয়ার শিকার রূপেই স্বর্ণ-গোধিকাকে গৃহে লইয়া আসিল; কালকেতুর অসাক্ষাতে কালকেতুর গৃহেই স্বর্ণ-গোধিকা অপরূপ দেবীমূর্তি ধারণ করিলেন। মোটামুটি তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, এই দেবীর যোগ গোধিকার সহিত। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। পুরাণগুলির মধ্যে অত্যন্ত অর্বাচীন

পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে গোধিকারূপে দেবীর কালকেতু ব্যাধকে ছলনা করিবার উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্লোকে ধনপতি সদাগর কর্তৃক কমলে কামিনী দর্শনের উপাখ্যানেরও আভাস পাই।[১৫] কিন্তু এই শ্লোক হইতে যে বাঙলা কাব্যে কালকেতু ব্যাধ বা ধনপতি সদাগরের কাহিনীর উদ্ভব নয়, বরং বাঙলা কাব্যের গল্পাংশ হইতেই শ্লোকটির উৎপত্তির সম্ভাবনা এ-বিষয়ে আজ আর কোনও মতদ্বৈধ নাই। পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেবীর সহিত গোধিকার সম্পর্কের কথা অন্যভাবে দেখিতে পাওয়া যায় কালিকা-পুরাণে ও বিশ্বসার-তন্ত্রে। "কালিকা-পুরাণে চণ্ডিকার প্রীতির জন্য গোধা বলিদান করার উপদেশ পাওয়া যায়। বিশ্বসার-তন্ত্রের পঞ্চম পটলেও বলা হইয়াছে যে, গোধা-মাংসে গুহ্যকালী তুষ্টা হন।"[১৬] উক্তিগুলি কিঞ্চিৎ বিরোধী হইলেও ইহার ভিতর দিয়া মোটামুটি ভাবে দেবীর সহিত গোধার একটা যোগ দেখিতে পাইতেছি। এই গোধার সহিত দেবীর যোগের স্পষ্ট প্রমাণ মিলিতেছে বাঙলা দেশে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রস্তরমূর্তির মধ্যে। সাধারণতঃ এই মূর্তিগুলির নিম্নদেশে একটি গোধামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কাছাকাছির বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। মালদহে প্রাপ্ত এই জাতীয় একটি মূর্তি প্রাচীনতর বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। প্রস্তরমূর্তির মধ্যে যেমন এই গোধা-সমন্বিত দেবীর সাক্ষাৎ পাই, তেমনই সংস্কৃতে লিখিত কিছু কিছু প্রতিমা-নির্মাণ গ্রন্থে এই গোধা-সমন্বিত দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন মূর্তি-শিল্পেও গোধা-বাহনা গৌরীমূর্তি পাওয়া যায়। সেই দেবীর ধ্যান এইরূপ—"গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতুর্ভুজাং বরদ-মুষল-যুত-দক্ষিণকরাং অক্ষমালাকুবলয়ালঙ্কৃত-বামহস্তাম্।"[১৭]

গোপীনাথ রাও তাঁহার *Elements of Hindu Iconography* গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রাচীন মূর্তিশিল্প-সম্বন্ধে গ্রন্থ 'রূপ-মণ্ডন' হইতে যে 'প্রতিমা-লক্ষণ' উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়[১৮]—

গোধাসনা ভবেদ্গৌরী লীলয়া হংসবাহনা।

প্রতিমা-লক্ষণে আরও দেখা যায়,—

অক্ষসূত্রং তথা পদ্মম্ অভয়ং চ বরং তথা।
গোধাসনাশ্রিতা মূর্তি গৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে সদা॥

---

১৫. ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ স্বসূনোঃ
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী (?)॥

১৬. 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, পৃ. ২৷৵০।

১৭. B. C. Bhattacharya, *Jaina Iconography*, পৃ. ১৭২: শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য কর্তৃক পূর্বোক্ত ভূমিকায় উদ্ধৃত।

১৮. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৩৫২।

এই গোধাসনা বা গোধা-বাহনা অথবা অন্যভাবে গোধা-যুক্তা দেবীর প্রসঙ্গে শ্রীযুত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। "মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি আদিম জাতি এখনও গোধাকে কুলকেতুরূপে (totem) পূজা করিয়া থাকে।"[১৯] এইখানেই সব জিনিসটির মূল সত্যের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া মনে করি। যে সকল আদিম জাতিগণের মধ্যে গোধা ছিল কুলকেতু তাহাদের মধ্যে প্রচলিত দেবীই ক্রমে ক্রমে নানা ভাবে গোধাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পরে আর্য-অনার্য সব দেবীই যখন এক দেবী হইয়া উঠিতে লাগিলেন তখন গোধা-কুলকেতু-জাতিগুলির দেবীই গোধাসনা গৌরীরূপে সংস্কৃত প্রতিমা-লক্ষণে স্থান পাইলেন।

ব্যাধ কালকেতু এই গোধা-কুলকেতু জাতি-ভুক্ত বলিয়া মনে করি। যিনি এই জাতির মধ্যে আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই গোধাশ্রিতা; সেই গোধাশ্রিতা দেবীই কবি-কল্পনায় রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বনমধ্যে স্বর্ণ-গোধিকা মূর্তিতে। কালকেতু বনমধ্যে আকস্মিক ভাবে ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পারে, সে তাহার কায়িক পরিশ্রমেও অপ্রত্যাশিত ধনৈশ্বর্য লাভ করিয়া থাকিতে পারে। যে রূপেই হোক, অপ্রত্যাশিত ধনৈশ্বর্য-প্রতিপত্তি লাভ ঘটিলে তাহা যে কোনও দেবীর অনুগ্রহেই ঘটিয়াছে, এই বিশ্বাস আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমান কালেও প্রচুর ভাবেই দেখিতে পাই। সে-সব ক্ষেত্রে নূতন করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও দেবীর প্রতিষ্ঠা ও অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে তাঁহার পূজা-প্রচারের ইতিহাস বর্তমান কালেও দেখিতে পাইতেছি। কালকেতুর ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

এদিকে শিয়রেই রহিয়াছেন কলিঙ্গরাজ-প্রতিষ্ঠিত কংসনদীর তীরবর্তী 'দেহরা'য় বর্ণহিন্দুগণ-স্বীকৃতা এবং পূজিতা চণ্ডিকাদেবী; কলিঙ্গরাজ প্রতিষ্ঠিত সেই প্রসিদ্ধা দেবী এবং নীচ ব্যাধকুলজাত গোধা-কুলকেতু-সমন্বিত কালকেতুর আরাধ্যা গোধাশ্রিতা দেবী যে একই দেবী, সমাজে সেই যুগে এই সত্যটি বিশেষ ভাবে প্রচারিত এবং স্বীকৃত হইবার প্রয়োজন ছিল। সেই স্বীকৃতির ইতিহাসই দেখি চণ্ডী-মঙ্গলের কালকেতু-উপাখ্যানে। সমাজ-জীবনে কালকেতু ব্যাধ অর্থবলে ও প্রতিপত্তিতে এমন ভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিল যে তখন তাহাকে স্বীকৃতি দিয়া বিরাট সমাজ-দেহের মধ্যে তাহার স্থান করিয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না; তাহাকে যখন সমাজ-দেহের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল তখন তৎপূজিতা দেবীকেও সমাজে প্রচলিত মহাদেবীর সহিত অভিন্না বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল। গোধা-কুলকেতুর আদিম-জাতিগণ কর্তৃক পূজিতা গোধাশ্রিতা দেবী এইভাবে রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চলের সমাজে ও ধর্মে এক সময়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রচার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহবাহনা দেবীর সর্ব অঞ্চলে এবং সর্ব সমাজে এত প্রসিদ্ধি ছিল যে এই গোধা-উপাদান দেবীর ক্ষেত্রে আর তেমন কোনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। তাই দেখি, চণ্ডী-মঙ্গলে দেবীর বনমধ্যে এই গোধিকা-রূপধারণের এবং কালকেতুর গৃহে আসিয়া

১৯ প্রাগুক্ত ভূমিকা।

আবার অপরূপ দেবীমূর্তি ধারণ করিবার কাহিনীটুকু মাত্রই দেখিতে পাইতেছি; আর বনের পশুগণের সহিতও দেবীর একটা উল্লেখযোগ্য যোগ দেখিতেছি; অন্যত্র দেবী আমাদের সেই প্রসিদ্ধা হরজায়া পার্বতী-চণ্ডিকা। পরবর্তী কালে আমাদের সাহিত্যে এবং শিল্পে এই গোধা-সংশ্লিষ্টা দেবীর আর কোনও উল্লেখ দেখিতে না পাইলেও বাঙলা কবিওয়ালাগণের গানে দেবীর এই ব্যাধসুত কালকেতুকে অনুগ্রহ করিবার কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাই—যেমন দেখিতে পাই শ্রীমন্ত সদাগরকে মশানে দেখা দিয়া অনুগ্রহ করিবার কাহিনী।[২০]

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগুলির ভিতরে ধনপতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে দেবীর আর একটি রূপের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হইল দেবীর 'কমলে কামিনী' রূপ। ধনপতি সদাগর এবং তৎপুত্র শ্রীমন্ত সদাগর এই উভয়েই সিংহল গমনের পথে সমুদ্রমধ্যে 'কালীদহে' দেবীর এই 'কমলে কামিনী' মূর্তি দর্শন করিয়াছে। সঙ্গের নাবিকগণ কেহই এই 'কমলে কামিনী' দেখিতে পায় নাই, সিংহলের রাজা আসিয়াও প্রথমে দেখিতে পায় নাই। দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় দেখি—

কমলেতে কমলিনী বসি রামা একাকিনী
গজরাজ ধরে বাম করে।
ক্ষনেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে॥

মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখি—

অপরূপ দেখ আর ওহে ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার॥

দ্বিজ রামদেব বর্ণনাকে আরও একটু বিস্তারিত করিয়াছেন—

---

২০. কালু বীরকে ধন দিয়ে তুমি,
আবার গিয়েছিলে তার ঘরে।—লালু-নন্দলাল। প্রাচীন কবিওয়ালার গীত
ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে
কালকেতু তোমায়।—নীলমণি পাটুনী। ঐ
তব গুণে সাধনসিদ্ধি, সত্য জানা গেল;
জানি তব গুণে তরে গেল,
কালকেতু ব্যাধের ছেলে॥—কানাই। ঐ
একবার মুখে দুর্গা ব'লে কালকেতু তোর চরণ পেলে।—রসিকচন্দ্র রায়,
শাক্ত-পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কমল কোরকদলে কামিনী বসিয়া হেলে
গজরাজে সংহারে পদ্মিনী।
কি যে দেখি অপরূপ বিদরে আমার বুক
যেন দেখি হিমালয়-নন্দিনী ॥
কমলে কমলমুখী কমল যুগল আঁখি
কমলিনী কমলতরঙ্গে।
পাকাইয়া করিবরে গর্জে রামা হুহুঙ্কারে
পেখি মন পড়ে মন ভঙ্গে ॥
খেনে করিরাজ ধরি খেনে পাছারিয়া মারি
খেনে খেনে গগনে উতারি।
ও কী বিস্তারিয়া অতি ও কী ধরে মুখ পাতি
ও কী কি কমলে-কুমারী ॥

এই 'কমলে কামিনী'র উপাখ্যান পরবর্তীকালে বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাকে অবলম্বন করিয়া যাত্রা-পাঁচালী গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'এই যে ছিল কোথা গেল কমল-দলবাসিনী' গানটি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও গ্রাম্য গায়কগণের মুখে খুব শোনা যাইত। মধুসূদন 'কমলে কামিনী' লইয়া সনেট লিখিয়াছেন। পরবর্তী কালের অনেক কবিও এই কাহিনীর কাব্যময় ব্যাখ্যা দিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন।

চণ্ডী-মঙ্গল-বর্ণিত এই কমলে কামিনী উপাখ্যান গজ-লক্ষ্মীর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষ্মীর মূর্তি অতি প্রাচীন; কিন্তু পূর্ব ভারতে ইহার কোনও যুগেই তেমন কোনও প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই না; ইহার প্রসিদ্ধি দক্ষিণ ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে। বাণিজ্যসূত্রে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে গিয়া বাঙালীগণ এই গজ লক্ষ্মীর সহিত পরিচিত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারই কাব্যময় রূপ চণ্ডী-মঙ্গলের এই 'কমলে কামিনী।'

দক্ষিণ ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে গজ-লক্ষ্মীর যে-মূর্তি খুব প্রচলিত তাহা হইল এই—সমুদ্রের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পদ্ম ফুটিয়াছে, তাহার উপরে দণ্ডায়মান এই লক্ষ্মীদেবী; দুই পাশ হইতে দুইটি হস্তী দুইটি হেমকুম্ভ শুঁড়ে জড়াইয়া দেবীর মস্তকে সলিল-সিঞ্চন করিতেছে। কোথাও শুধু শুঁড়ের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সলিল সিঞ্চন করিতেছে। এই গজ-লক্ষ্মীর মূল পরিকল্পনাটিও পৌরাণিক কবি-কল্পনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। বৈদিক খিলসূক্ত শ্রী-সূক্তের[২১] ভিতরেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি শ্রী-দেবী (বা লক্ষ্মী দেবী) নানা ভাবে পদ্মের সহিত সংশ্লিষ্টা। পুরাণগুলিতেও আমরা শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর সহিত পদ্মের এই সংস্রব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। এই শ্রী বা লক্ষ্মী সৃষ্টিরূপিণী;

২১. ঋগ্‌বেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিলসূক্তস্থ পঞ্চদশটি মন্ত্র।

সর্বদেশেই পদ্ম সৃজনী-শক্তির প্রতীক রূপে গৃহীত। এই জন্যই বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মার অবস্থানের কল্পনা। এই জন্যে লক্ষ্মী বৈদিক বর্ণনা হইতেই পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া, কমলা, কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সলিলোদ্ভূত; সেই জন্যই কি লক্ষ্মীর সমুদ্রোদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে? আমরা বৈদিক শ্রী-সূক্তেই লক্ষ্য করিতে পারি, লক্ষ্মী পদ্মা, পদ্মবর্ণা পদ্মোত্থিতা, আবার 'আর্দ্রা'। বিষ্ণু-পুরাণে সমুদ্র মন্থনের ফলে এই শ্রী-দেবীর আবির্ভাবের বর্ণনায় দেখি—

ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা।
শ্রীর্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা॥
... ...
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে।
দিগ্‌গজা হেমপাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্।
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্॥[২২]

'তখন বিকশিত কমলে স্থিতা পদ্মমালাধারিণী স্ফুরৎকান্তিমতী শ্রীদেবী সেই জল (সমুদ্রবারি) হইতে উত্থিতা হইলেন।...তখন গঙ্গাদি নদীসমূহ বিবিধ জলের দ্বারা দেবীর স্নানের জন্য উপস্থিত হইলেন। দিগ্‌গজগণও হেমপাত্রস্থ বিমল জল লইয়া সেই সর্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্নান করাইয়াছিল।'

আমাদের মনে হয়, এই জাতীয় কবিত্বময় বর্ণনা হইতেই গজ-লক্ষ্মীর পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজলক্ষ্মী পরিকল্পনার বিস্তারেই দেখিতে পাই, কমলস্থিতা দেবী দুই হাতে করী লুফিয়া খেলিতেছেন; একবার তাহাকে গ্রাস করিতেছেন, আবার তাহাকে মুখ হইতে উদ্‌গীর্ণ করিয়া দিতেছেন (গ্রসতী বমন্তী)। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি শ্রী-সূক্তে দেবীকে 'পুষ্করিণীং' বলা হইয়াছে।[২৩] 'পুষ্কর' শব্দ গজশুণ্ডাগ্রবাচক। আর একটি পৌরাণিক তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পুরাণে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিষ্ণু-মায়ার প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে, এই দেবী সদেবাসুর-মানুষ সর্ব জগৎকে গ্রাস করেন, আবার সৃজন করেন। কূর্ম-পুরাণে দেখি—

অনয়ৈব জগৎ সর্বং সদেবাসুর মানুষম্।
মোহয়ামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা গ্রসামি বিসৃজামি চ॥[২৪]

ইহাই কি দেবীর গজ-ভক্ষণ এবং গজ-বমনের তাৎপর্য? বৃহদাকার হস্তী কি এখানে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক মাত্র? পরবর্তী কালের কবীর প্রভৃতির প্রহেলিকা-কবিতার ভিতরেও এই ভাবের আভাস দেখিতে পাই।

২২. প্রথমাংশ, ৯ম অধ্যায়।
২৩. আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং ইত্যাদি
২৪. পূর্বভাগ, ১।৩৫, বঙ্গবাসী সং।

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে আসিয়া দেবীর যত প্রকারের রূপান্তর দেখিতে পাই তাহার ভিতরে একটি বিশেষ লক্ষণীয় রূপান্তর হইল দেবীর লৌকিক রূপান্তর। পৌরাণিক তত্ত্ব, উপাখ্যান, বর্ণনা, কিংবদন্তী সামাজিক উত্তরাধিকার রূপেই মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অনেকখানি পাইয়াছেন। কাহারও কাহারও হয়ত পুরাণাদির সহিত কিছু কিছু প্রত্যক্ষ যোগও থাকিতে পারে। উমার হিমালয়-দুহিতা রূপে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ্বর শিবের সহিত তাঁহার বিবাহের আখ্যান মঙ্গল-কাব্যের কবিগণ মোটামুটি ভাবে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের অনুরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সব উপাদান অতি স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গলকাব্যকারগণের রচনায় স্থান পাইয়াছে—এই সব উপাদান লইয়া আর পৃথক্ ভাবে বিস্তারিত আলোচনার তেমন কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। লক্ষণীয় নূতন উপাদান হইল সেই সেই যুগের মানবীয় উপাদান। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দেখিতে পাই, কৈলাসবাসী যোগেশ্বর শিব ক্রমে ক্রমে বঙ্গবাসী 'মাতাল ভোলা'য় রূপান্তরিত হইয়াছেন; দেবীও সঙ্গে সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার মাতাল বৃদ্ধ স্বামীর সুখদুঃখের ভাগিনী বঙ্গবাসিনী দারিদ্র্য-লাঞ্ছিতা 'ঘরণী'। হর গৌরীর এই লৌকিক রূপান্তরের আভাস বিভিন্ন যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই রহিয়াছে; কিন্তু সেখানেও দেবীর স্বামি-পুত্র-কন্যা লইয়া ঘর-সংসার লৌকিক গৃহচিত্রকে অবলম্বন করিয়া চিত্রিত হইলেও সেখানে দেবী এমনভাবে 'দিন-আনে দিন খায়'-পর্যায়ের নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের সুখদুঃখজালে জড়াইয়া পড়েন নাই। সংস্কৃত বর্ণনাগুলির ভিতরে মনে হয় সাময়িকভাবে দেবী লৌকিক জালে বদ্ধ হইয়া পড়িলেও তাঁহার কৈলাস গমনের সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; কিন্তু বাঙালী কবিগণ স্থানে স্থানে দেবীকে এমনভাবে বাঙলাদেশের ভাঁড়ার-উঠান-রান্নাঘরের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন যে, সেখান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুনঃ কৈলাস প্রবেশের বুঝি আর কোনও পথ নাই।

মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গলে পৌরাণিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই দেবীর এই মানবীয় রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। 'বাপের ঘরে' যাইবার অনুমতি চাহিয়া সতীরূপে দেবী শিবের নিকট যে বিনতি জানাইয়াছেন তাহার ভিতরেই বাপের-বাড়ি-মুখী বাঙালী মেয়ের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী শিবকে বলিতেছেন—

সুমঙ্গল সূত্র করে আইনু তোমার ঘরে
পূর্ণ বৎসর হইল সাত।
দূর কর অপরাধ পূরহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পর্ব্বত কন্দরে বসি নাহি পাট পড়সী
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
একদিন কোথা যাই যুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধি মোরে কৈল জন্ম দুঃখী॥[২৫]

২৫. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ

কয়েক বৎসর একাদিক্রমে স্বামীর ঘর করিয়া সেই করুণ আকুতি—'মায়ের রন্ধনে খাব ভাত!' যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য ঐ মায়ের হাতের রান্নাটুকু। আবার মায়ে-ঝিয়ে যেখানে কলহ লাগিয়াছে সেখানেও একেবারে বাঙালী ঘরের চিত্র। সতী দেহ ত্যাগ করিয়া উমারূপে গিরিরাণী মেনকার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ শিবের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। হর-গৌরীর বিবাহে বাঙালী স্ত্রী-আচার মেনকা কিছুই বাকি রাখেন নাই;[২৬] প্রতিবেশিনীগণকে লইয়া 'জলসহা'র অনুষ্ঠানও বিধিমত পালন করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পরে বৃদ্ধ জামাতা বাবাজীর আর শ্বশুর-গৃহ হইতে নড়িবার চড়িবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। নড়িয়া-চড়িয়া লাভই বা কি, নড়িলে-চড়িলেই ত আবার ছেঁড়া ঝুলি লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে। পার্বতীও বাপের বাড়ি মহা আনন্দেই আছেন, দিন-রাত্রি পাশা খেলিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু গরীব মা-বাপ আর কত দিন পারে? তা ছাড়া জামাই বাবাজী ত আর ঠিক একা নহে, সঙ্গে ত আবার কিছু ভূত-প্রেত তাল-বেতালও রহিয়াছে। তদুপরি জামাইয়ের আবার একটু নেশার অভ্যাস আছে, ভাঙের খরচটাও শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর দিয়াই চলে। মেয়েও শুধু যে বাপ-মায়ের ঘাড় জুড়িয়াই আছে তাহা নহে, দিনরাত বসিয়া পাশাই খেলিবে, ঘরে একা বৃদ্ধা মা পারে না দেখিয়াও তৃণগাছি ছিঁড়িয়া ভিন্ন করিবে না। সংসার যখন প্রায় অচল হইয়া উঠিল এবং শরীরও যখন আর চলে না তখন মা মেনকাকে কন্যার প্রতি কিছু কর্কশবাণী প্রয়োগ করিতেই হইল—

তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিয়াল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল॥
দুগ্ধ উথলিতে গৌরী নাহি দেহ পানি।
সখী সঙ্গে খেল পাশা দিবসরজনী॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল॥
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥
প্রেত ভূত পিশাচ মিলিল তার সঙ্গ।
অনুদিন কত নাকি কিনা দিব ভাঙ্গ॥
রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত॥ —মুকুন্দরাম

কিন্তু মেয়েও বেশ কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিবার মেয়ে, ছাড়িয়া কথা বলিবার পাত্রী নহেন; তিনি নিজের অংশের জমা-জমি ভাগ-বাঁটরাও বেশ বোঝেন।—

এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন।
ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন॥

২৬. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়নে' হর-গৌরীর 'শয্যা তোলনী'রও চমৎকার বর্ণনা দেখিতে পাই।

জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমি দান।
তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সর্ষা ধান॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।
আজি হইতে তোমার দুয়ারে দিনু কাঁটা॥

এই বলিয়া গৌরী কোপে ও অভিমানে 'ঝলকে ঝলকে লোচনের লোহ' বহাইয়া দিয়া বৃদ্ধ স্বামী লইয়া মায়ের ঘর ছাড়িয়া চলিলেন। ইহার পরে মাতাল বেকার অলস বৃদ্ধ স্বামী লইয়া দেবীর দুঃখ-দারিদ্র্যের ঘর-করনা—সে সব চিত্র একেবারেই আমাদের দৈনন্দিন 'কষ্টের সংসারে'র চিত্র।

পূর্বের দিন শিব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে রোজ রোজ আর বাহির হইতে ইচ্ছা করে না; এদিকে সেদিনকার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল যে তৎপূর্বদিনের 'উধার শুধিতে'ই খরচ হইয়া গিয়াছে তাহা ত ভোলানাথের জানিবার কথা নহে; তিনি সকালবেলা উঠিয়াই খোশমেজাজে 'গণেশের মাতা'কে একটু ভাল-অভাল রান্নার ফরমাশ করিলেন; এই রান্নার পদ প্রকরণের তালিকাটি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এতই রসাল যে আমরাও তালিকাটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।—

আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বার্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥
নটিয়া কাঁটাল-বিচি সার গোটা দশ।
ফুলবড়ি দিবে তাহে আর আদা-রস॥
কটু তৈল দিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
বাথুয়া ভাজিয়া তৈলে কর দৃঢ় পাক॥
রান্ধিবে মুসুরি ডাল দিবে টাবা-জল।
খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল॥
... ...
ঘৃত জিরা সম্ভলনে রান্ধিবে পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব॥ —মুকুন্দরাম

শিব ঠাকুরের কিঞ্চিৎ নেশার মৌতাতে দেবী রান্নার ফরমাশ ত বেশ পরিপাটি ভাবেই পাইলেন; কিন্তু তিনি ত আর কৈলাসের দেবী নন, সৃষ্টিকারিণী বিশ্বজননীও নন, তিনি হইলেন বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে যে-সব 'রমেশের মাতা', 'পরেশের মাতা', 'যোগেশের মাতা' রহিয়াছেন তাঁহাদেরই অন্যতমা 'গণেশের মাতা'। তিনি কাটাছাটা জবাব দিলেন—

রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই॥

আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল ॥

অতঃপর স্বামি-স্ত্রীতে গৃহ-কলহ বাঙালীর গৃহে যে রূপ ধারণ করে শ্রীশ্রীকৈলাসধামেও সেই রূপই ধারণ করিল।

দেবীর এই লৌকিক রূপের চরম দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে। শিব ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন, বাড়ির নিকটে আসিয়া 'বুড়া-ভিখারী' বিষাণে ফুঁ দিলেন; 'হাভাতে ঘরে'র পেট-টিংটিং দুই ছেলে কার্তিক-গণেশ, বাপ ভিক্ষা হইতে ফিরিয়াছে বুঝিতে পারিয়াই কিঞ্চিৎ খাদ্যলোভে ছুট দিল। রোজ এই সময়ে ভিক্ষার জিনিস লইয়া এক কলহ-কোন্দলের পালা দেখা দেয়; সুতরাং—

বালকে বারণ করে বিশাল-লোচনী।
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি ॥
অদ্য বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে।
তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা থাক কাছে ॥[২৭]

কিন্তু ক্ষুধিত বালকেরা কি আর এই সব বিনয়-বচনে কর্ণপাত করে? তাহারা ধাইয়া গিয়া বাপের 'পথ আগুলিল' এবং পিতার কাঁধের ভিক্ষার ঝুলি দেখিয়া একপায়ে নাচিতে আরম্ভ করিল। তখন 'শূলী দিল ঝুলি দোঁহে লুটী কর্যা খায়।' দুই ভাই হাঁটু গাড়িয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল; কাড়াকাড়ি হইতেই হুড়োহুড়ি, হুড়োহাড় হইতে হাতাহাতি। কার্তিকের ত মোটে দুইটি হাত, তাহাও গণেশ শুঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে, এবং সে নিজে চারি হাত দিয়া তাহার গজমুখে মুঠি মুঠি খাবার গিলিতেছে। তখন অতি স্বাভাবিক ভাবেই 'কার্তিক কান্দেন করাঘাত কর্যা বুকে'। ইহাত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার— তর্জন-গর্জন, মার-ধর করিয়া কিছু লাভ নাই; তাই—

দুর্গা দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন।
কার্তিকের করে কিছু দাও বাছাধন ॥
বিনয় মায়ের বুঝ্যা বিনায়ক শূর।
কিছু দিল কার্তিকে কোন্দল হৈল দূর ॥

শিব হাজার হোক বুড়া মানুষ, ঝুলি কাঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শিবকে বসিতে আসন দিয়া গণেশের মা পাখার বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাখার বাতাসে কি আর 'বুড়াশিবের' শ্রান্তি যায়?

শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কী।
ফাক্ক উড়ে ভাঙ্গ বিনা ভেক্কা হয়্যাছি ॥
ঘরে ছিল ঘোটনা মুষল গেল ফাট্যা।
দিন দুই দানবদলনী দেহ বাট্যা ॥

---

২৭. শ্রীযোগিলাল হালদারের সংস্করণ।

কিন্তু মায়ের পক্ষে দানব দলন করা অনেক সহজ, তাহাতে মায়ের উৎসাহও প্রচুর ; কিন্তু ঘরে বসিয়া বুড়া ভিখারী স্বামীর ভাঙ বাটিতে মায়ের বড় অনিচ্ছা।
সুতরাং—

পার্বতী বলেন আর পারি নাই যাও।
পোড়া ভাঙ গুড়া সিদ্ধ ফাঁকি কর্যা খাও॥

গিরিশ বলেন গৌরী গুড়া সিদ্ধি আছে।
গুড়া খায়্যা বুড়া মানুষ পড়্যা মরি পাছে॥

বলিয়া বুড়ামানুষ দেবীর নিকটে নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, এবং পার্বতীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে 'ভাযার পরম ভাগ্য ভাঙ্গি যার ভর্তা' এবং স্বামীর কথার উপরে 'মুখসাট মার্যা' কথা বলা স্ত্রীর পক্ষে নিতান্তই অশোভন। তখন দেবী আর কি করেন ?—

হরবাক্যে হৈমবতী হাসে খল খল।
গৌরী গর্গরী হস্তে গড়াইল জল॥
গাঁজা-ঝাড়া তিতা তাজা ভিজাইয়া তাকে।
মহিষমর্দিনী বাট্যা দিল মুহূর্তেকে॥
হিণ্ডীর সমীপে চণ্ডী দিল হাণ্ডী ভর্যা।
শিব তাকে ছাকে বাপে-পোয়ে বস্ত্র ধর্যা॥

সিদ্ধি খাইয়া বুড়াশিবের বেশ মৌতাত বৃদ্ধি হইল ; ঝট্‌পট্ দুটি রান্না করিয়া দিবার জন্য 'গিরীশের ঝি'র প্রতি আদেশ হইল। দেবী রান্না করিলেন ; বাপে-পোয়ে তিন জনে খাইতে বসিলেন। দেবী খাবার দিতেছেন, কিন্তু পারিয়া উঠিবেন কেন ? এদিকে কার্তিকের 'ষড়ানন', গণেশের এক ; সুতরাং দুই পুত্রের সাত মুখ— স্বামীর পঞ্চ মুখ— একুনে বারখানি মুখ।

তিনজনে একেবারে বারমুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়॥
... ...
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায়্য হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে॥
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হৈয়্যা খা॥

মায়ের কথা শুনিয়া কার্তিক ধৈর্য ধারণ করিয়া মৌনী হইয়াছিল— কিন্তু শিব পিছন হইতে কার্তিককে উস্কানি দিতেছিলেন এবং মায়ের বাক্যে কি জবাব দিতে হইবে তাহাও পিছন হইতে শিখাইয়া দিতেছিলেন। সুতরাং কার্তিক বলিয়া উঠিল—

রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে॥

পুত্রের উক্তি শুনিয়া মা রাগিলেন না ; হাসিয়া অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন।—

দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর।
শ্রমে হৈল সজল সকল কলেবর॥

হরবধূ অন্নমধু দিতে আর বার।
খসিল কাঁচলি কুচে পয়োধর ভার॥
লাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ।
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হইল শেষ॥

স্বামী-পুত্রের খাওয়া হইয়া গেলে মা নিজে খাইতে বসিলেন। মায়ের সেই খাইতে বসার মধ্যেও কবি রামেশ্বর বঙ্গ-পল্লী জনৈকা 'গণেশের মা'র সমবয়সীদের বা সহচরীদের লইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া গল্পে গুজবে হাস্য-কৌতুকে আস্তে আস্তে গ্রাস তুলিবার চিত্রটি ভুলিতে পারেন নাই।

সহচরী সঙ্গে করি পসারিয়া পা।
গ্রাস গড়ে গিরিসুতা গণেশের মা॥
মধ্যখানে মহামায়া সখী সব পাশে।
অন্নমুখে উপকথা আরম্ভিয়া হাসে॥

একদিন সকালবেলা বুড়াশিব 'রামরস' একটু বেশী মাত্রায় সেবন করিয়া নেশায় বুঁদ হইয়া আছেন, আজ আর ভিক্ষায় বাহির হইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু নেশায় জমিয়া একটু বসিয়া থাকিবার উপায় কি? 'ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।' নিত্যকারের সেই তিক্ত বাক্যবাণে বুড়ার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব'? এ-কথায় দেবী অপমানিতা বোধ করিলেন; তিনি বলিলেন, তিনি 'ভিক্ষুকের ভার্যা' হইলেও ছোটলোকের ঝি নন, তিনি 'ভূপতির ঝি', সুতরাং সংসারের জিনিস এদিক-ওদিক করিবার অভ্যাস তাঁহার নাই—'দিয়াছিলে যত ধন লেখ্যা-কর্য়া নেও'। নিরক্ষর বুড়া ভিখারী জীবনে কোনদিন লেখা-পড়ার ধার ধারেন নাই; তিনি একটু 'রামরস' পান করেন আর হরিনাম গান করেন।—

বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার।
বসুমতী পাতাল গিয়াছে কতবার॥
লেখাজোখা জানি নাই রামরস খায়্যা।
হয়্যাছি অজরামর হরিগুণ গায়্যা॥
মোকে মিথ্যা লেখাজোখা মনে মনে কর।
ঠেক্যাছি তোমার ঠাঁঞি ঠেঙ্গাইয়া মার॥
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাই ভাত।
যাব নাই ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ॥

পার্বতী বলিলেন, 'এখন ত ভাঙ-সিদ্ধির নেশায় জমিয়া আছ— ভাতের আর দরকার নাই, নেশা ভাঙিলেই তো আবার দুটি কিছু খুঁটিয়া খাইবার দরকার হইবে। তা ছাড়া, নিজে না হয় বুড়ামানুষ একদিন খাবার না হইলেও চলিবে; বাপের কাছেই যে দুই 'পো' বসিয়া আছে, তাহারা ত একটু পরেই 'ক্ষুধা হৈলে কবে মোকে খাইতে দেনা গো'; তখন আমি কি উপায় করিব?' প্রসঙ্গতঃ মহামায়া এ-কথা অতি স্পষ্টভাবেই জানাইয়া রাখিলেন যে তাঁহার নিজের কিন্তু আর করিবার কিছুই নাই; কারণ—

ডাকিনী ডিম্বের ঘরে ডুবাইল দেশ।
ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ॥
বান্ধা দিতে বাকি নাই দিতে নাই দাতা।
জঠর আনলে বলে জগতের মাতা॥

এখানে 'জগতের মাতা' শব্দের অর্থ হইল দুনিয়ার দরিদ্রের ঘরের সাধারণী-কৃত মাতা।

অতএব শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া-ফুটা তালিমারা ঝুলিটি কাঁধে করিয়া বুড়াশিবকে আবার বাহির হইতে হয়। এদিনে কিন্তু ভিক্ষায় অনেক কিছু মিলিল; শুধু চাল-ডাল নয়, ধন-রত্নও। বাড়িতে আসিয়া 'বুড়া' যখন ঝুলিটি পার্বতীর সামনে হাসিয়া রাখিলেন তখন পার্বতী সুখী হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতা এবং ভীতাও হইলেন। এত ধন যে ফোঁটাকাটা হরিনাম-করা বুড়া ভিক্ষা করিয়াই লাভ করিয়াছেন তাহা পার্বতীর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না; তাই—

সুন্দরী সুধান শিবে সত্য বল শূলী।
কারে মার‍্যা ধন হর‍্যা পুরাইলে ঝুলি॥
গলা ভর‍্যা মালা যার কপাল জুড়্যা ফোঁটা।
দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলা-কাটা॥

. . . .

বৈষ্ণব বলাও বিপরীত কর কাজ।
ধর্ম নাশ আর হাস নাই বাস লাজ॥

কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও এইটুকু ধর্মবোধ বঙ্গ-পল্লীর 'গণেশের মা'র পক্ষে স্বাভাবিক এবং সঙ্গতই হইয়াছে।

এই ভাবেই চলে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতকের বঙ্গ-পল্লীর হর-পার্বতীর সংসার। কিন্তু এইভাবে শুধুমাত্র উঞ্ছবৃত্তিতে আর কত দিন চলে? ছেলে দুইটি বাড়িয়া উঠিতেছে, অন্যান্য পোষ্যও কিছু বাড়িয়া যাইতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী একদিন বৃদ্ধ পতিকে বলিলেন,—'চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।' শিবের এই চাষ করিবার প্রসঙ্গ অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখিতে পাই। যজুর্বেদে ভগিনী অম্বিকাসহ যে রুদ্রের উল্লেখ পাই সেখানে রুদ্র ও অম্বিকা উভয়েই শস্যের সঙ্গে যুক্ত। বাঙলা 'শূন্য পুরাণে' শিবের চাষ চষিয়া বিবিধ রকমের ধান ফলাইবার বিস্তৃত বর্ণনা

পাই। এখানে শিবকে চাষের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে ভৃত্য ভীম। কিন্তু বিদ্যাপতি-রচিত পদে দেখি দেবীই শিবকে চাষ চষিতে বলিতেছেন। এই বর্ণনার সহিত রামেশ্বরের বর্ণনার মিল আছে।—

বেরি বেরি অরে সিব মো তোয় বোলো
কিরিষি করিঅ মন লাই।
বিনু সরমে রহহ ভিখিএ পএ মাগিঅ
গুন গৌরব দূর জাই॥
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ
নহি আদর অনুকম্পা।
তোহে সিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফুল চম্পা॥
খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল
ত্রিসুল তোড়িঅ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ
পাটএ সুরসরি ধারে॥[২৮]

"বারে বারে হে শিব, তোমাকে আমি বলি, মন দিয়া কৃষি কর। বিনা লজ্জায় তুমি ভিক্ষা মাগ, গুণ-গৌরব দূরে যায়। নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, আদর-অনুকম্পা করে না; তুমি শিব পাইলে আকন্দ ও ধুতুরা ফুল, (আর) হরি পাইল চাঁপা ফুল। হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া কর ফাল; ধুরন্ধর বৃষভকে হল লইয়া জুড়িয়া দাও—সুরেশ্বরীর (গঙ্গার) ধারায় পাট কর।"

যাহা হোক, রামেশ্বরের শিবায়নে দেখি, এক দিন নয়, দুদিন নয়—এখন দেবী নিত্যই সময় সুযোগ মত 'নরমে গরমে' এই চাষের পরামর্শ দিতেছেন, নতুবা আর যে উপায় নাই। শিবও কথাটা ভাবিয়া দেখিলেন, কিন্তু ঠিক মন সরে না; দরিদ্র হইলেও দেবতার জাতি (ব্রাহ্মণ ?)—চাষ করাটা কি শোভন হইবে ? দেবীকে শিব বলিলেন—

বলি বিলক্ষণ কিছু শুন শৈলসুতা।
দেবতার পোত-বৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥

তাহা ছাড়া 'শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর'; কিন্তু কাজে তত সহজ নহে। কারণ

চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব।
মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব॥

ভাল চাষ করিলেই ভাল ফসল ফলিবে এমন কথা নাই, 'শুখা হাজা'র ভয় আছে। তাহার

২৮. বিদ্যাপতি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত।

পরে 'গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা' তখন আবার 'রাজা' (ভূম্যধিকারী) আছেন রাজার সঙ্গে আবার তাঁহার 'কায়েত'ও আছেন। সুতরাং দেবীর নিকটে শিবঠাকুর অন্য কোনও ব্যবসায়ের বুদ্ধি চাহিলেন। দেবী বলিলেন, আর ব্যবসা আছে বাণিজ্য, তাহাতে দুইটি জিনিস না হইলেই নয়—একটি 'পুঁজি' (পুঞ্জি), অপরটি প্রবঞ্চনা-বুদ্ধি; ইহার একটিও শিবঠাকুরের নাই, তাই বাণিজ্য তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ব্যবসায় আছে 'রাজসেবা', 'সেব্য' জাতির পক্ষে তাহাও অসম্মানের; সুতরাং চাষই শিবের পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য বৃত্তি। শিব বলিলেন, চাষের জন্য অনেক কিছু যে চাই, তাহার যোগাড় হইবে কিরূপে? দেবী বলিলেন—

দেখ বিনা বেতনে বিশাইয়ে বল্যা কালি।
গাছ কাট্যা গড়াইব লাঙ্গলের ফালি॥
ঘাত কর্যে তারে লয়্যা পাতাইবে শাল।
শূল ভাঙ্গ্যা সাজসজ্জা গড়াইব কাল॥

এই 'বিশাই' মূলে 'বিশ্বকর্মা' বটেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ইনি বাঙলাদেশের 'গণেশের মা'র প্রতিবেশী 'বিশাই কামার'— যাহাকে বলিয়া কহিয়া সম্প্রতি বিনা মজুরীতেই হাল গড়াইয়া লওয়া যাইবে বলিয়া গণেশের মায়ের বিশ্বাস। এতক্ষণ গৃহিণীর (ব্রাহ্মণীর) উপদেশ-পরামর্শ শিবঠাকুর মন দিয়াই শুনিতেছিলেন; কিন্তু 'শূলভঙ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ।' কিন্তু কোপ করিলে কি হইবে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাবেই রাজি হইতে হইল। শিবঠাকুর তাঁহার বাহন বৃষটি লইয়া এবং শূলপাণির শূলের দ্বারা তৈরী লাঙ্গল লইয়া হরিনাম করিতে করিতে চাষে চলিলেন—

চলিল চঞ্চল বৃষ চণ্ডী বন চায়্যা।
হরষেতে যান হর হরিগুণ গায়্যা॥

জমি কিছু পাওয়া গিয়াছে কোচ্-পাড়ায়—নিজেদের গ্রাম হইতে তাহা অনেকদূর। শিব সেই কোচ্-পাড়ায়ই চলিলেন চাষ চষিতে। শিব যখব বাড়ি ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য চলিলেন, তখন—

ত্রিপুরা বলেন তবে আস গিয়া প্রভু।
ছাল্যা দুটীর তত্ত্ব লইও কভু কভু॥
শিব বলে সম্প্রতি সে কথা রাখ হাতে।
আকাশ ভাঙ্গিল শুন্যা অম্বিকার মাথে॥

শঙ্কর চাষের জন্য চলিয়াছেন দেবীচকের (রামেশ্বরের মেদিনীপুরে কৃষি-অঞ্চল এখনও বিভিন্ন 'চক' নামেই পরিচিত) দিকে, কারণ এইখানেই 'হরিহর' শিবের সংসার চলিয়া যায় এমন কিছু চাষ-জমি দেবোত্তর লিখিয়া দিয়াছেন। বাড়িতে থাকিতে হইবে অন্নহীন গৃহে দুইটি নাবালক পুত্র লইয়া একা গৌরীকে। শিবঠাকুর বৃদ্ধ হইলেও গৌরী যে এখনও অল্পবয়স্কা কুলবধূ; শিবের অনুপস্থিতিতে ভিক্ষায় বাহির হওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

শিব বলিয়া গেলেন, 'ধরাধর-সুতা ধান্য ধার কর তুমি'; কিন্তু 'পার্বতী বলেন প্রভু পারি নাই আমি'; কারণ কর্জের অনেক লেঠা; 'মদ্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা থাকে ঘরে। ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে॥' পাওনাদার যখন তখন আসিয়া হানা দেয়, দায় সামলাইতে হয় মেয়েদের; তাহারা বাহিরে আসিয়া কথাও বলিতে পারে না, ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিয়া ছেলের মুখে পাওনাদারের সঙ্গে কথা বলিতে হয়। তাহা ছাড়া—

কুবেরের কাছে পূর্বে লেঠা আছে মোর।
কতবার ক্রোধিয়া বল্যাছে ঋণচোর॥

এই 'কুবের'কেও সোজা ধন-দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, ইনি গ্রাম্য লগ্নি-কারবারী—হয়ত 'বিশাই কামারে'র কাছাকাছি বাড়ি। মোটামুটি গৌরীর একা একা বাড়ি থাকিবার কোনও দিক হইতেই ইচ্ছা নাই; তিনি স্পষ্ট বলিয়া বসিলেন—

ভাল যদি চাও মোরে লয়্যা যাও সাথে।
বাপ-নেওট ছাল্যা আমি নারিব পত্যাতে॥
ছটফট্যা ছাল্যা সব ছাড়্যা গেল্যা ঘর।
দশ হাতে ধুমধাম দিবে অতঃপর॥

কিন্তু কোনও কথায়ই কিছু ফল হইল না; দেবীকে একা ঘরে রাখিয়া শিব তাঁহার অনুচর ভীমকে লইয়া দেবীচকে চাষের জন্য চলিয়া গেলেন।

বুড়া শিব ও অনুচর ভীমের পরিশ্রমে ও যত্নে দেবীচকে ফসল ভালই ফলিয়াছে, শিব জমি ছাড়িয়া আর বাড়িতে আসিলেন না। এ দিকে দেবী একা বাড়িতে আর কতদিন থাকিবেন, নানা ফন্দি-ফিকির করিয়া শিবকে বাড়ি আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও চেষ্টাই সফল হইল না। শেষে দেবী বাগ্‌দিনীরূপ ধারণ করিয়া শিবের ফলন্ত শস্যের ক্ষেত্রে গিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করিলেন। শিব বাগ্‌দিনীর ভোলে পড়িলেন, ইহা লইয়া হর-পার্বতীর কিঞ্চিৎ আদিরসাত্মক লীলা দেখিতে পাই। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত শিব বাড়ি ফিরিলেন; শিব-শিবানীর মিলন হইল।

শিব এবারে দেবীচকের চাষী শিব, ক্ষেতে ভাল ফসল ফলিয়াছে; শিবানীর বহুদিন পরে মনে একটা শখ জাগিয়াছে; তিনি স্বামি-সোহাগের উপরে নির্ভর করিয়া আব্দার জানাইলেন—

দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটী বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু চাই নাই॥
লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥
তুল ডাটি পারা দুটি হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর॥

কিন্তু বুড়া স্বামী শিব বড় রূঢ়ভাষী ; প্রত্যাখ্যানের মধ্যে আর কোনও সহানুভূতি নাই—

শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসুতা।
অভাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা॥
গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তেনা।
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কড়ি সোণা॥
ভাত নাই ভবনে ভর্তার ভাগ্য বাঁকা।
মূল পাট্যা মরে তারে মাগী মাগে শাঁখা॥

প্রত্যাখ্যানের এই ভাষা ও ভঙ্গি বঙ্গীয় বৃদ্ধ চাষীর উপযুক্ত বটে। কিন্তু পার্বতীর মনে রূঢ় আঘাত লাগিল—অপমানে অভিমানে দেবী রক্তবর্ণা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাঙালীর ঘরের বধূ, রাগ করিয়া আর কোথায় যাইবেন? শেষ পর্যন্ত সেই বাপের বাড়ি! পার্বতীও সেই বাপের বাড়িই চলিলেন। শেষে অবশ্য শিব নিজেই শাঁখারি সাজিয়া গৌরীর বাপের বাড়ি গিয়া গৌরীকে শাঁখা পরাইয়া আসিয়াছিলেন।

এই কাহিনীটির উপরে আরও লৌকিক রস ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন কবিওয়ালা রামজী দাস। সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য আক্ষোভ-বিক্ষোভের আলোচনা ভাল জমে মামায়-ভাগিনায় বসিয়া। ভাগিনা নারদ গিয়াছেন মামা শিবের বাড়ি; শিব ভাগিনাকে একান্তে নিরালায় পাইয়া মনের ক্ষোভে বলিতেছেন—

আমার হলো একি দায়, তোর চাষা মামী শাখা চায়।
বুঝে না অবোধ নেকী ধরে দুটা পায়॥
কার্ত্তিক গজানন, ছেলেরা দু'জন,
ক্ষুধাতে আকুল হ'য়ে কান্দে সবক্ষণ,
ভাত না পেলে বাবা বলে দিগম্বরকে খাবলে খায়॥
তোর চাষা মামী সদা মোরে বলে কুবচন,
সে মানে নাক সদাই বলে ভাঙ্গড় ত্রিলোচন,
... ...
আমি কাঙ্গাল ত্রিলোচন, কোথা পাব ধন,
কি দিয়ে কিনে শাঁখা দিব রে এখন,
(আমার) সম্ভাবনা ছেঁড়া তেনা বাঘের ছালা পরি গায়॥[২৯]

আমরা রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের চিত্র একটু বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। রামেশ্বর অবশ্য তাঁহার কবি-কল্পনায় দেবীর লৌকিক রূপের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থূলতারও আমদানী করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র 'আয়্যগণ'কে দিয়া হর-পার্বতীর বর শয্যা এবং শয্যাতোলনী উপলক্ষ্যে আদিরসাত্মক স্থূল রসিকতাও বাদ দেন নাই। তাঁহার 'শিবায়নে' আরও দেখি, কুমারী অবস্থায় নির্জন কুঞ্জে গিয়া শিবের আরাধনার

২৯. প্রাচীন কবিওয়ালার গান, শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জন্য দেব-সমাজে পার্বতীর চরিত্র সম্বন্ধে কানাকানিও দেখা দিয়াছিল এবং সেই অপবাদ স্খালনের জন্য মধ্যযুগের অন্যান্য বাঙলা-কাব্যের নায়িকাগণের মত পার্বতীকেও বলিতে দেখি,—

কালি মোর দিহ বিভা আজি কর জ্ঞাতিসভা
বহ্নিশুদ্ধা হইব সংপ্রতি ॥

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে, দেবীকে আমাদের সুখ দুঃখ অভাব-অভিযোগ-ভরা দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব যুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা আমরা এই যুগে আরও অনেক স্থলে লক্ষ্য করিতে পারি। দেবীকে ব্যবহারিক জীবনের সহিত যতটা সম্ভব জড়াইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক কিংবদন্তী ও উপাখ্যান। মা যে কন্যারূপে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে বেড়া' এই কিংবদন্তীর পশ্চাতেও এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। আমরা রামেশ্বর আর রামকৃষ্ণের শিবায়নে দেবীর শাঁখা পরিবার উপাখ্যান দেখিতে পাই। এই উপাখ্যান টুকরা টুকরা হইয়া চৈত্র-মাসের গাজন গানের মধ্যে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের চৈত্রসংক্রান্তির নীল-পূজা উপলক্ষেও এই উপাখ্যান আমরা গীত হইতে শুনিয়াছি। সর্বশ্রেণীর বাঙালী নারীর আদরের বস্তু শাঁখা-সিন্দূর; যিনি বাঙালীর দেবী হইবেন তিনিও অবশ্যই শাঁখা-সিঁদূর-প্রিয়া হইবেন। এই মনোভাব হইতেই ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার শাঁখারির নিকট হইতে শাঁখা-পরিবার স্নিগ্ধ মধুর উপাখ্যানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি তরুদত্ত উপাখ্যানটিকে অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে একটি চমৎকার কবিতা রচনা করিয়াছেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক তাহার বাঙলা অনুবাদটিও স্বাদ্য। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই—তখনও ঠিক প্রভাত কাটিয়া বেলা হয় নাই; সোনার আলোমাখা গ্রাম্য পথ ধরিয়া হাঁকিয়া যাইতেছিল একটি শাঁখারি—'শাঁখা চাই, চাই শাঁখা'। কাছে 'ধানসেরা' দীঘির ঘাট; ঘাটে স্নানের জন্য চলিয়াছিল অপূর্বা সুন্দরী একটি রমণী; শাঁখারির 'শাঁখা চাই' ডাকের সাড়া দিল সেই রমণী। শাঁখারি তাঁহার কোমল সুগঠিত দুই হাতে পরাইয়া দিল মনোমত দুইগাছি শাঁখা। রমণী শাঁখা পরিয়া অদূরের একটি মন্দির দেখাইয়া বলিল, সেইখানে তাহার বাড়ি, শাঁখারি যেন সেখানে গিয়া তাহার পিতার নিকট হইতে শাঁখার দাম গ্রহণ করে; একটি ঝাঁপির মধ্যেই ঠিক দাম পাওয়া যাইবে। শাঁখারি মন্দিরের পূজারীর নিকট এই কথা বলিলে বিস্মিত পূজারী শাঁখারিকে লইয়া ঘাটে আসিয়া কন্যা-রূপিণী দেবীকে দেখা দিতে বলিলেন; স্তব্ধ নিথর কালো জলের মধ্য হইতে শুধু দেবীর শাঁখা-পরা হাত দুখানি জাগিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল!

ইহা বিশেষ কোনও কবির কবি-কল্পনা মাত্র নহে, ইহা বাঙলা-দেশের সহজ বিশ্বাসেরই একটি সহজ প্রকাশ।

এই যে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের কথা বলিলাম, ইহার ভিতরে দুইটি দিক লক্ষ্য করিতে পারি। একদিকে দেখিতে পাই, দেবীর সকল লীলা বর্ণনার ভিতর দিয়া মানবীয়

রূপ গুণের প্রকাশ ; এই মানবীয় রূপগুণ দেবীর মহিমাকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না ; মানবতার আধারে দেবীর মহিমা আরও যেন স্নিগ্ধ কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে—আরও আমাদের আপনার হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের অনেকগুলি শাক্ত পদের মধ্যে দেবত্ব ও মানবত্বের এই সানন্দগ্রাহ্য মিলন আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব। কিন্তু দেবীর এই মানবীয়তা লাভের আর একটি স্থূল রূপ আছে যেখানে দেবী শুধু উপলক্ষ্য বা অবলম্বন-মাত্র, সেখানে আমাদের যুগচিহ্নিত সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের স্থূলরূপের চিত্রটিই অঙ্কিত হইয়াছে। 'শিবায়ন' গুলির মধ্যে দেবীর মানবীয় রূপান্তর অনেক স্থলে এই-জাতীয় স্থূলতা লাভ করিয়াছে। এই-জাতীয় স্থূলত্বের চরম নিদর্শন দেখিতে পাই দাশরথি রায়ের পাঁচালীর কিছু কিছু বর্ণনায়। চন্দ্রের সাতাইশ পত্নী (ইঁহারা সকলেই দক্ষকন্যা) যখন দক্ষালয়ে যজ্ঞ-উপলক্ষ্যে চলিয়াছেন; তখন দক্ষালয়ে যাইবার পথে তাঁহারা বড় ভগ্নী সতীর সহিত দেখা করিলে সতী দুঃখ করিয়া বলিলেন—

অশ্বিনী দিদি, আমারে দুঃখিনী দেখিয়া পিতে।
অবজ্ঞা করিয়ে যজ্ঞে আজ্ঞা না করিলেন যেতে॥

তখন কন্যাগণের মধ্যে গরিব কন্যার প্রতি ধনী পিতার অবজ্ঞার কথাটি দেবীকে মানবীয় রূপান্তর দান করিলেও একান্ত স্থূল করিয়া তোলে না। কিন্তু তাহার পরে যখন দেখিতে পাই শিব সতীকে পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার (শিবের) সঙ্গে ও শ্বশুর মহাশয় দক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

আমাদের ভাব যেমন জামাই আর শ্বশুরে।
যেমন দেবতা আর অসুরে॥
... ...
যেমন জল আর আগুনে।
যেমন তৈল আর বেগুনে॥
যেমন পক্ষী আর সাতনলা।
যেমন আদা আর কাঁচকলা॥
যেমন ঋষি আর জপে।
যেমন নেউল আর সাপে॥
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে।
যেমন গৃহস্থ আর চোরে॥
যেমন কাক আর পেচকে।
যেমন ভীম আর কীচকে॥
যেমন শরীর আর রোগে।
যেমন দিন কতক হইয়াছিল ইংরাজ আর মগে॥

এই মত অসদ্ভাব দক্ষে আমায়।
শুন প্রিয়া আর কিছু কহিব তোমায় ॥[২৯]

আরও কিছু কহিবার আর প্রয়োজন করে না; দাশু রায় এই পর্যন্তে শিবের মুখে যাহা বলাইয়াছেন তাহাই যে কোনও মর্ত্যবাসীর নিকটেও কানে হাত দিবার পক্ষে যথেষ্ট। দাশরথি রায়ের এই জাতীয় বর্ণনা আরও উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিবার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু লৌকিক রূপান্তরে দেবীকে কতদূর পর্যন্ত নামিতে হইয়াছে তাহারই আরও একটু নমুনা দিবার জন্য আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। গিরিরাণী মেনকা সন্তান প্রসব করিলেন; ধাত্রী প্রসূতিকে কন্যা জন্মের কথা শুনাইল। শুনিয়া বাক্যশেলাহতা গিরিরাণী খানিকক্ষণ মুখ ফিরাইয়া নীরব রহিলেন এবং পরে সরবে কান্না জুড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

সুসন্তান শুনে গিরি কর্তো কত বাবুগিরি
কিছু সাধ ঘটলো না রে ঘটে।
সকল আশায় দিয়ে কালী কোথাকার এ পোড়াকপালী
মর্তে এসেছিলি মোর পেটে ॥
না করে কোলে অম্বিকায় পড়ে রন মা মৃত্তিকায়
নারীগণ শুনিল পরস্পরে।
সকলে হৈয়ে একযোগ গিয়ে কচ্ছে অনুযোগ
মন্দিরের দ্বারের বাহিরে ॥
মেয়ে বলে কি অনাদরে ফেলেছিস্ ধরা উদরে
তুই তো মায়ের মেয়ে বটিস্ কিনা।
চমকে মরি চমৎকার মব মাগির কি অহঙ্কার
দেখি নাই তো করে এত কারখানা।[৩০]

মুখের উপর এইরূপ কড়া কথা শুনাইয়া দিবার আড়শী-পড়শীগণ উপস্থিত না থাকিলে গরিব বাঙালী মায়ের কৃষ্ণ-বর্ণা বালিকা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পার্বতীর যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা যাইতেছে না। পিতা গিরিরাজ কিন্তু মাতার মতন নহেন; তিনি কন্যার জন্মোৎসবেই প্রচুর দান-ধ্যান করিলেন। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে কিছু কমতি পড়িল। তখন—

অসন্তুষ্ট হয়ে মন ব্রাহ্মণ করেন গমন
আর এক বিপ্র সহ দেখা পথে।
দানের দুঃখের কথা মানের অতি খর্বতা
তার কাছে কহে খেদমতে ॥

২৯. অথ দক্ষযজ্ঞ।
৩০. অথ শিববিবাহ।

বলিব কি হে ভট্টাচার্য দেশের বিচার কিমাশ্চর্য
ভার্যার কথায় রাজ্য এলেম হেঁটে।
পরিশ্রম হলো পণ্ড পাষাণ বেটা কি পাষণ্ড
দুঃখে মোর বক্ষ যায় ফেটে॥
ঠুঁটোর মত মুঠো করে দুটী মুদ্রা দিলেন মোরে
ভাবলাম দুটো কথা বলে যাই।
ছিল দুই দুরন্ত দ্বারি দ্বারে দু'টো স্কন্ধে হাত দে ধরে
দুটো দুয়ারের বার করেছে ভাই॥[৩১]

ইহার পরে পার্বতীর অন্নপ্রাশনের পালা। পর্বত-পুরবাসিনিগণের সঙ্গে একত্র হইয়া গিরিরাণী মেনকা নিজেই সব রান্না করিয়াছেন, সকলে খাইয়াও সুখী; কিন্তু সেদিনও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক বিশ্বনিন্দুক ছিলেন॥—

বিশ্বনিন্দুক একজন গিরিপুরে করি ভোজন
বিরাশি সিক্কার ওজন মতে।
এক মোট বস্ত্রে বান্ধিয়ে ভৃত্যের মস্তকে দিয়ে
ব্যস্ত হয়ে গমন হয় পথে॥
তারে দেখি যত্ন করে একজন জিজ্ঞাসা করে
ভোজনের কেমন পারিপাট্য।
শুনলেম ভোজনের ভারি যশ দ্রব্য নাকি নানা রস
বস্ত্র নাকি দান কচ্ছেন পট্ট॥
বিশ্বনিন্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয়
তারি কর্মে তারিপ ও মোর দশা।
সংসারটা ভারি আঁটা মহাপ্রেত সে গিরিবেটা
মিনসে হতে মাগি দ্বিগুণ কসা॥

মা পার্বতীর অন্ন-প্রাশনে আসিয়াই থামিয়া গেলাম, বিবাহাদির ঘোঁট-জোলসে আর প্রবেশ না-ই করিলাম।

৩১. অথ শিব বিবাহ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাংলা দেশের যে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও আলোচনা করিবার ব্যবস্থা আছে তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলা পুথির বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ইহা অগ্রণী। ইহার পত্রিকা ও গ্রন্থাবলীর মধ্যে পরিষদ্ বা অপরের সংগৃহীত বহু পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য পত্রিকায়ও মাঝে মাঝে প্রাচীন পুথি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।[১] পরিষৎপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের প্রথম খণ্ড প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয়ের সংকলিত ছয় শত পুথির বিবরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যায় শিবরতন মিত্র সংকলিত বীরভূম 'রতন লাইব্রেরী'তে সংগৃহীত ২০১ খানি পুথির বিবরণ স্থান লাভ করে। ১৩৩০ হইতে ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত নয় বৎসরে এই বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের তিন সংখ্যায় পরিষৎপুথিশালায় সংগৃহীত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে পরিষৎ-পুথিশালার অন্তর্ভুক্ত প্রথম চারিশত পুথির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার মধ্যে রামায়ণের পুথিই বেশি। ইহা ছাড়া, কিছু মহাভারত, মঙ্গল কাব্য ও বৈষ্ণব পুথি আছে। তৃতীয় সংখ্যায় বর্ণিত একশত পুথির অধিকাংশই বৈষ্ণব গ্রন্থের। এই সংখ্যার ভূমিকায় গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে।

এইভাবে পরিষদের পুথির বিবরণ সংকলিত হইতে থাকিলে সমগ্র পুথি সংগ্রহের বিবরণ প্রকাশিত হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে। তাহা ছাড়া, পুথি সংগ্রহের ক্রমিক সংখ্যানুসারে পুথির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলে একই গ্রন্থের একাধিক পুথির বা একই বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থের পুথির বিবরণ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হয়। ইহা মনে করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে পুথি সংগ্রহের বিষয়ানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলনের কাজে হাত দিই। ১৯৩৫ সালে পরিষৎসংগৃহীত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়—১৩৫১ সালে বাংলা পুথির বিবরণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়।[২] উহাতে রামায়ণের ৪২৬ খানি,

১. আবদুল করিম—গোকুল মঙ্গল (সাহিত্য, ১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা), কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত—প্রাচীন পুথির বিবরণ (ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা), অক্রূরচন্দ্র সেন—পূর্ববঙ্গের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য (ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা), কবি জনার্দন (এডুকেশন গেজেট, ১৩১৭-৩১ ভাদ্র)।

২. দীর্ঘকাল পরে ক্রমিক সংখ্যানুসারে পরিষদের বাংলা পুথির বিবরণ সংকলনের কাজ পুনরায় আরম্ভ করা হয়। পরিষৎ পত্রিকার ৬১-৬৪ খণ্ডে ৩২৩ (৪০১-৭২৩) খানি পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহা তৃতীয় খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা রূপে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাভারতের ৮৩৬ খানি ও ভাগবতের ২৯১ খানি বা মোট ১৫৫৩ খানি পুথির বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন-সংগ্রহ সহ ১৩৪২ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত পুথির প্রায় অর্ধাংশের বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাকী অর্ধাংশ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।[৩] ভাগবতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'বিবরণে' অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন আরও প্রায় একশত পুথি আছে। কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্গলের তিনখানি পুথি 'বিবরণে' উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দুইখানি পুথি পরিষৎ-সংগ্রহে আছে। ইহাদের একখানি (২৪৪ চি) ১০৭২ সালের লেখা। কৃষ্ণদাসের নারদ-সংবাদের প্রায় কুড়িখানি পুথির মধ্যে একখানি (২৭৭ চি) ১০২৮ সালে লেখা। ইহার বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ—দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নারদ কর্তৃক কৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণের উত্তর দান। কলিধর্ম, দশাবতার বর্ণন, সৃষ্টিবর্ণন ও ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। যদুনাথ দাসের ভ্রমরগীতা বা ভ্রমর সংবাদ (২৯১·৪, ৩৮চি, ৪২২ চি) ও কোকিল সংবাদ (৩৬০ চি) নামক ক্ষুদ্র পুস্তক দুইখানির প্রথমখানিতে ভ্রমরকে দূত কল্পনা করিয়া কৃষ্ণের নিকট যাইবার অনুরোধ ও তদুপলক্ষে গোপীগণের আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খানির বর্ণনীয় বিষয়—বিরহে ব্যাকুল কৃষ্ণ কর্তৃক এক কোকিলকে শ্রীমতীর নিকট প্রেরণ, শ্রীমতীর কৃষ্ণ সকাশে গমনে অনিচ্ছা জ্ঞাপন, কৃষ্ণ কর্তৃক কোকিলকে পুনঃ প্রেরণ ও পরিশেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন। দ্বিজ ভগীরথের তুলসীচরিত্রে (২৪৩ চি) নারায়ণ কর্তৃক বৃন্দার সতীত্ব হরণ, শঙ্খাসুরবধ, বৃন্দার শাপে নারায়ণের শিলাত্বপ্রাপ্তি ও নারায়ণের শাপে বৃন্দার তুলসীরূপে জন্ম—এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কৈলাস বসুর মহাভাগবত পুরাণে (৭৯৯-৮০১) শিবের বিবাহ, তারকাসুর বধ, রাবণ বধ, প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণের পুথির মধ্যে উল্লিখিত অদ্ভুত রামায়ণও (৫৬৬) ইঁহার রচনা। রামপ্রসাদ রায়ের কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু (১৩৪৯) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে রচিত। এই প্রসঙ্গে জীবন চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গল—নৌকাখণ্ড (৩৫৭ চি), নরহরি দাসের কেশবমঙ্গল (২৩০১), বিপ্র পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল (২২৯ চি), দ্বিজমাধবের কৃষ্ণমঙ্গল (২২৮ চি), সীতারাম দাসের উষাহরণ পালা ও বাণযুদ্ধ পালার (১৩৬ চি, ১৩৭ চি) পুথি উল্লেখযোগ্য।

পাঁচালি মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির পুথি সংখ্যা প্রায় তিনশত। পাঁচালি জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে সত্যনারায়ণ, সত্যপীর বা সত্যদেবের পাঁচালির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি বল্লভ, কালীচরণ, কৃষ্ণধন, কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গারাম দত্ত, পণ্ডিত গুণনিধি, জৈমিনি, নিধিরাম, ফকিররাম (চাঁদ ?), কবিভূষণ, বল্লভদাস, কবি বিদ্যাপতি, কবি বেচারাম, মথুরেশ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ, রামভদ্র, রামেশ্বর, শঙ্কর আচার্য, শিবরাম বাজ, শ্যামদাস দত্ত প্রভৃতি কবির নাম যুক্ত ও কবির নাম শূন্য প্রায় চল্লিশখানি পুথি এই বিভাগে আছে।

---

৩. পরিষদের বাংলা পুথির সাধারণ পরিচয় আমি ইতিপূর্বে পরিষৎ পত্রিকার ৩৯শ ও ৪৮শ খণ্ডে দুইটি প্রবন্ধে এবং পরিষদের বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যার ভূমিকায় প্রদান করিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে ফকিররামের নামযুক্ত রামায়ণের একাংশের একখানি পুথি 'বিবরণে' উল্লিখিত হইয়াছে। কবিরাজ ফকিররাম কবিভূষণের শশিসেনা (৮৮৫) গ্রন্থের একখানি পুথিও পরিষদে আছে। সত্যনারায়ণের উপাখ্যানের বৈচিত্র্য বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

কালিদাস, পরশুরাম, দ্বিজ বিনোদ, দ্বিজ যদুনাথের শনির পাঁচালির পাঁচখানি পুথি, সাগর বসু ও দ্বিজ শ্রীধরের একাদশীর পাঞ্চালী বা একাদশীর মাহাত্ম্যের তিনখানি পুথি, দ্বিজ কালিদাসের সূর্যব্রত পাঁচালি বা সূর্যের ব্রতকথার দুইখানি পুথি, দ্বিজ বৈষ্ণব (দাস) রচিত বাবা হর পাঁচালি, দ্বিজ রামকান্তের জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা, দ্বিজ রামপ্রসাদের সুবচনীর ব্রতকথা, বাণীরাম ঠাকুরের নিয়ত মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালির দুইখানি পুথি, দ্বিজ রঘুনাথের নিকট মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালির দুইখানি পুথি, দ্বিজ গদাধরের জয়মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রতকথা ও গ্রন্থকারের নামহীন ঘোর মঙ্গলচণ্ডীর পুথি পরিষদে আছে। বাংলার লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের ইতিহাসে এগুলির বিশেষ মূল্য আছে।

লক্ষ্মীচরিত্রের চৌদ্দখানি পুথির মধ্যে একখানিতে (২৪১৯) কমলাকান্ত, দুইখানিতে (২১৩৪, ২৩২৭) দয়ারাম দাস, দুইখানিতে (৫৩৯, ১৪০৬) ভরত পণ্ডিত এবং পাঁচ খানিতে (১৭৭, ১ চি, ১৪০৪, ১৪০৫, ২৫২৫) গুণরাজখানের নাম পাওয়া যায়। দয়ারাম দাসের আর একখানি গ্রন্থ ধুনা কুটার পালা (২৩৪৯) সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণনাত্মক কাব্য। জগন্নাথ বন্দনার পুথিতে (৮৪৫, ১৩৫২, ২৩৮৮) গ্রন্থকারের নাম দ্বিজ দয়ারাম—একখানিতে (৮৪৪) দ্বিজ দয়ারাম দাস। দয়ারাম দ্বিজের 'সই সাঙ্গাতীর কথা' (৯২০) ব্যঙ্গাত্মক রচনা মনে হয়। গুণরাজখানের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ 'বিবরণে' উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার নাম-যুক্ত শ্রীধর্মইতিহাস বা কথা ইতিহাসে (২১৭৮) মহাভারতের কাহিনী বর্ণিত আছে। এই গুণরাজখান ও মালাধর বসু অভিন্ন কিনা বলিবার উপায় নাই। সীতারাম দাসের জিবিত বাহন বা জীমূতবাহনের বন্দনার পুথির একটিমাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে (২৪৪৪)—ইহাতে জীমূতবাহনের পূজার কথা আছে। বিষয়টি মূল্যবান্—এজন্য উদ্ধৃত হইল।

করপুটে নতিমান্ বন্দ দেব জিবিতবা [হ]ন
রবিসুত তুমি মহাশয়।
তোমারে পূজয়ে যে সমরে বিজয়ী সে
আপদ বালাই দূর হয়॥
কাকবন্ধ্যাশ্রিত যারা পুত্র কন্যা হয়্যা হারা
তোমার অর্চনা যেবা করে।
ভাদ্রমাসে সিত পক্ষ দেবতা গন্ধর্ব রক্ষ
নাগনর সংসার ভিতরে॥
অষ্টমীতে পূজার পদ্ধতি।
বটপত্রে বেল্য ধান ইক্ষুদণ্ডে অধিষ্ঠান
চতুর্দিগে বেষ্টিত যুবতি॥

আয়াস্থয়া গণ মেলি সবে দেয় হুলাহুলি
বাদ্য ভাণ্ড বাজে নানারূপ।
নানা পুষ্প মাল্য চুয়া তাম্বূল কস্তুরি গুয়া
চন্দন অগৌর ধুনা ধূপ ॥
গিরিসি যাহার মাতা দিবাকর যার পিতা
আপনে বিজয়ী তিন লোক।
তোমার চরণে মন সদা বাঞ্ছে যেই জন
নাহি জানে ধনপুত্র শোক ॥
জগত বিখ্যাত নাম প্রতাপেতে অনুপাম
ত্রিভুবনে তোমার পূজন।
সীতারাম দাস গায় নায়েকেরে বরদায়
হবে প্রভু জি [বি] ত বাহন ॥

ইহাতে পূজার দিন ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্জিকায় ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী এই পূজার দিনরূপে নির্দিষ্ট। স্মার্ত রঘুনন্দন এই পূজার কোনও উল্লেখ করেন নাই। শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাচস্পতিমিশ্রকৃত চমৎকারচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ হইতে একটি শাস্ত্রীয়বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই বচন অনুসারে গৌণ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে পুত্রসৌভাগ্যকামনায় নারীগণের শালিবাহন রাজপুত্র জীমূতবাহনের পূজা কর্তব্য। শ্রীসুখময় সরকার বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত জিতাষ্টমীর ও আনুষঙ্গিক জীমূতবাহন পূজার বিবরণ দিয়াছেন (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬১, পৃ. ৫২৯-৩০)।

মঙ্গলকাব্যের পুথির সাধারণ পরিচয় পত্রিকার প্রবন্ধে এবং 'বিবরণে'র ভূমিকায় পাওয়া যাইবে। কবীন্দ্রের কালীর মঙ্গলের একখানি পুথির কথা এই ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে, আর একখানি পুথির অংশ হইতেছে ৯২৭ সংখ্যক পুথি। অকিঞ্চন দাস ও দ্বিজ মধুকণ্ঠের জগন্নাথমঙ্গল (২৬৪৯, ৮৪৭), দামোদর দাসের শ্রীদারুব্রহ্ম (৯৪৯) ও কালিদাস বসুর নীলাদ্রিচন্দ্রিকার (৯৪২, ১৬৪১) কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। দ্বিজ কবিচন্দ্রের কপিলামঙ্গলের দশ খানি পুথি ও দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর আট খানি পুথি ইহাদের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দান করে। গঙ্গা ও সরস্বতীর বন্দনার স্বতন্ত্র পুথি অনেকগুলি আছে। কবিকঙ্কণের গঙ্গার বন্দনার পাঁচখানি পুথি, নিধিরামের আট খানি, দ্বিজ অভিরামের এক খানি ও কবি শঙ্করের এক খানি। সরস্বতীর বন্দনা আছে বাসুদেব দাসের দুই খানি, কৃষ্ণচরণের এক খানি ও শ্যামাচরণের এক খানি। ইহা ছাড়া, জয়কৃষ্ণ দাসের মদনমোহনের বন্দনা তিন খানি, গোবিন্দরামের কালিঞ্জরের বন্দনা (১৫৫০), কবি বিষ্ণুদাস ও ৯৭৪ মল্লাব্দে রচিত কবি মদ্ধানের দিগ্‌বন্দনা, শ্যাম শর্মার দিগ্‌দেবী বন্দনা (৯২৯) উল্লেখযোগ্য। ১০৭৭ সালের হস্তলিখিত কলিমঙ্গলে (২৪০৬) ও বাঞ্ছারাম দেব রচিত কলিমাহাত্ম্যকথায় (৯৩৩) কলির অধর্ম ও অনাচারের বর্ণনা

দেওয়া হইয়াছে। বৈদ্যনাথমঙ্গলে (২৩৫৩) বৈদ্যনাথ শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল-নল দময়ন্তী (১৯০৬) ও গৌরীমঙ্গল (১৮০৫) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত ও মুদ্রিত হয়। রামচন্দ্রের মাধবমালতীর পুথিও (৯৬২) পরিষদে আছে। এই পুথির লিপিকাল ১২৪০ সাল। পুথিগুলি মুদ্রিত সংস্করণ হইতে নকল করা হইয়া থাকিতে পারে। পরিষদের পুথিশালার শৃঙ্গাররসপদ্ধতি (২১২৫) ও শৃঙ্গারতিলকপদ্ধতি (২৩৮৬) মুদ্রিত পুস্তকের প্রতিলিপি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৯।১৫৯)।

সংস্কৃত পুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রথমে কয়েকখানি তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এই বিভাগে শ্রীনাথের কামরত্ন (২৬৯৬), ভূতডামর তন্ত্র (১৮২৭), ব্রহ্মানন্দের [কৌলমার্গ] (২৭১০), ও হরমেখলা (২৬৮৫) উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিশাস্ত্রে পাতি লিখিবার ধারা (২৩৬৯), গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের দায়ভাগ ও অশৌচ ব্যবস্থা (২৭১১), দ্বিজ কালীশঙ্করের অশৌচ ব্যবস্থা নির্ণয় (২৬৯৫), রাধাবল্লভ শর্মার স্মৃতিকল্পদ্রুম—শ্রাদ্ধমঞ্জরী (১৫৬১); বৈদ্যকশাস্ত্রে রামনাথ বৈদ্যের রোগবিবরণ (২৬৬২), বালবোধিনী (২৬৫৯); কামশাস্ত্রে শৃঙ্গারপদ্ধতি (২১২৫), শৃঙ্গারতিলক পদ্ধতি (২৩৮৬), রসিকদাসের রতিবিলাস পদ্ধতি (২১৩০), পদ্মপুরাণানুবর্তী রতিশাস্ত্র (৯২৫, ১৫৫২, ২১২৯); জ্যোতিষশাস্ত্রে পঞ্জিকায় উদ্ধৃত জ্যোতিষবচনের অর্থ (২৫৩৯); অলঙ্কার ও সঙ্গীতশাস্ত্রে কবিবল্লভের রসকদম্ব (১৪৯৩), পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী (১৯৯, ৯৮১), রাধামোহন প্রভুর শিষ্য উদ্ধবদাসকৃত তালমালা ও রাগমালা (২১২৭) নানাদিক দিয়া আলোচ্য। শাস্ত্রাতিরিক্ত গ্রন্থের মধ্যে নীতিশ্লোকের অনুবাদ[৪] (৩৬৬, ৯৪১, ২১৪৯), হিতোপদেশ (২১৫৯), সিংহাসন বত্রিশা (৮৯৫), বত্রিশ পুত্রিকার পুস্তক (৮৯৪) ও মহিম্নঃস্তব (২১৫০) উল্লেখযোগ্য। একখানি নামহীন খণ্ডিত পুথিতে (২৪২৭) জীবহত্যার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাদের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী শাখায় চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন (১৭৯) নানা কারণে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, রায় শেখর, ভূপতি নাথ, দ্বিজ ধনঞ্জয়, গৌরকিশোর দাস, দ্বিজ রামচন্দ্র—ইঁহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পদসংগ্রহের পুথি আছে। বিভিন্ন কবির পদাবলী সংগ্রহের মধ্যে অনেকগুলিতেই সংগ্রাহকের কোনও নাম পাওয়া যায় না। নামযুক্ত সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যায় হরিবল্লভ বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গীতচিন্তামণি (৯৮২খ, ২৫৪৯), রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র (৯৮২ চ, ২৫৪৬, ২৩৭২), বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু বা গীতকল্পতরু (২৩৭৪, ২৩৭৩, ২০৫৮,

৪. কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার নাম মোহমুদ্গর (৮৫৭-৯, ১৬৭৩)। এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের নাম ব্যবহারপ্রদীপ (১৫৬০)।

২০৫৭, ৯৮২ ঙ) ও ১২১৩ বঙ্গাব্দে রচিত ও ১২১৪ বঙ্গাব্দের হস্ত লিখিত কমল শ্রীকরণের পদরত্নাকর (৯৫৩)। শাক্তপদাবলীর মাত্র একখানি পুথি আছে (২২৬৯)।

কতকগুলি পুথিতে পারিবারিক বা স্থানীয় ইতিহাস ভূগোল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি বিশেষ প্রাচীন না হইলেও মূল্যবান্। বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল (২১৪৪) পরিচিত গ্রন্থ। ইহার একটি সংস্করণ পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মহানন্দ চক্রবর্তীর তীর্থযাত্রার নির্ণয় (১৯৬৫), ব্রহ্মপুত্র তীর্থযাত্রা বর্ণনা (১৯৬৬), শ্রীক্ষেত্র তীর্থযাত্রাবর্ণনা (১৯৭০), রেলপথভ্রমণ বর্ণনা (১৯৭১), পাকুড়ের প্রাচীন রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯৭২) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মহানন্দ পাকুড়-রাজের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন মনে হয়। শ্রীক্ষেত্র তীর্থযাত্রা বর্ণনের পুথির মধ্যে পাওয়া একখানি কাগজে কবির বংশলতিকা লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে কবির পূর্বপুরুষ রঘুনাথ দুবের নাম আছে। রঘুনাথের পুত্র প্রাণবল্লভ পাকুড়ের জমিদারের নিকট হইতে চক্রবর্তী উপাধি লাভ করেন এবং বংশানুক্রমে ইহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। মহানন্দের গ্রন্থ-রচনার কাল ১২৬৪ সাল হইতে ১২৮০ সাল পর্যন্ত। মহানন্দ নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন এবং অবসরমত গ্রন্থ রচনা করিতেন। গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত ও রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের উপসংহার ভাগ হইতে ইহা জানা যায়। দেশের দুঃখকষ্টের চিন্তা কবিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। তিনি কোন কোন গ্রন্থের শেষে দেশের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

১২৬৬ সালের ৯ই শ্রাবণ এই তারিখযুক্ত স্যমন্তক মণিহরণের পুথির শেষে তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

অবশেষ নাহি ভাষ কেমনে রচিব।
অনাবৃষ্টি হৈল দেশ কিসে রক্ষা পাব ॥

১২৭৪ সালের ফাল্গুনে প্রারব্ধ ও ১২৭৫ সালের শ্রাবণ মাসে সমাপ্ত রামায়ণের আদিকাণ্ডের শেষে তিনি বলিয়াছেন—

ঘন না বরিষে ঘন এই [বড়] খেদ ॥
অতি মন্দ বরিষণ অনাবৃষ্টি প্রায়।
সবে চিন্তাকুল সে সময় বঞ্চয় ॥

১২৮০ সালের কোজাগর পূর্ণিমায় সমাপ্ত রামায়ণ উত্তরাকাণ্ডের পুথিতেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়—

বৃষ্টি বিনে সৃষ্টি নাশ লোকে কষ্ট পায়।
কোথা শস্য উপজিল কোথা কিছু নাই ॥
গ্রামে উপজিল শস্য জল বিনে মরে।
কিঞ্চিৎ হইলে বারি রক্ষা পাইতে পারে ॥

গগনে মেঘের নাহি দেখিয়ে সঞ্চার।
আরম্ভ হইল শীত বৃষ্টি হওয়া ভার ॥
যেছিল সম্বল তাহা হইল অবশেষ।
এবি কি হইবে তাই ভাবিয়া অশেষ ॥

প্রসঙ্গক্রমে রাজার অসুখে রাণী কর্তৃক রাজ্য পরিচালনার উল্লেখ করা হইয়াছে —

বেদনায় শ্রেষ্ঠ বাবু আছেন কাতর।
ভূপতি বিহীনে রাণী রাজ্য অধিকারী ॥

মহানন্দের রেলপথ ভ্রমণ বর্ণনা একটি কৌতুকপূর্ণ রচনা। মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে মফস্বল হইতে রেলযোগে কলিকাতায় আসার একটি সরস বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। রেলপথ প্রবর্তনের সমসময়ের কবির লিখিত এই বিবরণ কল্পনাপ্রসূত হইলেও ইহা নূতন যন্ত্রদর্শনে তৎকালীন জনসমাজের বিস্মিত মনোভাবের অকৃত্রিম চিত্র প্রকাশ করিতেছে। ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার মূল্য যাহাই হউক না কেন বাঙালি পাঠক ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। আধুনিক যুগের গোড়ার দিকের এই সাহিত্যসাধক আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত।

জাতিগত ইতিহাসের দুইখানি ছোট পুথি আছে। একখানি পরমেশ্বরী দত্তের তিলি জাতির কুল আর্যা (২৫৩৬), অপরখানি তন্তুবায় কুলপঞ্জি (২১৭৮)। চরিতকাব্যের মধ্যে মথুরদাসের মুরারিচরিত্র (২৬২চি) উল্লেখযোগ্য।

অনেকগুলি পুথি অত্যন্ত খণ্ডিত—বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পাতা মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য। কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহার সাহায্যে অনতি প্রাচীনকালের বাঙালি চিন্তাধারার নানাদিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অক্ষরচৌতিশায় (১৫৫৪-৫) ককারাদি বর্ণের সাহায্যে কৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা—

চএ বলে চিন মন চৈতন্য থাকিতে।
চিত্তভ্রম হৈয়া লুক চলে অন্যপথে ॥
চিন রে পরমপদ লয় পরিচএ।
চারিবেদে কহে হরি তুমি দয়ামএ ॥

আজির চৌতিশায় (৯৩৯) ককারাদি বর্ণের সাহায্যে নীতিকথা বলা হইয়াছে। যথা—

আজি অক্ষরের আদি নহে চৌতিশার ভিন্ন।
আজির আকৃতি নাই অক্ষরের চিহ্ন ॥
আজির প্রলাপে গিয়া সঙ্গে আদি পাএ।
আদি অনাদি দেব বন্দম মাতাএ ॥
কদাচিত না ছাড়িঅ আপনার ভোল।
কুটুম্ব অধীন হৈলে জীবন বিফল ॥

কুৎসিত আচার কর্ম্ম কভু না করিঅ।
কুচ[রিত্র] লোকেরে জে ইষ্ট না বলিঅ॥
খর কথা না কইঅ রাজার সাক্ষাত।
খলতা বাড়াইলে পুনি হইব বিবাদ॥

জ্ঞানভারত (২৩৩৩) নাম দেখিয়া ইহাকে মহাভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার একটিমাত্র রক্ষিত পত্র হইতে ইহার সঠিক বিষয় নির্ণয় করা যায় না। ইহার আরম্ভ এইরূপ—

জ্ঞানভারথ পুস্তক লিক্ষতে।
বিজয়পণ্ডিত নামে পুরথি।
দিগ্‌বিজয়তুল্য পণ্ডিত হৈল জেন মতে॥
চরণে পূজিঞা তার বিদ্যালাভ হৈল॥
সেই গুরুপ্রসাদে হৈল বিচক্ষণ।
রচিল গোপ্ত কথা শ্রীগুরুচরণ॥
গুরুমুখে যত কথা ভেদ পাইল।
জ্ঞানভারথ নামে পুস্তক রচিল॥
... ...
শুন ভাই সর্ব্বজন বচন সুসার।
গুরুর প্রসাদে বিদ্যা পাইল অনন্তার॥
ছোটবড় গুরু কাকো না করে ঘৃণা।
তে কারণে পাইল বিদ্যা করিয়া কামনা॥
বিজয়ের ল পণ্ডিত পাইল যেবা স্থানে।
চরণে ভজিয়া বিদ্যা লইলো ভাল মনে॥

সোনা রূপা এবং উহু শব্দের শ্লোকের (২১৩৩) ইহার প্রথম দিকটা হেঁয়ালির মত—

সোনা রূপা তামা কাসা রাঙ্গী লোহা পিতল সিসা।
ধান চাউল চিরা খই পত্র মাটি করি লৈ। সোলক১
মানব কথাএ পীতল লই চিরা রাজ কোরি হএ।
সোনা তামা ধান পত্র পাই। ২। কোরি চিরা চাউল
লএ মাটি তামা লোহা হএ। ইচ্ছা হইলে পিতল রূপা লই॥ ৩॥

উহু শব্দের শ্লোকের বিষয় এইরূপ—বিক্রমাদিত্য তাঁহার নবরত্নসভায় উহুশব্দের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতগণ বলেন—যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিলে তিনি 'উহু' বলিয়াছিলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিবার সময় সুভদ্রা 'উহু' বলিয়াছিলেন, রাজপুত্রের বিরহে রাজকুমারী 'উহু উহু' করিয়াছিলেন, কুলবধূগণ হাতে শাঁখা পরিবার সময় 'উহু উহু' করেন—এইরূপ উহু শব্দের অনেক মাহাত্ম্য আছে।

কাপাসের পালায় (৪২৫) কাপাসের মাহাত্ম্য উল্লিখিত হইয়াছে—

বৎসরের মধ্যে ভাই কাপাস ফসল।
ইহাতে পরম সুখী সংসার সকল ॥
লোকের কারণে সৃষ্টি করিল ঈশ্বর।
সভার বাসনা বড় পরিতে কাপড় ॥
... ...
সকলের মধ্যে ভাই কাপাস ফসল।
অনেক আসয় করে সংসার সকল ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় করিয়া ভাবনা।
সর্বেশ্বর সভাকার পুরাহ বাসনা ॥

সইসাঙ্গাতীর কথার (৯২০) দ্বিতীয় পত্রটি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। ইহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

... ... রভূঞি নগরে।
বিবিরা সয়ান করে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
গোড়ন্দাযে নন্দির মাঝে লাগ্যা গেল ঘটা।
ধুম ধুম ধুম পড়িছেরে কি লাগিল হলো কুটা ॥
ঘরকে আসি দুই জনাতে যুক্তি কৈল মনে।
আমরা করিব সই কার ঘরের সনে ॥
দেখি আগে সকল লোকে কেমন রূপ করে।
আমার মনে সাদ আছে করিব রায়ের ঘরে ॥
ইতর যতেক লোক কাছে থাকে বস্যা।
তারা সোই সাঙ্গাতির কথা শুন্যা সবাই মরে হাস্যা ॥
... ...
বাপ বড়াপের শ্রাদ্ধ গেল সোইসাঙ্গাতি হৈল।
ঘরের শালগ্রাম চাউল না পায় মনসাদেবী আইল ॥
বিষ্ণুপুরে ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা।
সয়ার হাথে হাথ দিঞা ফিরিছে কতজনা ॥
... ...
আমি আপন জালায় পুড়্যা মরি মাগি হৈল কাল।
আজি করি সই সাঙ্গাতি পাছে হবে শাল ॥
জনমে জনমে নাহি হবে হেন সুখ।
দয়ারাম দ্বিজে কয় দেখ সইয়ের মুখ ॥

বেথুন সোসাইটি

সপ্তম প্রস্তাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দীর্ঘ তের বৎসর যাবৎ বেথুন সোসাইটি দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মিলন-ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। বিবিধ বিদ্যার আলোচনায় তাঁহারা অভিনিবিষ্ট হন। ভারতীয় সমাজের কল্যাণকর নানা বিষয়েরও আলাপ-আলোচনা হইত এখানে। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখিয়াছি, এখানকার অধিবেশনগুলিতে যে-সব বিষয় আলোচনা হইত তাহাকে ভিত্তি করিয়া কলিকাতার কতকগুলি সুফলপ্রদ প্রতিষ্ঠানও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের কথা এখানে বলিতে পারি। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনায়ও যে ইহা সাহায্য করিতে পাবে সে সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র সেন পূর্ব্ব বৎসরে একটি বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের কোন কোন বিদ্বান্ ও সমাজ-নেতা এখানে আসিয়া বক্তৃতা দিয়া যান। ভারতবর্ষে তখনও সেন্সাস গ্রহণ শুরু হয় নাই। মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ সরকারীভাবে সেন্সাস গ্রহণের ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বেই বেথুন সোসাইটির একটি বিশেষ অধিবেশনে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এইরূপে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজকল্যাণকর বিষয়াদি সম্বন্ধে সুধীবৃন্দ সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান করিতে থাকেন।

সোসাইটি চতুর্দ্দশ বৎসরে (১৮৬৬-৬৭) পদার্পণ করিল। এবারে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হইল পাঁচটি এবং বিশেষ অধিবেশন দুইটি। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন নিয়মিত অধিবেশন বলিয়া ধরিলে অবশ্য ছয়টি মাসিক অধিবেশনই হইয়াছিল। সোসাইটির ছয়টি বিভাগের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। তবে মাসিক অধিবেশনগুলি প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে যথারীতি হইতে লাগিল। আলোচ্য বৎসরের বিশেষ অধিবেশনগুলি বেশ মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। সভাপতি জি. বি. ম্যালেসন প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করেন শিক্ষা-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর হেনরি উড্রো। সভাপতির ভাষণে প্রথমেই তিনি বলেন যে, বিভাগগুলির কার্য্যকারিতা সকলেই স্বীকার করিলেও ইহার কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সোসাইটির আর্থিক অবস্থাও তেমন আশাপ্রদ নয়। এই দুইটি বিষয়ের দিকে তিনি সদস্যদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলেন। এই দিনের বিশেষ কার্য্য—বেথুন সোসাইটির দুইজন প্রধান সদস্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। এই বিষয়ে এখন বলিতেছি।

বিগত বৎসরে কলিকাতায় লর্ড বিশপ কটন এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সভাপতি উড্রো বক্তৃতায় কটনের গুণপনা এবং আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে একটি

মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। লর্ড বিশপ কটন সোসাইটির একজন বান্ধব ছিলেন। তিনি এখানে তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শেষ বক্তৃতা মাত্র পূর্ব্ব বৎসর প্রদত্ত হয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহার আভাস দিয়াছি। এই সময়ে, ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি, ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে জাতি-বৈরিতা বা জাতি-দ্বেষিতা প্রকট হইয়া উঠে। এই জাতি-বৈরিতা প্রশমনকল্পে যে-সব ইউরোপীয় অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে লর্ড বিশপ কটন ছিলেন শীর্ষস্থানে। কটন ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের ভিতরে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। উড্রো বলেন, তিনি আসাম-ভ্রমণে কটনের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার মানব-প্রীতি, বিশেষতঃ ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। আসাম-ভ্রমণ পরিসমাপ্তির পর ষ্টীমারে কুষ্টিয়ায় তাঁহারা আসেন। কূলে উঠিবার কালে কটন জলে পড়িয়া ডুবিয়া যান, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার আর খোঁজ মিলিল না। উড্রোর চোখের সম্মুখেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ছিলেন সোসাইটির অন্যতর সহকারী সভাপতি। সোসাইটির বিবিধ কর্ম্মে তাঁহার সহায়তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে যুগে কলিকাতায় যত রকম জনহিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই প্রতাপচন্দ্রের যোগ ছিল। এইমাত্র যে আর্ট স্কুলের উল্লেখ করিলাম তাহার স্থাপনায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তদীয় ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ইহার জন্য লোয়ার চিৎপুর রোডে একখানি ভবন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুতে সোসাইটি একজন সত্যকার বান্ধব হারাইলেন। কটন ও প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুতে সোসাইটি দুইটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রতাপচন্দ্রের উপর শোকপ্রস্তাবটি এই :

> "That this Society deeply deplores the death of their Vice-President, the late Rajah Pertap Chunder Singh Bahadur, whose many amiable qualities, united to the possession of a princely fortune, enabled him to win the esteem and admiration of the Society by his kindly disposition, his graceful manners and his liberal contribution in furtherance of the objects of the Society.
>
> "They accordingly desire to record their appreciation of the qualities and their sense of gratitude for the many benefits conferred by him upon the Society."

সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ। সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি জি. বি. ম্যালেসন অনিবার্য্য কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সোসাইটির পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, পূর্ব্বে বক্তৃতাও দিয়াছেন কোন কোন বিষয়ে। ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে বিশপ কটনের ন্যায় তিনিও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি এদেশীয় ভাষা জ্ঞাত থাকায় দেশীয়দের মনোভাব জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার পদত্যাগে সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ হন। একটি উপযুক্ত প্রশংসাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সভা নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন।

সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভা ম্যালেসনের স্থলে সভাপতি পদে নিয়োগ করেন হাইকোর্টের বিচারপতি জন বাড ফিয়ারকে। ফিয়ার সাধারণ সভায় বিশেষভাবে অভিনন্দিত

হইলেন। তিনিও ছিলেন ভারতবাসীর দরদী বান্ধব। বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে তিনি ও তাঁহার পত্নী নিজেদের ব্যাপৃত করেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের বহু সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের ঐকান্তিক সহায়তালাভে সমর্থ হইয়াছিল। ফিয়ার সভাপতির প্রথম ভাষণে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতি ম্যালেসনের গুণপনার বিশেষ উল্লেখ করেন। সোসাইটি ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মিলন-ক্ষেত্র এবং উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের একটি প্রধান উপায়। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপনের একটি উৎকৃষ্ট পন্থার বিষয় ভাষণে উল্লেখ করেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের নারীজাতির ভিতরে পরিচয় স্থাপন এবং ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারিলে মিলনের প্রতিকূল বাধাগুলি বিদূরিত হইতে পারিবে। তিনি এইজন্য এখানকার স্ত্রীশিক্ষার যথাযোগ্য আয়োজনের কথা পাড়িলেন। যেটুকু আয়োজন চলিয়াছে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য বটে, কিন্তু আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। এই সভায় কুমারী মেরী কার্পেণ্টার উপস্থিত ছিলেন। ফিয়ার তাঁহার উপস্থিতির বিষয় সকলকে জানান। তাঁহার দ্বারা এ দেশে নারীজাতি যে বিশেষ বল পাইবে তাহাও তিনি বলিতে ভুলিলেন না। কুমারী কার্পেণ্টার নারীজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন এবং এ সমুদয়ের উন্নতির পন্থা নির্ণয়ের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি পর পর কয়েকবারই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি এই অধিবেশনের দুই দিন পূর্ব্বে সোসাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। ইহার কথা পরে বিশদভাবে বলা যাইবে।

সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হয় ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৬৭ তারিখে। বিচারপতি ফিয়ার যথারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এ দিনকার বক্তা—প্রাক্তন সভাপতি মেজর জি. বি. ম্যালেসন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—"The Empire of Akbar" বা আকবরের সাম্রাজ্য। ম্যালেসন ঐতিহাসিক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গত শতাব্দীতে ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরে ম্যালেসনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আকবর এবং তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, শাসন-প্রণালী, হিন্দু-মুসলমানে ব্যবহার-সাম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। ম্যালেসন নিজ বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বক্তৃতার উপসংহারে একটি বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিলেন। তিনি বলেন—

> "The successors of the adventurers who followed Clive are better administrators than the adventurers who followed the son of Humayun. It is for the people of Hindustan to point the moral. Let them shew themselves in all things capable, let them cast aside those prejudices which weigh them down with the weight of ignorant ages, let them shew themselves as enlightened as the most enlightened monarch of Hindustan, and it is certain that they will then no longer have to complain that India is not even in this respect governed on the principles of Akbar."

ম্যালেসনের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, হুমায়ুনের বংশধরেরা এদেশীয়দের মধ্যে এক শ্রেণীর বীর্য্যবান্ ও শাসনদক্ষ লোক পাইয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে আগত মোগলদের অপেক্ষা ছিলেন উন্নততর। কিন্তু ক্লাইবের সমকালীন ও পরবর্তী ইংরেজেরা ঐসকল মোগল অভিযানকারীদের অপেক্ষা নানা বিষয়ে উন্নততর ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেশ-শাসন কার্য্যে লাগান হইয়াছে। তাঁহারা এদেশীয়দের দ্বারা উন্নততর বিবেচিত হইতেছেন। ভারতবাসীদের উচিত, এখন তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করা। তাহা হইলে তাঁহারাও ক্রমে দেশ শাসনে আগের যুগের মত অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন।

ম্যালেসনের এই উক্তির মধ্যে সেযুগের সদাশয় মহানুভব ইংরেজদের মনোবৃত্তির প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা, শুধু তাঁহারা কেন, ভারতীয়রাও তখন এদেশ যে একদা স্বাধীন হইতে পারিবে এরূপ হয়ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

সোসাইটির চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে (১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৭) সভাপতি ফিয়ার উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্থলে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্যামুয়েল লব্। সোসাইটি সংক্রান্ত ঘরোয়া মামুলি কায্য সম্পন্ন হইবার পর লব্ বলেন যে, গত ও বর্ত্তমান সেসনে এখন পর্য্যন্ত একজন মাত্র ভারতীয় সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, ভারতীয় সুধীবৃন্দ অধিক সংখ্যায় বক্তৃতাদি দিতে আগাইয়া আসিবেন। সোসাইটির অন্যতম প্রধান সদস্য কিশোরীচাঁদ মিত্র ইহার উত্তরে বলেন, কার্য্যবিবরণী দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ভারতীয়েরা উক্ত বিষয়ে কখনও পশ্চাৎপদ নন, তবে সাময়িকভাবে হয়ত কিছুকাল এরূপ হইয়া থাকিবে। এ দিনের বক্তা রেভারেণ্ড ডন। বক্তৃতার বিষয়—"Oliver Cromwell"। অলিভার ক্রম্ওয়েল ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে কয়জন বীর ইংরেজ অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ক্রম্ওয়েলের নাম সকলের আগে মনে পড়ে।

সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৬৭ তারিখে। এদিন সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি ফিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এদিনকার বক্তা ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—"Hindu Philosophy" বা হিন্দু-দর্শন। মূল বক্তৃতাটি আমরা সোসাইটির প্রবন্ধ-পুস্তকে পাই না বটে, তবে যে সারাংশ কায্যবিবরণে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা হইতে ঐ সময়ে বিদগ্ধ-সমাজে হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে কি ধারণা প্রচলিত ছিল জানা যায়। বক্তা প্রথমেই এইরূপ একটি মতবাদের উল্লেখ করেন যে, কাহারও কাহারও ধারণা গ্রীক-দর্শন হইতে হিন্দুর ষড়দর্শনের উৎপত্তি। তিনি যুক্তিপ্রমাণ প্রয়োগে দেখাইলেন, হিন্দু-দর্শন গ্রীক-দর্শনের বহু পূর্ব্বেকার এবং দুইটিই সহজভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে গ্রীক-দর্শনে হিন্দু-দর্শনের প্রভাব পড়া বিচিত্র নহে। ঐ সময়কার আর একটি মতবাদ এই যে, হিন্দুর ষড়দর্শন বৌদ্ধ-দর্শনের পরবর্ত্তী এবং ইহা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বৌদ্ধ মতবাদ সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী হওয়ায় এইরূপ ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। বক্তা এই মতবাদও ক্ষালন করিতে সমর্থ হন। বক্তা ইহার পর হিন্দু-দর্শনের বিবিধ পর্য্যায় বা স্তর বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত বিশদ ভাবে আলোচনা করেন।

সোসাইটির বিশেষ অধিবেশন তুইটির কথা এখন বলিব। প্রথম বিশেষ অধিবেশন হইল ১১ই ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে। বিচারপতি ফিয়ার সভাপতি হইলেন। এ দিনের প্রধান বক্তা ছিলেন কুমারী মেরী কার্পেণ্টার। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—"The Reformatory School System and its influence on Female Criminals"। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার সম্বন্ধে অন্যত্র কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। তিনি সমাজকল্যাণে একান্তভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও একটি পরিচয় আছে। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত-প্রবাস কালে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং *Last days of Rajah Rammohan Roy* শীর্ষক একখানি পুস্তক লেখেন। যৌবনকাল হইতেই তিনি ভারতবর্ষের একজন হিতৈষী বন্ধুরূপে কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু বিলাতেও সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া তিনি স্বদেশবাসীর বিশেষ প্রীতি-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। তিনি সমাজকল্যাণ উদ্দেশ্যে যে বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই ছিল এই বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু—অর্থাৎ, বিবিধ কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ব্যবস্থা এবং বালিকা অপরাধীদের উপর উহার প্রভাব।

কুমারী কার্পেণ্টারের বক্তব্য বিষয় কতকটা সীমিত হইলেও তিনি এ বিষয়ে বলিবার পূর্ব্বে নিজ কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালী কাজকর্ম্মেও দক্ষ হইয়া উঠেন। তিনি যৌবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে বালিকাদের সাধারণ শিক্ষা, সীবন শিক্ষা ও ছোট ছোট শিল্প শিক্ষারও আয়োজন করিয়াছিলেন। এখানে শিক্ষিত হইয়া বহু ছাত্রী শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ গৃহিণী হইয়াছেন, আবার কেহ কেহ সমাজ সেবায়ও তৎপর হইয়াছেন। কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে তিনি দেখিলেন সমাজে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা, ধরুন সাত-আট বৎসর বয়স, নানারূপ অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত। কারাগার হইতে বাহির হইয়া তাহারা পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়, বরং তাহাদের অপরাধপ্রবণতা ক্রমশঃ বাড়ে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাগী আসামীতে পরিণত হয়। পাঁচ বার কি সাত বার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াও তাহাদের স্বভাব কিছুতেই শোধরায় না। সামান্য তুই একবার এরূপ কারাজীবন যাপন করিলেই যে ভয়ঙ্কর দাগী বনিয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে জেল খাটিয়া তাহারা স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত হইয়া যায়। ইহারই ফলে সমাজের অশুভ ঘটেও বিস্তর।

এই বিষম অবস্থার প্রতিকার মানসে কুমারী কার্পেণ্টার একটি 'রিফর্মেটরি স্কুল' খুলেন। কিন্তু শিশু ও কিশোর অপরাধীদের পাইবেন কোথা হইতে? তাহারা তো দণ্ড লইয়া কারাগারে আশ্রয় লয়। তিনি কারামুক্ত কিশোরদের সংশোধনাগারে প্রথমে স্থান দিতেন। যাহাতে অপরাধী অল্পবয়স্কদের কারাগারে না পাঠাইয়া রিফর্মেটরি স্কুলে পাঠানো হয় সে উদ্দেশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। সাত বৎসর কাল তিনি অপরাধী বালকদের

ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে থাকেন। ইহাতে বেশ সুফল পাওয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ১৮৫৪ সালে পার্লামেণ্টে শিশু-অপরাধীদের সম্পর্কে এই মর্ম্মে আইন পাস হইল যে, দণ্ডপ্রাপ্ত শিশু ও কিশোরদের কারাগারে না পাঠাইয়া রিফর্মেটরি বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অন্যূন সাত বৎসর হইতে অনধিক ষোল বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত শিশু ও কিশোরদের এই ধরণের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে। বলাবাহুল্য, কুমারী কার্পেণ্টারের স্কুলের আদর্শে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সরকার এ বিষয়ে তাঁহাকে ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে শুরু করিয়া দেন। প্রথমে মেয়ে অপরাধীদের নিমিত্ত তিনি এ ব্যবস্থা করেন নাই, মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহাদের জন্যও বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। তিনি অতঃপর মেয়ে অপরাধীদের কথাই বিশেষভাবে বলিলেন। তাহারা স্বাধীন দেশের অধিবাসী। তাহারা উচ্ছৃঙ্খল, একগুঁয়ে ও অসংযত আচরণের নিমিত্ত কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে বিস্তর। তাহাদিগকে স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। তিনি সঙ্গে করিয়া এই সব অপরাধী ও অপরাধপ্রবণ মেয়ের কতকগুলি ফোটো আনিয়াছিলেন—স্কুলে প্রবেশকালীন ফোটো এবং স্কুল হইতে বিদায়কালীন ফোটো। পাঁচ-ছয় বৎসর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিয়া জীবনযাপন করিবার ফলে তাহাদের চেহারার কতই না পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! কুমারী কার্পেণ্টার বলেন, এই সব মেয়ের অনেকে এখন ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জ্জনে নিয়োজিত হইতেছে। সমাজ তাহাদের দ্বারা উপকৃত না হইয়াই পারিবে না। বক্তা এদেশে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেন। তবে এখানেও যে রিফর্মেটরি স্কুলের মত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে উপকার হইবে তাহা তিনি আহ্মেদাবাদে কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল এবং পরিত্যক্ত অনাথ শিশু দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন। রিফর্মেটরি স্কুলে অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সাধারণ বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সেলাই শিক্ষা ও কিছু কিছু কুটীর শিল্পও ছাত্রীদের শেখানো হয়। ইহার ফলে তাহারা গৃহকর্ম্মে সুনিপুন হইয়া থাকে। শিক্ষিত ও আচরণে ভদ্র হওয়ায় পরিবারে তাহারা হয় পত্নী নয় পরিচারিকারূপে গৃহীত হইয়া থাকে। বাংলার মনোমোহন ঘোষ এবং বোম্বাইয়ের বালকৃষ্ণ তাঁহার বিদ্যালয় দেখিয়া আসিয়াছেন।

বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি ফিয়ার উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে কুমারী কার্পেণ্টারকে প্রশ্ন করিতে বলেন। পাদ্রী লঙ্ প্রশ্ন করেন—তাঁহার বিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা। উত্তরে কার্পেণ্টার বলেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। লঙের আর একটি প্রশ্নের উত্তরে কুমারী কার্পেণ্টার বলিলেন যে, জায়গার অসংকুলানহেতু ছাত্রীদের উদ্যান-রচনা (gardening) সবক্ষেত্রে শেখানো সম্ভব নয়। ব্রিটেনের শহরগুলিতে যে-সব ঘরবাড়ী আছে তাহাতে বাড়তি স্থান নাই বলিলেই হয়। তথাপি যেটুকু জায়গা পাওয়া যায় তাহাতে ফুলগাছ

জন্মানো হয়। ব্রিটিশ জাতি ফুলের এত প্রিয় যে, জানালার ফাঁকে ফাঁকে পর্য্যন্ত ছোট টব বসাইয়া বহু ফুলগাছ জন্মায়। ফুটন্ত ফুলে শুধু গৃহস্থেরাই আনন্দ পায় না, পথচারীদেরও উহা আনন্দবর্দ্ধন করে। এদেশে এত জমি-জায়গা থাকা সত্ত্বেও ফুল গাছের অভাব দেখিয়া কুমারী কার্পেণ্টার বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সভাপতি ফিয়ার উপসংহার-বক্তৃতায় কুমারী কার্পেণ্টারকে বিশেষ সাধুবাদ করিলেন। তিনি বলেন যে, কুমারী কার্পেণ্টার এদেশে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের অবস্থা-দৃষ্টে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকই এই ধরণের অপরাধীর সংখ্যা যে খুবই কম, নিজ ক্ষমতাধিকার বলে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে ইহার সত্যতা তিনি যাচাই করিতে পারেন। তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, এদেশীয়দের ভিতরে যৌথ-পরিবার প্রথা বলবৎ থাকায়ই ব্রিটেনের মত এখানে এরূপ সম্ভাবনা ঘটে নাই। এখানে পরিবারে অক্ষম, অন্ধ, খঞ্জ এবং বেকার লোকদেরও অন্ন-সংস্থানের সুযোগ হয় এই যৌথ-পরিবার প্রথার দরুন। ইহার মন্দ দিক সম্বন্ধে তিনি কম অবহিত নন, কিন্তু এ বিষয়ে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে। তবে এদেশেও যে শিশু-অপরাধী একেবারে নাই এমন কথা তিনি বলেন না। এখানেও রিফর্মেটরি স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ফুলের অভাবের কথাপ্রসঙ্গে ফিয়ার বলেন, কুমারী কার্পেণ্টার এমন সময় এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন যখন ফুল তেমন জন্মে না। তিনি বর্ষাকালে একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তখন ফুলের রকমারি ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঋতুবিশেষে ফুলের উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইংরেজের চেয়ে ভারতবাসীর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আদৌ কম নয়।

সোসাইটির দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন হইল ২১শে এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে। ফিয়ার পূর্ব্ববৎ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এদিনে বিশেষ বক্তা ছিলেন সিংহলের আইন-সভার সদস্য মুথ্ কুমারস্বামী। তিনি তখন সবেমাত্র উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—উত্তর-ভারত-পরিক্রমা কুমারস্বামী বিভিন্ন অঞ্চলের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বারাণসীধাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ভারতবর্ষের প্রধানতম তীর্থ বারাণসী বা কাশীধাম। এখানকার বিশ্বেশ্বরের মন্দির এবং গঙ্গার ঘাটগুলি পর্য্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ স্থল। ভারতের স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরেই বিধৃত হইয়াছে। গঙ্গার ঘাটসমূহে বিবস্ত্র সাধুগণ প্রত্যেকেরই নজরে পড়িবে। একজন সাধুর কথা তিনি বিশেষভাবে বলেন—তাঁহার নাম তৈলঙ্গ স্বামী। তিনি তেলেঙ্গা তথা মাদ্রাজ হইতে আগত। কুমারস্বামী স্বয়ং তাঁহাকে দেখিয়াছেন। আচারে-আচরণে মনুষ্যেতর জীব বলিয়াই তাঁহাকে কিন্তু মনে হইবে। তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যেমন পুণ্যকামীরা আসিয়া এখানে ভীড় করেন, তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীরাও নানাস্থান হইতে আসিয়া থাকেন। বারাণসীধাম সংস্কৃত-শিক্ষার এবং সংস্কৃত শাস্ত্র-চর্চ্চার একটি

প্রধান কেন্দ্র। বারাণসীর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে দেশ-বিদেশের বুধমণ্ডলী আলোচনা-গবেষণার অনেক মাল-মশলা পাইয়া থাকেন। ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদের সঙ্গে এখানে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে। এই সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত-চর্চ্চার পুনঃপ্রচলনের নিমিত্ত তিনি আবেদন জানান।

আবার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সাক্ষাৎ মেলামেশার সুযোগ ঘটিয়াছে তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা। রামেশ্বরম্ হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তীর্থ-পর্য্যটনের নিমিত্ত ভারতবাসীরা আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এযুগেও যে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে তাহা তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেন। কি দক্ষিণী, কি উত্তর-ভারতীয় সকল অধিবাসীদের মধ্যেই ধর্ম্মগত ও সংস্কৃতিগত আচার-আচরণে ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। ইহারও কারণ উল্লিখিত দুইটি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন—যথা, সর্ব্বত্র সংস্কৃত-চর্চ্চা এবং তীর্থ-পর্য্যটন। প্রাচীনদের মত পুণ্যার্জ্জন মানসে হয়ত এখন আর আমরা তীর্থ-পর্য্যটন করি না, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া তথাকার অধিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়া বর্তমান যুগে একান্ত দরকার। তিনি এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমার কথা উল্লেখ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের সুপণ্ডিত ভাওদাজীও কয়েকজন সঙ্গী লইয়া উত্তর-ভারতে পর্য্যটন করিয়া কলিকাতার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে এরূপ গমনাগমন এবং ভাবের আদান-প্রদান একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বক্তৃতা শেষে কেহ কেহ আলোচনায় যোগদান করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেন, এখন সংস্কৃতের দোহাই দিয়া কোন ফল হইবে না। কুমারস্বামী ইহার এই বলিয়া উত্তর দেন যে, বর্ত্তমানে ইংরেজী আমাদের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ অনুকূল সন্দেহ নাই, কিন্তু সংস্কৃত-চর্চ্চার দ্বারা আমরা পুরাতন শাস্ত্র, ঐতিহ্য, ইত্যাদির বিষয়ে নিজেদের যেমন জানিতে ও বুঝিতে পারিব এমনটি আর কিছুর দ্বারা সম্ভব নহে। সভাপতি ফিয়ার বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, মুথু কুমারস্বামী ভারতীয়দের ভিতরে ঐক্যের বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রযোজ্য হইতে পারিলে তিনি খুবই আনন্দিত হইতেন। সমাজের জন্মগত, শ্রেণীগত ভেদাভেদ বিদূরিত না হইলে এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটিলে সত্যকার ঐক্যের সম্ভাবনা অতি অল্প। এইরূপে বিশেষ অধিবেশন পরিসমাপ্ত হইল।

স্বরলিপি

রামনিধি গুপ্ত (১১৪৮-১২৪৫) সাধারণ্যে নিধুবাবু বলিয়া পরিচিত। মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১২৪৪ সালে রামনিধি "গীতরত্ন" নামক গ্রন্থে তাঁহার সঙ্গীত-সংকলন প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থটি ১২৫৩ সালে রোজারিও সাহেবের যন্ত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়া উক্ত সাহেবের পুস্তকালয় হইতে প্রচারিত হয়। অতঃপর ১২৭৫ সালে গ্রন্থটি তদাত্মজ জয়গোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া "নৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"

"গীতরত্ন" গ্রন্থে এই গানের সুর লিখিত আছে বেহাগ। "বাঙ্গালীর গান" এবং "প্রীতিগীতি" গ্রন্থে ইহার সুর ঝিঁঝিট-খাম্বাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই গানগুলির সুর সম্পর্কে ইহা বলা আবশ্যক যে পুরাতন গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত সুর দেওয়া আছে তাহাদের সহিত গায়ক পরম্পরায় প্রচলিত সুরগুলির অনেক ক্ষেত্রে মিল নাই। পূর্বপ্রচলিত সুর এবং বর্তমানে প্রচলিত সুরেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে গায়কভেদে সুরের পরিবর্তন হইয়াছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে সুরের উল্লেখ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হয় নাই। এই সব গানের প্রকাশিত স্বরলিপি না থাকায় সুর সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের মতই নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করি।—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

খাম্বাজ। ত্রিতাল

চন্দ্রাননে কি শোভা কমল নয়ন।
ভুরু ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি করে মধুপান॥
কেশ বেশ কি তাহার
কিবা নীরদ আকার
মনশিখী তাহা দেখি হরিষে অজ্ঞান॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল
চমকে অতি চঞ্চল
কিরণ ঝলকে তায় দামিনী সমান॥

রামনিধি গুপ্ত ঃ নিধুবাবু

সুর-সংগ্রাহক। শ্রীকালীপদ পাঠক　　স্বরলিপি। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

II	গা	গা	গা	গমপা	।	-মগরা	গা	মা	গা	।
	চন্	দ্রা	ন	নে০০		০০০	কি	শো	ভা	

	-া	গা	মা	পা	।	র্ধা	পা	-া	-া	I
	০	ক	ম	ল		ন	য়া	০	০	

-মপা	-মগা	-রগা	-মপা	।	-া	-া	গা	মা	।
০ ০	০ ০	০ ০	০ ০		০	ন্	ভু	রু	
ধা	-া	ধা	-া	।	-া	-া	গা	-মা	I
ভৃ	ঙ্	গ	০	।	০	০	ভ	ঙ্	
পধা	-ণর্সা	-র্সণা	-ধণা	।	ধা	পা	-া	-া	।
গি০	০ ০	০ ০	০ ০		ক	বি	০	০	
পা	মপা	-ধণা	-ধপা	।	মা	গা	-া	-া	I
ক	রে০	০ ০	০ ০		ম	ধু	০	০	
গমা	-পধা	-ধধা	-পমা	।	-গমা	-পপা	-পপা	-মগা	।
পা০	০ ০	০ ০	০ ০		০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	
-রগা	-মগা	-রসা	-া	।	-া	-া	-া	-া	II
০ ০	০ ০	০ ০	০		০	০	০	ন্	
মা	-া	ধণা	-র্সণা	।	-ধপা	-ধনা	-া	-া	।
কে	শ্	বে০	০ ০		০ ০	০ ০	০	শ্	
না	র্সা	নর্সা	-া	।	-া	-া	-া	-া	I
কি	শো	হা	০		০	০	০	র্	
না	না	না	র্সা	।	র্সর্রা	-নর্সা	ধর্সা	ণর্সা	।
কি	বা	নী	র		দ০	০ ০	আ০	কা০	
-ণধা	-পধা	-া	-া	।	-া	-া	-া	-া	I
০ ০	০	০	০		০	০	০	র্	
গা	মা	গা	মা	।	পা	পধা	-ণধা	-পধা	।
ম	ন	শি	খী		ভা	হা০	০ ০	০ ০	
-নর্সা	না	র্সা	-া	।	র্সা	নর্সা	-র্র্গা	-র্মা	I
০ ০	দে	খি	০	।	হ	রি০	০ ০	০	
-র্মর্গাঃ	-র্রঃ	না	র্সা	।	নর্সা	-র্রর্রা	-র্সণা	-ধণা	।
০	০	যে	অ		জ্ঞা০	০ ০	০ ০	০ ০	
-র্সর্সা	-ণধা	-পধা	-ণধা	।	-পমা	-গা	-রগা	-া	II
০ ০	০ ০	০ ০	০ ০		০ ০	০	০	ন্	

II মা মা ধণা -র্সণা । ধা -পধনা না না ।
শ্র ব ণে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ শো ভে

র্সা না র্সা -া । -া -া -া -া I
কুন্ ড ল ০ ০ ০ ০ ০

না না না না । র্সা র্সর্রা -র্সা -নর্সা ।
চ ম কে অ তি চ ০ ০ ০ ন্

ধর্সা ণর্সা -ণধা -পধা । -া -া -া -া I
চ ০ ল০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা মা গা মা । পা পধা -ণধা -পধা ।
কি র ণ ঝ ল কে০ ০ ০ ০ ০

-নর্সা না -র্সা -া । র্সা নর্সা -র্র্গা -র্মা I
০ ০ ভা ০ য় দা মি০ ০ ০ ০

-র্মর্গাঃ -র্রাঃ না র্সা । নর্সা র্রর্রা র্সণা ধণা ।
০ ০ না স মা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-সর্সা -ণধা -পধা -ণধা । -পমা -গা -রগা -া II I
স ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
১৩৬৫

মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাঙলার অন্যতর প্রতিবেশী সাহিত্য মৈথিলীতে শক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়া অনেক রকম সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েক শত বর্ষ পূর্বেও গৌড়বঙ্গ, মিথিলা ও কামরূপ ধর্ম-সংস্কৃতিতে একটি ঐক্যবদ্ধ জনপদ ছিল এবং এই অঞ্চলটি তন্ত্র-সাধনা ও শক্তি-সাধনার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। বাংলা-সাহিত্যের পরে শাক্ত-ধর্ম ও শাক্ত-সাহিত্যের প্রাধান্য মৈথিলীতেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই আমরা মিথিলায় শাক্ত প্রভাবের প্রমাণ পাই। পুরাণতত্ত্ববিদ্ ডক্টর রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের মতে পুরাণোক্ত নরকাসুরের উৎপত্তি মিথিলায়। কালিকা-পুরাণের ৩৮শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, নরকাসুরকে বিষ্ণু কামরূপে (কিরাত দেশে) প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কামাখ্যা দেবীর সেবক হইয়া থাকিতে বলিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক এই কালে কামরূপ এবং মিথিলা উভয় দেশেই শাক্ত ধর্মের প্রচার হইয়াছিল মনে হয়। বিহারের সর্বশ্রেণীর উচ্চ-বর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে নানা রকমের শাক্ত ধর্মের প্রচলন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত কলিকাতাস্থিত কালীঘাটের কালী (কালী কলকত্তেওয়ালী) এবং কামরূপের কামাখ্যা ইঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যাত্রিগণের ভিড়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিহারবাসি-গণের।

শিব, শক্তি ও বিষ্ণু—এই তিন দেবতাই হইলেন মিথিলার জনপ্রিয় দেবতা। উচ্চ-বর্ণের মৈথিলী হিন্দুগণ সাধারণতঃ কপালে যে রেখাঙ্কন দিয়া থাকেন তাহাও এই শিব, বিষ্ণু ও শক্তিরই প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কপালে ডাইনে-বাঁয়ে পাশাপাশি যে তিনটি ভস্মরেখা উহা শিবের দ্যোতক, লম্বালম্বি তিনটি শ্বেত চন্দনের রেখা বিষ্ণুর দ্যোতক এবং রক্তচন্দন বা সিন্দুরের বিন্দুটি হইল শক্তির দ্যোতক।[১] মিথিলার বহু পরিবারেই 'গোসাউনিক ঘর' দেখিতে পাওয়া যায়।[২] এখানকার প্রতিষ্ঠিতা দেবী হয় ভদ্রকালী, না হয় তারা

১. "The simultaneous threefold marks on the forehead of the Brahmanas represent this characteristic of the Maithilis : the three horizontal lines of the sacred ashes represent their devotion to Shiva, the vertical white sandal paste represents their faith in Vishnu, and the dot of red sandal paste or of vermillion represents their veneration for Shakti."—Jayakanta Mishra, *History of Maithili Literature*, Part I, p. 19.

২. গোসাউনী=গোস্বামিনী=দেবী ; শিব হইলেন গোস্বামী=গোসাঁই।

বা দুর্গা, অথবা দেবীর অন্য কোনও মূর্তি। বহু গৃহী উপাসক শক্তিমন্ত্রে পারিবারিক গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মিথিলায় কতকগুলি প্রসিদ্ধ শক্তিতীর্থও রহিয়াছে, তাহার মধ্যে উচ্চৈঠ, চণ্ডিকাস্থান, উগ্রতারাস্থান, চামুণ্ডাস্থান এবং জনকপুর অতি প্রসিদ্ধ। বর্ণপরিচয়ের পরে মৈথিলী শিশুদের প্রথম যে শ্লোকটি মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইল—

সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধো যয়া পশুপতিঃ পতিঃ॥

বাঙলাদেশে যে শারদীয়া মৃন্ময়ীদেবী পূজার প্রচলন আছে তাহার ঠিক সমপরিমাণে না হইলেও মিথিলাতেও এই সময় মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। এই সকল ব্রাহ্মণ দ্বিজগণ গৃহ ও পরিবারের কল্যাণ কামনায় চণ্ডী পাঠ করেন। দশহরা মিথিলার একটি বড় ধর্মোৎসব। মাঘমাসে মিথিলায় 'পাতড়ি' উৎসব হয়, এই উৎসবে দেবীর অংশস্বরূপ কুমারী-গণকে ক্ষীর (পায়স) খাওয়ান হয়। ব্রজ-অঞ্চলে আশ্বিন মাসে এইরূপ কুমারী-ভোজনের উৎসব আছে, তাহাকে বলা হয় 'কন্যা-লাঁগুরা'; ইহা দেবী-আরাধনারই বিশেষ একটি অঙ্গ। মিথিলায় যে সকল আলপনা অতি জনপ্রিয় সেই সব আলপনা তন্ত্রের 'যন্ত্র' হইতেই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই ভাবে আমরা নানা দিক হইতে মিথিলায় একটা ব্যাপক শাক্ত প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি।

কবি বিদ্যাপতির সময় হইতে আমরা হর-পার্বতীকে অবলম্বন করিয়া একরূপ মঙ্গল-গীতির জনপ্রিয়তা দেখিতে পাই। সঙ্গীতগুলি মুখ্যতঃ লোকসঙ্গীত। কবি বিদ্যাপতির নামে যে সংগীতগুলি সংগৃহীত আছে তাহারও অধিকাংশই মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত, লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত। গানগুলি মুখ্যতঃ হর-গৌরীর বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন ও গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কিত। এইগুলি বিবাহ-কালে মঙ্গল-সংগীত রূপেই এখনও মিথিলায় গীত হইয়া থাকে। আমরা পূর্বে বিবিধ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির হর-পার্বতী-বিষয়ক কিছু কিছু গানের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। এখানে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক সঙ্কলিত বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত এই জাতীয় আরও কিছু কিছু গান লইয়া আলোচনা করিতেছি। একটি পদে গৌরী-অভিলাষী যতিবেশধারী শিবকে দেখিয়া মাতা মেনকা বলিতেছেন—

এতএ কতএ অএল জতি গোরি অছ তপে।
রাজরে কুমারি বেটি ডরব দেখি সাপে॥
তোড়ব মোয় জটাজুট ফোড়ব বোকানে।
হটল ন মান জতি হোএত অপমানে॥
তীনি নঅন হর বীসম জর দহনু।
উমা মোরি নন্থমি হেরহ জনু॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন জগমাতা
ও নহি উমত ত্রিভুবন দাতা॥ —৭৭৬ সং

'এখানে কোথা হইতে আসিল যতি, গৌরী আছে তপে। রাজার কুমারী আমার মেয়ে, সাপ দেখিয়া ডরিবে। আমি ছিঁড়িয়া দিব জটাজুট, ফুড়িয়া দিব ঝুলি ; হটাইলে যদি না মানে যতি, (তাহা হইলে) হইবে অপমান ! তিন-নয়ন হর, (তৃতীয় নয়নে) বিষম অগ্নি জ্বলে ; উমা আমার নবনী-কোমল—যেন না দেখে। বিদ্যাপতি বলেন, শুন জগন্মাতা, ও নয় উন্মত্ত—ত্রিভুবনের দাতা।'

কিন্তু মেনকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেখা হইল, তপোবনেই গিয়া যতি নিজে উমার সঙ্গে দেখা করিয়া ভাব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। উমা বিস্মিত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—

এ মা কহএ মোয় পুছোঁ তোহী।
ওহি তপোবন তাপসি ভেটল
কুসুম তোরএ দেল মোহী॥
আঁজলি ভরি কুসুম তোড়ল
জে জত অছল জাঁহা।
তীনি নয়নে খনে মোহি নিহারএ
বইসলি রহলি জাঁহা॥
গরা গরল নয়ন অনল
সির সোভইহি সসী।
ডিমি ডিমি কর ডমরু বাজএ
এহে আএল তপসী॥
সির সুরসরি ভ্রমু কপালা
হাথ কমণ্ডলু গোটা।
বসহ চঢ়ল আএল দিগম্বর
বিভূতি কএল ফোটা॥
ন বিদ্যাপতি সামিক নিন্দা
ন কর গৌরী মাতা।
তোহর সামি জগত ইসর
ভুগুতি মুকুতি দাতা॥—৭৭৭ স'

'এ মা, আমাকে কহ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ওই তপোবনে এক তপস্বী দেখা দিল, কুসুম তুলিয়া দিল আমাকে। অঞ্জলি ভরিয়া কুসুম তুলিল, যেখানে যত ছিল যাহা ; আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেখানে তিন নয়নে ক্ষণে আমাকে দেখিল। গলায় গরল, নয়নে অনল, শিরে শোভে শশী ; ডিমি ডিমি করিয়া ডমরু বাজাইয়া এখানে আসিল তপস্বী। শিবের সুরসরিৎ (গঙ্গা) কপালে ভ্রমিতেছে, হাতে একটি কমণ্ডলু, বৃষভে চড়িল, আসিল দিগম্বর, বিভূতি (ভস্ম) দিয়া করিল ফোঁটা। মা (কহে) বিদ্যাপতি,

স্বামীর নিন্দা করিও না গৌরী মাতা; তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর—ভক্তি-মুক্তি-দাতা।'

বিবাহ উপলক্ষ্যে হর-গৌরী বিষয়ক এই গানগুলি করিবার একটি বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য আছে। গানগুলির ভিতর দিয়া নানাভাবে দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে একটি ভারতীয় আদর্শই বর-কন্যা এবং আড়শী-পড়শী সকলের কাছে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা। সে আদর্শটি হইল এই, স্বামী বয়সে একটু বেশি হোক, দরিদ্র হোক, দেখিতে আপাত-রমণীয় না হইয়া রুক্ষ হোক, পরিচ্ছদে আভরণে সজ্জায় বিলেপনে চিত্তাকর্ষক না হোক, এমন কি ধাম-কুল-গোত্রহীন হোক—তথাপি স্ত্রীর লক্ষ্য করিতে হইবে তাহার আন্তর ঐশ্বর্য; সেই ঐশ্বর্য যদি তাহার থাকে তবেই সে-ই হইবে সর্বাপেক্ষা বরণীয়। উমামহেশ্বরের সকল কাহিনীর বিবিধ বিস্তারের মধ্যেও এই ভারতীয় আদর্শই কবিকল্পনাকে নাড়া দিয়াছে। পরবর্তী কালের লোকেরা যখন দেখিল যে উমা-মহেশ্বরের ভিতর দিয়া এই ভারতীয় আদর্শটি স্পষ্ট মূর্তি লাভ করিয়াছে তখন বিবাহ উপলক্ষ্যে এই বিষয়ক গানই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই আদর্শের আর প্রকাশ রাম-সীতার মধ্যে, এই জন্যই বিবাহের গান হয় হর-গৌরী না হয় রাম-সীতাকে লইয়া। বিদ্যাপতির এই পদগুলির মধ্যে দেখি, হরকে দেখিয়া মেনকা ভয় পাইল, পার্বতীও প্রথমে সামান্য যেন একটু দ্বিধান্বিত হইল; কিন্তু একটু পরেই দেখি—

> জোগিয়া মন ভাবই হে মনাইনি।
> আএল বসহা চঢ়ি বিভূতি লগাএ হে।
> মন মোর হরলনি ডামরু বজাএ হে॥
> সুন্দর গীত অজর পতি সে নাহে।
> চিত সোঁ নই ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে॥—৭৭৮ সং

'হে মা মেনকা, যোগিয়া মন ভাবায়। আসিল বৃষভে চড়িয়া—বিভূতি লাগাইয়া, মন আমার হরিয়া লইল ডমরু বাজাইয়া। সুন্দর গাত্র, অজর (জরারহিত) পতি সেই নাথ চিত্ত হইতে ছোটে না—কিছু 'টোনা' (মন্ত্রতন্ত্র) নিশ্চয়ই জানে!'

ইহার পরে হর-পার্বতীর বিবাহের দৃশ্য—সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা যেরূপ যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি এবং বাঙলা সাহিত্যে তাহার যেরূপ বিস্তার দেখিয়া আসিয়াছি—ঠিক সেই রূপই। সেই ডমরু-হস্তে ভস্ম-বিভূষিত রূপ! বর আসিলে সবাই ধাইয়া চলিল বর দেখিতে, তাহার পরে অন্যত্রও যাহা এখানেও ঠিক তাহাই—

> পরিছয় চললি মনাইনি সব গাইনি।
> নাগ কয়ল ফুফুকার তুরহ পড়াইলি॥
> এহন উমত বর কেকর উর বিসধর।
> গৌরি বরু রহথু কুমারি করব বর দোসর॥—৭৭৯ সং

'স্ত্রী-আচারে চলিল মেনকা সব গায়নীকে লইয়া; নাগ করিল ফোঁস্ ফোঁস্—সকলে দূরে

পালাইল। এমন উন্মত্ত বর কাহার ?—বক্ষে বিষধর! গৌরী বরঞ্চ কুমারী থাকুক—অন্য বর করাইব।'

পরের পদেও দেখি মেনকা সখেদে বলিতেছেন—

মঙ্গল বিলুবিঅ সিন্দুর পিঠারে।
তোঁহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে॥
চলহ চল হর পলটি দিগম্বর।
হমরি গোসাউনী তোহ ন জোগ বর॥
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী।
কি করব তবে জপমালী তোরী॥
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী।
হিমগিরি ধীএ সহব কইসে আগী॥
ভাল বলই নয়নানল রাসী।
ঝরকত মউল ডাঢতি পটবাসী॥—৭৮০ সং

'মঙ্গল সাজাইলাম সিন্দূর ও পিটালি দিয়া, তোমাকে ভাল সঁপিলাম- তুমি সাজিয়া আছ ছাইতে। চল হে চল, হে দিগম্বর ফিরিয়া চল, আমার ঈশ্বরীর তুমি নও যোগ্য বর। হর হইতে গৌরী গৌরবে গুরু, তোমার জপমালা তবে কি করিবে? সসম্ভ্রমে তোমার নয়নে নেহারিবে, হিমগিরি দুহিতা কি করিয়া সহিবে অগ্নি? ভালে জ্বলিতেছে নয়নানল রাশি, ঝলসিয়া যাইবে গৌরীর মুকুট, জ্বলিয়া যাইবে পট্টবাস।'

পরের পদটিতেও (৭৮১ সং) দেখি মেনকার সেই একই আক্ষেপ। জটাজুট ঝুলাইয়া বলদে চড়িয়া আসিয়াছেন বর, কে বর—কে বরযাত্রী কিছুই বুঝিবার উপায় নাই! ভস্মের ঝোলা লইয়া আসিয়াছেন বিবাহের উপঢৌকন! বিবাহের অন্য আচার-বিধি কিছুই মানেন না—শুধু পাশা খেলা—আর সাপ লইয়া ছুটোপুটি। শুধু কি তাই ?—

খিরি ন খাএ হর চুকতি গজাএ।
এহন উমত কোনে জোহল জমাএ॥—৭৮১ সং

'খিরি (পরমান্ন) খায় না হর—গাঁজাতেই অবসান (গাঁজা পাইলেই হইল)। এমন উন্মত্ত বর কে যোগাড় করিয়া দিল ?'

ইহার পরে বিবাহ বর্ণনা। এ-প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে যে স্থূল রসিকতার আমদানি দেখিয়া আসিয়াছি মৈথিলী বিদ্যাপতিও সেখানে কোনও ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেন নাই।

জখনে সঙ্করে গৌরি করে ধরি আনলি মণ্ডপ মাঝ।
সরদ সঁপুন জনি সসধর উগল সময় সাঁঝ॥
চৌদহ ভুঅন সিব সোহাওন গৌরী রাজকুমারি।
হেরি হরখিত ভেলি মদাইনি আএল জনি জভারি॥
হেমত সরির পুলকে পূরল সফল জনম মোরি।

হরি বিরঞ্চি দুহু জন বৈসল হরকে দেল মোয়ঁ গোরি।
নারদ তুম্বুর মঙ্গল গাবথি আওর কতন নারি।
কৌতুকে কোবর কৌসলে কামিনি সবে সবে দেঅ গারি॥
ভন বিদ্যাপতি গৌরি পরীণয় কৌতুক কহএ ন জাএ।
সাপ ফুফুকারে নারি পড়াইলি বসন ঠাম নড়াএ॥—৭৮২ সং

'যখন শঙ্কর গৌরীকে করে ধরিয়া আনিলেন মণ্ডপের মাঝে, যেন শরতের সম্পূর্ণ শশধর সন্ধ্যাকালে উদয় হইল। চৌদ্দ ভুবনের শোভাকারী শিব—গৌরী রাজকুমারী; দেখিয়া মন্দাকিনী হরষিত হইলেন—যেন জম্ভারি (ইন্দ্র) আসিলেন। হেমন্তের (হিমালয়ের) শরীর পুলকে পূরিল,—সফল আমার জন্ম; হরি বিরিঞ্চি দুইজনে বসিলেন, হরকে দিলাম আমি গৌরী। নারদ তম্বুরায় মঙ্গল গান, আরও কত নারী (মঙ্গল গায়); কৌতুকে বাসরঘরে কামিনীরা কৌশলে সকলে সকলকে (পরস্পরে) গালি দেয়। বলিতেছে বিদ্যাপতি গৌরী-পরিণয়, কহা যায় না, সাপের ফোঁস্ফোঁসানিতে নারীরা পলাইল, বসন সব ফেলিয়া।'

বিবাহের পরে শিব শ্বশুরবাড়িতেই গৌরীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, সৃষ্টিছাড়া তাঁহার সব কাণ্ডকারখানা। নৃত্যে নৃত্যে মস্তকের গঙ্গাজলে নীচের নৃত্যভূমি গেল ভিজিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া হর পড়িয়া যান পিছলাইয়া; তুলিয়া ধরিতে গৌরী শীঘ্র আগাইয়া যান, করকঙ্কণ-ফণী ওঠে ফোঁস করিয়া।

গঙ্গাজলে সিচু রঙ্গভূমি। পিছরি খসল হর ঘুমি ঘুমি॥
অবলম্বনে গোরী তোরএ জাএ। করকঙ্কণ ফনি উঠ ফাঁফএ॥—৭৮৩ সং

ইহার পরে সম্ভোগ বর্ণনা। সংস্কৃত কবিগণও এ-ক্ষেত্রে যেমন নিষেধ মানেন নাই, বিদ্যাপতিও মানেন নাই। তবে হর-গৌরীর ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি অনেক সংযত। 'অঞ্জলি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন, তাহা লইয়া শম্ভু আরাধনে চলিলেন ভবানী। জাতি যূথী আর বেলপাতা তুলিলাম আমি,—উঠ হে মহাদেব, প্রভাত হইয়া গেল। যখন হর (পার্বতীকে) দেখিলেন তিন নয়নে, সেই অবসরে মদনে পীড়িতা হইলেন গৌরী। করতল কাঁপিতে লাগিল—ছড়াইয়া পড়িল কুসুম, বিপুলপুলক তনু—বসন দিয়া ঝাঁপিলেন। ভাল হর, ভাল গৌরী, ভাল ব্যবহার, জপ-তপ দূরে গেল মদন-বিকারে!'

অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনী।
সম্ভু অরাধএ চললি ভবানী॥
জাহি জুহি তোড়ল মোয়ঁ আওর বেলপাতে।
উঠিঅ মহাদেব ভএ গেল পরাতে॥
জখনে হেরলি হরে তিনিহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরি পিড়লি মদনে॥

করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িআউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝাঁপউ॥
ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দুর গেল মদন বিকারে॥

কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গেল ঝগড়াঝাঁটি রাগারাগি; গুরুরোষে ঘর ছাড়িয়া কোথায় গেলেন হর নিখোঁজ হইয়া—গৌরী পথে বাহির হইলেন সন্ধানে। এই জাতীয় কয়েকটি পদ আমরা প্রসঙ্গান্তরে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।[৩]

এত ঝগড়াঝাঁটি বাদবিসম্বাদের মধ্যেও বিদ্যাপতি পুত্র বিবাহের একটি চমৎকার ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কার্তিক বড় হইয়াছে, বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহা লইয়াই হর-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা।

আনে বোলব কুল অথিকহ হীন।
তেঁহি কুমার অছল এত দীন॥
তোহর হমর শিব বএস ভেল আএ।
আবহু ন চিন্তহ বিআহ উপাএ॥
ভল শিব ভল শিব ভল বেবহার।
চিতা চিন্তা নহি বেটা কুমার॥
হসি হর বোলথি সুনহ ভবানী।
জনিতহু ককে দেবি হোহ অগেয়ানী॥
দেস বুলিএ বুলি খোজওঁ কুমারী।
হুন্হিক সরিস মোহি ন মিলএ নারী॥
এত শুনি কাতিক মনে ভেল লাজ।
হম ন হে মাএ বিআহক কাজ॥
নহি বিআহব রহব কুমার।
ন কর কন্দল অমা সপথ হমার॥

'অন্যে বলিবে কুল হীন ছিল, তাই (কাতিক) এতদিন কুমার (অবিবাহিত) ছিল। তোমার আমার হে শিব, বয়স হইল, এখনও বিবাহের উপায় চিন্তা করিতেছ না। ভাল শিব, ভাল শিব, ভাল তোমার ব্যবহার; তোমার চিত্তে চিন্তা নাই, ছেলে রইল কুমার (অবিবাহিত)। হাসিয়া হর বলিলেন, শোন ওগো ভবানি,—জানিয়া শুনিয়াও কি করিয়া দেবি হও অজ্ঞানী? দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরি, খুঁজি কুমারী, উহার (কার্তিকের) উপযুক্ত মেয়ে আমার মিলিতেছে না। ইহা শুনিয়া কার্তিকের মনে হইল লাজ—হে মা, আমার বিবাহে কাজ নাই। বিবাহ করিব না, কুমার থাকিব, তোমরা দুজনে কোন্দল করিও না, আমার শপথ।'

৩. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬৫ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পুত্রের কথায় পিতা-মাতার কোন্দল অন্তত তৎকালের জন্য থামিয়া গেল।

বিদ্যাপতি রচিত এই হর-পার্বতী সম্বন্ধীয় গানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে বিচার করিলে চলিবে না; পূর্বেই যে আমরা মিথিলায় শাক্তধর্ম ও সংস্কৃতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবের কথা বলিয়া আসিয়াছি বিদ্যাপতির গানগুলিকে তাহার সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হইবে, কারণ এইরূপ হর-পার্বতী সম্বন্ধীয় গান বা শুধু দেবী-সম্বন্ধীয় গান মিথিলায় পরবর্তী কালে নানা ভাবে পাওয়া যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, বিদ্যাপতি মিথিলার সিংহ-রাজবংশীয় ধীর সিংহের (ভৈরব সিংহ?) আদেশে বা উৎসাহে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' নামে সকল পুরাণ-তন্ত্রস্মৃতি অবলম্বন করিয়া একখানি দুর্গাপূজাবিধি প্রণয়ন করেন। ইহা হইতে মনে হয় বিদ্যাপতির পূর্ব হইতে মিথিলায় মৃন্ময়-দুর্গাপূজার একটা জনপ্রিয়তা ছিল। মহামহোপাধ্যায় মুকুন্দ ঝা বক্সী মহাশয় তাঁহার 'মিথিলাভাষাময় ইতিহাস' গ্রন্থে পণ্ডিত আঁখী ঝা নামক তান্ত্রিক শক্তি-উপাসকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মিথিলার কর্ণাট রাজগণের গুরু শক্তি-উপাসক সিদ্ধ কামেশ্বরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান খণ্ডবলা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠাকুর ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (?) তাঁহার রাজ্যত্যাগের পরে গঙ্গা ও তারা সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। মধ্যযুগের সংগীতশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ 'রাগ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থের রচয়িতা লোচন শক্তিকে অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

> জয় জয় জয় নত সতত সিবঙ্করি পরিহিত নরসিরমালে।
> লম্বিত রসনি দসন অতি ভীষন বসন মিলল বঘ ছালে॥
> চৌদিসঁ মানুস মাঁসু মুদিত অতি ফেরু ফুকর কতরাসে।
> মনিময় বিবিধ বিভূষনে মণ্ডিত বেদি বিদিত তুঅ বাসে॥
> বিমল বালরবি মণ্ডল সন তুঅ তীন নয়ন পরগাসে।
> অসুররুহির মদিরামদ মাতলি বদন অমিয় সম হাসে॥
> তুঅ অনুরূপ সরূপ বুঝিঅ নহি তৈঅও তোহর গুন গাউ।
> এেকঁহি তুঅ পদবন্ধ করিঅ দেখি নিএগনে 'লোচন' লাউ॥[৪]

এই গানে বর্ণিতা দেবী হইলেন কালী। আমরা বাঙলা শাক্ত পদাবলীতে কালীর যে-সকল বর্ণনা দেখিয়া আসিয়াছি এই বর্ণনার তাহার সহিত বেশ মিল আছে।

নেপালে যাঁহারা মৈথিলী সংগীত রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভূপতীন্দ্র মল্লের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচিত মৈথিলী সংগীতের কথা ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ই প্রথম আবিষ্কার ও উল্লেখ করেন। নেপাল দরবার পুস্তকাগারে রক্ষিত ভূপতীন্দ্র মল্ল কর্তৃক রচিত 'ভাষা-সংগীত' গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক গান আছে, তাহার অর্ধেকের বেশি শক্তি সম্বন্ধে। তাঁহার মতে শক্তি স্বতন্ত্রা এবং পরমতত্ত্ব—অন্য দেবগণ তাঁহার সেবক মাত্র।—

৪. রাজ-তরঙ্গিণী, পণ্ডিত বলদেব মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৯৯-১০০।

জয় নগনন্দিনি, বাহনি মৃগরাজ।
অনুখন সেবয় বিধি-সুররাজ॥

তাঁহার একটি গানে প্রপত্তির ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

হে দেবি শরণ রাখ ভবানি।
মন বচ করম কর ও মান কিছু
সে সবে তু আপদ জানি॥
হমে অতি দিনহীন তুঅ সেবা
রাখ হরি স্বজন ঠানি।
অভি(বি)নয় মোর অপরাধ সম্ভব
মন জনু রাখহ আনি॥
অওর-ইতর জন জগ জত সে সবে
গুণ রসমক সে বাণি।
তুঅ পদকমল ভমোর মোর মানস
জনমে জনমে এহো ভানি॥[৫]

নেপালের রাজা জগৎপ্রকাশ মল্ল গৌরী ও ভবানী সম্বন্ধে অনেক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন; রাজা রণজিৎ মল্লও শাক্ত সংগীত রচনা করিয়াছেন।

হর-গৌরীকে অবলম্বন করিয়া নেপালে এবং মিথিলায় মৈথিলী ভাষায় অনেক নাটক রচিত হইয়াছে।[৬] নেপালের জগজ্যোতির্মল্ল 'হর-গৌরী-বিবাহ' (১৬২৯ খ্রীঃ অঃ) নামে নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নেপালের জিতামিত্র মল্ল 'ভারত-নাটকম্' রচনা করিয়াছেন, ইহার বিষয়বস্তুও হর-গৌরী। বংশমণি ঝা 'গীত-দিগম্বর' (১৬৫৫খ্রীঃ অঃ) নামে যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহাতে গৌরী কি করিয়া শিবকে স্বামী লাভ করিলেন তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। এই নাটকের পুঁথি নেপালের দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। লাল কবি 'গৌরী-স্বয়ম্বর' নামে নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকখানি অনেকটা একাঙ্ক নাটকের ন্যায়। নাটকের মধ্যে বহু সুন্দর সুন্দর মৈথিলী গান আছে। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' তপস্যারত গৌরীকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বটুবেশধারী শিবের আগমন ও গৌরীর সহিত শিব-সম্বন্ধে তাঁহার তর্ক—ইহাই এখানে মুখ্য বিষয়। শিবনিন্দা শুনিয়া গৌরী বটুব্রাহ্মণকে কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করিলে শিব স্বমূর্তি ধারণ করিয়া গৌরীকে বলিলেন—

হে সখি সবহু সুনৈ ছিঅ গারি।　　ককরহু তহ নহি হোইছনে বারি॥
অসত বচন কহনে অনুতাপে।　　বড় জন নিন্দা সুননহু পাপে॥

৫. অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম্. এ.-র সংগ্রহ হইতে।

৬. এ সম্বন্ধে তথ্যগুলি অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত

হিনকা কহিঅনু জাথি ফিরি গামে। নহি তোঁ হমহি তেজই ছিঅ ঠামে॥
ঈ করি চরণ উঠাওল জানি। ধয়ল জটিল কর তরলি ভবানি॥
কহলহি শংকর হমরে নাম। করব বিবাহ জায়ব নিজ ধাম॥
এত বা সুনি গৌরী হরসিত ভেলি। তহি খন তপ তেজি মন্দির গেলি॥
সুকবি লাল নে থির রহ কাল। সুদিন সদাশিব ভেলাহ দয়াল॥

'হে সখি শুনিয়াছি সব গালি, কাহারও দ্বারাই এ নিবারিত হইতেছে না। অসৎ বচন বলিলে অনুতাপই হয়; বড় জনের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। ইঁহাকে বল গ্রামে ফিরিয়া যাইতে, না হইলে আমিই এই স্থান ত্যাগ করিতেছি। এই কহিয়াই চরণ উঠাইলেন; জটাধারী চঞ্চলা ভবানীর হাত ধরিলেন। কহিলেন, আমারই নাম শঙ্কর, বিবাহ করিয়া নিজের ধামে যাইব। এত শুনিয়া গৌরী হরষিত হইলেন, তখনই তপস্যা ত্যাগ করিয়া মন্দিরে গেলেন। সুকবি লাল বলিতেছেন, কাল স্থির থাকে না, সুদিনে সদাশিব দয়াল হইলেন।'

'গৌরী-পরিণয়' নামে শিবদত্ত রচিত একখানি নাটক আছে। এখানে দেখি, গৌরী নিজ-কাননে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন হঠাৎ শিবকে দেখিতে পাইলেন। প্রথম দর্শনেই গৌরীর প্রাণে প্রেম সঞ্চার হইল, গৌরীর আর ঘরে ফিরিয়া যাইবারও ইচ্ছা রহিল না—

আহে সখি বাঢ়ল শিবক সিনেহ, গেহ নহি জাএব হে।

কুমারী নারীর প্রেমনিবেদন লইয়া এখানে চমৎকার কতকগুলি গান দেখা যায়। এই গানগুলি স্থানে স্থানে রাধার প্রেমনিবেদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কাহ্নারাম দাসের 'গৌরী-স্বয়ম্বর-নাটক' আছে। এই নাটকের সংগীতগুলি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সম্বলিত কীর্তন-সংগীতের অনুরূপ রীতিতে লিখিত। এখানে দেখা যায়, দয়িত শিবের জন্য গৌরী সব রকমের কৃচ্ছ্রতা সাধন করিতেছেন। একস্থানে দেখি শিবপূজার জন্য পুষ্পচয়নের নিমিত্ত গৌরী গহন বনে ফুলের অন্বেষণ করিতেছেন—

ভমি ভমি বিপিন তোড়ল দল ফূল। অনেক কুসুম দল ছোড়ি অড়হুল॥
বেলি চমেলি কুন্দ নেবার। তোড়ল শ্রীদল তাকি অংগার॥
ধূপ দীপ নৈবেদ কর তুল। পূজিঅ সদাশিব হোথি অনুকূল॥
করব কঠিন ব্রত গৌরি ত্রিকাল। বরিঅ আব হর দীন দয়াল॥

আধুনিক কালে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র মহাশয়ও মুখ্যতঃ কুমারসম্ভবের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রাজ-রাজেশ্বরী-নাটক' রচনা করিয়াছেন। কবি হর্ষনাথ ঝার 'মাধবানন্দ নাটকম্'-এও প্রথম গীতিটি হইল দেবী সম্বন্ধে।—

জয় জগজ্জননী জয় জগজননী দেহু সুমতি মৃগপতি গমনী।
সরসিরুহাসন বিপদবিনাশনকারিণি মধুকৈটভদমনী॥…

তুঅ গুণ নিগম অগম চতুরানন কহি ন সকত কত সহস্রফণী।
অমরনিশাচরদনুজমনুজশিরচিকুরকলিতজিতরকতমনী॥
তুঅপদযুগল সরোরুহ মধুকর হর্ষনাথ কবি সরস ভনী॥[৭]

হর্ষনাথ ঝার তারা সম্বন্ধে একটি গান আছে, তাহার ছন্দ ও ভাষা উভয়ই বৈষ্ণব কবিতার অনুরূপ। যেমন—

নবল জলদ মঞ্জু ভাস,
জ্বলিত প্রেত ভূমিবাস
মুণ্ডমাল অতি বিলাস বিপদহারিণী।
তীন নয়ন অরুণ বরণ,
বিশ্বব্যাপি সলিল সরন,
ললিত ধবল কমল যুগল চরণধারিণী॥ ইত্যাদি।[৮]

উপরি-উল্লিখিত নাটকগুলি ব্যতীত মৈথিলীতে হর-গৌরী বিষয়ে বা শুধু দেবী-বিষয়ে আরও অনেক কাব্য কবিতা ও গীত রচিত হইয়াছে। লাল দাস 'সাঙ্গ-দুর্গা-প্রকাশিকা' নামে সংস্কৃত দুর্গা-সপ্তশতীর (চণ্ডীর) একটি মৈথিলী অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি 'শম্ভু-বিনোদ' ও 'গণেশ-খণ্ড' নামেও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গুণবন্তলাল দাস ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকে অনুসরণ করিয়া 'গৌরী-পরিণয়-প্রবন্ধ' রচনা করেন। ঋদ্ধিনাথ ঝা রচিত 'সতী-বিভূতি'ও উল্লেখযোগ্য। গণেশ্বর ঝা রচনা করিয়াছেন 'দেবী-গীতা'। আধুনিক মৈথিলী কবি চন্দা ঝার 'গীত-সপ্তশতী'তে ও 'সঙ্গীত-সুধা'তে[৯] হর-গৌরী সম্বন্ধে অনেক গান আছে। চন্দা ঝার 'মহেশ-বাণী-সংগ্রহ' ও শিব-শক্তি লইয়া রচিত গীত-সমষ্টি। তাঁহার 'চন্দ্র-পদ্যাবলী'তেও[১০] শিব-শক্তি সম্বন্ধে গান আছে। ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা কর্তৃক সম্পাদিত 'গণনাথ-বিন্ধ্যনাথ-পদাবলী'তে[১১] শক্তি বিষয়ে বিবিধ সংগীত সংগৃহীত হইয়াছে, কতকগুলি প্রার্থনার গান, কতকগুলি শক্তিতত্ত্বের গান। এগুলি নবরাত্র দুর্গা-পূজা উপলক্ষ্যে গীত হইবার জন্যই রচিত।

শক্তিবিষয়ক লিখিত কাব্য বা গীত ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগে লিখিত বহু মৈথিলী কাব্যেই নমস্কার বা আশীর্বাদ বা মঙ্গলাচরণে শক্তি-বিষয়ক পদ দেখিতে পাওয়া যায়।[১২]

৭. অমরনাথ ঝা, 'হর্ষনাথ-কাব্যগ্রন্থাবলী'।
৮. অমরনাথ ঝা, 'হর্ষনাথ-কাব্যগ্রন্থাবলী'।
৯. ইউনিয়ন প্রেস, দ্বারভাঙ্গা।
১০. রাজ লাইব্রেরী, দ্বারভাঙ্গা।
১১. ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।
১২. যেমন রমাপতি উপাধ্যায় রচিত 'রুক্মিণী-পরিণয়ে'—
প্রশান্ত রমাপতি তুঅ পদ কিঙ্কর সংকর সুনিয় বিনতি হমারা।
গিরিজা সহিত সকল অঘ দুরী কএ পরসন ভএ দিঅ অভয়বরা॥

অনেকগুলি কাব্যে বিপদে পড়িলেই অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার হইলে নায়িকাকে দেবীর নিকট স্তব করিতে দেখা যায়।[১৩]

গৌরী তপস্যা দ্বারা শিবের মত বর লাভ করিয়াছিলেন। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া সীতার জন্মভূমি মিথিলায় এই প্রবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল যে সীতা গৌরী-আরাধনা করিয়া রামচন্দ্রের মত স্বামী লাভ করিয়াছিলেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানসে'র মধ্যেও আমরা সীতাকে রামচন্দ্রকে বররূপে পাইবার জন্য দেবী আরাধনা করিতে দেখি। মৈথিলী বিভিন্ন কাব্যে ও লোক-সঙ্গীতে এই প্রবাদের কাব্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দা ঝার (জন্ম ১৮৩০) 'মিথিলা-ভাষা-রামায়ণে' দেখিতে পাই, সীতা তাঁহার মায়ের নির্দেশে সখিগণসহ অরণ্যকুঞ্জে পৌছিয়া নানাবিধ বনফুল তুলিলেন এবং নিকটবর্তী তড়াগে স্নান করিয়া বিবিধ স্তবস্তুতিতে দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন।—

জয় দেব মহেশ সুন্দরী। হমছী দেবী অহাংক কিংকরী॥
শিবদেহ নিবাস কারিণী। গিরিজা ভক্ত সমস্ত তারিণী॥
হম গোড় লগৈত ছী শিবে। জননী ভূধররাজ সম্ভবে॥
জনতা মন তাপ নাশিনী। জয় কামেশ্বরি শম্ভু লাসিনী॥[১৪]

আরও অনেক স্তবস্তুতির পরে আসল প্রার্থনা দেখিতে পাই—

অপনে কঁা হম গৌরি কী কহু। অনুকূলা জনি মেঁ সদা রহু॥
হমরা জে মন মধ্য চিন্তনা। সভটা পূরব সৈহ প্রার্থনা॥

আধুনিক কবি শ্রীসীতারাম ঝার কাব্য 'অম্ব-চরিতে'ও[১৫] দেখিতে পাই জনৈকা হিতৈষিণী ঘরের দাসী সীতা-জননী জনক-গৃহিণীকে বলিতেছে—

গৌরী পূজথু রাজকুমারী। কন্যা হেতুক ঈ ব্রত ভারী॥
সাবিত্রী নিত গৌরি মনৌলনি। তহিসঁৌ মন বাঞ্ছিত ফল পৌলনি॥
ইহো পূজি যদি গৌরি মনৌতী। তৌ নিশ্চয় অভিমত বর পৌতী॥

১৩. যেমন কবীন্দ্র দেবানন্দ রচিত 'উষাহরণে' নায়ক অনিরুদ্ধ নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া দুর্গার নিকট প্রার্থনা করিতেছে—

জয় জয় দুর্গে জগত জননী। দুর কএ ভবভএ হোহ দহিনী॥
খনে লীনা খনে সিত নিরমান। খন কুঙ্কুম পঙ্ক তনু অনুমান॥
রাকা বিধুমুখ নববিধু মরাল। তত নয়ন সোম কেশ করাল॥
লোহিত রদন লোহিত কর পান। ভৃকুটি কুটিল পুহু মোন খেআন॥…
পুনি পুনি হই হো দেবি গোচর লৈহ। নাগপাস বন্ধন মোক্ষ দৈহ॥
আনন্দে দেবানন্দ নতি গাব। ছরি চঢ়ি রিপু হনি পুরহ ভাব॥

১৪. বলদেব মিশ্র সম্পাদিত, দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়।

১৫. সংস্কৃত বুক ডিপো, বনারস, সং ২০১৩।

শুনিয়া জনক-গৃহিণী রাণীও বলিলেন—

কহুনি দাই কৈঁ গৌরি অরাধথু। শ্রদ্ধা সহিত নিয়ম ব্রত সাধথু॥

সীতাও ঠিক করিলেন—

হমরি মায় জগ মেঁ ছথি প্রাজ্ঞা। পালব অবস জনক সব আজ্ঞা॥

তাহার পরে দেখিতে পাই, সীতা দীর্ঘ স্তবের দ্বারা গৌরী আরাধনা করিতেছেন। এই স্তব স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রাপ্ত দেবগণের দেবী-স্তবের সহিত মিলিয়া যায়।—

জয় জগ-উৎপতি-পালন-কারিনি, সকল চরাচর হৃদয় বিহারিনি।
জয় জয় বিবিধ দিব্য-তনু-ধারিণি, সকল সাধুজন-সংকটটারিনি॥
অহী কালিকা শিবা ভবানী, লক্ষ্মী অহীঁ অহী ব্রহ্মানী।
দুর্গা অহীঁ অহীঁ ইন্দ্রানী, অহী বুদ্ধি বিদ্যা ও বানী॥
স্বাহা সুরগন তুষ্টি হেতু ছী, স্বধা পিতরগন-পুষ্টি হেতু ছী।
সভক হৃদয় মেঁ ভক্তি রূপ ছী, সভ পদার্থ মে শক্তি রূপ ছী॥ ইত্যাদি।

লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও সীতার এই গৌরীপূজার কাহিনী নানাভাবে দেখিতে পাই। একটি 'গোসাউনিক গীতে' দেখি—

জননী মো পর হোহু সহায়।
ঋষি মুনীস্বর কেঁ উবারল, মারল মহিষা কেঁ জায়॥
সুংভ নিসুংভ অসুর সংহারল, জয় জয় সব্দ মচায়।
জনকনন্দিনী অহাঁকেঁ পুজলনি, রামচন্দ্র-বর পায়॥
কবি বিমতী কালী কে তারল, কিংকর অপন বনায়।
হমরা নহি অবলম্বন আন অছি, অহীঁ ছী এক উপায়॥[১৬]

'গৌরীক-গীত'-এর একটি গীতে জানকীকে জনক-ভবনে বসিয়া গৌরীপূজা করিতে দেখি। ফুল-ফল-বিল্বপত্র, ধূপ-আসন সিন্দূর প্রভৃতি লইয়া দেবীপূজার আয়োজন হইয়াছে।—

গৌরী পূজু জানকী জনক ভবন মে
জনক ভবন মে সিব সংকর জী কে সংগ মে।
ফুল লাও ঝট দৈ অছিনজল লাও ছন মে—গৌরী পূজু···।
কেরা লাও ঝট দৈ ধূপ লাও ছন মে—গৌরী পূজু···। ইত্যাদি।[১৭]

---

১৬. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

১৭. ঐ। তুলনীয়—

গৌরী পূজয় চললী সখিয়া জনক নগরিয়া হে
জনক নগরিয়া হে সখিয়া মিথিলা নগরিয়া হে
ফুল বেলপত্র লয় গংগজল নীর লয়—গৌরী পূজয়··।
অক্ষত চন্দন লে চললী জনক নগরিয়া হে
জনক নগরিয়া সখিয়া মিথিলা নগরিয়া হে—গৌরী পূজয়·· ॥ ঐ॥

শুধু স্বামিলাভের জন্য নহে—স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণকে দেবররূপে পাইবার জন্যও সীতা গৌরীপূজা করিয়াছেন।—

জানকী [illegible] অরাধল মন সাধল হে
চলহুঁ নিকুংজবন জাই সুন্দর ফুল লোঢ়ব হে
ডালী ভরি ফূল লোঢ়ল কিছু তোরল হে
পড়ল লছন মুখ দৃষ্ট মনহি লজায়েল হে
জোহী ঠাম সীতা কে নিহরল লট ঝাড়ল হে
চলহু জনকপুর ধাম ওহি ঠাম বিয়াহব হে
পান সিন্দূর গৌরী পূজল বর মাঁগল হে
বর ভেটল শ্রীরাম লছন সন দীঅর হে[১৮]।

মৈথিলী কবিগণের গানে ও কবিতায় দেবীর বিবিধ রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়, আমরা পূর্বে নানা-প্রসঙ্গে এই জাতীয় অনেক গানের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। মিথিলার লোক-সঙ্গীতে 'গোসাউনিক গীত', 'ভগবতীক গীত', 'গৌরীক গীত' প্রভৃতি যে সকল গীত পাওয়া যায় তাহার বিষয়বস্তুও বিবিধ এবং বিচিত্র। কতকগুলি গান আছে যেখানে দেবীকে সাধারণ মূর্তিতে বা কালী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি মূর্তিতে বর্ণিত হইতে দেখি। যেমন সাধারণ বর্ণনায়—

তোঁহী ঘরনী তোঁহী করনী, তোঁহী জগতক মাত॥ হে মা॥
দশ মাস মাতা উদর মে রাখল, দশ মাস দুধ পিয়াব॥ হে মা॥
নিরংকার নিরংজনি লক্ষ্মীশ্বরি, ভবঘরনি তোঁ কহাব॥ হে মা॥
গাইনি মুখ মে গান ভএ পৈসলি, সুস্বর গীত সুহাব॥ হে মা॥
'মংগনীরাম' চরণ পর লোটথি, ভক্তি মুক্তি বর পাব॥ হে মা॥ [১৯]

কোথাও দেখি কালী বা তারার বর্ণনা। যেমন—

শংকরি শরণ ধয়ল হম তোর।
কুকরম দেখি পরম যদি কোপিত, যমহু করত কী মোর॥

১৮ শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

১৯. অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তুলনীয়—

জগ জননী পূজৈ ঐলৌ দুআর
অচ্ছত চন্দন ফুলো কে মালা অরহুল ছৈ বিকরাট—জগ জননী…।
হাথ মে কংগন খপ্পর সোভৈ সিন্দুর ছৈ বিকরাট—জগ জননী…।
মাথা মে খুটিয়া ও মালা বিরাজৈ তিরসুল ছৈ বিকরাট—জগ জননী…।
তু ত্য ভবানী ত্রিলোচন কে রানী, মহিমা ছৈ অগম অপার—জগ জননী…।

শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

স্তুরতরু অরতর শিবউ উপর, বাস আস অতি ঘোর।
সহস দিবস মনি চান কোটি জনি, তন্থ দ্যুতি করত ইজোর॥
বামা হাথ কুবলয় ধরু, দহিন খংগবর কাতী।
পাঁচ কপাল ভাল অতি শোভিত, শিব ইন্দীবর পাতী॥
শিব শব আসন পাস যোগিনীগণ, পহিরন বঘছালা।...
বিকট বদন রসনা লহ লহ কর নব যৌবন মুণ্ডমালা॥
চহু দিশি ফেরব মুণ্ডাবলি, চিতা অগ্নি থিক গেহ।
তীনি নয়ন মণিময় সব ভূষণ, নব জলধর সম দেহ॥ ইত্যাদি।[২০]

আর একটি বর্ণনা পাই সিংহারূঢ়া কালিকার।[২১] এই সিংহারূঢ়া কালিকামূর্তি কালিকা-পুরাণোক্ত কালিকার আদিদেবীত্বেরই প্রভাব সূচিত করে; অর্থাৎ সিংহারূঢ়া কালিকাই আদি দুর্গারূপ, গৌরীরূপ পরে লব্ধ।

জগত্র জননী নাম কালিকা সিংহ পীঠ অসবার হে
জাব জংগল বাঘ ঘেরত তাহাঁ পহুঁচত ভগবতী। ইতাদি।[২২]

বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদেও সিংহারূঢ়া বাঘছাল-পরিহিতা যোগিনীবেশ-ধারিণী কালীর বর্ণনা পাই।—

সিংহ চঢ়লি দেবি লেল পরবেশ।
বঘছল পরিহন যোগিনি বেশ॥...
ভনই বিদ্যাপতি কালী কেলি।
সদা রহু মৈয়া দাহিনি ভেলি॥[২৩]

একটি গানে দেখিতে পাই ছিন্নমস্তার বর্ণনা।—

জয় জগজ্যোতি জগতি গতি দাইনি চিকুর চারু রুচি ভালে।
পরম অসম্ভব সম্ভব তুঅ বস পীন পয়োধর বালে॥
কমল কোপ রবি মণ্ডলতা বিচ ত্রিবিধ ত্রিকোণক রেখা।
তা বিচ রতি বিপরীত মনোভব সুষমা সরিত বিশেষা॥
পদ আরোপিত পদলস তা পর অরুণ মান শশিরেহা। ইত্যাদি।[২৪]

'আদিনাথে'র ভনিতায় প্রাপ্ত একটি পদ বিদ্যাপতির বৈষ্ণব প্রার্থনার পদ অস্পষ্টভাবে স্মরণ করায়।—

২০. কৃষ্ণকবি রচিত; অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২১. ও ২২. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

২৩. গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সংকলিত।

২৪. অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হম অতি বিকল বিষয় রস মাতল ভগবতি তোহর ভরোশে।
অশরণ শরণ হরণ দুঃখ দারিদ তুঅ পদ পংকজ কোশে॥
বিধি হরি শিব শনকাদিক সুরমুনি পাবি মনোরথ দানে।
তুঅ গুণ যশ বরণন কর অমুছন বেদ পুরাণ বখানে॥ ইত্যাদি।[২৫]

এই লোক-সংগীতগুলির মধ্যে কতকগুলি গানে দেখিতে পাই অত্যন্ত লৌকিকভাবে দেবীকে পূজা ও সেবার বর্ণনা, আর সাংসারিক সুখ-সুবিধা, ধন-জন, আপদ্-মুক্তি, ব্যাধিনাশ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা। দেবী আসিবেন, কোথায় বসিবেন, কি অর্ঘ্য কি উপচার? দেবীর জন্য চাই সোনার আসন, পাট সিংহাসন,—সোনার ঝারি, গঙ্গার বারি—সোনার থালা, কর্পূরের আরতি—সোনার থালায় পায়স—ইত্যাদি ইত্যাদি।[২৬] আবার অন্যখানে দেখি---তিন বস্তুতে মায়ের পূজা হইবে—সিন্দূর ফুল বেলপাতা; তিন বস্তু ভোগে লাগিবে—কলা নারিকেল ডালিম; তিন বস্তু লইয়া আরতি—অগর গুগ্‌গুল আর দীপ; বরদানও চাওয়া হইবে তিনটি---নীতি ধর্ম আর সৌভাগ্য।[২৭] কোথাও দেখি মায়ের নিকট শুধু 'হমর মন পুরা করু'---এই প্রার্থনা,[২৮] কোথাও দেখি বন্ধ্যা অবলার পুত্র-প্রার্থনা,[২৯]

---

২৫. অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২৬. কথী কৈ আসন কথী সিংহাসন-- ভগবতী মা কে আনি বৈসাবু দেবী ললিতা
সোনে কে আসন পাট সিংহাসন— ভগবতী মা কে আনি বৈসাবু দেবী ললিতা।
সোনে কে ঝারি গঙ্গাজল পানী --- ভগবতী মা কে চরন পথারু দেবী ললিতা
সোনে কে থারী কপূরক আরতী--- ভগবতী মা কে আরতী উতারু দেবী ললিতা॥
ইত্যাদি। শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

২৭. তীন বস্তু লৈ গৌরী পূজব সিন্দুর ফূল বেলপত্র যো
তীন বস্তু লৈ ভোগ লগৈবহি কেরা নরিয়ল অনার যো
তীন বস্তু লৈ ধূপ দেখৈবহি অগর গুগুল অরু দীপ যো
তীন বস্তু বরদান মাঁগব নেতি ধর্ম অহিবাতি যো॥ ঐ॥

২৮. অম্বে অম্বে কৈ হরদম জপব হম বরু
আস মাতা হমর মন পুরা করু।
পুত্র হমহুঁ অহাঁ কে পরল ছী গরু— আস মাতা···।
পাঠ পূজা ন জানী ধ্যান কোনা ধরু— আস মাতা···॥ ঐ॥

২৯. এক বিনয় হম গায়ব জননী হম অবলা ছী পুত্র বিনা ছী।
বাঁঝিক পদ ছুড়াও হে জননী গোখুলা বিচ অন্যায় হোইত ছৈ
মথুরাক ফন্দ ছুড়াও হে জননী—
সোনাক থার কপূরক বাতী আরতিক ভেস দেখাও হে জননী॥ ঐ॥

অন্যত্র প্রার্থনা দেখি—অন্ধ আছে মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া—অন্ধের চোখ দাও, কুষ্ঠরোগী আছে দাঁড়াইয়া—তাহার রোগ দূর কর, নির্ধনকে ধন দাও, বন্ধ্যাকে পুত্র দাও—এই সকল প্রার্থনা।[৩০] কিন্তু গানগুলির সবত্রই যে এই অত্যন্ত সাধারণ সংসারীর ন্যায় কেবল 'দেহি দেহি' প্রার্থনা তাহা নহে—কতগুলি গানে বেশ একটা সন্তানভাব এবং হৃদয়ের আকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন 'গোসাউনিক গীতে'র একটি গানে দেখি—

জননী আব কিছু করিয় উপায়—
কী হম করব কতয় হম জায়ব
কে হোয়ত দোসর সহায়॥
জন বিনু অবলম্বন অবলম্বন ধার মে পডলোঁ
চিন্তা সঁ অতি অগুতায়।
আব কৃপা কএ হেরহুঁ জননী
কর ধএ লেহুঁ উঠায়॥
পূজা ধ্যান একো নহি কয়লহুঁ
তদপি ন ত্যাগব মায়।
পুত্র বিকল দেখি জগ-জননী
কোর কৈঁ লেল উঠায়॥
কর চুচকার দুলারতি জননী
চিন্তা দেল হটায়।
সৃষ্টিক কারণ অহাঁ জগতারিণি
মাতা সত্য কহায়।
হম সন পুত্র অহাঁক মতি আয়ল
রাখিয়হুঁ সংগ লগায়॥[৩১]

---

৩০. আহে মা কে দুআরি পর অন্ধা খড়ী— মা হে অন্ধাকে নয়না দিও ন কনী।
আহে মা কে দুআরি পর কোঢ়িয়া খড়ী— মা হে কোঢ়িয়াকে কায়া দিও ন কনী।
আহে মা কে দুআরি পর নির্ধন খড়ী— মা হে নির্ধনকে ধন দিও ন কনী।
আহে মা কে দুআরি পর বাঁঝি খড়ী— মা হে বাঁঝিকে পুত্রফল দিও ন কনী। ॥ঐ॥

৩১. তুলনীয়—

সব কৈ সুধি অহাঁ লৈ ছী মাতা
হমরা কিয়ে বিসরৈ ছী হে
সগর রৈনি হম ঠাঢ় রহৈ ছী
দরসন বিন তরসৈ ছী হে
ছিকহুঁ পুত্র অহীঁ কে অম্বা
ঈ তঁ অহাঁ জনৈ ছী হে
সগর রৈনি হাম ঠাঢ় রহৈ ছী
দরসন বিন তরসৈ ছী হে॥ ঐ ॥

একটি গীতে এই আকুতি এবং জগত্তারিণী মায়ের উপরে নির্ভর বেশ মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

জগতারা হমর কষ্ট কহিয়া হরব
ভবতারা হমর কষ্ট কহিয়া হরব।
ভবসাগর মে নৈয়া ডুবল অছি হমর
নহি হেরব পলক হম ডুববে করব,
মা অপনে সে করুআরি জা ঠৌ ধরব।
মা উবরবা কে তা নৈ ভরোসা করব
মা সবনো মে আ কএ পরল ছী তুরত
মা নয়ন মুঁদি অহাঁ সুতল ছী কোনা ॥[৩২]

'জগতারা আমার কষ্ট কবে হরিবে, ভবতারা আমার কষ্ট কবে হরিবে? ভবসাগরে নৌকা ডুবিয়া আছে আমার —আর পলকও দেরী করিও না নতুবা ডুবিয়াই যাইব; মা তুমি নিজে আসিয়া যে পযন্ত না দাঁড় ধরিবে, সে পযন্ত নিস্তারের ভরসা করিব না। মা এইমাত্রই তোমার শরণে আসিয়া পড়িয়াছি মা তুমি কিভাবে নয়ন মুদিয়া শুইয়া আছ!'

কবি ঈশনাথ কর্তৃক রচিত এইজাতীয় কতকগুলি প্রপত্তিমূলক সংগীত দেখিতে পাই। একটি গানে দেখি—

জে জন গহল অইক পদ-পঙ্কজ, পূরল তকর মনকামে।
এক হমহিঁ অতি দীন অভাগল, রহলহুঁ ঠামক ঠামে ॥ মাহে ॥
জঁ কিছু দোষ পড়ল হো জননী, ছমব জানি সন্তানে।
আপন সুতক জঁ লাজ ন রাখব, রাখত কে পুনি আনে ॥ মাহে ॥
অএলহুঁ অইক শরণ, হম পামর, অছি মন মে অভিমানে।
মাইক অপন কুরূপহু শিশুপর, রহইছ ভাব সমানে ॥ মাহে ॥[৩৩]

৩২. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ। তুলনীয়—

হে ভবাণী দুখ হরু মা পুত্র আপন জানি কৈ
দৈ রহল ছী ক্লেশ ভারী বীচ বিস্ময় আনি কৈ।
আবি আসা হম পরল ছী কী কহু হম কানি কৈ
হে ভবাণী দুখ হরু মা পুত্র আপন জানি কৈ ॥
দেখি দুর্বল পুত্র কৈ মা কী সুতল ছী তানি কৈ
দেখি আসা পূর করনা ফুল তোড়ব হম কানি কৈ
জানি হে মা নিত্য পূজব নেমা ব্রত কৈ ঠানি কৈ ॥ ঐ ॥

৩৩. গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সংকলিত। তুলনীয়—

জগত-জননী মিনতী সুনু মোর। শরণ জানি গহলহুঁ পদ তোর ॥

গৌরী সম্বন্ধে কতগুলি লোক-সংগীত বাংলাদেশের আগমনী বিজয়া-সংগীতের সহিত তুলনা করার যোগ্য। কিছু কিছু বৈচিত্র্যেরও সন্ধান মেলে। যেমন গৌরী ও শিবের পূর্বরাগ। এ-বর্ণনা অনেকখানি রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনার অনুরূপ। প্রেম-কৌশলটিও একজাতীয়। বিদ্যাপতির একটি পদে পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শিব ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া উমাকে দেখা দিয়াছেন—উমার মন তাহাতেই মজিয়াছে। গোবিন্দ দাসের প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে, কৃষ্ণও গোরখ যোগী সাজিয়া রাধার মান ভাঙাইয়াছেন। একটি মৈথিলী লোক-গীতিতেও দেখি ভিখারীর বেশে শিবের উমা-দর্শনের চেষ্টা।—

হেমন্ত দুআরি পর চন্দনক গছিয়া
তাহি তর যোগিয়া ধূনী রমাবল রে।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাগে
সুতলী মে ছলি হে গৌরী উঠলি চেহায়—
আগে মায় ডিম ডিম ডমরু কে বজায়।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে—
থারি ভরি লেলনি গৌরী চংগেরী ভরি লেলনি
মাই হে উপর সঁ লেলনি দূবি ধান হে।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে—
ভিখিয়ো নে লৈ ছৈ হে যোগী মুখহু ন বোলৈ
ঘুরি ঘুরি গৌরীকে নিরেখৈ হে।
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে—
হম নহি থিকহুঁ হে গৌরী ভিক্ষু ভিখারী
তোহরো সুরতিয়া দেখ ভুলেলোঁ হে।[৩৪]

আপন সুতক লখি সঙ্কট ঘোর। কওন জননি নহি বহবএ লোর॥
কএল জনম ভরি পাপ-বটোর। সদিখন রহলহুঁ মদহিঁ বিভোর॥…
ঈশনাথ একরে টা জোর। মাইক হিঅ নহি রহএ কঠোর॥ ঐ॥

আরও— আবহু তাকিঅ হে জননী॥
অধম উধারিণি, তারিণি, সুত দিসি হেরিঅ সদয় কনী॥
সভ পাওল মন-কাম, নাম তুঅ জপি, সঙ্কট-হরণী॥
হমরহি বিসরি দেল কিএ, অইঁ নহি, এহন কঠোর বনী॥…
হো কুপূত, নহি মাএ কুমাতা, হোইত কতহু সুনী॥
কী হমহী ছী এহন অভাগল, জে নিত মাথ ধুনী॥

কবি জীবানন্দ রচিত; ঐ॥

৩৪. শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ।

হেমন্তের (গৌরী-পিতা) দুয়ারে চন্দনের গাছ--তাহারই নীচে যোগী ধূনী রাখিল। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। শুইয়াছিল গৌরী—চেঁচাইয়া উঠিল,—ওগো মা, ডিম ডিম ডমরু কে বাজায়! তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। থালি ভরিয়া আনিল গৌরী—চাঙ্গেরী ভরিয়া নিলেন গৌরী—মা গো, তাহার উপরে রাখিলেন ধান-দূর্বা। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। ভিক্ষা না লয় যোগী—মুখে না কথা বলে—শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া গৌরীকে নিরীক্ষণ করে। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। 'আমি ভিক্ষু-ভিখারী নহি হে গৌরী, তোমার রূপ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি!'

একটি গানে গৌরীর স্বামীর সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরবাড়িতে দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র করুণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পানের মত পাতলা--ফুলের মত সুন্দরী গৌরী, কোন্ বনে যাইবে? যেখানে তপোবনে তপস্বী ভিখারি সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে পরে গৌরী চিরকাল কত আভরণ—কোন্ বনে যাইবে এই গৌরী? যেখানে বনে বনে কাঠ খোঁজা হয়, সেই বনে যাইবে গৌরী। শ্বশুরবাড়িতে পরে গৌরী ছেঁড়া পুরাণ কাপড়—সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে খায় গৌরী পুরি ও জিলেপী—কোন্ বনে যাইবে এই গৌরী? শ্বশুরবাড়িতে আছে ভাঙ খাবার—সেই বনে যাইবে। মায়ের বাড়িতে শোয় গৌরী কোমল পালঙ্কে— কোন্ বনে যাইবে এই গৌরী? শ্বশুরবাড়িতে আছে ভূমি আশ্রয় —সেই বনে যাইবে গৌরী।[৩৫]

৩৫. পান সন পাতর গৌরী ফুল ঐসন সুন্দরি হে।
কোন বন জৈতী--
তপোবন তপসী ভিখারী হে ওহি বন জৈতী।
নহিরা মে পিহ্নতী গৌরী চির আভরন মা হে
কোন বন জৈতী--
বন বন লকরী চুনৈ তী হে ওহি বন জৈতী।
সসুরা মে পিহ্নতী গৌরী গুদরী পুরনমা হে
ওহি বন জৈতী।
নহিরা মে খৈতী গৌরী পূরী ও জিলেবী
কোন বন জৈতী।
সসুরা মে ভাংগ আধার হে ওহি বন জৈতী।
রংগকে রংগীলী গৌরী প্রেমকে সুন্দরী—
কোন বন জৈতী—
নহিরা মে সুততী গৌরী ললিয়া পলংগিয়া হে
কোন বন জৈতী
সসুরা মে ভুইয়াঁ অধার-- ওহি বন জৈতী॥ ঐ

অন্য একটি গীতে দেখিতেছি, এইরূপ ঘরে বরে গৌরীকে দিয়া মা মেনকার দুশ্চিন্তা ও খেদের অন্ত নাই। স্বামীর ঘরে যে গৌরীর দুঃখের অন্ত নাই। স্বামী পাগলা ভোলা যে গাঁজাখোর ভাঙখোর—ভোজনে ধুতুরা ও আঁক; বসিয়া খাইবার ঘর-দুয়ারও নাই। ঋষিরাজ নারদ যে ডাকাতি করিয়াছেন! অঙ্গে তাহার সাপের হার—অঙ্গে অঙ্গে ব্যাপ্ত বিষ। ঘোর পাপের ফলেই নিশ্চয় এইরূপ হইয়াছে, গৌরী ভয়ে মরিয়া যাইবে। শ্মশানে বনে বাস—ব্যাঘ্রচর্ম আসন! না জানি গৌরীর কি হইতেছে!

নহি জনী আব গৌরী দুখ কোন কোন পৌতী
গজখোর ভাংগ পীবা ভোলাক সংগ জৈতী॥
ভোজন ধতুর আকে ঘর ছৈ ন দুআর থাকে
ঋষিরাজ দেল তাকে বেটা হমর কী খৈতী।
নহি জানি আব গৌরী···
বৈদেহ হার সাঁপক বিষ অংগ অংগ ব্যাপক
ফল থিক ঘোর পাপক ডর ফোকি মরি জৈতী।
রহতী স্মসান বন মে নহি জানি কেনা হোইতী
বঘচর্ম ছৈহি আসন তৈয়ো ত্রিলোক সাসন
সিব কে ত্রিয়া কহৌতী॥[৩৬]

আর একটি পদে দেখি, একদিন স্বামী-পুত্র কাহাকেও সঙ্গে না করিয়া একা একা গৌরী মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত। মা মেনকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভরা যমুনায় কেমন করিয়া আসিলে গৌরী?' গৌরী বলিল,—'মা, আমি শাড়ি ভিজাইয়া আসিয়াছি।' 'বৃষ ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিলে গৌরী?' 'মা, বৃষের দড়ি ধরিয়া আসিয়াছি।' 'গণপতিকে কি করিয়া ছাড়িয়া আসিলে গৌরী?' 'মা, গণপতিকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছি।' 'মহাদেবকে কি করিয়া ছাড়িয়া আসিলে গৌরী?' 'মহাদেবকে পূজায় বসাইয়া দিয়া আসিয়াছি মা।'[৩৭]

---

৩৬. তুলনীয় ঈশনাথ রচিত একটি গীত --
গৌরা! কথিলএ করব বিআহ॥
এহন দিগম্বর বুঢ়বা বরসঁ, কথিলএ করব বিআহ॥
নহি ভরি বীত খেত ছনি হিনকা, নহি হর ও হরবাহ॥
ভীখ মাঙিকেঁ পেট পোসৈ ছথি, অইক কোনা নিরবাহ॥ ইত্যাদি।
— গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সংকলিত।

৩৭. গৌরী হে ভরল জমুনা কোনা এলৌ।
আমা হে সরিয়া ভিজৈতে হম্ এলৌ॥
গৌরী হে বসহা কে ছোড়ি কোনা এলৌ।
আমা হে বসহা কে ডোরিয়া ধরি এলৌ॥

অন্য একটি গানে পাই ভাঙখোর স্বামীর সঙ্গে গৌরীর গার্হস্থ্য জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র। গানটি তুলসীদাসের নামে প্রচলিত।

ভএ গেল ভাংগ কে বেরা
উঠূ হে গোরা।
হম কোনা উঠব ঈসর মহাদেব
কার্তিক গনপতি মোরা কোরা।
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ...
আসন খসায় দিঅ
কার্তিক সুতায় দীঅ
পীসি দীঅ ভাংগকে গোলা
উঠূ হে গোরা।
ভএ গেল ভাংগকে বেরা
নৈ ঘর সাসু ননদ জে ছথি
কে রাখত কার্তিক কোরা
উঠূ হে গৌরা, ভএ গেল গেল বেরা।
তুলসীদাস প্রভু তুম্হরে দরস কো
মহাদেব কে হৃদয় কঠোরা।
উঠূ হে গৌরা॥

মহাদেব ডাকিতেছেন,—'হইয়া গেল ভাঙের বেলা, উঠ হে গৌরা।' গৌরী বলিতেছেন,—'আমি কেমনে উঠিব ঈশ্বর মহাদেব, কার্তিক-গণপতি যে আমার কোলে।' আবার ডাকেন মহাদেব, 'ভাঙের বেলা হইল, ওঠ হে গৌরা। আসন খসাইয়া (বিছাইয়া) দাও, কার্তিককে শোওয়াইয়া দাও—ভাঙের গোলা পিষিয়া দাও, ওঠ হে গৌরা।' গৌরী বলিতেছেন,—'ঘরে নাই শাশুড়ী—নাই ননদ, কে রাখিবে কার্তিককে কোলে?' কিন্তু তবু হাক-ডাক,—'ওঠ হে গৌরা'। তুলসীদাস বলিতেছেন,—'তোমার দর্শনের জন্য আমি ব্যাকুল; কিন্তু হৃদয় কঠোর।'

একেবারে আধুনিক কালের মৈথিলী সাহিত্যে আর একটি প্রবণতা লক্ষ্য করিতে পারি। সমগ্র দেশে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব দেখা দিয়াছে—এই বিপ্লবের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশ চাহিতেছে একটি নূতন যুগান্তকারী বিবর্তন। শোষকের নির্মম অত্যাচারে

গৌরী হে গণপতি কে ছোড়ি কোনা এলौं।
আমা হে গণপতি কে ঠোকি সুতেলौं॥
গৌরী হে মহাদেব কে ছোড়ি কোনা এলौं।
আমা হে মহাদেব কে পূজ পর বৈসায় এলौं॥ ঐ

এবং শোষিতের আর্তরবে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই লোভী শোষকরূপ দানবের দলনের জন্য মা যেন নিজেই আবার রক্তপিপাসু হইয়া উঠিয়াছেন— নিজেই আবার সমরাঙ্গনে আবির্ভূতা হইতে চাহিতেছেন। এইজাতীয় একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

শোণিত দে শোণিত মৈথিলায
প্যাসেঁ তবধল অছি খড়্গ হমর
বড়বানল ছুধা ধরাতল কৈঁ
সংহার করৈ পরতচ্ছ ঠাঢ়ি
অছি খপ্পর ছুচ্ছে যুগ যুগ সঁ
খল খল কয় প্রাণিক প্রাণ বাঢ়ি
মারুত গতি বঢ়ি গেল দিগ দিগন্ত
ধুধুআএল ধূম কহেস প্রখর
ই প্রকৃতি ক্লান্ত ক্রন্দন করইছ
স্পন্দন প্রাণিক রুদ্ধ ভেল
শোষিত ক আহুতি দেখি দেখি
শোষক পর মন মোর ক্রুদ্ধ ভেল
আএল ছী উঠ দে মাংস একর
হম পেট ভরব পুনি করব সমর।[৩৮]

---

৩৮. ক্রান্তি-গীত, রাঘবাচার্য শাস্ত্রী রচিত। কলিকাতা 'মৈথিল-সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত
এই প্রসঙ্গে বাঙলা দেশের পঞ্চাশের মন্বন্তরকে লইয়া রচিত এই কবিতাটি তুলনীয়—
ভূখ ভবানী জো দেতী হৈ
ভূখ ভবানী বংগদেশ কী
যা দেবী বঙ্গদেশেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ···
যা দুর্গা বঙ্গদেশেষু দৈন্যরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ···
যা কালী বঙ্গদেশেষু কালরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ···

বেথুন সোসাইটি

অষ্টম প্রস্তাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেথুন সোসাইটির কার্য্যকলাপ আমরা এযাবৎ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা গিয়াছে যে সমাজ-কল্যাণ চিন্তায় ইহার কর্ত্তৃপক্ষ বরাবর নিরত ছিলেন। সোসাইটির বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বহু বিদগ্ধ সুধী ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রবন্ধপাঠ বা বক্তৃতার শেষে সদস্যগণ ইহার আলোচনায় শুধু যোগ দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধেও তাঁহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এইরূপ একটি সংস্কৃতিমূলক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের মধ্যে থাকিয়া সমাজের যে বিশেষ কল্যাণ-সাধন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

১৮৬৭-৬৮ সনের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয় ২৮ নবেম্বর, ১৮৬৭ তারিখে। সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি, বিচারপতি ফীয়ার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতিরূপে তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বরাবর তিনি মাসিক বা সাধারণ অধিবেশনগুলিতে শুধু পৌরোহিত্য করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না, নিজেও কোন কোন সময়ে মূল বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিতেন; এবং প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনেই উপসংহার বক্তৃতায় তিনি নিজ অভিমত এবং কার্য্যকর মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। সভাপতি ফীয়ার ভারতবর্ষের সত্যকার হিতৈষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁহার মতামত আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় না হইলেও ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর স্থায়ী হিতসাধনকল্পে তাঁহার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

এই প্রথম মাসিক বা সাধারণ অধিবেশনে সোসাইটির বৈষয়িক ও আভ্যন্তরিক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর (৬ই জুন, ১৮৬৭) বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া সভাপতি ফীয়ার তাঁহার গুণপনা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে যাঁহারা ইহার প্রাথমিক সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শম্ভুনাথ পণ্ডিত একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ কৃতীবলে ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যে এবং ব্যবহার-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে প্রথম ভারতীয়-রূপে বসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ জনহিতকর কর্ম্মে আমৃত্যু লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার গভীর আইন জ্ঞান, মধুর ব্যবহার এবং সোসাইটির উন্নতি সম্বন্ধে আকূতির বিষয় উল্লেখ করিয়া সভাপতি সহকর্ম্মী শম্ভুনাথের বিশেষ প্রশংসা করেন। এই অধিবেশনে শম্ভুনাথের স্থলে সোসাইটির সহকারী সভাপতি পদে বৃত হন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোসাইটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিবিধ কর্ম্ম পরিচালনা আরম্ভ করেন। মধ্যে এই সকল শাখা প্রায় স্তিমিত হইয়াছিল। এবারে দেখিতেছি শাখাগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক শাখারই সভাপতি এবং সম্পাদকও সোসাইটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শাখাগুলি ও প্রত্যেক শাখার সভাপতি ও সম্পাদকের নাম এই:

১.	শিক্ষা বিভাগ :	হেন্‌রী উড্রো, সভাপতি
		রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, সম্পাদক
২.	সাহিত্য ও দর্শন :	পাদ্রী কৃষ্ণমোহন, সভাপতি
		গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক
৩.	স্বাস্থ্য :	ডাঃ ইউয়ার্ট (Ewart), সভাপতি
		ডাঃ কানাইলাল দে, সম্পাদক
৪.	সমাজ বিজ্ঞান :	পাদ্রী জেম্‌স্ লঙ্, সভাপতি
		লালবিহারী দে, সম্পাদক
৫.	স্ত্রীজাতির উন্নতি :	দ্বারকানাথ মিত্র, সভাপতি
		হরশঙ্কর দাস, সম্পাদক

দেখিতেছি শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগ সম্পর্কে এই অধিবেশনে কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগের সভাপতি পদে কয়েক বৎসর যাবৎই কার্য্য করেন কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ। তিনি কোন কারণে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে সভাপতি পদ প্রদত্ত হয় দ্বারকানাথ মিত্রকে। দ্বারকানাথ প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী। তিনি কিছুকাল পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহার প্রযত্ন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য শাখার সভাপতি ও সম্পাদক পদেও যে ঐ সময়ের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ মনোনীত হইয়াছিলেন তাহা নাম দৃষ্টে আমাদের বোধগম্য হয়।

এদিনকার সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সভাপতি ফীয়ার স্বয়ং। তিনি বক্তৃতাদান করিতে উঠিলে তাঁহার স্থলে কিশোরীচাঁদ মিত্র সাময়িক ভাবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ফীয়ারের বক্তৃতার বিষয় ছিল—"Women Teachers for Women" অর্থাৎ ছাত্রীদের জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী। ঐ সময়ে কুমারী মেরী কার্পেন্টারের উপস্থিতির সুযোগ লইয়া এদেশে বালিকাদের মধ্যে যথাযথ শিক্ষাপ্রসার ও ইহার উন্নতিকল্পে একটি 'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল' বা স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সুরু হয়। কুমারী কার্পেন্টারও ছিলেন এইরূপ একটি ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল স্থাপনের বিশেষ পক্ষপাতী। বলাবাহুল্য বিচারপতি ফীয়ার এই প্রযত্নের সপক্ষে ছিলেন। শুধু তাহাই নয় এই ধরনের বিদ্যালয় যাহাতে সত্বর প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্যও তিনি নানাভাবে যত্ন লইয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় ইহার সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিকতার যথেষ্ট পরিচয় মিলে। তিনি এই মর্ম্মে বলেন যে, আট, দশ বা বার বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েরা বালিকা বিদ্যালয়ে পণ্ডিতদের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন কিন্তু এই অল্পবয়স্কাদের মধ্যেও এমন কতকগুলি

বিষয় আছে যাহা তাহারা পুরুষ শিক্ষকদের নিকট বলিতে ইচ্ছুক নয় বা ভরসা পায় না। তাহাদের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করা নারী-শিক্ষয়িত্রীদিগের পক্ষেই সম্ভব। এ কারণ স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে নারী-শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি আরও বলেন যে, সমাজের অর্দ্ধেক সংখ্যক লোককে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন রাখিলে দেশের কি সমাজের কাহারও যথার্থ উন্নতি হইতে পারে না। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজ পরিবারের কথা উল্লেখ করেন। সেখানে শিক্ষিতা স্ত্রী সুনিপুণ ভাবে গৃহস্থালী কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন। গৃহকর্ম্মের চিন্তা হইতে রেহাই পাওয়ায় পুরুষেরা বিভিন্ন বিষয়ে কত কার্য্য করিতে সক্ষম হন।

বক্তৃতাশেষে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে পাদ্রী ড্যাল, ল্যাজারাস, পার্কার, নাইট এবং কয়েকজন বাঙ্গালী সদস্য আলোচনায় যোগ দেন, বক্তা ফীয়ারের মূল বক্তব্য বিষয় মানিয়া লইলেও কোন কোন বিষয়ে কেহ কেহ ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। পাদ্রী ড্যাল বলেন যে, পুরুষ শিক্ষক সকল ক্ষেত্রেই যে অবাঞ্ছনীয় এ কথা বলা যায় না। একজন বাঙ্গালী সদস্য বলেন যে, বাঙ্গালা সমাজের অর্দ্ধেক বা নারীগণ নানা বিষয়ে অজ্ঞ এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন এ কথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যাহা হউক বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদানের পর এইদিনকার অধিবেশন শেষ হয়।

সোসাইটির দ্বিতীয় মাসিক বা সাধারণ অধিবেশন হইল পরবর্তী ১৯শে ডিসেম্বর। অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন। তাহার বক্তৃতার বিষয় -A Visit to the Punjab বা পাঞ্জাব পরিদর্শন। এই বক্তৃতায় তিনি পাঞ্জাবের শিখ জাতি ও শিখ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শিখ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানক। তিনি ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্ম্মানীতে মার্টিন ল্যুথার (১৪৮৩ খ্রী.) এবং বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৫ খ্রী.) আবির্ভাবে বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ চিন্তায় যুগান্তর সূচিত হয়। শিখদের দশম গুরু গুরুগোবিন্দ সিং শিখ-ধর্ম্মাশ্রয়ীদের একটি যোদ্ধ-সমাজে পরিণত করেন। শিখ ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদের স্থান নাই, যদিও বিবাহাদি বিষয়ে শেষোক্তটির ঊর্দ্ধে তাহারা যাইতে পারে নাই। নিম্নশ্রেণীর শিখদের ভিতরে এক প্রকারের বিধবাবিবাহও প্রচলিত রহিয়াছে বলিয়া বক্তা উল্লেখ করেন। ইংরেজী শিক্ষার কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্তন হইলেও স্ত্রীশিক্ষা তাহাদের মধ্যে একরূপ নাই বলিলেই চলে। পাঞ্জাবে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চ্চার জন্য একটি সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছে। "সঙ্গত"-সভায় সমাজের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা যোগ দিয়া ধর্ম্মীয় মূল তত্ত্বাদির সম্বন্ধে আলোচনার একটি আয়োজনও করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র শিখ জাতির সামরিক শক্তির বিশেষ প্রশংসা করেন। ভারতের মহাজাতি গঠনে তাহাদের সহযোগিতা যে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে তাহা তিনি বলিতে ভুলেন নাই। কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভ্রমণ করিয়া ঐ ঐ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করিয়াছেন। নিজ বাঙ্গালী-সমাজের স্বকীয়তা তিনি অবগত। এই তিন প্রদেশবাসীর সঙ্গে পাঞ্জাববাসীর মিলন ঘটিলে ভারতবর্ষ কিরূপ

একটি মহৎ, সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে, তাহার বিষয়ও তিনি বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন। ইহার কোন কোন অংশগুলি এ যুগেও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— "...Now what he had seen of Madras, Bombay, Bengal and the Punjab, he was of opinion that each had a noble and distinctive mission to accomplish, and that much depended upon the blending all the races by instituting a system of active co-operation among the educated natives of all Presidenceis and Provinces. The Bethune Society, which has hither to done much in the way of speaking and writing, should, he thought, enter the sphere of action and become the focus of such co-operation and fellowship among the educated natives of India. He entertained the hope that under the able Presidency, and the wise counsel and warm philanthropy of the honorable gentleman who occupied the chair, the Bethune Society would yet live to fulfil the high mission reserved for it." (P. Cxv.) অর্থাৎ, বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বেথুন সোসাইটি এযাবৎ বক্তৃতা-প্রবন্ধ-আলোচনাদির দ্বারা এইরূপ একটি মিলন-ক্ষেত্রের পথ দেখাইয়া আসিতেছে। সোসাইটির বর্ত্তমান কর্ণধার সচেষ্ট হইলে ইহাকেই একটি সমগ্র ভারতের মিলনস্থল করিয়া তোলা যাইবে। ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে ইহার কার্য্যকরতা খুবই বেশী।

এই বৎসরের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হয় পরবর্ত্তী ৯ই জানুয়ারী, ১৮৬৮ দিবসে। এদিনকার প্রধান বক্তা ছিলেন বেথুন সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি মেজর জি. বি. ম্যালেসন। বক্তৃতার বিষয়—"Native Dynasties in India", অর্থাৎ ভারতবর্ষের দেশীয় রাজবংশ। বক্তা ম্যালেসন গত শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা-গবেষণার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। তিনি এদিনকার ভাষণে প্রথমেই বলেন যে বক্তব্য বিষয় ব্যাপক না করিয়া তিনি মাত্র একটি রাজ্য ও রাজবংশের কথা বিবৃত করিবেন।

তিনি বলেন, মহীশূর রাজ্যের পত্তন করেন চাম্‌রাজ ১৫০৭ সনে। তাঁহার হাতে ছয়টি আঙুল ছিল বলিয়া তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হয়। এই রাজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে চাম্‌রাজের বংশধরদের সুকীর্ত্তি ও কুকীর্ত্তি রহিয়াছে বিস্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহীশূরে হায়দার আলির অভ্যুদয় হয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। তবে রাজবংশ বহির্ভূত এবং রাজবংশের সঙ্গে সম্বন্ধহীন এক ব্যক্তিকে নামে মাত্র "রাজা" করিয়া লন। হায়দার আলি ১৭৮২ সনে এবং উক্ত "রাজা" ১৭৯২ সনে মারা যান। শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা এবং শিশু পুত্রকে হায়দার আলির পুত্র টিপু সুলতান একটি অপরিচ্ছন্ন কুটিরে বন্দী করিয়া রাখেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি যখন শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করেন তখন তিনি এই দুই ব্যক্তিকে উক্ত কুটিরে পান।

ওয়েলেস্‌লি মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ নিজামকে অর্পণ করেন, কিয়দংশ ব্রিটিশের খাস অধিকারে আনেন এবং বাকী অংশের উপরে উক্ত কুটিরে পাওয়া ছেলেটিকে ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি একটি কমিশনের উপর এই ব্যক্তির যথোপযুক্ত শিক্ষার ভার দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়া যায়, শাসনে অনাচারও চরমে ওঠে। শেষে ব্রিটিশ সরকার ইহাকে এককালীন মোটা টাকা পেনশন দিয়া মহীশূরের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

ম্যালেসানের বক্তৃতার মর্ম্ম ছিল এই। কিন্তু ইহা লইয়া এই সভাতেই বিষম বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিতর্কে মৌলবী আব্দুল লতিফ, পাদ্রী লঙ্‌, লালবিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সোসাইটির সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু যোগদান করেন। মৌলবী আব্দুল লতিফ সাধারণভাবে বক্তাকে ধন্যবাদ দানের পর পাদ্রী লঙ্‌ বলেন যে শাসন ব্যাপারে প্রজাদের কল্যাণই আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁহাদের উপর অত্যাচার অনাচার হইলে আশু প্রতিবিধান হওয়া বিধেয়। এই কথার পরেই বিতর্ক খুব জোরালো হইয়া উঠে। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লালবিহারী দে এই মর্ম্মে বলেন যে, দেশমধ্যে অনাচার-অত্যাচার সংঘটিত হওয়ার অছিলায় প্রতিবেশী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাহাদের এই উক্তির লক্ষ্য ছিল মহীশূর রাজ্যে ব্রিটিশের হস্তক্ষেপ, একথা বলাই বাহুল্য। বক্তা ম্যালেসন এই বিতর্কের উত্তরে বলেন যে, একটি দেশীয় রাজ্য বা রাজবংশকে হীন প্রতিপন্ন করা তাহার উদ্দেশ্য নয়। মহীশূরের মূল রাজবংশের অনেকেই যে প্রজাবৎসল ছিলেন একথা তিনি বলিয়াছেন। মহীশূরের সমৃদ্ধির মূলেও ছিল রাজাদের এবম্বিধ সুশাসন।

চতুর্থ অধিবেশনে (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮) প্রবন্ধ পাঠ করেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয়—"The Proper Place of Oriental Literature in Indian Education," অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের স্থান। কৃষ্ণমোহন বক্তৃতায় ইংরেজী ও সংস্কৃত তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার অনুকূলে যুক্তি প্রমাণসহ নিজ বক্তব্য বিশদভাবে পরিবেশন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন একজন সদস্য নিছক প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষাদানরত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কলেজের মর্য্যাদা দিয়া মঞ্জুরী দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহারই প্রতিবাদে তাঁহার এই প্রবন্ধ। তিনি ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের ক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে হোরেস হেম্যান উইলসনের কৃতিত্ব সর্ব্বজন স্বীকৃত। তিনি সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজকে একই গৃহে স্থান দিয়া উভয়কে উভয়ের পরিপূরক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক বলেন, হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষা করিলেও তিনি সেই প্রথম যুগে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া সংস্কৃত পড়িতেন সংস্কৃত কলেজে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহনও বক্তৃতায় সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা

বিশদভাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইংরেজী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। তিনি উদাহরণ দিয়া দেখাইলেন যে, ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চলে (যেমন বাঙ্গালায়) ইংরেজী শিক্ষার প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই সব অঞ্চলের ভাষাগুলিও বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তিলাভ রহিয়াছে এই ধরনের সমৃদ্ধির মূলে। কিন্তু বাংলা তথা দেশ-ভাষাগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং দ্রুত উন্নতির পক্ষে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের অনুশীলনও একান্ত প্রয়োজনীয়। বক্তা এই সারগর্ভ বক্তৃতাটিতে এ সকল কথা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। শিক্ষা-কর্তৃপক্ষেরও যে এ বিষয়ে বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে তিনি ভোলেন নাই।

বক্তৃতার মূল লক্ষ্য ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে কলেজী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে ইহা লইয়া এবারেও বিশেষ বিতর্কের উদ্ভব হয়। এই বিতর্কে যোগ দেন এইচ্. এল. পোয়ার ওয়াইন, যদুনাথ ঘোষ, সার রিচার্ড টেম্পল (পরবর্তী কালে বঙ্গের ছোটলাট), পাদ্রী লঙ, পাদ্রী ডি. মারে মিচেল এবং সভাপতি স্বয়ং। ওয়াইন বলেন, দেশভাষার মাধ্যমে কলেজী শিক্ষাও যাহাতে প্রদত্ত হইতে পারে তাহার উপায়-চিন্তার সময় আসিয়াছে। তখন হইতেই এই সকল ভাষায় বিবিধ বিদ্যার পুস্তক রচনা যে সুরু হইয়াছে তাহার প্রসারকল্পে উৎসাহদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেন। সার্ রিচার্ড টেম্পল বলেন যে বোম্বাই প্রদেশেও একটি উচ্চশিক্ষিত বিদগ্ধসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সভাপতি ফিয়ার অধিবেশন সমাপ্তির পূর্ব্বে উপসংহার বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দুইটি দিকের পার্থক্য বা তারতম্য প্রদর্শন মূল বক্তার অন্যতম লক্ষ্য। এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। "Popular Education" বা জনসাধারণের শিক্ষা এবং "Liberal Education" বা উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক স্তরে দেশ-ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার বেলায় অন্যকথা। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানে মৌলিক পুস্তক রচিত না হইলে উচ্চশিক্ষায় দেশভাষা প্রাচ্যভাষাকে তথা প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে শিক্ষার বাহন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠকের মূল বক্তব্যের দিকে সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অধিবেশন সমাপ্ত করেন।

পঞ্চম অধিবেশন হয় পরবর্ত্তী ১২ই মার্চ্চ। ঐদিনকার মূল বক্তা এইচ্. এল. পোয়ার ওয়াইন। বক্তৃতার বিষয়—Bodily Training as an Agent in National Regeneration বা জাতীয় পুনরুজ্জীবনে শরীর চর্চ্চার স্থান।

এই বক্তৃতায় শারীরিক শক্তির বিকাশের উপায় সমূহ বিশদভাবে ব্যক্ত করা হয়। বিভিন্ন জাতির উত্থানপতনের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা বলেন যে, উহাদের প্রত্যেকের

ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে শারীরিক শক্তির উন্মেষ সাধনা প্রয়াসের তারতম্যের উপরে ইহা বারবার নির্ভর করিয়াছে। কোন জাতির সত্যকার উন্নতি, কি চিন্তায়, কি কর্ম্মে, করিতে হইলে তাহার অন্তর্গত জনসাধারণের স্বাস্থ্য তথা শারীর-শক্তি উন্নত হওয়া আবশ্যক। সাহস এবং শারীর-শক্তি দুইয়ের মিলন হইলে অঘটন ঘটান যাইতে পারে। স্বাস্থ্যবান লোকের ভিতরেই সাহসের আধিক্য সচরাচর দেখা যায়। মানসিক শক্তির বিকাশ সম্ভব করিতে হইলেও দেহকে সুস্থ ও সবল করিয়া লইতে হইবে।

বক্তৃতার পর বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন সোসাইটির অন্যতম সদস্য তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রসঙ্গত যে কয়টি কথা বলেন তাহা বড়ই প্রণিধানযোগ্য। সোসাইটির কার্য্য বিবরণে তাঁহার উক্তি এইরূপ বিধৃত রহিয়াছে—"...The subject was one that did not admit of much discussion. He thought also, that it was too early to expect the fruits of English education in this country, education being more an exotic than a natural growth of the country. Education, in the highest sense of the term, must be one of national development to be of any use to a country. That result, however he thought, was not to be expected in India, so long as the vast superiority of the English race caused itself to be felt by the natives and produced in their minds an overwhelming sense of their own inferiority. The two nations, he thought, must be amicably parted, before anything good or great could be achieved by the people of this country."—P. Cxxii

উদ্ধৃত অংশ হইতে তারাপ্রসাদের এরূপ মন্তব্য প্রকাশের কারণগুলি বুঝা যাইবে না। তবে মূল বক্তার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় পুনর্জন্ম বা পুনরুজ্জীবনে শারীরিক শক্তি উন্মেষের আলোচনা। তারাপ্রসাদ হয়ত বলিতে চাহিয়াছেন জাতীয় পুনরুজ্জীবন তখনই সম্ভব যখন ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতার পরিবেশে কার্য্য করিবার সুযোগ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরেজী শিক্ষার কথা তিনি উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। আমরা যতই ইংরেজী শিক্ষা লাভ করি না কেন ইংরেজের মত প্রবল ও স্বাধীন প্রতিপক্ষের সম্মুখে পরাধীন বলিয়া আমাদের মনে হীনমন্যতা বোধ জন্মিবেই। তাই তিনি মনে করেন ইংরেজ আপোষে এদেশ হইতে চলিয়া গেলে স্বাধীন পরিবেশে আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবন তথা সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইবে। সাহস এবং শারীরিক শক্তি যুগপৎ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদর্শন করিতে পারিব।[১] তারাপ্রসাদের পর আরও কয়েকজন সদস্য আলোচনায় যোগদান করেন এবং কেহ কেহ তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া ইহার সমালোচনা করেন। হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র বলেন যে, বাঙ্গালী সন্তানেরা ইতিমধ্যেই শারীর-চর্চ্চায় মনোযোগী হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের দ্বারা একটি ভলান্টিয়ার কোর বা

১. লেখক ১৯৪৫ সনে "মন্দিরা"য় এবং ১৯৪৬ সনে (জুন-জুলাই) প্রকাশিত "জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ" পুস্তকে তারাপ্রসাদের ইংরেজী উক্তিটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হইয়াছে। সম-সময়ে শারীর-চর্চ্চার বেশ ধুম পড়িয়া গিয়াছে, এজন্য পল্লীতে পল্লীতে কুস্তির ও ব্যায়ামের আখড়াও স্থাপিত হইতেছে।

অন্যান্য বক্তার মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, মানসিক শক্তি বিকাশে শারীর-চর্চ্চার প্রয়োজন নাই। সভাপতি ফিয়ার উপসংহার বক্তৃতায় এরূপ চাঞ্চল্যকর উক্তির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই আলোচনায় কিশোরীলাল সরকার, কালীমোহন দাস এবং পাদ্রী ডাঃ মারে মিচেলও যোগদান করেন।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইল ১৬ই এপ্রিল ১৮৬৮ তারিখে; এদিনকার প্রধান বক্তা হেনরী উড্রো "The Indian Civil Service Examination" বা ভারতীয় সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। সভা বিলম্বে আরম্ভ হওয়ায় বক্তাকে তাঁহার ভাষণ অসম্পূর্ণ রাখিতে হয়। বক্তা সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একটি পরিসংখ্যান-চার্ট প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত সভ্যদের দেখান। তিনি বক্তৃতার একস্থলে মনোমোহন ঘোষের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিষয়-বিশেষের উপরে অতিরিক্ত জোর দেওয়াই তিনি পরীক্ষায় বিফলমনোরথ হইয়াছেন, সংস্কৃতের নম্বর কমাইয়া দেওয়াতে এরূপ হয় নাই।

বক্তৃতা অন্তে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনায় যোগদান করেন। তিনি এই মর্ম্মে বলেন যে, ভাবী ভারতীয় সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীগণ যে সব ক্লাসিক্সে (যেমন, গ্রীক) অধিক নম্বর দেওয়া হইয়াছে, তাহার শিক্ষায় ও অনুশীলনে যেন মন দেন। সোসাইটির অন্যতম সদস্য ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ অতঃপর আলোচনায় যোগ দেন। তিনি মূল বক্তার প্রতি এই বলিয়া অনুযোগ করেন যে, তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। তাঁহার অসাফল্যের কারণ উড্রোর বক্তৃতায় প্রকাশ পায় নাই। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতের নম্বর সাড়ে তিন শত হইতে হঠাৎ কলমের এক খোঁচায় আড়াই শত কমাইয়া দেওয়ায় অন্তত তাঁহার ক্ষেত্রে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অন্যান্য বিষয়ের নম্বর পূর্ব্ববৎ একরূপই রাখা হয়। সভাপতি ফিয়ার ভারতীয় যুবকদের এই পরীক্ষায় অধিক সংখ্যায় যোগদানের আবেদন জানান। তিনি বলেন, বিলাতের শিক্ষক ও পরীক্ষকদিগের নিকট হইতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না, এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার আছে। অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়। এইরূপে আলোচ্য বৎসরের কার্য্য শেষ হইল।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন

১৮৫৮ — ১৯২০

রথীন্দ্রনাথ রায়

উনবিংশ শতাব্দীর যে বিশিষ্ট কাব্যপ্রেরণা পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যের পথনির্দেশ করেছিল, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীই তার ধ্যানতন্ময় ভাবাবিষ্ট মনের প্রাঙ্গণে তার অস্পষ্ট পদসঞ্চার অনুভব করেছিলেন। অবশ্য গীতিকাব্যের প্রেরণা ও সিদ্ধি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন নয়। কিন্তু বিহারীলাল সেই পুরাতন প্রেরণাকেই তাঁর আত্মভাবমগ্ন নবীন সাধনার দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন করে তুললেন। মধুসূদনও গীতিকবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু তার রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তার লিরিকের ভঙ্গিটি ছিল ধ্রুপদী। বিহারীলালের মতো তিনি ধ্যানশীল ও আবিষ্টচিত্ত ছিলেন না তিনি ছিলেন আত্মসচেতন ও জাগ্রতচিত্ত। কিন্তু বিহারীলাল-প্রবর্তিত আত্মভাবমুগ্ধ কাব্যধারাটিই এই যুগের শক্তিশালী গীতিকবিদের পথনির্দেশ করেছে। বাংলা সাহিত্যে যে আখ্যায়িকাপ্রধান কাব্য একটি কৃত্রিম-ক্লাসিকপর্বের অস্পষ্ট সূচনা করেছিল, বিহারীলাল ও তার অনুবর্তীদের নূতন ভাবসাধনায় তা ধীরে ধীরে তিরোহিত হল। রোমান্টিক গীতিকাব্যের অন্তর্মুখী ধারা রবীন্দ্রনাথের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন যে দুজন কবি বাংলা কাব্যের এই নবীন ভাবসাধনাকে তাঁদের কবিকৃতির মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশী জয়যুক্ত করেছিলেন, তাঁরা হলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও কবি অক্ষয়কুমার বড়াল।

রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বিহারীলালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য-কৈশোরের স্মৃতি-পর্যালোচনায় একাধিক স্থানে কবি বিহারীলালের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। বিহারীলালের মৃত্যুর পর লিখিত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটিতে (আধুনিক সাহিত্য) রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিমানসের মৌলিক অভিপ্রায়টিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু বিহারীলালের কবিকৃতিরই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন নি, তিনি তার সঙ্গে নিজের হৃদয়-অংশটুকুও যোগ করে দিয়েছেন। কারণ তিনি বিহারীলালের অন্তর্মুখী কাব্যাচরণটিকেই এক মহোত্তম বাণীমন্ত্রে ও কবিকল্পনার ঐশ্বর্যে জয়যুক্ত করে তুলেছেন। বিহারীলালের আর-এক মন্ত্রশিষ্য অক্ষয়কুমার তাঁর কাব্যগুরুর মৃত্যুর পর লিখেছিলেন,

> বুঝায়েছ তুমি,—কত তুচ্ছ যশ,
> কবিতা চিন্ময়ী, চির সুধা-রস,
> প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ
> নারী কত মহীয়সী!

দেবেন্দ্রনাথ সেন

জন্ম ১৮৫৮ মৃত্যু ১৯২০

পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্‌-দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী !

এই শোকগাথার মধ্যে অক্ষয়কুমার শুধু বিহারীলালের প্রতি আবেগময় শ্রদ্ধাঞ্জলিই নিবেদন করেন নি, তিনি তাঁর কবিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নি। নিতান্ত কিশোর বয়সেই অক্ষয়কুমার ও রবীন্দ্রনাথ যেমন বিহারীলালের কাব্যের, এমন কি ভাষা-ছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন ঘটে নি। কর্মোপলক্ষে তিনি যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বাস করেছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁর কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয়। গাজিপুরে অবস্থানকালে তিনি তিনখানি ছোট কাব্য প্রকাশ করেন—'ফুলবালা' (১৮৮০), 'উর্মিলা-কাব্য' (১৮৮১) ও 'নির্ঝরিণী' (১৮৮১)। দেবেন্দ্রনাথের এই প্রথম তিনখানি কাব্য পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশী হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই তার কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রীতি-পক্ষপাতের কথা উল্লেখ করেছেন.

'রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও উর্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার নির্ঝরিণী কাব্যের "আঁখির মিলন" কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ না থাকিলেও, পত্রের দ্বারায় পরিচয় ছিল। তিনি আমার উর্মিলা কাব্যের সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসান হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি" ইত্যাদি। গাজিপুরে অবস্থানকালে রবিবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়।'[১]

দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ আছে। রবীন্দ্রনাথ তখন গাজিপুরে ছিলেন. অল্পসময়ের মধ্যেই এই দুই কবি আন্তরিক প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হন। গাজিপুরের সেই প্রীতিমুগ্ধ প্রহরগুলির কাহিনী শুনিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন প্রৌঢ় কবি--

'সে এক মহা-আনন্দের— আমার জীবনের দোলপূর্ণিমার দিন ছিল। নিত্য উৎসব, নিত্য পার্বণ! আমার অপ্রকাশিত কবিতাগুলি রবিবাবুকে শুনাইতাম— তিনি আনন্দিত হইয়া শুনিতেন। তিনিও আপনার অপ্রকাশিত নূতন কবিতাগুলি আমাকে শুনাইতেন। আমি হর্ষবিহ্বল হইয়া শুনিতাম। তখনকার রবিবাবুর যেমন দেবকান্তি, তেমনই সুন্দর কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি। আমরা দুই জনে একপ্রকার Mutual Adulation Society করিয়া তুলিয়াছিলাম।'[২]

গাজিপুরেই রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথকে 'ভারতী' পত্রিকায় লিখতে অনুরোধ করেন। দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অবশ্য

১. স্মৃতি : ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

২. পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ

এ দুটি পত্রিকা ছাড়া তৎকালীন অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায়ও তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' (১৮৯৪) কাব্য 'কবিভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেনকে উৎসর্গ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁর 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২) কাব্যখানি 'সাহিত্য-সম্রাট' 'বন্ধুশ্রেষ্ঠ' রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে চিরদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পাঁচবছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবিভ্রাতা'র তিনটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।[৩]

২

দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের স্বরূপধর্ম নির্ণয় করতে হলে বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমারের কবিচরিত্রের মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে এর তুলনা করার প্রয়োজন। বিহারীলালের কাব্যের ভাব-বিভোরতা একটি মুগ্ধ-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি বলেছেন :

বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা—
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!

'বিচিত্র মত্তদশা' কিম্বা 'ভাবভরে যোগে বসা' বিহারীলাল বর্ণিত সারদার স্বরূপ বর্ণনা মাত্র নয়, এগুলি কবির মানস-প্রকৃতির বিশেষণও বটে। বহির্বিশ্বের বস্তু অংশও অন্তরের এই ভাব-বিভোরতার রসে বিগলিত হয়ে বিহারীলালের ধ্যান-নিবিষ্ট চিত্তের স্বপ্নসাধ রচনা করেছে। এই অন্তরময় 'সুগভীর ভাবানুভূতি'ই কবিকে শেষ পর্যন্ত রহস্যরসের পথিক করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই রহস্যরস সাধনা ও মিস্টিক ভাবানুভূতিই বিহারীলালের কাব্য-ফলশ্রুতি :

রহস্য মাধুরীমালা,
রহস্য রূপের ডালা,—
রহস্য স্বপন-বালা
খেলা করে মাথার ভিতরে
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে।
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

৩ অনুবাদ তিনটি ১৯১৬ সালে মডার্ন রিভিউ পত্রে মার্চ ও মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়— "The Maiden's Smile", "My Offence" এবং "The Unnamed Child"। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের *Love 's Gift* (no. 21) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

উদ্ধৃত অংশটিকে বিহারীলালের কবি জীবনের চরম স্বীকৃতি বলা যায়। কবির কাছে এই 'রহস্য' লীলারসেরই নামান্তর। স্বচ্ছ সরোবরে যেমন চন্দ্রবিম্ব পড়ে, তেমনি কবিচিত্তেও এই রহস্যরসের লীলা চলে। এই লীলাই হল কবির ও যোগীর পরম সম্পদ। বিহারীলাল এই রহস্যরসের বিচিত্র লীলাকেই 'নেশার নয়নে' দেখতে চান—এর বেশী আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। এই অর্ধ-জাগর রহস্যধ্যান কবিচিত্তের একটি বিশেষ অবস্থা বটে, কিন্তু এই অবস্থাকে কাব্যের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত শিল্পরূপের দ্বারা মূর্ত করে তুলতে হয়। কিন্তু বিহারীলালের শিল্প সাধনা তত বড়ো ছিল না। তাই রহস্যধ্যান-বিভোরতার অস্পষ্ট গোধূলি লগ্নেই তাঁর কাব্যজীবনের নীরব পরিসমাপ্তি। বিহারীলালের ভাবসাধনা যেমন গভীর ছিল, শিল্পসাধনা তেমনি ছিল দুর্বল।

বিহারীলালের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৮৯৪) অক্ষয়কুমারের তিনটি কাব্য প্রকাশিত হয়—'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫), 'ভুল' (১৮৮৭)। 'প্রদীপ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বিহারীলালের মৃত্যুর এক বছর আগে (১৮৯৩)। বিহারীলালের মৃত্যুর পর বড়াল কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের আত্মিক সম্পর্কটি যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনি 'প্রেম কত ত্যাগী', 'নারী কত মহীয়সী', 'পূত ভাবোল্লাস', 'ভাষা কিবা গরীয়সী' প্রভৃতি অংশগুলির মধ্যে কবি নিজের অন্তর্জগতকেও উদ্ঘাটিত করেছেন। বিহারীলালের কবিশিষ্যদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের কাব্যজীবনের উপরেই তাঁর প্রভাব সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তবু বিহারীলালের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের একটি বড়ো পার্থক্য প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের কাব্যজীবনে প্রথম থেকেই যে-জাতীয় ভাব-বিভোরতা ছিল, অক্ষয়কুমারের কাব্যে তার স্বরূপ স্বতন্ত্র ধরনের। বিহারীলালের কবিমানস এত বেশী ভাব-বিভোর, যে সেখানে জাগ্রতচিত্ততা বা সতর্ক বিচার বুদ্ধির কোনো স্থান নেই। জাগ্রত বুদ্ধি ও সতর্কবিচারের উপলখণ্ডের নিম্নগহনে, ধীর মন্থর রহস্যরসের নির্জন উপকূলেই তাঁর মগ্নময় সাধনা। অক্ষয়কুমারের ভাবজীবনের মধ্যেও কখনো কখনো বিভোরতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় যে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ছিল, সেই অধ্যায়েরই একটি বিশিষ্ট অবস্থা হল এই আত্ম-বিভোরতা। কিন্তু অক্ষয়কুমারের মনে এই ভাবটি চিরস্থায়ী হয় নি, কারণ এই আত্মমগ্ন রসাবেশ একটু পরেই তিরোহিত হয়েছে :

যা ছিল সকলি আছে, স্বপন টুটিয়া গেছে—
আমি বুঝি আত্মহারা সই,
যা নয়—তা ভেবে ভেবে—যা নই, তা হই।

বড়াল কবি তাঁর কাব্য গুরুর আত্মনিমগ্নতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তাঁর কবিচরিতে আর একটি দিকও ছিল। বিহারীলালের মতো ভাবাবেগের কৈবল্যই তাঁর ছিল না, তিনি ছিলেন বিহারীলালের তুলনায় অনেক বেশী আত্মসচেতন। সুমার্জিত ভাষা, বাগ্‌বিন্যাসের

গাঢ়তা, ভাস্কর্য-সুঠাম কাব্যরীতি অক্ষয়কুমারের কাব্যে এক সংযত সংহত 'ক্লাসিক আর্টের' গরিমা সঞ্চারিত করেছে।[৪]

বিহারীলাল ও তাঁর মন্ত্রশিষ্য অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের পার্থক্য কম নয়। বিহারীলালের কবিচিত্তের ধ্যানশীলতা দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় অনুপস্থিত, বিহারীলাল শেষ পর্যন্ত মিষ্টিক—কিন্তু মিষ্টিক সাধনা দেবেন্দ্রনাথের মনের অনুকূল ছিল না, বরং তিনি তার বিপরীত রসেরই সাধক ছিলেন। শিল্পসাধনায় তিনি ছিলেন অক্ষয়কুমারের সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। অক্ষয়কুমারের কাব্যরীতিতে যে সুমার্জিত ভাষা, যত্নকৃত বাগবিন্যাস ও গাঢ়বন্ধ কাব্যশ্রী আত্মপ্রকাশ করেছে, দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় তা একেবারেই নেই! এ কথা তার কবিতার ভাবসম্পর্কে যেমন সত্য, প্রকাশরীতি সম্পর্কেও তেমনি সত্য। তাই দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের ক্রমবিকাশের সূত্র নির্ণয় করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার এমন কি সে যুগের কোনো কোনো অপ্রধান কবির কাব্যেও ক্রমবিকাশের সূত্র ধরে কবিমানসের মৌলিক অভিপ্রায় নির্ণয় করা সম্ভব। অবশ্য মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন: 'এ জন্য তাঁহার কবিজীবনের কালক্রম বা কবিশক্তির ক্রমবিকাশ তাহার কাব্যগুলির মধ্যেই চিহ্নিত হইয়া আছে এবং চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে একটা ক্রমসূত্র পাওয়া যাইবে, এরূপ ধারণা অসংগত নহে, এতদ্ভিন্ন, প্রথম বয়সের রচনা, মধ্য বয়সের রচনা, ও শেষ বয়সের রচনা—এরূপ স্তরবিভাগে কোনও বাধা নাই!'[৫]

মোহিতলালের মন্তব্যটির মধ্যে 'চেষ্টা করিলে' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই কথাটির দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের ক্রমপরিণতির সূত্রটি আচ্ছন্নপ্রায়, কবিচরিত্রের অসম পদক্ষেপই তার কারণ। তাই তার মনের পরিণতি খানিকটা অনুমান ও অনেকখানি চেষ্টার দ্বারা বুঝে নিতে হয়। অক্ষয়কুমারের মানস-পরিণতির ইতিহাস তেমন নয়। তিনি শুধু কাব্যের বহিরঙ্গ-প্রসাধনেই সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন না, তাঁর কবিমানসের প্যাটার্নখানির মধ্যেই জীবনপরিণামের সুস্পষ্ট পথরেখা অঙ্কিত। এই তুলনামূলক আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথের মানস-বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়। আসল কথা, দেবেন্দ্রনাথের সব বয়সের কবিতাতেই অসম-পদবিক্ষেপ আছে অর্থাৎ একই সময় তিনি যেমন প্রথম শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন, তেমনি নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত কবিতাও লিখেছেন। এই বৈশিষ্ট্য শুধু দেবেন্দ্রনাথের কবিজীবনের বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কেই সত্য নয়—তাঁর প্রায় চল্লিশ বৎসরব্যাপী কবিজীবনেরও প্রকৃতি এই। এই কারণেই নিছক কাব্যোৎকর্ষের দিক

৪ 'অক্ষয়কুমারের কবিচিত্ত অনিয়ম অপেক্ষা নিয়মের, উচ্ছ্বাসের অবধি প্রাচুর্য অপেক্ষা সংযমের স্বল্পভাষী কঠিনতার পক্ষপাতী ছিল। এই হিসাবে তাঁহার কবিতাগুলিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের classic art-এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যাইতে পারে।'

—অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা, নানা নিবন্ধ: ড. সুশীলকুমার দে

৫. দেবেন্দ্রনাথ সেন: আধুনিক বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ১৪০

থেকে দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের ক্রমপরিণতি নির্ণয় করা সহজ নয়। তাঁর ভাবোদ্বেল উচ্ছ্বসিত কবিমনের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য কম নয়। কিন্তু কবিকল্পনার অসংযম ও অধীর উৎকণ্ঠা তাঁকে যেমন প্রকৃতি ও নারী সম্পর্কে ইন্দ্রিয়সচেতন রূপপিপাসাব বিমুগ্ধ শিল্পীতে পরিণত করেছে, তেমনি হৃদয়াবেগেই সেই দুর্জয় বন্যাই তাঁকে পথভ্রষ্ট করেছে। এই যুগের কোনো কবির কাব্যেই বোধ হয় কবিক্ষমতাব এত বেশী অপচয় হয় নি। তাই বাংলা সাহিত্যের এই শক্তিমান রূপ-রসিক কবির কাব্যজগতে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, গত যুগের সেই উদ্যানটি আগাছা ও বন্য লতাপাতায় প্রায় দুর্ভেদ্য—কিন্তু তারই মধ্যে অশোকের রক্তরাগে, গোলাপের গন্ধ-বিলাসে, শেফালির শিশিবসিক্ত শুভ্রসৌন্দর্যে, পারিজাতগুচ্ছের স্বর্গীয় প্রভায় একটি অমর সৌন্দর্যস্বপ্ন প্রসারিত—'চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি—রূপের পূজারী।'

৩

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম তিনখানি কাব্যকে (ফুলবালা, ঊর্মিলা-কাব্য, নির্ঝরিণী) তাঁর কবিজীবনের ভূমিকা বলা যায়। এই তিনখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ যদিও তাঁর পরিণত শক্তিব বাহন নয়, তবু এই অপরিণত কাব্য-কাকলির মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের কবিশক্তির দোষ গুণ দুইই বিদ্যমান। 'ফুলবালা' কাব্যখানি একটি পুষ্প-কবিতাব সংকলন। রোমাণ্টিক যুগের ইংরেজী কাব্যে পুষ্প-কবিতার বিচিত্র সংকলন লক্ষ্য করা যায়। ফুলের বস্তুধর্মের আড়ালে তাঁরা একটি বিশেষ ভাবরূপকেই উদ্ঘাটিত করতেন! ওয়ার্ডসওয়ার্থের ফুলের কবিতাগুলিতে অতি সাধারণ উপেক্ষিত ফুলগুলির মধ্যে এক আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি ও প্রাত্যহিক জীবনে 'মানবের শিক্ষণীয় অনেক গুণ' আবিষ্কৃত হয়েছে। শেলীর ফুলের কবিতায় এক অপার্থিব অসীম ব্যঞ্জনা দ্যোতিত হয়েছে। ফুলের মধ্যেও মানবহৃদয়সুলভ সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা তিনি গীতি-মূর্ছনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে বৃহত্তর সৌন্দর্যলোকের সঙ্গে এর একটি অখণ্ড যোগসূত্র নির্ণয় করেছেন। কীট্সের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপপিপাসা ফুলগুলির বর্ণের দীপ্তিতে ও গন্ধের প্রগল্ভতায় এক অখণ্ড সৌন্দর্যরাজ্য সৃষ্টি করেছে।

দেবেন্দ্রনাথের 'ফুলবালা' কাব্যটিতে আঠারোটি ফুলের কবিতা আছে। সবগুলি ফুলই প্রকারান্তরে নারীচরিতের আলোচনা। ফুলের পুষ্পসত্তা কোথায়ও নেই বললেই চলে—সর্বত্রই নারীচরিতের এক-একটি দিক প্রকাশিত হয়েছে। 'কামিনী' ফুলের কথা বলতে গিয়ে তাঁর নারীর ক্ষণস্থায়ী যৌবনের কথা মনে হয়েছে :

হায় রে তোমারই মত নারীর যৌবন।
ভাল করি না ফুটিতে,   স্বসৌরভ না ছুটিতে,
স্মৃতি-দর্পণের তলে হয় রে পতন ;
তাই কি কৌশলে ছলে করাও স্মরণ ?

'সূর্যমুখী' কবিতায় কবি নারীপ্রেমের এক বিশ্ববিজয়িনী শক্তিকে দেখেছেন। 'প্রেম অতি মহাবল, প্রেমের অদ্ভুত বল'-ই সূর্যমুখীরূপিণী নারীসত্তার মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন :

এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে আজি
তপন-সুন্দরি !
নারী হয় প্রেমময়ী প্রেম তার বিশ্বজয়ী
ভূধর যদ্যপি টলে, টলে নাগো নারী ;
প্রেমে যাই বলিহারি !

দেবেন্দ্রনাথের ফুলের কবিতার মধ্যে ঐ যুগের নারীবন্দনা মন্ত্রই ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। ফুল তার বস্তু অংশ বর্জন করে এক একটি নারীচরিত্রের প্রতীকরূপিণী হয়ে উঠেছে। ফুলকে অবলম্বন করে হৃদয়ের কোনো সূক্ষ্ম গভীর সংবেদন এখানে লীলায়িত হয়ে ওঠে নি। আসল কথা, 'ফুলবালা' দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য, এখানে খুব গভীর ভাবও প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু একটি বিষয় এখানেও লক্ষ্য করা যায়ঃ কবিতাগুলির অবলম্বন ফুল, কিন্তু বিষয় হল নারী। এই দুটি বিষয় তাঁর কবি জীবনের সর্বাংশ অধিকার করে আছে।

'ঊর্মিলা-কাব্যে'র 'সীতার প্রতি ঊর্মিলা' কবিতাটিকে পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' (১৯১২) কাব্যের একটি প্রাথমিক খসড়া বলা যায়। কিন্তু এই কাব্যের আর একটি কবিতা দেবেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার নূতন সংকেত দেয়। 'ফুলবালাদিগের উক্তি' পরবর্তীকালে 'গোলাপ গুচ্ছ' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও কবিতাটি আসলে 'ঊর্মিলা-কাব্যে'রই। কবিতাটি পূর্ববর্তী কাব্যের চেয়ে কাব্যাংশে সার্থক। এখানকার ফুলবালাদের মধ্যে পুষ্পসত্তা ও নারীসত্তার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ফুলবালাদের আত্মকাহিনীতে পুরাণ, কালিদাস ও শেক্সপীয়রের প্রসঙ্গও এসে পড়েছে। ফুলবালাদের জগতের সূক্ষ্ম সুরময় ঝঙ্কারকেও কবি শুনিয়েছেন :

দুর্বাদল-পরশিনী,
পরীর নূপুর-ধ্বনি
শুনাই মোদের কুঞ্জে, লুকায়ে নিভৃতে।
(অপরের অগোচর !)
নক্ষত্রের মনোহর,
কলকণ্ঠ গীতধ্বনি, শুনাই নিশীথে।

দেবেন্দ্রনাথের 'ফুলবালা' কাব্য ও 'ফুলবালাদিগের উক্তি' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শৈশব সঙ্গীত' (১৮৮৪) কাব্যটির কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। এই 'ফুলবালা' 'দিক্‌বালা' 'কামিনী ফুল', 'গোলাপ-বালা' 'ফুলের ধ্যান' প্রভৃতি কবিতায় ফুলের প্রসঙ্গ আছে। আছে। দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয় কবির পক্ষেই এ যুগটি একটি অবাস্তব স্বপ্ন-বিলাসের যুগ। অশরীরী বাসনার কুয়াশা মনের দিগন্তে যে অস্পষ্ট ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল, তাই জীবনাভিজ্ঞতাবর্জিত এই দুই কবির এই যুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। জীবন

সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার অভাবেই এই জাতীয় কবিতাগুলি একটি স্বপ্নাচ্ছন্ন। অবাস্তব-মনোহর জগতের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। অথচ 'ফুলবালা' জাতীয় কবিতাগুলি ঠিক প্রকৃতির কবিতাও নয়। প্রকৃতিচেতনার গভীরতাও নেই, আবার জীবনের অভিজ্ঞতাও নেই।—এ যুগের সব কিছুই রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত 'অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তি'।[৬] দেবেন্দ্রনাথের 'ফুলবালা'-পর্বের কাব্য সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য হতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথের এই উন্মেষ-পর্বের কাব্যত্রয়ীর সবশেষ কাব্য 'নির্ঝরিণী'তে অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর কবিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যেন 'ফুলবালা'-পর্ব অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন। এতদিন জীবন-অভিজ্ঞতাবর্জিত যে অশরীরী বাসনাগুলি নীহারিকার মতো কবির মনের দিগন্তে জেগে ছিল, এখন থেকে তা রূপ পেতে শুরু করেছে। এখন শুধু ফুলের জগৎ, চাঁদের আলো, অপ্সরীর চপল নৃত্য ও প্রাচীন কাব্য-রোমান্সের প্রেমোপাখ্যান-গুলির মধ্যেই কবি বিচরণ করেন না ;—জীবনের মধ্যে অভিজ্ঞতার রঙ্ মিশেছে। দাম্পত্য প্রণয়রসের যে কয়েকটি ছবি তিনি এঁকেছেন, তা তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কাব্যের 'আঁখির মিলন' কবিতাটি একসময় রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। দাম্পত্যজীবনের মিলন-মাধুর্যকেই কবি রূপ দিয়েছেন :

আঁখির মিলন ও যে—আঁখির মিলন।
লোকে না বুঝিল কিছু লোকে না জানিল কিছু
দম্পতীর হল তবু শত আলাপন !
হল মন জানাজানি হল মন-টানাটানি--
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন ,
বিজয়ার কোলাকুলি— আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন-লেপন।

দেবেন্দ্রনাথ দাম্পত্যপ্রেমকেই নানা প্রসাধনে মণ্ডিত করেছেন। এই প্রসাধন-রচনায় বর্ণময়তা ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁর কবিমনের সূক্ষ্ম সুকুমার-সংবেদনও সোনালি রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। 'আশার চিকণ হাসি'—কাব্যাংশটি সেই মুগ্ধমনের একটি সার্থক স্বাক্ষর রেখেছে।

'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'ভালবেস না' কবিতাটি (পরবর্তীকালে এই কবিতাটি 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যে সংকলিত হয়) দেবেন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটি নিগূঢ় সংকেত বহন করে। তেরোটি স্তবকের বারোটিতেই কবি নারীপ্রেমে সংশয় প্রকাশ করেছেন—কুসুমের মধ্যে যে কীট থাকে এ কথা বলতেও তিনি ভোলেন নি। নানাভাবে তিনি নারীপ্রেমে সংশয় প্রকাশ করেছেন :

গোলাপে কণ্টক হয় বিধাতার খেলা রে,
অগ্নির বিকার মাত্র সুন্দরী চপলা রে ;

---

৬. 'যে-বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে,…সেই বয়সের কথা।'—জীবনস্মৃতি (১৩৫০ সংস্করণ), পৃ. ৯৪-৯৫

রত্নের উত্তম যেই, উজ্জ্বল হীরক সেই,
অঙ্গার-বিকারমাত্র, ভুল নারে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না।

বারোটি স্তবকের ভিতর দিয়ে যে ভাবটি উপমাদি অলংকারে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল, সর্বশেষ স্তবকের একটি স্বীকৃতিতে প্রেমনিয়তির রহস্য যেমন ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি দেবেন্দ্রনাথের কবিজীবনের অভিপ্রায়ও প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমিকের অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয় দিয়ে কবি প্রেমকে সংশয়দৃষ্টিতে দেখলেও আসলে প্রেমের চিরজয়ী সত্তারই বন্দনা করেছেন। তাই কবিতার শেষস্তবকে বলেছেন :

বৃথা বাণী। বৃথা বাণী! প্রেমান্ধ প্রেমিক রে!
তার কাছে "প্রেম" সত্য, কভু কি অলীক রে?
কভু নয়, কভু নয়। হে প্রেম, তোমারি জয়!
অমলা, ধবলা প্রিয়া, নহে কলঙ্কিনী রে!
চিরদিন সুখ-প্রসবিনী রে!

কবিতাটি পড়ে মনে হয় যে, কবির সংশয়-অভিমান চিরজয়ী প্রেমকেই উজ্জ্বলতর করে দেখানোর একটি কাব্য-কৌশল মাত্র।

দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতিও এই কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় চিত্র-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। দর্পণে প্রতিবিম্বিত সুন্দরীর রূপচ্ছবি কয়েকটি নির্বাচিত উপমায় রূপায়িত হয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকেই কবি উপমাদির প্রয়োগে চিত্ররূপ দিয়েছেন—এই চিত্রধর্মিতাই কবিতাটির প্রাণ :

চারু মুখপদ্ম ফুটিছে দর্পণে,
অধর-সংস্থিত বিরাজিছে তিল,
ভৃঙ্গ-শিশু যেন পদ্মপত্র-কোণে,
গলদেশে আসি কৃষ্ণ কেশরাশি,
হরিদ্রাভ অঙ্গ চুম্বিছে সঘনে।
কৃষ্ণমেঘ যেন সুধাংশু-বদনে।

দেবেন্দ্রনাথের কবিজীবনের উদ্ভবলগ্নটির প্রারম্ভিক অধ্যায় 'ফুলবালা' পর্ব—ফুল-লতাপাতা-চাঁদ প্রভৃতি দিয়ে একটি জগৎ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। এ এক অবাস্তব মনোবিলাসের পর্ব। এখানকার ফুলগুলিও না প্রকৃতি, না মানুষ। এ জগতের মধ্যে জীবনসমুদ্রের দু-একটি লবণাম্বুকণিকাও উৎক্ষিপ্ত হয় নি। কিন্তু কবি ধীরে ধীরে জীবনের সমীপবর্তী হয়েছেন, জীবনের বাস্তব-অভিজ্ঞতার স্পর্শে কবিতাগুলিও নূতন রসে সঞ্জীবিত হয়েছে—'নির্ঝরিণী' কাব্যের কয়েকটি কবিতাই তার প্রমাণ। অস্পষ্ট মানস-বিলাসের যুগ ধীরে ধীরে কেটে গেল—জীবনরসের নূতন অধ্যায় প্রসারিত হল। 'উদ্ভব' পর্ব থেকে

কবি অগ্রসর হলেন 'সমৃদ্ধি' পর্বের দিকে! 'নির্ঝরিণী' কাব্যেই সেই জগতে কবির দ্বিধাজড়িত প্রথম পদক্ষেপ।

৪

দেবেন্দ্রকাব্যের 'সমৃদ্ধি'-পর্বের সর্বোত্তম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে (প্রথম সংস্করণ ১৯০০)।[৭] এই কাব্যটিতেই দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের অধীর উল্লাস এই কাব্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। নারীসৌন্দর্যের মোহিনীমায়ায় কবির এই বিহ্বলতা রূপৈশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে :

যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?
বিহ্বলা মোহিনী বেশে, কথা কস্ হেসে হেসে
জহুরির দোকানের পট খুলে যায়।
কোহিনূরে কোহিনূরে, আলো যে উথলি পড়ে!
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরায় মুক্তায় ;

কবিহৃদয়ের অশান্ত রসাবেশ কোহিনূরের আলোকচ্ছটায়, ইন্দ্রনীল-হীরা-মুক্তার বর্ণ ও রূপজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে!

দেবেন্দ্রনাথের পিপাসাতুর দেহমনের উৎকণ্ঠা 'দাও দাও একটি চুম্বন' কবিতায় এক বন্ধনহীন দুর্বার উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছে। সমগ্র কবিতার মধ্যে যে রূপকরণ ও অলংকার আছে, তা এমনি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত যে, মনে হয় কবির তৃষাতুর মনেরই এক-একটি দুর্লভ স্পন্দন এক বিচিত্রচিত্রিত প্রবালদীপ্তিতে জলে উঠেছে—এ দীপ্তি যেমন প্রগল্ভ তেমনি বর্ণময়। কিন্তু উচ্ছ্বাসের এই ফেনস্ফীত উদ্বেলতা যতই থাকুক-না কেন, দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের অন্তরঙ্গ রূপকেই অভ্রান্ত করে তুলেছে :

দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগরসঙ্গমে,

৭. ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের পরিণতি বিচারের পক্ষে এই দ্বিতীয় সংস্করণের তেমন প্রয়োজন নেই। কারণ এই সংস্করণে যেমন পূর্ববর্তী সংস্করণের এগারোটি কবিতা বর্জিত হয়েছে, তেমনি এগারোটি নূতন কবিতাও সংযোজিত হয়েছে। এমন কি প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থেরও কিছু কিছু কবিতা এখানে আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের 'অশোকগুচ্ছ' কাব্য কতকটা বিভিন্ন পর্বের কবিতার সংকলনজাতীয়। এইজন্য বর্তমান আলোচনায় অশোকগুচ্ছের প্রথম সংস্করণকেই অবলম্বন করা হয়েছে।

দুর্জয় বানের মুখে, ভাসাইয়া দিব সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

কবি 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন'কে 'দুর্জয় বানের মুখে' ভাসিয়ে দেওয়ার যথার্থ কবিভাষাও আয়ত্ত করেছেন। 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যের 'শেষ চুম্বন' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। এখানে পূর্ববর্তী কবিতার সেই দুর্বার হৃদয়াবেগ কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়ে এসেছে, কিন্তু কবির তৃষ্ণা তেমনি আছে। এই পিপাসা যে নিছক পিপাসাই নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু-একটি নির্বাচিত উপমায়। কবি তাঁর অমর পিপাসাকে সূর্যকান্ত মণি, প্রবাল ও কাঞ্চনের রূপৈশ্বর্যে মণ্ডিত করেছেন। প্রথম কবিতাটির দুর্জয় বন্যা এখানে মণিখণ্ডের নিটোল ও সংহত রূপের মধ্যে যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে :

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
সূর্যকান্ত মণি সম অধর-প্রবালে মম
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ!

'অশোকগুচ্ছ' কাব্যের আর-একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'নারীমঙ্গল'। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের একটি ইতিহাস আছে। এই কবিতায় কবি 'বঙ্গ-সুন্দরী'-কেই আরতি করেছেন। বঙ্গবধূর গার্হস্থ্য চিত্রকে এখানে বর্ণের আল্‌পনায় ও কল্পনার ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত করে তোলা হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসে বড়াল-কবির মতো কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবু প্রত্যহ ও প্রত্যক্ষের মধ্যেই তিনি কখনো কখনো 'বিশ্বের আকাশ'কে প্রতিবিম্বিত দেখেছেন :

বসি তব রূপকক্ষে বিশ্বের আকাশ
হেরি সখী, সীমাশূন্য সে নীলবিতানে
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ—
দেববৃন্দ, দেববধূ, আলোক-বিমানে।

কিন্তু এই সীমাশূন্য নীলবিতান দেবেন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকে বেশীক্ষণ উধাও করে রাখতে পারে নি, বঙ্গবধূর প্রণয়ের আকর্ষণ তাকে গার্হস্থ্যজীবনের প্রাঙ্গণে টেনে এনেছে :

হে মোহিনি শিক্ষাদাত্রি! তাই এ বন্ধন
মম অবন্ধন-মাঝে! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী
দিয়া আনিছ টানিয়া, ধন্য এ যতন!

কবির সেই মোহিনী শিক্ষাদাত্রীই তাঁর কল্পনা-অশ্বিনীর বাধাবন্ধহীন গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিকল্পনা আকাশ-বিহারের উল্লাসে কখনো কখনো সর্ববন্ধন অতিক্রম করেছে, কিন্তু কবির শিক্ষাদাত্রী সেই নারীলক্ষ্মীই তাকে শৃঙ্খলিত করেছে—দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই শৃঙ্খলই শিঞ্জিনীতে পরিণত হয়েছে। কারণ এই মধুর বন্ধন

কবিরও কাম্য। 'নারীমঙ্গল' কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' (সোনার তরী) কবিতাটির তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই দুই কবির কবিমানসের লক্ষ্য ও পরিণামের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। 'মানসসুন্দরী' কবিতায় কবির প্রেয়সী কখনো দুর্নিরীক্ষ্য ঊর্ধ্বলোকের নিঃসঙ্গ তারকা. আবার সেই তারা গৃহদীপের নম্র মাধুর্যে কবির জীবনকে সুন্দর করে তুলেছে। কবি একবার বলেছেন :

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি,
প্রণয়ে বিকাশি।

তার পরেই আবার বলেছেন :

বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে— টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়—

'মানসসুন্দরী' কবিতায় 'সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালোবাসা' ও 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা'—দুটি সুরই বিদ্যমান। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায়ও এই দুটি সুর আছে, কিন্তু স্বরূপগত পার্থক্য অনেকখানি। 'সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা' বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝিয়েছেন (অন্তত মানসসুন্দরী কবিতায়) তা বাঙালীর গার্হস্থ্যজীবনেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র নয়, গৃহজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনায় তা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে নি। তাঁর মানসসুন্দরী এক মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্যলোকের অধিশ্বরী—বিশ্বপ্রকৃতির লাবণ্যতরঙ্গে তার ললিত যৌবনের বিস্তার। কবি এই বন্ধনহীন সৌন্দর্যকে যখন একান্ত আপন করে পেতে চান, তখনই প্রশ্ন জাগে—'পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি'। মানসসুন্দরী কবিতায় যদিও বলা হয়েছে—'কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।'—তবুও এ 'মূরতি' কখনো দেবেন্দ্রনাথের বঙ্গবধূদের মতো আটপৌরে শাড়ী পরে শ্বশুর-দেবরকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করেন না! দেবেন্দ্রনাথের কবিতাটিতে যাঁর ছবি আছে, তিনি স্বরূপতই বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের বধূ :

বধূর সুমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আ মরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি!—ত্যজি শাটী,
পড়ি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরী,
কোথা যাও, বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে!

পশিয়া রন্ধনগৃহে, তণ্ডুল ব্যঞ্জন
সুস্বাদু ! রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে।

এ চিত্র 'মানসসুন্দরী' কবিতায় প্রত্যাশা করাই ভুল ! দেবেন্দ্রনাথের 'বিশুদ্ধ গার্হস্থ্যরস' ও রবীন্দ্রনাথের 'সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা' যেমন একজাতীয় নয়, তেমনি এই দুই কবির সৌন্দর্যানুভূতিও স্বতন্ত্র প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যবাসনা যে দূরায়িত নিরুদ্দেশের মহা-উপকূলে স্বপ্ন-বাসর রচনা করে, দেবেন্দ্রনাথের কবিকল্পনার পক্ষে তা সম্পূর্ণ অনায়ত্ত- কারণ গৃহজীবনের অজস্র সম্পর্কবন্ধনে তা শতপাকে জড়িত। তাই তাঁর 'কল্পনা-অশ্বিনী'ও পক্ষীরাজ নয়, মেঘলোকে উধাও হওয়ার মতো তার পাখা নেই—এ অশ্বিনী প্রাত্যহিক জীবনেরই গৃহপালিত। তার গতি আছে, কিন্তু সে গতি মর্ত্যলোকের, মেঘলোকের নয়।

৫

অশোকগুচ্ছের 'আমি কে ?' কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাতে তার কবিচরিত্রের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে :

গ্রামের এ কূলে কূলে, প্রাণের অশ্বত্থ-মূলে
যতদিন বহিবে জাহ্নবী—
খোকারে লইয়া বুকে,
প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে,
বুক পুরি' রঞ্জিব এ ছবি---
ক্ষুদ্র আমি বাঙ্গালার কবি !

দেবেন্দ্রনাথ মুক্তপথ কল্পনায় ঊর্ধ্ববিহারের কথা বলেন নি, 'মেঘচুম্বিত অস্তগিরির সাগরতলে' উত্তীর্ণ হওয়ার আশ্বাসও দেন নি—তিনি এক প্রীতিমুগ্ধ গার্হস্থ্যজীবনকেই হৃদয়রাগে রঞ্জিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের কাব্যে এই স্নেহপ্রীতি সমুজ্জ্বল গার্হস্থ্যরস নানা মূর্তিতে রূপায়িত হয়েছে। এই গার্হস্থ্যরসের কবিতাও দুটি প্রধান ধারায় অভিব্যক্ত দাম্পত্যপ্রেমের কবিতা ও বাৎসল্যরসের কবিতা। কখনো কখনো আবার পারিবারিক জীবনের অন্যান্য অংশের উপরও আলোকপাত করেছে। 'আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী', 'ডায়মনকাটা মল' প্রভৃতি কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের ভাষা ও কল্পনা চাতুরীর প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু দাম্পত্যরসের কবিতাগুলির মধ্যে কবির রূপোল্লাস অশোকের রক্তরাগে প্রবালের দীপ্তিতে বিলসিত হয়েছে। প্রেমের হাব-ভাব, লীলা-চাতুরী, চুম্বন-আলিঙ্গন প্রভৃতি রূপবৈচিত্র্যগুলি দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাণময় হয়ে উঠেছে। দাম্পত্যরসের মধ্যেই প্রেমের

মূলমন্ত্রটি তিনি পেয়েছেন। এ যুগের কবিরা সকলেই প্রায় এই মন্ত্রেরই পূজারী। তবু তার মধ্যেও প্রকারভেদ আছে বই কি?

দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই প্রকারভেদটি কি? দাম্পত্যপ্রীতিরসের সঙ্গে যৌবনস্বপ্ন ও রূপোল্লাস দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এক ত্রিবেণীতীর্থ রচনা করেছে। দাম্পত্যপ্রীতিরস যৌবনস্বপ্নের সুখাবেশে কেমন বর্ণবিচিত্র ও লীলাচতুর হতে পারে তার একটি উদাহরণ :

কে আনিল আলোরাশি হৃদয়-আঁধারে?
অধরের ফাঁক দিয়া,
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া,
দম্পতীর শয্যার আগারে!
রঙ্গীন বারনীস্ পেয়ে, খাটপালা হেসে উঠে!
কে রে এ চতুর কারিগর?
দেয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হল!
কে রে সুনিপুণ চিত্রকর?
কনক-পারদ লেগে, মলিন দর্পণখানি
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর!

এই শ্রেণীর কবিতায় বর্ণের বিভ্রম ও লীলার চাতুরী আছে, কিন্তু তবু এই জাতীয় কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের চূড়ান্ত পরিচয় বহন করে না। কারণ লীলার উচ্ছলতাই এর সবটুকু, সে লীলাও কবির কাব্য-কৌতূহলের শফরীনৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। দেবেন্দ্রনাথ এর চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছিলেন; তাই এই-জাতীয় কবিতাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার দ্যোতক মনে করা সংগত হবে না।

দেবেন্দ্রনাথ যৌবনস্বপ্ন ও রূপোল্লাসের কবি। তার নিজের অধিকারটুকুর মধ্যে যেখানে যৌবনস্বপ্ন ও রূপোল্লাস গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে, সেখানেই তিনি কবিহিসেবে সবচেয়ে বেশী সার্থক হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের রূপোল্লাসের একটি সার্থক কবিতা হিসেবে 'দীপহস্তে যুবতী' কবিতাটি উদ্ধার করা যাক :

"ছাড় ছাড়; হাত ছাড়—"
ছাড়িলাম হাত,
হে সুন্দরী রোষ কেন? তুমি যে আমার
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আঁধার?
তোমাতে আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ!
তরুটি ভরিয়া গেছে, অশোকে অশোকে,
বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে!
কবিচিত্ত ভরি গেল মাধুরী-আলোকে,
তুমি সখি তরু হতে নেমে এলে ভূমে!

কি অশোক-বার্তা আনি' মরমে মরমে
ঢালি দিলে কবিকর্ণে অশোক-সুন্দরী !
দিবসের পাপ-চিন্তা কলুষ সরমে
হেরি ও সাঁঝের দীপ গিয়াছে বিস্মরি' ?
হাসিয়া ছাড়ায়ে হাত গেল বধূ ছুটি—
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি।

কবিতাটিতে কবির গার্হস্থ্য-চেতনা তেমন পরিস্ফুট নয়, এক 'বধূ' শব্দটি ছাড়া দাম্পত্য-সম্পর্কের ছায়াও এখানে নেই কবির সৌন্দর্যমুগ্ধতা এখানে আরো নিঃসংশয়ভাবে ধরা দিয়েছে 'প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি।'

দেবেন্দ্রনাথের বাৎসল্যরসের অধিকাংশ কবিতাই 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' কাব্যে সংকলিত হয়েছে। গার্হস্থ্য-চেতনার একটি সুর যেমন তার দাম্পত্যপ্রীতির কবিতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি বাৎসল্যরসের কবিতা আর-একটি সুরকেই পূর্ণ করে তুলেছে। এই দুই শ্রেণীর কবিতার প্রকৃতিগত পার্থক্য বেশী নয়, অনায়াসেই একটি স্তর থেকে আর-একটি স্তরে যাতায়াত চলে। এই যুগের কবিদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল বাৎসল্যরসের কবিতা রচনায় খ্যাতিলাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যও এই পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের বাৎসল্যরসের কবিতার সঙ্গে স্ত্রীবিয়োগের বেদনাও মিশ্রিত আছে। মাতৃহারা পুত্রকন্যাদের প্রাত্যহিক সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে পত্নীবিরহের অশ্রুধৌত মহিমা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের বাৎসল্যরসের কবিতায় এই সুরটি অনুপস্থিত। পূর্বোল্লিখিত কবিদের মতো দেবেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত পত্নীবিয়োগের অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় নি। তাই তাঁর বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি তুলনামূলকভাবে অনেকখানি নিষ্প্রভ—যেন একমেটে মাটির সাজ ; স্ত্রীবিয়োগের বিরহভাস্বর স্বর্ণরশ্মি কবিতাগুলিকে দ্বিজত্বের মহিমা দেয় নি।

সহজ-মুগ্ধতা ও রূপোল্লাস যেখানে অবিমিশ্রভাবে কবিহৃদয়ের সূক্ষ্মতর সংবেদনকে লীলায়িত করে তুলেছে, দেবেন্দ্রনাথের কবিশক্তি সেইখানেই চূড়ান্তশীর্ষে আরোহণ করেছে। তাঁর প্রকৃতি-সম্পর্কিত কবিতার মধ্যেও ইন্দ্রিয়সচেতন রূপ-সুখোল্লাস স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। বর্ণের গাঢ়তায়, রেখার স্পষ্টতায়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের উৎসব-বিলাসে দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই স্বরূপত চিত্রধর্মী। পরিচিত বর্ণের কত বিচিত্র বিভাগ তিনি করেছেন ! অশোকের রক্তরাগ বর্ণনায় কবিহৃদয়ের বর্ণপিপাসা যেন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় নি—গোপিনীর আবীর কুঙ্কুম থেকে মদন-বধূর অধরের কোণ পর্যন্ত সর্বত্র কবি লাল রঙের অনুসন্ধান করেছেন :

কোথায় সিন্দূর গাঢ়—সধবার ধন ?
আবীরকুঙ্কুম কোথা গোপিনী-বাঞ্ছিত ?
কোথায় হুরীর কণ্ঠ আরক্তবরণ ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ লোহিতে রঞ্জিত ?

কোথায় বা ভাঙে-রাঙা রুদ্রের লোচন ?
কোথা গিরিরাজ-পদ অলক্তে মণ্ডিত ?
মদন-বধূর কোথা অধরের কোণ—
ব্রীড়ার বিক্ষেপে হায় সতত লোহিত ?

অশোক ফুলের 'গাঢ় ও তরল' রূপের উপমা চয়ন করতে গিয়ে কবিমনের বর্ণমুগ্ধতাই প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একসময় কাদম্বরী কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাণভট্টের যে বর্ণবিলাস প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, তা দেবেন্দ্রনাথের এইজাতীয় কবিতাগুলি প্রসঙ্গে আংশিকভাবে প্রযোজ্য। দেবেন্দ্রনাথের বর্ণগাঢ়তার প্রতি এই সতৃষ্ণ আকর্ষণ তাঁর রূপোল্লাসেরই একটি উপকরণ—তাই এই রঙ কোথায়ও আতিশয্যে পরিণত হয় নি। যদি কোথায়ও আতিশয্য থাকেও তা হলে তা বর্ণের নয়, হৃদয়াবেগের।

দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে 'রূপের পূজারী' বলেছেন। এখানে রূপ অর্থ শুধু সৌন্দর্যই নয়। কারণ যে সৌন্দর্য অতীন্দ্রিয়, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, দেবেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কখনো তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে নি। এখানে 'রূপ' শব্দটি এর বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারা যায়, এ রূপ-চেতনা 'সাকারে জড়িত', 'নিরাকারের অভিমুখী' নয়। বাধাবন্ধহীন বিমূর্ত (abstract) সৌন্দর্য কোনদিনই তাকে প্রলুব্ধ করে নি। 'বর্ষা'র কবিতায়ও তাঁর মন দিগ্ দিগন্তে অভিসার করে নি—প্রকৃতির বহিরাশ্রয়ী বর্ণপ্রগল্‌ভ পুষ্পলাবণ্যই তাকে রূপসৃষ্টিতে তৎপর করে তুলেছে। মূর্তিরচনা করেই কবির আনন্দ :

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ওই রূপসী ?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে !
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ করি,
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝর্ঝরি।

দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার প্রসঙ্গে কীটসের সৌন্দর্যদৃষ্টির কথা মোহিতলালের মনে হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি এই দুই কবির সৌন্দর্যদৃষ্টির পার্থক্যটিকেও নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : 'কীট্‌সের সৌন্দর্য-পিপাসা অতি প্রখর বস্তুজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রাকৃতিক বস্তুসকলের রূপ, রং, রেখা, গতি ও স্থিতির ভঙ্গি, এ সকলই আশ্চর্যরূপে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, তাঁহার ইন্দ্রিয়চেতনায় কেবল ভোগবিলাস বা ভাবস্বপ্ন ছিল না, অতি-নিপুণ জ্ঞান-ক্রিয়াও ছিল।... কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। তাঁহার কল্পনায় তীব্র মাদকতা ছিল, সজ্ঞানতা ছিল না ; তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম ভাবাবেগ-বিহ্বল, বস্তুজ্ঞান-বিমুখ ; তাহাতে চেতনা অপেক্ষা মোহই অধিক।'[৮]

৮. আধুনিক বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৬২-১৬৩

কীট্‌স তার সুবিখ্যাত 'ওড্ অন্ এ গ্রিসিয়ান আর্ন' কবিতায় বলেছেন :

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter ; therefore, ye soft pipes, play on ;
Not to the sensual ear, but more endear'd,
Pipe to the spirit ditties of no tone.

কীট্‌সকে সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপচেতনার কবি বলা হয়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে (Sensuous beauty) পূর্ণতর মহিমা দেওয়ার জন্য তিনি এক বৃহত্তর সত্যের কল্পনা করেছেন। তাই কীটসীয় সৌন্দর্যানুভূতি শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকেই রূপে রসে মহিমান্বিত করে নি, এর পিছনে আর একটি বৃহত্তর জগতের পটভূমি আছে,—এই প্রত্যয়ই তাঁকে অশ্রুত সঙ্গীতের মধুরতর আস্বাদনে বিশ্বাসী করে তুলেছে।[১] এই কবিতায় কীট্‌স তাঁর সৌন্দর্যদর্শনের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকৃতি তাঁর সৃজনীকল্পনারই (Creative Imagination) একটি গূঢ় অভিপ্রায়কে সূচিত করেছে। দেবেন্দ্রনাথের রূপোল্লাস প্রসঙ্গে কীটসীয় রূপদৃষ্টির কথা উত্থাপিত হওয়াই উচিত নয়। কারণ দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে যা একটি মুগ্ধতা ও উল্লাস মাত্র, কীট্‌সের পক্ষে তা কল্পবৃত্তির উৎসসন্ধানী দিব্যদৃষ্টি। কীটসকে তাই ক্রমশ অন্তর্মুখী ও লক্ষ্যভেদী হতে হয়েছে। ফুলের বর্ণ ও ফলের রসোচ্ছল নিটোলতা তাকে মুগ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু সেই 'রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে'ই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন নি। মর্ত্যের রূপজগতকে যেমন তিনি মোহময় করে তুলেছেন, তেমনি অবসাদ, অকালমৃত্যু, মোহভঙ্গ প্রভৃতির প্রতি অনুযোগও তাঁর সৌন্দর্যচেতনার উপর বিষণ্ণতার নীলাভ-স্পন্দন ছায়াবিস্তার করেছে। দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যমোহ, মুগ্ধতার সীমাস্বর্গেই আবদ্ধ—কিন্তু সেই দৃশ্যমান রূপজগতের চারদিকে যে অশ্রুতসঙ্গীতময় জ্যোতির্লোক আছে, তার কোনো ক্ষীণ আভাসও তাঁর কবিতায় নেই। তার কবিতা রূপোল্লাসের পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নি—অধীর ভাবোৎকণ্ঠার উদ্দাম তরঙ্গ ভাব-স্থির উপলব্ধির স্ফটিকদর্পণে পরিণত হয় নি। সৌন্দর্যের গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের শক্তি তাঁর ছিলনা, কারণ তাঁর কবিচেতনায় সৃজনী কল্পনার সেই সৃষ্টিরহস্যভেদকারী খরদীপ্তি ছিল না। কোনো দ্বন্দ্ব-সংশয়, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের দিকে চেয়ে অপরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত।

১. 'The truth is that in his conception of this unheard music Keats expresses with great force something which lies close to the centre of all truly creative experience. Great as was his physical sensiblity and his appreciation of everything that came through his senses, he knew in the moment of enjoying it that it was not everything and not enough. Anything so vivid and yet so transient must be related so some larger reality which, being permanent and complete, gives a satisfying basis to it.

—C. M. Bowra, ***The Romantic Imagination***, p, 141,

দৃশ্যমান প্রকৃতি ও গার্হস্থ্যজীবনের সুখতৃপ্তি, তাঁর কবিচিত্তে যে মোহাবেশের সৃষ্টি করেছিল, তাকে সবটুকু উৎকণ্ঠা ও আবেগোচ্ছ্বাস নিঃশেষ করে দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের ব্যর্থতা-সার্থকতা ঐটুকু ঘিরেই। কীট্‌সের মতো তিনি মর্ত্যলোকের সৌন্দর্যের সঙ্গে অসীম সৌন্দর্যলোককে এক স্বর্ণযোগসূত্রে আবদ্ধ করেন নি।—সে কবিশক্তি তাঁর ছিল না।

৬

দেবেন্দ্রনাথের কাব্য-যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বেই তাঁর কবিপ্রতিভার ক্লান্তি ও অবসাদ লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজেও যে এ বিষয় সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে জব্বলপুরে অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

'আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, অকপটভাবে তাহার উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আপনারা কি এখন আমার কবিত্বশক্তির হ্রাসপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিতেছেন? কোন কোন মাসিক পত্রিকা যেন সেইরকম কথা বলিতেছে। আমি অবশ্য তাহাতে ক্ষুন্ন নহি। কারণ আমাদের গণ্ডারের চামড়া, ওরকম সমালোচনায় গায়ে একটি আঁচড়ও পড়ে না। সে যাই হউক, আপনার আন্তরিক মত কি, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব।'[১০]

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এই পরিণতিকে কোনোমতেই আকস্মিক বলা যায় না। শেষজীবনে তিনি ভক্তির কবিতা লিখেছেন, সাময়িক বিষয় ও কোনো কোনো ব্যক্তিকে অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। কাব্য হিসেবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির খুব বেশী মূল্য নেই। কবিকল্পনার সেই প্রমত্ত উৎসবলীলা আর নেই। ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত শীর্ণধারা ভক্তিরসকে আশ্রয় করেছে। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিবর্তন আকস্মিক মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর কবিপ্রকৃতির দিক থেকে এই প্রকার পরিণতি নিতান্ত আকস্মিক নয়। কাব্যজীবনের প্রথম থেকেই দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রীতিমুগ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রীতিই রূপোল্লাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর কবিজীবনকে সার্থক করে তুলেছিল। ঐ রূপোল্লাসের অনেকখানিই যৌবনস্বপ্ন থেকে উদ্ভূত। তাই যৌবনজোয়ার যখন ভাঁটার টানে অনেকখানি প্রশমিত হল, তখন রূপোল্লাসেরও সেই বেগ আর রইল না, প্রীতিমুগ্ধতাই তার চেয়ে বড় হয়ে উঠল। এই প্রীতিরই স্বাভাবিক পরিণতি ভক্তিরস। তাই দেবেন্দ্রনাথের শেষজীবনের কবিতায় ভক্তিরই আধিপত্য, সৌন্দর্যবোধ সেখানে ক্লান্ত। দেবেন্দ্রনাথ ক্ষণবসন্তের কবি—যৌবনস্বপ্নমদির বিশেষ ঋতুটিই তাঁর কাব্যে পুষ্পাভরণে

১০. দেবেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৪৫, পৃ. ১৮-১৯ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলসিত। সেই স্বপ্ন যখন ফিকে হয়ে আসে তখন একমাত্র প্রীতিকে সম্বল করে ভক্তিরসের কবিতা রচনা করাই সম্ভব। একদা যৌবনোদ্বেল রূপ-তরঙ্গিণীর প্রবল বন্যায় এই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি তাঁর 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন'কে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আজ সে উদ্বেলতা নেই,—চাতুর্য ও মাধুর্যের মহোৎসব নেই—শুষ্ক নদীর বুকে কবির অসহায় চিত্তের শীর্ণ আকিঞ্চনটুকু মাত্র আছে। সেইটুকুকেই ভক্তির রসে বিগলিত করে এই 'ছিন্নকণ্ঠ পিক্' সান্ত্বনা পেতে চান :

আমার প্রতিভা আজি কাঙ্গালিনী, হে শ্যামসুন্দর
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে
নহে আর ; মাধবী-মণ্ডপ তার মধুপে মধুপে
নহে আর ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত ! শুষ্ক সরোবর,—
ফোটে না ফোটে না তথা একটিও পদ্ম মনোহর
উপমার ; ঝরি গেছে লতা-পাতা ; ওই দীনস্তূপে
ক্রোটনের পাতা কাঁপে, (হায় রে তারে কে করে আদর ?)
কম্বল-সম্বল-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চুপে !
হে বঁধু, হে প্রাণেশ্বর ! নাহি খেদ নাহি তাহে লাজ ;
তুমি যবে আসিয়াছ, কিবা কাজ গোলাপী ভূষণে ?
যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী ভুলি তুচ্ছ সাজ,
আলুথালু কেশ-পাশ—পড়ে নাকি রাতুল চরণে ?
জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না ঘৃণা,—
পতিচক্ষে, প্রাণনাথ ! প্রবীণা যে সুচির-নবীনা।

কবির এই স্বীকৃতিই তাঁর কবিজীবনের চরমতম ফলশ্রুতি !

৭

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের মানসিকতা ও কাব্যচরণের দিক থেকে দুটি ধারা লক্ষণীয়। এর প্রথমটি হল কৃত্রিম-ক্লাসিক কাব্যাদর্শ, আর দ্বিতীয়টি হল রোমান্টিক ভাবাদর্শ। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে পূর্ণাঙ্গ ক্লাসিক্যাল যুগ গড়ে ওঠে নি। একমাত্র মধুসূদনই তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে মিল্টনীয় সমুন্নতি ও ক্লাসিক ভাবাদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চারিত করেছিলেন। মধুসূদনের অনুকারীদের মধ্যে এক জাতীয় কৃত্রিম ক্লাসিক ভাবাদর্শের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের কাব্যসাধনা এই ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সার্থক প্রতিবাদ। ধীরে ধীরে এই ধারা একটি অন্তর্মুখী রোমান্টিক ধারার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় রোমান্টিক ধারারই জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে।

মধুসূদনের পরে কাব্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের প্রভাব খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের কেউ কেউ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' প্রথমভাগে হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে অনেকখানি, সামান্যকিছু নবীনচন্দ্রের প্রভাবও আছে। কামিনী রায় যে শুধু তাঁর কাব্যের ভূমিকা হেমচন্দ্রের দ্বারা লিখিয়েছিলেন তাই নয়, অনেককাল পর্যন্ত তিনি হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মধুসূদনের সঙ্গে আত্মীয়তাসম্পর্ক মানকুমারীকে 'বীরকুমারবধ কাব্য রচয়িত্রী' করে তুলেছিল। এই কমপ্লেক্স থেকে তিনি কোনোদিনই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেন নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনাও মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যের দ্বারা কোনো কোনো অংশে প্রভাবিত হয়েছে।[১১]

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে বলেছেন: '...সে বহুকালের কথা। আমি হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের কবিতা মুখস্থ করিতাম, নিজেও খুব কবিতা লিখিতাম, কোন নূতন সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম।'[১২] অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তকে তিনি বলেছিলেন: —'দেখুন, আমি পুরাতন 'স্কুলের'—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি। এই রবীন্দ্রের যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত। ... আমার কিন্তু সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। সে যাহাই হউক, মাইকেলই আমার গুরু।'[১৩]

দেবেন্দ্রনাথের এই দুটি স্বীকারোক্তি তাঁর কবিপ্রকৃতি বিচারের একটি মূলসূত্র। মধুসূদনের কাব্যরীতির প্রভাব তাঁর কবিতার অনেক জায়গায়ই আছে। 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' ও 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' কাব্যদুটিতে মধুসূদনীয় কাব্যপরিকল্পনার প্রভাব আছে। কিন্তু সে প্রভাব বেশীর ভাগই বহিরঙ্গগত। তাঁর কাব্যে মধুসূদনীয় বাগ্‌ভঙ্গিও অনেক আছে।[১৪] দেবেন্দ্রনাথের প্রথম তিনখানি কাব্যের প্রকৃতিকবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত ব্যঙ্গাত্মক বাগ্‌ভঙ্গিও হেমচন্দ্রের ঐ শ্রেণীর কবিতাকে স্মরণ করিয়ে

১১. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন রচিত 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০।

১২. স্মৃতি : ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ. ১৬২

১৩. দেবেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৪৫, পৃ. ২০: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪. 'সমাসোক্তি (personification) এবং সম্বোধন (apostrophe) দেবেন্দ্রনাথের কাব্যপদ্ধতির নিজস্ব রীতি। এ বিষয়ে মধুসূদন ইঁহার গুরু। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পয়ারে এবং অন্যত্রও parenthesis-এর ব্যবহারে দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনের অনুসরণ করিয়াছেন।'

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০, পৃ. ৫২৫: ড. সুকুমার সেন।

দেয়। তবু দেবেন্দ্রনাথকে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের ধারার কবি মনে করাও সংগত হবে না। তিনি যেমন একদিকে বাংলাকাব্যের ক্রমবিলীয়মান অধ্যায়টির শেষরশ্মি পান করেছেন, তেমনি বাংলা কাব্যের আর-এক দিগন্ত যে অসাধারণ কবিকল্পনার দীপ্তরাগে রঞ্জিত হয়েছিল, তাকেও তিনি প্রাণভরে অভিনন্দন জানিয়েছেন :

নববলয়িতা লতা বালিকা-যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর-পরশে—
লাজে বাধ' বাধ' বাণী, রূপের আলসে
ঢল ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন !
পাঠ করি', সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে !

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার রহস্যরসেও তিনি অবগাহন করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সনেটগুলি মধুসূদনের আদর্শে রচিত হয় নি, তিনি প্রধানত 'কড়ি ও কোমল'-এর রূপাদর্শের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—দুই যুগের দুই কবিপ্রতিনিধি দেবেন্দ্রনাথকে সমভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। একজন তাঁর রতি, আর একজন আরতি। মধুসূদনের কাব্যভূমিতে বসেই তিনি রবীন্দ্র-আরতি করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-বরণের জন্য কিছুকালের জন্য সেই অতি প্রিয় কাব্যভূমিকেও ছাড়তে হয়েছিল—সেইখানেই শুধু ক্ষণকালের জন্য তাঁর কবিকল্পনা পঞ্চেন্দ্রিয়ের রূপ-বিলাসে মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর বীরাঙ্গনা-ব্রজাঙ্গনার কবির রূপাদর্শে তিনি ফিরে এসেছেন। কিন্তু কল্পনার ধারা তখন শুষ্কপ্রায়—সেইটুকু দিয়েই তিনি ভক্তিঅর্ঘ্যরচনার শেষ চেষ্টা করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনও নন, রবীন্দ্রনাথও নন। কিন্তু এই দুই মহাকবির কাব্যজগতের মাঝখানে যে সংকীর্ণ ভূখণ্ড ছিল দেবেন্দ্রনাথ তারই অধিবাসী—'ক্ষুদ্র এক বাঙ্গালার কবি।' দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসের এই স্বরূপটি সে যুগের বাংলাকাব্যের একটি স্বল্পস্থায়ী মিশ্রমানসের পরিচয় বহন করে। এই হিসেবে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা বিশিষ্ট।

জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবার্ষিকী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাহিত্য পরিষদের সহিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তাহা হয়ত অনেকেরই অজ্ঞাত। বৈজ্ঞানিক হিসাবেই তাহার খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত, এবং তাঁহার বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাই অধিকতর পরিচিত ; কিন্তু তাঁহার সহজ সাহিত্যবোধ ও পরিষদের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ তাঁহার মননশীলতার আর-একটি দিকের পরিচয় বহন করে। জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনার অধিকাংশই ১৩২৮ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে . গ্রন্থের নামকরণই তাঁহার সাহিত্যপ্রবণ কল্পনার নির্দ্দেশক। ইহা ছাড়া, প্রকাশিত চিঠিপত্রের মধ্যেও তাঁহার বাংলা রচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বাংলা সাহিত্যের সহিত জগদীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ সংযোগ হইয়াছিল ১৩১৮ সাল হইতে, যে সময় তিনি ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কেবল বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা নয়, এই নির্ব্বাচনের মূলে ছিল ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা। তাঁহার প্রথম সুপরিচিত নিবন্ধ 'দাসী' পত্রিকায় এপ্রিল ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত 'ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে'। এই সময়ে তাঁহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা, 'যুক্তকর', 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ', 'অগ্নিপরীক্ষা' ও 'গাছের কথা'। কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্যপরিবেশনে নয়, রচনা-নৈপুণ্যেও এই প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্মেলনের সভাপতি হইয়া তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাঁহারও উপযুক্ত প্রতিপাদ্য ছিল 'বিজ্ঞানে সাহিত্য'।

নিজস্ব গবেষণার ফল প্রচারের জন্য জগদীশচন্দ্রকে বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। চতুর্থবার বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁহাকে ডি. এস্-সি উপাধি ভূষিত করে, তখন (৫ই শ্রাবণ, ১৩২২ সালে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সান্ধ্যসম্মিলন আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। ইহার পর বৎসর, ১৩২৩ সালে, পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া ১৩২৫ সাল পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি পরিষদকে গৌরবান্বিত করেন। এই সময় পরিষদে 'নবীন ও প্রবীণ' এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার অভিভাষণে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার প্রাজ্ঞতা, ধীর-শান্ত নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই বিরোধ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছিল, এবং পরিষদের কার্য্যক্রমে শৃঙ্খলা আসিয়াছিল। ১৩২৪ সালে তৎকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও মনীষীদের সহযোগিতায় তিনি পরিষদে নানা বিষয়ে ভাষণাবলীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; এবং নিজেও আলোকচিত্রের সাহায্যে 'আহত উদ্ভিদ' সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাত্মক একটি বিষয়ের সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

পুনর্ব্বার বিদেশগমন ও নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁহাকে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু পরিষদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-সূত্র কোনও দিন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যশোমণ্ডিত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর ১৩২৭ সালে পরিষদ্ তাঁহাকে সোনার দোয়াত-কলম উপহার দিয়া, এবং পুনরায় ১৩৩৪ সালে তাহার সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে অভিনন্দনপত্র দিয়া সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। দেহান্তের পরে, তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উন্নতির জন্য তিন হাজার টাকা দান করিয়া পরিষদে একটি স্মৃতি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষদের প্রতি জগদীশচন্দ্রের মমত্ববোধের ইহা একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

দেশ-বিদেশে অভিনব গবেষণার প্রচারের জন্য তাঁহাকে বিদেশী ভাষাতেই লিখিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার স্বল্পসংখ্যক-বাংলা রচনা সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার স্বদেশ ও স্ব-ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের। বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিভাষিক শব্দ আছে, সুতরাং লেখা দুষ্কর নয়; কিন্তু বাংলায় উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অভাবে গবেষণাত্মক বিষয় সহজবোধ্য ও মনোগ্রাহী করিতে হইলে বৈজ্ঞানিকের যে ভাষাজ্ঞান ও রচনানৈপুণ্যের প্রয়োজন তাহা জগদীশচন্দ্র সহজেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্যগুলি স্বচ্ছ ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করিবার যে অসাধারণ শক্তি তাঁহার বাংলা রচনায় আমরা দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার শিক্ষিত মনের সহজাত সাহিত্যবোধ হইতেই বিকাশলাভ করিয়াছিল। শব্দপ্রয়োগে দক্ষতা আছে, কিন্তু আড়ম্বর নাই; প্রকাশভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু কৃত্রিমতা নাই। নিছক সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার সময় বা অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না, কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিতে কেবল বৈজ্ঞানিকের নয়, সাহিত্যিকেরও অপূর্ব্ব পরিচয় রহিয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

তীর্থযাত্রী

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ঋষি এবং কবি প্রায় সমানার্থবাচক শব্দ। যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা, যাঁহার নিকট প্রকৃতি বা বিশ্বভুবনের মর্ম অনাবৃত হয়, তিনিই ঋষি, তিনিই কবি। বর্তমান জগতে অন্যান্য বিদ্যা অপেক্ষা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ জগৎবাসীর নিকটে বিজ্ঞান অঘটনঘটনপটীয়সী বিদ্যার আকারে সমাদর লাভ করিলেও প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের নিকটের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সমাদর সম্পূর্ণ অন্য কারণে ঘটিয়া থাকে। মানুষ নানা উপায়ে সত্য লাভ করিয়া থাকে; তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্তমান জগতে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানী বস্তুজ্ঞানের উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করেন, এবং সেই জ্ঞান তিনি বহুবিধ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার সহায়তায় সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে তথ্যের সংগ্রহমাত্র বিজ্ঞান নহে। এমন-কি সংগ্রহের মূলেও যদি সজাগ মন এবং তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তির প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তথ্য সংগ্রহের কর্ম ইষ্টকস্তূপ সংগ্রহের মত নিরর্থক হইতে পারে। উৎকৃষ্ট বহু ইষ্টক সংগ্রহ করিলেই তাহা মন্দির হয় না, মন্দিরের গঠন স্বতন্ত্র; অবশ্য উৎকৃষ্ট মন্দির নির্মাণের জন্য উৎকৃষ্ট ইষ্টকেরও প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত ভূমিকা নিবেদন করিবার কারণ হইল, বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে এক প্রকার দুর্বল মনোভাব আমাদের ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবনের উচ্চতম স্তরে পর্যন্ত যেন কায়েমী হইয়া বসিয়া আছে। স্বাধীনতা অর্জনের পরেও যেন তাহা ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহিতেছে না। ইউরোপ বা আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকগণ সমাজের নানা জীবন্ত সমস্যা লইয়া পর্যালোচনা করেন। শিল্পে, বাণিজ্যে, মনুষ্যসমাজে বহুবিধ সমস্যার উদয় ঘটিয়া থাকে, ঐ সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইহার যথাযথ সমাধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন প্রকৃতির গভীরতর সমস্যার উদ্ঘাটনে যাঁহারা রত, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মৌলিক জিজ্ঞাসাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। বর্তমান কালে ইউরোপের বহু স্থানে এবং আমেরিকায় পাখীর ভাষা, মৌমাছির ভাষা প্রভৃতি লইয়া যেমন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গবেষণাকার্য আরম্ভ হইয়াছে, তেমনই মানুষের মনের গূঢ় ক্রিয়াদির বিষয়েও অভিনব উপায়ে নিরীক্ষণ বা পরীক্ষাদির সূচনা দেখা দিয়াছে। ফলে নূতন নূতন অপ্রত্যাশিত সত্যের অধিকার লাভ ঘটিতেছে।

অভাগা ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহই যে মৌলিক, স্বাধীন প্রশ্নের অবতারণা বা পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভব করেন নাই, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে ইহা সত্য তাঁহাদের সংখ্যা ইউরোপের তুলনায় অসম্ভব রকমের অল্প বলিয়া মনে হয়। ভারতের বাহিরে অপর দেশে কোথায় কে কি কাজের দ্বারা সুনাম

অর্জন করিয়াছে, তাহারই ভারতীয় সংস্করণ বা পুনরাবৃত্তির যত নমুনা দেখা যায়, তাহার পর্বতস্তূপের অন্তরালে মৌলিক গবেষণা প্রায় অদৃশ্য হইয়া থাকে।

বহুদিনের পরাধীন দেশে এরূপ অনুকরণপ্রিয়তা বা দাসসুলভ মনোভাবের অস্তিত্ব একান্ত অস্বাভাবিক নহে। বিজ্ঞানে যে অনুকরণের স্থান নাই তাহাও নহে; বস্তুতঃ একই পরীক্ষা পৃথিবীর নানা স্থানে, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর দ্বারা অনুসৃত হইলে তবেই আমরা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু যে কথা আমাদের বারংবার স্মরণ রাখা কর্তব্য তাহা এই যে, বিজ্ঞানী নিজের পারিপার্শ্বিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। এবং যদি কোনও সমস্যা জীবনের স্তর হইতে উদ্ভূত না হইয়া থাকে, তবে তাহার সমাধান বহুক্ষেত্রে নিষ্ফল অনুকরণে পর্যবসিত হয়।

মানুষের মুক্তি হয় মনে। এবং মুক্ত অথবা মুক্তিকামী মন লইয়া যখন বিজ্ঞানসেবী নিজের চারিপার্শ্ব পর্যবেক্ষণ করেন তখন তাহার মনে হয়তো এমনই সকল প্রশ্নের উদয় হয় যাহার উত্তর সন্ধান করিতে গিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্পূর্ণ নূতন দুয়ার উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন। আমাদের দেশে যে স্বল্পসংখ্যক বৈজ্ঞানিক এই পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

তিনি প্রথমে পদার্থবিদ্যা অধিকার করেন। কিন্তু সেই পদার্থবিদ্যার মধ্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গতি সম্বন্ধে এমন সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, এবং তাহার উত্তর সংগ্রহ করিতে গিয়া এমন বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিলেন যে এক দিক দিয়া বলিতে গেলে জগতের প্রথম বেতার বার্তাবহ যন্ত্র তাঁহারই উদ্ভাবনী শক্তির বশে নির্মিত হইল।

বিজ্ঞানে যাঁহারা উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, এমন কি জীববিদ্যা প্রভৃতির মত আপাততঃ পৃথক শাস্ত্রের ব্যবধান উত্তরোত্তর ঘুচিয়া যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের দ্বারা উদ্ভিদ এবং প্রাণী, এমন কি জীব এবং জড়ের মধ্যে সীমারেখা সত্যসত্যই নির্ধারণ করা যায় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকজন সুদক্ষ বাঙালী কারিগরের সাহায্যে তিনি এমনই সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করিতে সমর্থ হইলেন, যাহার দ্বারা উদ্ভিদের জীবনের গতি বা 'হৃদয়-স্পন্দন' আমাদের নিকট আলোক রেখার গতির আকারে, বা উদ্ভিদের নিজের লিখিত বিন্দুসমষ্টির রূপ ধরিয়া হস্তলিপির মত প্রতিভাত হইল।

যন্ত্রের উদ্ভাবনে তাঁহার যেমন মৌলিকতা দেখা যায়, চিন্তার রাজ্যে ভয়শূন্য মনে নূতন নূতন দুঃসাধ্য বা প্রায় অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেও তাঁহাকে তেমনই লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। মনে উত্থিত কোন প্রশ্নকেই তিনি হেলায় ফেলিয়া দিতে চাহিতেন না; দুর্গম পথে নূতনতর সন্ধানে যাত্রা করা তাঁহার নিকট যেন চিত্তের আমোদ জোগাইত।

বৈজ্ঞানিকের জাতি নাই, ইহাই সচরাচর আমাদের ধারণা। কিন্তু বিজ্ঞানীও তো মানুষ, এবং যাহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "স্থানীয়তা" বলিয়াছিলেন, সেই স্থানীয়তা গুণ

বৈজ্ঞানিকের মনকেও যে সমৃদ্ধ করিতে পারে, ইহা মনে না করিবার কোনও হেতু নাই। যে জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যার মত সংস্কারবিহীন শাস্ত্রের সাধনায় রত ছিলেন, তাঁহার আরও একটি দিক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। এবং ইঁহারা দুইজনে ভারতীয় সংস্কৃতির যে-দুই বিশিষ্ট স্রোতধারাতে অবগাহন করিয়াছিলেন, জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গগুণেই হউক, অথবা স্বীয় স্বাধীন ভারতপ্রেমের বশেই হউক, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সেই বহুমুখী স্রোতধারায় অবগাহন করিয়া শুদ্ধ, সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। উপনিষদে যে বাণী মুখরিত হইয়াছে, যাহার মূল তত্ত্ব হইল ইহাই যে 'সেই একই বহু হইয়াছেন', জগদীশচন্দ্র স্বীয় বিজ্ঞানসাধনার মধ্যে নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা জড়ে ও জীবে, উদ্ভিদে এবং প্রাণীজগতে তাহারই সত্যতা স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজ্ঞান "স্থানীয়তা" গুণে সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিল।

ইহার অর্থ এরূপ নহে যে আচার্য জগদীশচন্দ্র সত্যকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জড় ও জীবের সম্পর্কে, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বিষয়ে এমন-সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন যাহার মৌলিকতা বিস্ময়কর, এবং যে-কারণে তাঁহাকে ইউরোপের বিজ্ঞানজগৎ দ্রুত সম্মানের আসন দান করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

ভারতীয় সংস্কৃতির যে গূঢ়তত্ত্বে জগদীশচন্দ্র অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সঞ্চয়ের একটি উপায় তাঁহার ছিল তীর্থদর্শন। যৌবনে বিবাহের কিছুকাল পর হইতেই তিনি ভারতের তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে উত্তরোত্তর তাঁহার অন্তরে গভীর হইতে গভীরতর উপলব্ধি এই "স্থানীয়তা" গুণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়।

মানুষকে তিনি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। হয়তো সেই কারণে প্রকৃতি তাঁহার নিকট অপরাপর সকল তীর্থ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিল। কাশ্মীর অথবা নৈনীতালের পর্বত ও হিম নদী দর্শন অথবা মায়াবতী বা কেদার-বদরীর যাত্রা তাঁহাকে যে-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহার তুলনা হয় না। আচার্যের হৃদয়মন্দিরে হিমালয়ের জন্য একটি পবিত্রতম স্থান নির্দিষ্ট ছিল। দার্জিলিঙেই হউক অথবা অন্যত্রই হউক, তিনি এক একবার প্রকৃতির রূপে, তাহার বিশালতায় অবগাহন করিয়া চিত্তের মধ্যে প্রশান্তি লাভ করিয়া আসিতেন।

কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, নানা-ভাষাভাষী, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে অগণিত তীর্থযাত্রী একই সৌন্দর্য ও একই মন্ত্রের আকর্ষণে কেদার-বদরীর পথে চলিয়া প্রবাহশীল এক অবিভক্ত নরস্রোতের যে-আকার ধারণ করে, সেই মানবতীর্থ প্রকৃতির প্রিয়রূপ ভাগীরথীর মতই আচার্যের নিকট অপর এক আধ্যাত্মিক লোকের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দিত। সমগ্র ভারতবর্ষ সমগ্রতার বা অখণ্ডতার রূপ লইয়া এক নূতনভাবে তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিত।

মানুষের প্রতি আকর্ষণের মূলে জগদীশচন্দ্রের মনে অবস্থিত মানবীয়তার ভাবও অনেকাংশে দায়ী। হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক আচারের ভারে মানবীয়তা বহুলাংশে নিষ্পেষিত হইয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আমরা তাহা শুদ্ধতর এবং স্পষ্টতররূপে অবলোকন করিতে পারি। বুদ্ধের করুণা এবং মৈত্রী, তাঁহার সত্যলাভের জন্য দুর্জয় তপস্যার আকর্ষণ যত সহজে মানুষের চিত্তকে স্পর্শ করে হিন্দুধর্মের মরমীয়া সাধনা তত সহজে সাধারণ মানুষের চিত্তকে হয়তো আকর্ষণ করে না। আচার্য জগদীশচন্দ্র শুধু যে বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের ভূমি বজ্রাসনের অধিষ্ঠান বুদ্ধগয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা নহে, যে রাজগৃহের সহিত বুদ্ধের জীবনকাহিনী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেখানেও গমন করিয়াছিলেন।

হিন্দুর পূজা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংঘ বলিতে বৌদ্ধধর্মে যাহা বুঝায়, উত্তরকালে হিন্দুধর্মের সংগঠনে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান রচিত হইলেও বৌদ্ধ ইতিহাসেই তাহার সমধিক প্রকাশ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পশ্চিমাঞ্চলে কার্লি, অজন্তা, কেনহেরি প্রভৃতি স্থানেও যেমন আচার্যদেব আকৃষ্ট হন, বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলা বা নালন্দার প্রতিও তাহার আকর্ষণ তেমনই সহজবোধ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। ভগবান বুদ্ধের ধর্মসংগঠনের আকর্ষণে জগদীশচন্দ্র বিভিন্নকালে সাঁচি হইতে সিংহল পর্যন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন।

সংস্কারকামী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে গুরুনানক এবং শিখধর্মও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিহারে অবস্থিত গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান যেমন তিনি দর্শন করেন, তেমনই লাহোর ও অমৃতসরে গমন করিয়া অন্যান্য শিখগুরুগণের দ্বারা পবিত্রীকৃত ভূমিও তিনি স্পর্শ করিয়া আসেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কারবাদী হইয়াও আচার্য জগদীশচন্দ্র হিন্দুধর্মের মন্দিরকে উপেক্ষা করেন নাই। পুরী, কোণারক বা ভুবনেশ্বরে অথবা বোম্বাই শহরের অনতিদূরবর্তী এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে অবস্থিত অপরূপ ভাস্কর্য এবং ইলোরার স্থাপত্য হয়তো শুধু শিল্পগুণেই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু অন্যান্য এমন বহু তীর্থেই তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন যেখানে তাঁহার সংস্কারবাদী শিক্ষিত আধুনিক মন কুসংস্কার বা আচারের আতিশয্যে হয়তো বিরক্ত হইবারই কথা। নর্মদাতীরে মান্ধাতায় ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে নিজের সৌন্দর্য বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু স্থানটি পরম রমণীয়। কিন্তু তাঞ্জোর, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি স্থানের সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। মন্দির এ-সকল স্থানে সুন্দর সন্দেহ নাই; কিন্তু অলঙ্কারের আতিশয্যে সেগুলি এমনই ভারাক্রান্ত যে স্পর্শকাতর মন লইয়া সেখানে রসোপভোগ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অথচ বিভিন্ন কালে আচার্য জগদীশচন্দ্র এ-সকল তীর্থদর্শনও করিয়া আসিয়াছিলেন।

বিচিত্র এই যে, আচার্যের মন হয়তো এমনই উচ্চকোটিতে আরোহণ করিয়াছিল, ভারতের মাটি ও মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ তাঁহার চিত্তে এমনই এক প্রেমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তিনি কুসংস্কারের স্তূপের দ্বারা পরাহত হইয়া ভারতীয় সাধনার

অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। পাংশুর দ্বারা আবৃত কাষ্ঠখণ্ড হইতে ধূম উত্থিত হইলে যেমন অন্তর্নিহিত অগ্নির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়, ভারতের হিন্দুমন্দির ও তীর্থের মধ্যে জগদীশচন্দ্র হয়তো তেমনই সত্যপদার্থের অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন। এবং সেইজন্যই অবহেলায় বা অনাদরে সেগুলিকে পরিহার করিয়া, শুধু শিল্পরসের সন্ধানও করেন নাই।

কথিত আছে, শ্রীরঙ্গমের মন্দির দর্শনকালে পুরোহিতগণ যখন তাঁহাকে বিমানের অভ্যন্তরে, গম্ভীরায়, মূল মূর্তি দর্শনের জন্য আহ্বান করেন তখন জগদীশচন্দ্র তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, তিনি সনাতনী হিন্দু নহেন, সংস্কারপন্থী হওয়ায় নিষিদ্ধ আচারের দ্বারা তিনি নিয়মলঙ্ঘনও করিয়াছেন। উত্তরে পুরোহিতগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মন্দিরের গম্ভীরায় প্রবেশ করিতে বাধা নাই, কেননা তিনি তো সাধু বা সন্ন্যাসী-শ্রেণীর লোক।

পুরোহিতেরা ঠিকই চিনিয়াছিলেন। যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের শাসনকে স্বীয় কাব্য-শক্তির দ্বারা বা ঋষিজনোচিত দৃষ্টিশক্তির বশে গভীরতর ও উজ্জ্বলতর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনিই স্বীয় "স্থানীয়তা"কে বা ভারতপ্রেমকে আশ্রয় করিয়া আনুষ্ঠানিক সর্ববিধ গণ্ডী এমনভাবেই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে অবশেষে ভারতের প্রচলিত ভাষায় "অনিকেতন" সন্ন্যাসীর ভূমিতে আরোহণ করেন; যখন স্থান এবং কালের ব্যবধান নিরাকৃত হইয়া তাঁহাকে প্রেমে সর্বমানবের সহিত এক অখণ্ডসূত্রে গ্রথিত করিয়া দেয়। তাহাই আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনার সর্বোচ্চ বিভূতি লাভের প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।

নির্মলকুমার বসু

জগদীশচন্দ্রের রচনা

মনস্বিতার একটি লক্ষণ এই যে তা এক মহৎ জীবনদর্শনে গিয়ে পরিণতি লাভ করে। এখানে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের পথ একই। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে করতে পদার্থের অতীত এমন এক অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের সন্ধান পেয়েছিলেন যে-জগৎ কবির জগৎ ও সাহিত্যিকের জগৎ বলেই সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে। কবিও সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্তরের ঐক্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই জগদীশচন্দ্র তাঁর 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' প্রবন্ধে বলতে পেরেছিলেন, "বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে স্বরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।"

কিন্তু কেবল কবিজনোচিত দার্শনিকতা নয়, তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এমন একটি গুণ আছে, যা তাদের সাহিত্যরূপে চিহ্নিত করেছে। অবশ্য জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনার সংখ্যা অত্যল্প। একখানি মাত্র গ্রন্থ, 'অব্যক্ত', তাঁর রচনার নিদর্শনরূপে বর্তমান। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-কৃতিত্বের সাক্ষীরূপে আমার মনে হয়, তাঁর পত্রাবলীকেও গণনা করা উচিত। কেননা, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে কেবল যে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, সেগুলির মধ্যে তাঁর বাংলা রচনায় এমন একটি সহজ সারল্য ও অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, যা গদ্যলেখক মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত।

সত্য বটে, জগদীশচন্দ্র বাল্যাবধি সাহিত্য-সাধনা করেন নি। সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের দুরূহ দুর্জ্ঞেয় বহু জিজ্ঞাসায় তাঁর মন এমন পরিপূর্ণ হয়েছিল যে, সাহিত্যরচনার অবকাশ তিনি খুব অল্পই পেয়েছেন। তবু তাঁর 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে যে সাহিত্য-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনার যোগ্য।

সাহিত্যের বিশেষ চর্চা না করেও জগদীশচন্দ্র তাঁর রচনায় যে কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন, তা কেবলমাত্র আন্তরিক প্রেরণা দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। এ-প্রেরণাও তাঁর প্রতিভারই আর একটি লক্ষণ। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'হাজির'-এ জগদীশচন্দ্র নিজেই এ-প্রেরণার কথা বলেছেন :

"এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে।··· কোনদিন লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞায় 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম।"

'অব্যক্ত' কুড়িটি প্রবন্ধের সমষ্টি। তার মধ্যে প্রথমটি অবতারণিকা-স্বরূপ, ছয়টি প্রবন্ধ

বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা, দুটি উদ্ভি দ্-জীবন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এবং একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য। 'মন্ত্রের সাধন,' 'বোধন', 'মনন ও করণ' ও 'দীক্ষা' প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানের দুরূহ সাধনায় নিষ্ক্রিয় বাঙালীকে উদ্ব্দ্ধ করার প্রেরণাময় প্রবন্ধ। 'হাজির' প্রবন্ধটির উল্লেখ পূর্বেই করেছি। বাকি পাচটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি এক ঐতিহাসিক বীরত্বের বিবরণ, দুটি সাহিত্য-সম্মিলনী ও সাহিত্য-পরিষদে পঠিত সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা, একটি বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে জগদীশচন্দ্রের নিবেদন ও একটি ভারতীয় নারীর সহজাত মহত্ত্ব ও বর্তমানে নারীর দুর্দশা সম্বন্ধে গভীর সমবেদনাময় ক্ষুদ্র রচনা।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রীতির একটি অন্তঃসলিল প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। পরাধীনতার গ্লানি, তৎকালীন বাংলা ও বাঙালীর অবনত অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা এবং ভগ্নোদ্যম অলস বাঙালী যুবককে বৃহত্তর কর্মে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণা জগদীশচন্দ্রের সকল প্রবন্ধেরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তৎকালীন মনীষীমাত্রই এই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, কেননা এ-কথা তখন তাঁরা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে স্বাধীনতা ভিন্ন প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হতে পারে না।

এই দেশপ্রেম এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস জগদীশচন্দ্রের সকল রচনায় সুস্পষ্ট। যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি কি শুধু পদার্থজগতের বাইরের রূপই দেখেন? এই বস্তুজগতের অন্তরালে জীবনের যে গভীরতর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন তা কি কেবল দার্শনিক ও কবিরই উপলব্ধ? ভাবের দিক থেকে জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এই দুই সত্তার যে মিলন সাধিত হয়েছিল, তা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে'র মধ্যে প্রকট। এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কিন্তু পড়বার সময় যে-কোনো পাঠকের পক্ষে এটিকে ভাবব্যঞ্জনাময় সাহিত্যপ্রবন্ধ বলে ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক।

"নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুনিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীব্যাপিনী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

"শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে ৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।"

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন, তাকে সাহিত্য-রূপে পরিবেশন করার ক্ষমতা জগদীশচন্দ্রের ছিল বলেই তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে রচনা-সৌন্দর্যের জন্যও আমরা শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারি না।

'অব্যক্ত' গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিই বস্তুতঃ জগদীশচন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন

করে। 'সাহিত্য'-পত্রিকায় প্রকাশিত 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' আর একটি প্রবন্ধ যা ভাষার স্বচ্ছতায়, প্রকাশের ঋজুতায় ও অলংকরণে সাহিত্যরূপে গণ্য হবার যোগ্য।

"এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এ মুহূর্তে যাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান নদীস্রোত যেরূপ উপলখণ্ডকে বার বার ভাঙ্গিয়া অনবরত তাহাকে নূতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তি-স্রোতও সেইরূপ দৃশ্যজগৎকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিরাম নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই।...

"সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।"

উপরের উদ্ধৃতিটি কেবলমাত্র বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বব্যাখ্যা নয়, এখানে বিজ্ঞান সাহিত্য ও দর্শন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

'মুকুল'-এ প্রকাশিত ছোটদের জন্য সহজ ভাষায় যে বিজ্ঞানালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যেও জগদীশচন্দ্রের রচনা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া, তাঁর রচনা যে তিনি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, ইতিহাস, নারীর মহিমা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়েই প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাতেই মনে হয় যে তাঁর রচনায় সাহিত্যগুণ তো ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনেরও একটি সাহিত্যিক দৃষ্টি ও সাহিত্যিক ঔদার্য ছিল যা বিজ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ছিল না।

যে সৌন্দর্য ও রসোপলব্ধি সাহিত্য রচনার প্রেরণাস্বরূপ এবং মনের যে বিশেষ গঠন কবিকে কবি ও শিল্পীকে শিল্পী করে তোলে, জগদীশচন্দ্রের তা সহজাত ছিল। সে জন্য বিজ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন থেকেও এই অসাধারণ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের রচনার মহত্ত্ব বহু তথাকথিত সাহিত্যিক ও সমঝদারের আগেই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই ভিন্নপথচারী বন্ধুর সাহিত্য-সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় জানতেন বলেই নিজের সকল রচনা এঁকে না দেখিয়ে তৃপ্তি পেতেন না। বিলাত-প্রবাস-কালে কর্মব্যস্ত জগদীশচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা কী আনন্দ, কী প্রেরণা বহন করে নিয়ে যেত, জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীতে তার বহু পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য জগদীশচন্দ্রের আগ্রহ ছিল কী গভীর! একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখছেন, "যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হয় তাহাদিগকে করুণার পাত্র মনে করি। আর যাঁহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্বচন কি আপনার নিকট পৌঁছে না? আমি ত কখন কখন আপনার ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়া যাই। কোন কোন স্বর শুনিয়া মনে হয়, এ কি একজনের কথা, না, এই দুঃখসুখময় সময়ের অগণিত অশান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস?" আর একখানি চিঠিতে **জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন,** "তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে

আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এ দেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না।...এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে কেবল জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি নয়, তাঁর রচনার আন্তরিকতা এবং সহজ সাবলীল ভঙ্গিটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতের নিশ্ছিদ্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলোই ছিল তাঁর আনন্দ ও প্রেরণাস্বরূপ, এ কথা জগদীশচন্দ্রের চিঠি পত্রে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্রের অন্তরের যোগ সাহিত্যের সঙ্গে কত নিবিড় ছিল, এই চিঠিপত্রগুলি তার নিদর্শন।

জগদীশচন্দ্রের কর্মময় জীবন ও রচনা আলোচনা করলে তাঁর তিনটি প্রধান আকর্ষণ অতি স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি--বিজ্ঞান, স্বদেশ ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম, অতি গভীর ভালোবাসা। বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি আজন্মকাল বহু দুঃখ ও অশান্তি সহ্য করেছেন, সত্য অন্বেষণে ব্যাঘাত ঘটবে আশঙ্কা করে যিনি ক্রোরপতি ব্যবসাদারের কাছে বহু মূল্যেও তাঁর যন্ত্রের পেটেণ্ট বিক্রি করতে সম্মত হন নি, তাঁর বিজ্ঞান-প্রেমের কথা আলোচনা করা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু তাঁর তীব্র স্বদেশপ্রেম ও সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় তাঁর রচনাগুলি না পড়লে পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করা যায় না। কি তাঁর চিঠিপত্রে, কি তাঁর রচনায় ও অভিভাষণগুলিতে, এক দিকে যেমন তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম জাজ্বল্যমান্, অপর দিকে তেমনই তাঁর সাহিত্য-প্রীতি ও রচনার সৌন্দর্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত।

মনের যে বিশেষ গঠন, ভাব ও ভাবনার যে বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা, ভাষার উপর যে সহজ প্রভুত্ব সাহিত্যিককে সাহিত্যিক করে তোলে, তার কোনোটারই অভাব জগদীশচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু তিনি সাহিত্যের সেবা অপেক্ষা বিজ্ঞানের সাধনাকেই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। তবু, সেই অক্লান্ত সাধনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমাদের জন্য যতটুকু সাহিত্য পরিবেশন করে গিয়েছেন, তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অজিত দত্ত

জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা-সূচী

পুস্তিকা ও গ্রন্থ

সভাপতির অভিভাষণ। পৃ ১৪, পরিশিষ্ট [/০]। Printed by Pulin Bihari Das from "Debakinandan Press", 66 Manicktola Street, Calcutta.

আখ্যাপত্র বা লেখকের নাম নাই।

১৩২৪ সালের ৫ই চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে পরিষৎ-সভাপতি জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক পঠিত। "শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। এই অধিবেশন সেই অভিভাষণ পাঠের জন্য আহূত হইয়াছিল।"

এই পুস্তিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্বিংশ ভাগের চতুর্থ সংখ্যার (১৩২৪) ক্রোড়পত্র-রূপে অন্তর্ভুক্ত। জগদীশচন্দ্রের অব্যক্ত গ্রন্থে "নবীন ও প্রবীণ" নামে এই অভিভাষণ পুনর্মুদ্রিত, সাময়িক বিবরণ পরিবর্জিত।

অব্যক্ত। আচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, এফ্, আর, এস্। মূল্য ২॥০। পৃ [।৵০], ২৩৪ প্রকাশ-তারিখ আশ্বিন ১৩২৮। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

সূচী

রাণী-সন্দর্শন ॥ ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৮

নিবেদন ॥ নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ ; প্রবাসী, পৌষ ১৩২৪

দীক্ষা ॥

আহত উদ্ভিদ ॥ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৬

স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ ॥

হাজির ॥ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৮

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-কর্তৃক এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়—বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী তারিখ ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৮। বহু বৎসর পরে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-কর্তৃক এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয় (১৩৫৮ ও ১৩৬৪)। এই গ্রন্থের জগদীশচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ যন্ত্রস্থ। অব্যক্ত প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর ১৩২৯ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে 'বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী' নামে জগদীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি অব্যক্তের জগদীশচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণভুক্ত হইবে এরূপ জানিয়াছি।

নবীন ও প্রবীণ ব্যতীত, অব্যক্ত গ্রন্থে সংকলিত আরও কোনও কোনও রচনা পূর্বে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে এরূপ অনুমানের কারণ আছে, যথা বিজ্ঞানে সাহিত্য, ও নিবেদন। এগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' অভিভাষণের একটি ইংরেজি রূপও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল—

LITERATURE AND SCIENCE. Substance of the Presidential Address given by the anthor in Bengali at the Literary Conference at Mymensingh, April 14, 1911. Pp. 16. [8 May 1911].

প্রবন্ধাবলী। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী বসু। ১৩৪০। প্রকাশক শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, ৫।১ স্থইনহো রোড, কলিকাতা।

ইহার প্রথমাংশে মুদ্রিত গাছের কথা ও মন্ত্রের সাধন প্রবন্ধ জগদীশচন্দ্রের রচনা, অব্যক্ত গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত। অপর রচনাগুলির অধিকাংশই অবলা বসু মহোদয়ার রচনা, তাঁহার স্বাক্ষরে মুকুলে প্রকাশিত হয়[1] ; সম্ভবতঃ অন্য কয়টিও তাঁহারই লিখিত।

পত্রাবলী। জগদীশচন্দ্র বসু। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী-সমিতি। ৯৩।১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা। শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশ ৩০ নভেম্বর ১৯৫৮।

এই পত্রসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ৮৮ খানি ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ২ খানি চিঠি সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ৮ খানি ও শ্রীহেমলতা ঠাকুরকে লিখিত ১ খানি অবলা বসুর চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে।

১. শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপার্থ বসু অনুগ্রহপূর্বক পুরাতন 'মুকুল' পত্র হইতে, এই রচনাগুলি যে অবলা বসুর, তাহা সন্ধান করিয়া দিয়াছেন।

জগদীশচন্দ্রের রচনা-সংবলিত গ্রন্থ

কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম। (১৩০০-১৩১৫) প্রকাশক—এইচ. বসু, পারফিউমার, দেলখোস হাউস, কলিকাতা। ১লা বৈশাখ, ১৩১৭।

এইচ. বসু বা হেমেন্দ্রমোহন বসু-প্রবর্তিত কুন্তলীন গল্প-পুরস্কার-প্রতিযোগিতা বাংলা সাহিত্যে এক সময় সুপরিচিত ছিল—শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্প, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও হেমেন্দ্রমোহন বসুর জন্য গল্প লিখিয়াছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলি প্রতিবৎসর কুন্তলীনের উপহাররূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত। এই গ্রন্থে প্রথম বারো বৎসরের প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্প একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথমবারের প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিল জগদীশচন্দ্রের রচনা 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। "এই উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে পুরস্কার (৫০৲) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছিল।" পরে অব্যক্ত গ্রন্থে 'পলাতক তুফান' নামে ইহা জগদীশচন্দ্রের রচনারূপে স্বীকৃত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশকালে গল্পটির প্রভূত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

প্রথম বৎসরের কুন্তলীনের উপহার পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকিবে, তাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল। জীবন। শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। ১৩২৪।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের পত্র ও উক্তি ৫৪১ ও ৫৪২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

জয়ন্তী-উৎসর্গ। রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা কর্তৃক প্রকাশিত। ১১ই পৌষ ১৩৩৮।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তি-উৎসবে প্রকাশিত রচনাসংগ্রহ। ইহার প্রথম প্রবন্ধ জগদীশচন্দ্রের লিখিত 'জয়ন্তী' [*Golden Book of Tagore*-এ প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধের শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কৃত অনুবাদ]।

রজত-জয়ন্তী। ভারত সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর। (১৯১১-১৯৩৫)। সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। প্রথম সংস্করণ, জুন ১৯৩৫...।

এই প্রবন্ধসংগ্রহে জগদীশচন্দ্রর 'জড় জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ এবং প্রাণী-জগৎ' রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। [ইহা অব্যক্তে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত]।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। পাঠশালা কার্যালয়। ৩০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। গ্রন্থকারের ভূমিকার তারিখ, ৩ জানুয়ারী ১৯৩৮।

৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায়, 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসুকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্র বা মন্তব্য মুদ্রিত। ইহা মূলতঃ বাংলায় লিখিত কিনা তাহা জানিতে পারি নাই।

অসিতকুমার ঘোষ

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও জীবন -কথা ॥ গ্রন্থসূচী

বাংলা

জগদানন্দ রায়। **বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার**। অতুল লাইব্রেরি; কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ইসলামপুর, ঢাকা। 'বিজ্ঞাপনে' তারিখ, আশ্বিন ১৩১৯। পৃ. ২, ।৹, ২৪১।

সূচী ॥ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু; বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বা অদৃশ্যালোকের প্রকৃতি; বৈদ্যুতিক তরঙ্গই কি অদৃশ্যালোক উৎপাদক; আকাশ তরঙ্গ; বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সমতলীভবন। দ্বিতীয় খণ্ড : প্রাণী ও উদ্ভিদ— জড় ও জীব; উদ্ভিদের আঘাত অনুভূতি; প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা; পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন; রসশোষণ; উদ্ভিদের বৃদ্ধি; উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য; উদ্ভিদ্‌ ও আলোক; উদ্ভিদের নিদ্রা; আচার্য বসুর শেষ পুস্তক। তৃতীয় খণ্ড : জড় ও জীব— সজীব ও নির্জীব; জড় জীবের আঘাত-অনুভূতি; অবসাদ; দৃষ্টিতত্ত্ব; দৃষ্টিবিভ্রম; ফোটোগ্রাফি।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী নানা দেশে নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের ভাষায় তাহা প্রচারিত না হওয়া, বড়ই ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিয়াছে।' 'এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আচার্যবরের···কয়েকটি স্থূল তত্ত্বের' কথা লিখিত আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। **উদ্ভিদের চেতনা**। আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৩৬। পৃ. ॥৹, ৮৬।

সূচী ॥ প্রাণী ও উদ্ভিদ; গাছের চেতনা; রস-আকর্ষণ ও রস-সঞ্চালন; উদ্ভিদের আলোকতৃষ্ণা; উদ্ভিদের স্নায়ু; উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন।

ফণীন্দ্রনাথ বসু। **আচার্য জগদীশচন্দ্র**। বরদা এজেন্সি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ভাদ্র ১৩৩৮। পৃ. ২০৫।

সূচী ॥ জন্মকথা ও পিতৃপরিচয়, বিদ্যারম্ভ; ভারতে শিক্ষা; প্রথমবার বিলাত যাত্রা; সরকারি চাকরি গ্রহণ; দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা; পারিস কংগ্রেস ও বিলাত প্রবাস; বসু বিজ্ঞান মন্দির; বঙ্গসাহিত্য ও জগদীশচন্দ্র; ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন; জগদীশচন্দ্রের বন্ধুবর্গ; ঐতিহাসিক কাহিনী; বৈজ্ঞানিক গবেষণা; সপ্ততিতম জন্মোৎসব; জাতীয় সমস্যায় জগদীশচন্দ্র; প্রতিষ্ঠা; জগদীশচন্দ্রের দান।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু**। পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 'ভূমিকায়' তারিখ, ৩ জানুয়ারি ১৯৩৮। পৃ. ॥৹, ৯৬।

'আচার্যদেবের বিভিন্ন লেখা এবং তাঁহার নিকট হইতে যে সব কথা শুনিয়াছি, উহা এই পুস্তকের মালমসলা যোগাইয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহার কথা দিয়াই তাঁহার পরিচয় দিয়াছি।'— ভূমিকা।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -সংকলিত। **জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার**। বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। ১ ভাদ্র ১৩৫০। পৃ. ৪০।

পরবর্তী মুদ্রণে (কার্তিক ১৩৫১) শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর তালিকা সংযোজিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। **চিঠিপত্র** ষষ্ঠ খণ্ড। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। মে ১৯৫৭। পৃ. ॥৵০, ২৬২।

প্রধানত জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর এই সংগ্রহের পরিশিষ্টে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কবিতা, নিবন্ধ, পত্র, 'রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রশ্নোত্তর', 'জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য পত্র', এবং বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয়ে জগদীশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বহু তথ্য গ্রথিত হইয়াছে।

মনোরঞ্জন গুপ্ত। **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু**। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫ আগস্ট ১৯৫৮। পৃ. ২, ৯৪।

গ্রন্থারম্ভে সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী এবং গ্রন্থশেষে ছয়টি পরিশিষ্টে জগদীশচন্দ্রের রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সূচী এবং জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রের তালিকা মুদ্রিত।

মণি বাগচি। **বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র**। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। নবেম্বর ১৯৫৮। পৃ. ১২, ১৭৮।

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র। মূল জীবনী, শুভেন্দু ঘোষ; সম্পাদনা দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫। পৃ. ১৲, ২৫০।

প্রথম খণ্ডে জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা আলোচিত।

দ্বিতীয় খণ্ড বিভিন্ন রচনার সংকলন। যথা— 'আচার্য জগদীশচন্দ্র ও চারণকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়', দেবকুমার রায়চৌধুরী; 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; 'জগদীশচন্দ্র বসু', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; 'মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের শ্রদ্ধাঞ্জলি'; 'জগদীশচন্দ্র···প্রসঙ্গে দুই রুশ বিজ্ঞানী', এম্. রাদোভ্‌স্কি; জীবনের ঘটনার কালানুক্রমিক তালিকা; এতদ্ব্যতীত, রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ড হইতে জগদীশচন্দ্রের তিনটি প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা সংগৃহীত হইয়াছে।

শিশু ও কিশোর -পাঠ্য

অনিলচন্দ্র ঘোষ। **আচার্য জগদীশ** জীবনী ও আবিষ্কার॥ প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 'ভূমিকা'য় তারিখ, আশ্বিন ১৩৩৮। পৃ. ।।০, ১৩২।

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক হইতে বিবরণ গৃহীত।

সুধীন্দ্র রাহা। **আচার্য জগদীশচন্দ্র**। শরৎ-সাহিত্য-ভবন, ২৫ ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ১৩৫৬। পৃ. ৭২।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। **জগদীশচন্দ্র**। স্বাক্ষর, ১১বি চৌরঙ্গি টেরাস, কলিকাতা। ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬। পৃ. ।০, ৬৬। মূল্য এক টাকা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র। **আচার্য জগদীশচন্দ্র**। শিশু সাহিত্য সংঘ, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। অগ্রহায়ণ ১৩৬৩। পৃ. ৵০, ৩০।

অনাদিনাথ পাল। **আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা**। আসাম বুক ডিপো, ১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। ১৩৬৫। পৃ. ।।০, ৩৪।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য -সংকলিত। **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু**। জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশত-বার্ষিকী সমিতি, কলিকাতা। ১৯৫৮। পৃ. ২, ৪৬।

গ্রন্থকারের 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' (১৯৩৮) ও 'জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার' (১৩৫০) হইতে সংকলিত।

ইংরেজি

SIR. J. C. BOSE. Biographies of Eminent Indians Series. G. A. Natesan & Co, Madras. Pp. 47. June 1918.

পুস্তিকাটিতে পরিশেষে প্যাট্রিক গেডিস -লিখিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বিবরণ ("The Indian Temple of Science") উদ্ধৃত আছে। লেখকের নাম নাই; *Century **Review*** পত্রে ফণীন্দ্রনাথ বসু -লিখিত জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে প্রবন্ধ হইতে পুস্তিকাটির অনেক উপকরণ সংগৃহীত, এইরূপ উল্লেখ আছে।

Patrick Geddes. THE LIFE AND WORK OF JAGADIS C. BOSE. Longmans Green and Co., 39 Paternoster Row, London. 1920. Pp. XII. 260.

CHAPTERS : Childhood and Early Education ; College Days at Calcutta and in England ; Early Struggles ; First Researches in Physics—Electric Waves ; Further Physical Research and its Appreciation ; Physical Researches Continued—The Theory of Molecular Strain and its Interpretations ; Response in the Living and the Non-Living ;

Holidays and Pilgrimages ; Plant Response ; Irritability of Plants ; The Automatic Record of Growth ; Various Movements in Plants ; The Response of Plants to Wireless Stimulation ; Tropisms : The Sleep of Plants ; Psycho-Physics : Friendships and Personality ; The Dedication ; The Bose Research Institute.

বাল্যজীবন, বিশ্ববিজ্ঞান-সভায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া জগদীশচন্দ্রকে যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় তাহার ইতিহাস, সুদীর্ঘ বিজ্ঞানসাধনার বৈজ্ঞানিক তথ্যবহুল বর্ণনা, এবং পরিশেষে মানুষ জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বিবরণ দিয়া লেখক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই পুস্তক জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনার আকর-গ্রন্থ রূপে বিবেচিত।

SIR JAGADISH CHANDER BOSE. HIS LIFE, DISCOVERIES AND WRITINGS. G.A: Natesan & Co., Madras. Pp. viii, 248. September, 1921.

এই গ্রন্থের প্রথমাংশ (পৃ. ১-৪০) জগদীশচন্দ্রের জীবনী, পরবর্তী অংশে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ ও অভিভাষণাবলী বিষয়ানুক্রমে মুদ্রিত (পৃ. ৪১-২১৭)। অতঃপর মডার্ন রিভিউ পত্র (১৯১২) হইতে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-প্রবন্ধাবলী ইত্যাদির তালিকা সংকলিত (পৃ. ২১৮-২৪০)। পরিশেষে প্যাট্রিক গেডিস -লিখিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

D. M. Bose. J. C. BOSE'S PLANT PHYSIOLOGICAL INVESTIGATIONS IN RELATIONS TO MODERN BIOLOGICAL KNOWLEDGE The Bose Research Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. The Preface is dated September, 1949. Pp. 80.

TRANSACTIONS OF THE BOSE RESEARCH INSTITUTE, Vol. vii, 1947-48 হইতে পুনর্মুদ্রিত।

D. M. Bose. JAGADISH CHANDRA BOSE : A LIFE SKETCH, Bose Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. 1958. Pp. 31.

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা ও বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত।

D. M. Bose. SCIENTIFIC ACTIVITIES OF JAGADISH CHANDRA BOSE. Bose Institute, 93/1 Upper Circular Road, Calcutta. 1958. Pp. 18.

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘকালব্যাপী (১৮৯৪-১৯৩৩) বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস বর্ণিত।

Amal Home [Ed.]. ACHARYA JAGADIS CHANDRA BOSE. BIRTH CENTENARY 1858-1958. Acharya Jagadis Chandra Bose Birth Centenary Committee, 93/1 Upper. Circular Road, Calcutta. November 30, 1958. Pp. viii, 84. Price Rupees Two Only.

CONTENTS : Jagadis Chandra Bose—The Story of His Life ; To Jagadis Chandra Bose, Rabindranath Tagore ; The Voice of Life, Jagadis Chandra Bose ; Memorial Address, Rabindranath Tagore ; From Romain Rolland to Jagadis Chandra, A Letter ; The Bose Institute To-day ; Jagadis Chandra Bose—A Chronology.

গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের 'To Jagadis Chandra Bose' কবিতার (১৯০১) মূল বাংলা পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত আছে। ইহা ছাড়া জগদীশচন্দ্র বসুর কয়েকটি এবং আরও অনেকগুলি চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

EXHIBITION CATALOGUE : Acharya Jagadish Chandra Bose Birth Centenary. 1958.

জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে কয়েকদিনব্যাপী যে প্রদর্শনী হয় তাহার বস্তুসম্ভারের বিস্তৃত তালিকা ছাড়া ইহাতে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, কেল্‌ভিন, বার্নার্ড শ, লর্ড র‍্যালে প্রমুখ মনীষীদের পত্রের পাণ্ডুলিপিচিত্র ; জগদীশচন্দ্র, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির, জগদীশচন্দ্রের উদ্‌ভাবিত কয়েকটি যন্ত্রের এবং জগদীশচন্দ্র-বসু-সংগ্রহের কয়েকটি চিত্র মুদ্রিত আছে।

JAGADISH CHANDRA BIRTH CENTENARY CELEBRATION ADDRESSES AND TWENTINTH MEMORIAL LECTURE. 30th November 1958. Bose Institute, 93/1 Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta. Pp. 22.

Welcome Address, Dr. B. C. Roy ; Address, Dr. D. M. Bose ; Inaugural Address, Sri Jawaharlal Nehru ; Presidential Address, Sm. Padmaja Naidu ; Vote of Thanks, Prof. S. K. Mitra ; Acharya Jagadish Chandra Bose Memorial Lecture, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan.

Arthur James Todd. THREE WISE MEN OF THE EAST AND OTHER LECTURES. University of Minnesota Press, U.S.A. 1927. Pp. X, 240.

এই গ্রন্থটি দেখিবার সুযোগ হয় নাই। A. Arouson প্রণীত RABINDRANATH THROUGH WESTERN EYES (1943) গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইহার উল্লেখ আছে।

জগদীশ-প্রসঙ্গ-সম্বলিত ইংরেজি গ্রন্থ

T. C. Bridges and H. Hessell Tiltman. MASTER MINDS OF MODERN SCIENCE. George G. Harraps & Co, London. New Edetion 1935. Pp. 278,

ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় (পৃ. ২৮-৩৬) "Do Plants and Metals Feel ? The Amazing Experiments of Sri Jagadish Bose."

L. F. Rushbrook Williams (*Ed.*) GREAT MEN OF INDIA. The Home Library club. ***n. d.***

ইহাতে (পৃ. ৫৮৩-৮৯) ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ লিখিত "Sir Jagadish Chandra Bose and his Researches into Plant Physiology" নামে একটি প্রবন্ধ আছে।

এইরূপ আরো গ্রন্থ থাকাই সম্ভব। যে কয়টি হার আমাদের লক্ষ্যগোচর হইয়াছে তাকে উল্লেখ করা হইল।[২]

জর্মন

Patrick Geddes. LEBEN UND WERK VON SIR JAGADIS C. BOSE. Rotapfel-Verlag. Erlenbach-Zurich und Leipzig. ? Pp. 263.

প্যাট্রিক গেডিস-রচিত পূর্বোল্লিখিত ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ।

শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

২. শ্রীশোভন বসু ১৯৫৮ নভেম্বর সংখ্যা মডার্ন রিভিউতে, ঐ পত্রে (১৯০৭-৩৮) মুদ্রিত জগদীশচন্দ্র বসু-সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনায় একটি সূচী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জগদীশচন্দ্রের জীবন ও আবিষ্কার -বিষয়ক বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও জগদীশচন্দ্র

পরিষৎ-সভাপতি মহাশয় বর্তমান সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যোগের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। নিম্নমুদ্রিত সংকলনে সেই প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইল।

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য

জগদীশচন্দ্র ১৩১৮ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিপদে বৃত হন, ১৩২৩ সালে তিনি পরিষদের সভাপতিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু তাহার পূর্বেই পরিষদের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন, ১৩১০ সালে পরিষৎ-কর্তৃক বিশিষ্ট সদস্য পদে নির্বাচনের সূত্রে। প্রথমাবধি পরিষদে 'সাহিত্যকে কোনও ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই' এখানে 'আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি,' এজন্য সাহিত্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানসাধকের স্থানও পরিষদে সসম্মানে স্বীকৃত হইয়াছে; বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে, সভাপতিপদে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তন করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, পরে তিনি পরিষদের সভাপতির আসনও অলংকৃত করেন।

প্রায় দুই বৎসরকাল বিলাতে অবস্থানপূর্বক বিদেশে বিজ্ঞানীসমাজে নিজের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৩০৯ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে প্রত্যাগত হইলে দেশের শিক্ষিতসমাজে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্রকে বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্বাচিত করিয়া পরিষৎ এই আনন্দের অংশী হইয়াছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও এই বৎসর (১৩১০) পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ইহার পূর্বেই সহজ ভাষায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সহিত একাত্মতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এখন স্মৃতিমাত্র, অনুরূপ অন্যান্য সম্মিলন এখন তাহার স্থান লইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে এই বার্ষিক মিলনসভা যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তদবধি যতকাল ইহা জীবিত ছিল এই সম্মিলন দেশের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছে। ১৩১৮ সালে ময়মনসিংহে চতুর্থ অধিবেশনে এই সম্মিলনের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন জগদীশচন্দ্র। সাহিত্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানসেবকের স্থান আছে কিনা, অভিভাষণের সূচনায় এই আলোচনাপ্রসঙ্গে সাহিত্যের একটি উদারমূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিবার কথা যে তিনি বলিয়াছিলেন, পরিষদের পক্ষে এখনও তাহা স্মরণ করিবার আবশ্যকতা আছে—

"এই সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্বত্র

গভীরভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দর অলঙ্কার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

"পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদপ্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

"অপর দিকে, বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এক-কে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।

"আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতঃই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সঙ্কীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছ।

"ফলতঃ জ্ঞান-অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে-কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাঁহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।"

কবি ও বিজ্ঞানীর যোগের বিষয় তিনি এই অভিভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য—

"কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার

ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।…

"বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না। এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

"বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

"কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন।"

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মনে পড়ে, এই যুগেই বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ কবি ও বিজ্ঞানীর যে যোগ হইয়াছিল তাহার কথা— সমগ্র দেশ তাহার ফলভাক্ হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র স্বয়ংও কবি-মনীষী, 'আদি কবির প্রতিচ্ছবি'[১] বলিয়া অভ্যর্থিত হইয়াছেন দেশে-বিদেশে; তিনি বিজ্ঞানকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহারও মূলকথা বর্ণিত হইয়াছে এই অভিভাষণে—

"এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন, মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদ্‌কে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে

১. দ্রষ্টব্য, পরবর্তী প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষদে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত -কৃত 'আচার্য্য-প্রশস্তি'

এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।"

বিজ্ঞান-সাহিত্যের আলোচনা ও সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন সাহিত্য-পরিষদের 'উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়' বলিয়া প্রথমাবধিই স্বীকৃত; ময়মনসিংহ অধিবেশনের পর হইতে সাহিত্য-সম্মিলনের একটি 'বৈজ্ঞানিক বৈঠক' বা বিজ্ঞান-শাখাও গঠিত হয়।

পরিষদের সভাপতি

১৩২৩ সালের ১৪ শ্রাবণ দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে, 'নবীন ও প্রবীণ' উভয় দলের শ্রদ্ধাভাজন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সভাপতিপদে বৃত হন। প্রথম মাসিক অধিবেশনে (৪ ভাদ্র ১৩২৩) উপস্থিত হইয়া তিনি পরিষদের উন্নতিকল্পে যে-সকল প্রস্তাব করেন, কার্যবিবরণীতে তাহার আভাস আছে—

"প্রথমে তিনটি বিষয়ে এই সভার উন্নতি করিতে আমি ইচ্ছা করি। একটা বিষয় আজ বলিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, অল্পদিনে সাহিত্য-পরিষৎ উচ্চস্থান অধিকার করিবে। ফরাসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, পরিষদকে তাহার তুল্য করিতে হইবে। সেখানকার নানা ছবি ও নানা দুর্লভ পুস্তক এমন সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান আছে যে, সেখানে প্রবেশ করিলে লোকমাত্রেরই কেমন একটা তন্ময়ভাব আসে—Academy-র সৌন্দর্য্যে ও মহত্ত্বে যেন মন মুগ্ধ হয়। পরিষৎ-গৃহে আসিলে যেন সেইরূপ ভাব আসে, সেইরূপ ভাবে পরিষৎকে গড়ে তুলতে হবে। অনেক অমূল্য জিনিষ এখানে আছে, বহু বড়লোকের হাতের লেখা, রামমোহন রায়ের পাগড়ি, বঙ্কিমের কলম ইত্যাদি অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহার সুবিন্যাস নাই। এখন পরিষৎকে এমন করিতে হইবে যে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে যে, ইহা একটি মস্ত কীর্ত্তি।...পরিষদের সমস্ত সদস্যদের চিঠি লিখে জানাতে হবে যে, প্রত্যেকে এক এক বন্ধুকে দিয়ে পরিষদের এক এক সেট বই কিনিয়ে দেন।...এই সমস্ত বিষয় কার্য্যে আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। জানুয়ারী মাসের মধ্যে এ কাজটা সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি নিজে ১০০৲ দিতে প্রস্তুত আছি।"

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (৪ পৌষ ১৩২৩) সভাপতিরূপে জগদীশচন্দ্র বলেন—

"এই সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির যাহাতে কেবল নামে মাত্র পর্য্যবসিত না হয়, দেশবাসীর

নিকট যাহাতে নামে ও কর্ম্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেইরূপ ইচ্ছা করি। আমি ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রথায় সাজাইব ইচ্ছা করিয়াছি।...এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমিকে বড় করিতে হইবে।..."

কেবল যে পরিষদের শিল্পসৌন্দর্যবিধানের দিকে জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তাঁহার কার্যকালে (১৩২৩-২৫) তিনি ইহার বৈষয়িক উন্নতিসাধন, কর্মীদের মধ্যে মতদ্বৈধের দূরীকরণ, সর্বোপরি, পরিষদের মূল উদ্দেশ্য 'সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন,' এ-সকল বিষয়েই উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন এবং সে উদ্‌যোগ বহুলপরিমাণে ফলপ্রসূও হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ (৫ চৈত্র ১৩২৪)[২] এবং পরিষদের কার্যবিবরণ হইতে তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ সংকলিত হইল—

"...স্থির করিলাম, সাহিত্য-পরিষদের জন্য যথাসাধ্য কার্য্য করিব এবং ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইব। যে মুমূর্ষু, সে-ই মৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে, যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্ত্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার পথে যে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে; তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্রীভূত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

"সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই পরিষদের কতকগুলি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি দেখি, স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে যে ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিশোধের বিশেষ উপায় দেখা যাইতেছে না। অনেক অমূল্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে এমন পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে, যাহা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে। মনে হইল, কেবল সাহিত্যচর্চ্চা করিতে যাইয়া বর্ত্তমান জীবন্ত সাহিত্যের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। সভ্যদিগের নিকট অনেক টাকা অনাদায় হইয়া রহিয়াছে। পরিষদের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশি, দেখি, পুস্তকাগারের কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই; পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রাশি রাশি অবিক্রীত পুস্তক পরিষদভবনে এরূপ স্তূপীকৃত হইতেছে যে, তথায় মনুষ্যের চলাচল দুর্গম হইবে। অমূল্য শিলালিপি, তৈলচিত্র, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে, যাহাতে প্রবেশমাত্র দর্শকের মনে এই মন্দিরের বিশালত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদন করে।...

---

২. ইহা সংক্ষিপ্ত আকারে "নবীন ও প্রবীণ" নামে 'অব্যক্ত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহাতে বৈষয়িক ও একান্ত সাময়িক প্রসঙ্গ বর্জিত। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনবোধে মূল প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ উদ্‌ধৃত হইল।

*স্থায়ী ভাণ্ডার

" ·শুনিয়া সুখী হইবেন যে, এত অনটন সত্ত্বেও গত দুই বৎসর পুস্তকাদি প্রকাশ বা গৃহসংস্কারাদি কোন কারণেই স্থায়ী ভাণ্ডারের ঋণ বৃদ্ধি হয় নাই। বরং এই দুই বৎসরে আমরা দেড় হাজার টাকা ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হইয়াছি।···

*গৃহ-সংস্কার

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অবিক্রীত পুস্তক-স্তূপ জঞ্জালপ্রায় হইয়া পরিষৎ-ভবনে চলাফেরার পথ বন্ধ করিয়াছিল। আরও বহু বিশৃঙ্খলা ছিল, সে সব দূর না করিলে পরিষদের বিকাশ অসম্ভব হইত। নূতন আলমারী, বক্তৃতাগৃহে বসিবার আসন, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আরম্ভ করিতেই অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। এতদর্থে আমাদের অবিক্রীত পুস্তকরাশি গ্রন্থাবলীর সেট করিয়া স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্থানাভাব দূর হইয়াছে এবং আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের অধিক প্রচার হইয়াছে। ১৩০৭ হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে গড়ে ১০০৲ টাকার পুস্তক বিক্রী হইত। তাহার পর ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত গড়ে ৮০০৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসরে পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা ৩৫০০৲ টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের চতুর্গুণ মূল্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ভবিষ্যতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ১৭০০৲ টাকা রাখিয়া মন্দিরের সৌষ্ঠবের জন্য ১৮০০৲ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।··

"এখন মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িতেছে, তাহা আপনারা দেখিতেছেন। তৈলচিত্র, প্রাচীন শিলা ও মুদ্রা যথাযথ প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকাগার সুসজ্জিত হইয়াছে। পুস্তকতালিকা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে। পড়িবার স্থান প্রশস্ত হইয়াছে এবং মৌলিক গবেষণার জন্য দুইটি ক্ষুদ্র কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

*পরিষদ্-গৃহে বক্তৃতা

"যে সব বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলাম, তাহা কার্য্য করিবার উপলক্ষ্য মাত্র। সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদর্থে প্রতিভাশালী মনীষিদিগের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

*"বসু-মহাশয় স্বয়ং এবং তাঁহার আহ্বানে শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, চুনীলাল বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকে পরিষদ্-মন্দিরে লোকরঞ্জক

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পরিষৎ-পরিচয়," প্রথম সংস্করণ। এই সংকলনে ব্যবহৃত অন্যান্য কতকগুলি তারিখও 'পরিষৎ-পরিচয়' হইতে গৃহীত।

বক্তৃতা দান করেন।" জগদীশচন্দ্র ১৩২৪ সালের ৭ চৈত্র "আহত উদ্ভিদ্" সম্বন্ধে ও ১৩২৭ সালের ১৯ চৈত্র "স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ"[৪] সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভাপতির অভিভাষণে জগদীশচন্দ্র পরিষদে নবীন-প্রবীণে দলাদলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন দেশের সকল প্রতিষ্ঠানপ্রসঙ্গেই তাহার স্থায়ী মূল্য আছে, তাহা বিস্তারিত উদ্‌ধৃত হইল —

"দলাদলি

"জীবনের বহু বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানা দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে হয় শুধু করতালি দেন, না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম্ম শুধু কর্ত্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন এক দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দামভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বহ্নি উদ্ভূত হয় তাহা অনুষ্ঠানটিকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরূক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই কারণে সাহিত্য-পরিষদে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয় সেজন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি।[৫] প্রতিষ্ঠিত কোন সাহিত্য-সমিতিকে খর্ব্ব করিয়া নিজেরা বড় হইবার প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি। সাধারণ সদস্যদিগের উদ্যমের উপর পরিষদের ভাবী মঙ্গল যে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, এ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে লিখিয়াছিলাম—'পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ্য মাত্র।' আরও লিখিয়াছিলাম যে, 'সদস্যগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্ত্তব্যশীল সভ্য নির্ব্বাচিত করেন তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শৈথিল্যই

৪. বক্তৃতা দুইটি 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

৫. "আমাদের সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। এই সকল মতভেদ দূর হইয়া, যাহাতে সদস্যদের মধ্যে কোন প্রকার অপ্রীতি না থাকে তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি উভয় পক্ষের মতামত গ্রহণ করিয়া, নিজ মন্তব্য সহ কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন।"—চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

ভবিষ্যৎ দুর্গতির কারণ হইবে।' এই সহজ পথ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অবলম্বিত উপায় কি শ্রেয় হইবে? তথায় প্রতিযোগিতারই পূর্ণ প্রকাশ। সহযোগিতা কি আমাদের সাধনা নয়? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পক্ষ ও বিপক্ষের ভেদ প্রবল হইয়া উঠে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করে ও কুৎসা রটায়, অন্য পক্ষও জবাবে এক কাঠি উপরে উঠেন। ইহার শেষ কোথায়? যে চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বিকশিত হয় তাহা কি এইরূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে?

"নবীন ও প্রবীণ

"নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। তবে তাহাই বিসম্বাদের প্রধান কারণ নহে। ব্যক্তিবিশেষের আত্মম্ভরিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ; ইহা প্রবীণ বা নবীন কাহারও নিজস্ব নহে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত। যদিও বার্দ্ধক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে, মন ত তাহার অনেক উপরে, সে ত চিরনবীন! মন কেন সাহস হারাইবে? অন্য দিকে নবীন, অভিজ্ঞতা অভাবে হয়ত অতি দ্রুত চলিতে চাহেন এবং বাধার কথা ভাবিয়া দেখেন না। যাহারা বহুকাল ধরিয়া কোন অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান। হয়ত কখনও প্রবীণের বহু কষ্টে অর্জ্জিত ধন নবীন বিনা দ্বিধায় নিজস্ব করিতে চাহেন। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়। প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এতদিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। যে দেশে আমাদের সামাজিক জীবনে নবীন ও প্রবীণের কার্য্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, সে স্থানেও কি একথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে?"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণের উপসংহারে জগদীশচন্দ্র পরিষদের বিষয়ে যে আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার যে রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া এই সংকলন সমাপ্ত করি— এই আশা যতদূর পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই রূপ যতদূর প্রকাশমান হইবে তাহার উপরেই পরিষদের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে—

"[দাক্ষিণাত্যে] গুহামন্দিরে [বিশ্বকর্ম্মার] যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্ম্মা বাঙ্গালী চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

"...আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে

পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

"সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। আন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষদ সাধকদের সম্মুখে দেব-মন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

আচার্য্য-প্রশস্তি

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যখন স্বদেশে ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তখন যে সকল ছাত্র তাঁহার পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের ক খ শিখিয়াছিল, আমি তাহাদের অন্যতম। অতএব তাঁহার সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে[১] কিছু বলিতে সংকোচ বোধ করিতেছি। বিজ্ঞানক্ষেত্রে আচার্য্য মহাশয় যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যে জন্য ভারতবাসীর নাম জগতে এখন ঘোষিত হইতেছে, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিতেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা করিয়া facts সংগ্রহ করেন, সজ্জিত করেন, ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই সকল facts ও ব্যাপার হইতে অদ্ভুত মনীষাবলে সত্যের আবিষ্কার করেন, নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্‌কে যদি বৈজ্ঞানিক বলা হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে প্রাজ্ঞানিক বলা উচিত। বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহারা তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করেন। এই প্রজ্ঞানকে পাশ্চাত্যগণ scientific imagination আখ্যা দিয়াছেন।

জড়ের যে জীবন আছে, উদ্ভিদের যে প্রাণন আছে, উভয়ের যে ক্লান্তি স্ফূর্ত্তি আছে, উভয়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তি ক্রীড়া করিতেছে, আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে একথা অনেকস্থলে উল্লিখিত দেখা যায়। অতএব এ সকল কথা আমরা অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কানে শুনা আর চক্ষে দেখায় অনেক অন্তর। আমরা যে সকল কথা কানে মাত্র শুনিয়াছিলাম, আচার্য্য মহাশয় তাহা আমাদিগকে চক্ষে দেখাইয়াছেন। এখন আমরা এই সকল প্রাচীন উপদেশের সারবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক জন পাশ্চাত্য লেখক তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক যাদুকর আখ্যা দিয়াছেন। এ-নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

এ দেশে যাঁহারা সত্য দর্শন করিতেন, তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহাদিগের প্রাচীন নাম ছিল কবি। যিনি বৈদিক সত্যের আদি স্রষ্টা, প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহাকে আদি কবি বলে—

তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সেই আদি কবির প্রতিচ্ছবি। তিনিও তত্ত্বদ্রষ্টা, সত্যের আবিষ্কর্ত্তা। অতএব তাঁহার সমক্ষে আমাদের শির আপনি প্রণত হইতেছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।[২]

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

---

১. ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানীসমাজে স্বীয় আবিষ্কার প্রচারান্তে জগদীশচন্দ্রের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা (১৫ শ্রাবণ ১৩১২)। "উত্তরে তিনি [জগদীশচন্দ্র] বলেন যে, বিদেশে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন তাহা তাঁহার দেশেরই প্রাপ্য।"

২. ১৩২২ ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত।

স্বরলিপি

শ্রীধর কথক ১২২৩ সালে হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গানেও সংস্কৃতিসম্পন্ন সুমার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানতঃ কথকতায় খ্যাতিলাভ করিলেও তিনি সংগীতে বিশেষ করিয়া টপ্পায় পারদর্শী ছিলেন। বিবিধ সংগ্রহপুস্তকে তাঁহার অনেক রচনা রক্ষিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার রচিত গানগুলি একটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন— সেই খাতা হইতে সংগৃহীত বহু গান "বাঙ্গালীর গান" নামক সংকলনগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নিম্নে যে গানটির স্বরলিপি প্রদত্ত হইল তাহার সুর কয়েকটি সংকলন গ্রন্থে ঝিঁঝিট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "বাঙ্গালীর গান"-এ সুর দেওয়া আছে "সিন্ধু-পিলু"। প্রবীণ গায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক মূল সুরটি "দেশ-খাম্বাজ" জাতীয় বলিয়া মনে করেন। তাল-"আড়াঠেকা" সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। —শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

দেশ খাম্বাজ। আড়াঠেকা

কেন যাবে তারে মন দিতে বলে গো
নয়ন আমার
নিবারণ করি যদি অমনি ভাসে নয়ন জলে গো।
মন নয় মনেরি মত
নয়নেরি অনুগত
বুঝায়ে রাখিব কত নানা পথে চলে গো॥

সুর সংগ্রাহক : শ্রীকালীপদ পাঠক　　স্বরলিপি : শ্রীরাজ্যেশ্বর

গা গা গা মা II { গমা -পধা -ণা পা । মজ্ঞা রা মা পা ।
কে ন যা রে তা০ ০০ ০ রে ম০ ন দি তে

না না র্সা -া । -া -া -া -া ॥ I
ব লে গো ০ ০ ০ ০ ০

(ধা ণা -ধণা ‿ -পা । -া -া -া পা ।
ন য় ০০ ন্ ০ ০ ০ আ

পধণা -পধা -র্সা -া । ণা ধপা গা মা)} I
মা০০ ০০ ০ র্ কে ন০ যা রে

না না নর্রা -র্সনধা । না র্সা না র্সা ।
নি বা র০ ০০ণ ক রি য দি

	গা	মা	পা	না	।	না	র্সা	-না	-র্সা	I
	অম্	নি	ভা	সে		ন	য়	॰	ন্	
	ধা	র্সা	-ণা	ধপা	।	পা	পা	-পা	পা	।
	জ	লে	গো	॰ ॰		ন	য়	ন্	আ	
	পধণা	-পধা	-র্সা	-া	।	ণা	ধপা	গা	মা	II
	মা॰॰	॰ ॰	॰	র্		"কে	ন ॰	যা	রে"	
II	না	-া	নর্া	-র্সনধা	।	-া	না	না	র্সা	।
	ম	ন্	ন ॰	॰ ॰ য়্		॰	ম	নে	রি	
	না	র্সা	-া	-া	।	পা	না	না	না	I
	ম	ত্ত	॰	॰		ন	য়	নে	রি	
	র্সা	র্সর র্সা	-না	-র্সা	।	ধর্সা	ণা	-া	-া	।
	অ	ন্তু ॰॰	॰	॰		গ॰	ত্ত	॰	॰	
	-ধণা	-ধপা	-মধা	-মণা	।	-ধা	-পা	-া	-া	I
	॰ ॰	॰ ॰	॰ ॰	॰ ॰		॰	॰	॰	॰	
	মা	পা	মপধা	ধপা	।	মা	মগা	-রমা	-মগা	।
	বু	ঝা	য়ে॰॰	রা		খি	ব ॰	॰ ॰	॰ ॰	
	-রা	ন্া	সা	-া	।	পা	না	না	র্সা	I
	॰	ক	ত্ত	॰		না	না	প	থে	
	ধা	র্সা	ণা	-ধপা	।	পা	পা	-পা	পা	।
	চ	লে	গো	॰ ॰		ন	য়	ন্	আ	
	পধণা	-পধা	-র্সা	-া	।	ণা	ধপা	গা	মা	II II
	মা॰॰	॰॰	॰	র্		"কে	ন॰	যা	রে"	

শ্রী গিরীন্দ্রমোহিনী-

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
১৩৬৫

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি—আদিকাণ্ড

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির মধ্য হইতে কৃত্তিবাসের মূল রচনা উদ্ধার করিবার চেষ্টা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ১৩০৭ ও ১৩১০ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রাচীন পুথি অবলম্বনে স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় অযোধ্যা ও উত্তর কাণ্ডের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরিষদ্ বা দত্ত মহাশয় তাঁহাদের প্রারব্ধ কার্যে আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। মনে হয়, সন্তোষজনক উপকরণের অভাবই তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিল।

কৃত্তিবাসের সমসাময়িক বা অল্প পরবর্তী কালে লিখিত পুথি পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের হস্তলিখিত কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত যে অজস্র পুথি পাওয়া যায়, সেগুলি নানা সময়ের নানা রচনায় ভারাক্রান্ত ও বিকৃতিপূর্ণ— তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিল অপেক্ষা অমিলের পরিমাণ বেশি। এই অবস্থায় দত্ত মহাশয়ের পরে অনেক দিন যাবৎ আর কেহ কৃত্তিবাসের আসল রচনা উদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার পূর্বে ও পরে রামায়ণের অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য। তবে তাহাদের অধিকাংশই যথেচ্ছ পরিবর্তনাদি সহ একে অপরের পুনর্মুদ্রণ মাত্র— কোথাও কোন নূতন উপকরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে তাহার সম্যক্ পরিচয় জানিবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে সংস্করণগুলি সহজলভ্য না হওয়ায় তাহাদের তুলনামূলক আলোচনা বা পুথির সহিত পাঠ মিলাইয়া দেখা দুঃসাধ্য। এত অসুবিধা সত্ত্বেও নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় আর একবার কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৩৪৩ সালে তাঁহার সম্পাদিত রামায়ণের আদিকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণের ভূমিকা হইতে জানা যায়— ভট্টশালী মহাশয় সুন্দরকাণ্ডের সম্পাদন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরকাণ্ডের সম্পাদনকার্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। এইগুলি এখন কি ভাবে আছে জানি না— ইহাদের কার্য কতটা উদ্দেশ্যের অনুকূল হইয়াছিল, তাহাও বলিবার উপায় নাই। তবে আদিকাণ্ডের কার্য পণ্ডিতসমাজকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। ভট্টশালী মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রন্থসম্পাদনে তিনি যে মূল নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ঠিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মতে—'যে কৃত্তিবাসী পুথির বিষয়বিন্যাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা মূল রামায়ণের অনুগত, তাহাই কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণের খাঁটি পাঠ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।' (পৃ. ৩৮/০)। কারণ, 'কৃত্তিবাস মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন— রাজা যখন তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা

করিতে আদেশ দিলেন, তখন মূলতঃ তিনি বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।' (পৃ. ॥৶০)। অন্য সুদৃঢ় প্রমাণের অভাবে এ যুক্তি মানিয়া লওয়া কঠিন। পাঠসংগঠনের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবলম্বিত নীতি সকল ক্ষেত্রে সন্তোষজনক মনে হয় না। বন্দনা-পয়ারসমূহের স্থলে তিনি একখানি পুথির পাঠকে মানিয়া নিয়াছেন। কারণ, আলোচিত অন্যান্য পুথির মধ্যে কোন কোনটির বন্দনা 'নিতান্তই গায়েনের বন্দনা'— কোনটির বন্দনা 'নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও কুরচিত।' গৃহীত পাঠ সম্পাদকের মতে 'গ্রহণযোগ্য এবং সম্ভবতঃ উহা কৃত্তিবাসরচিত।' (ভূমিকা, পৃ. ৩॥৶০)। প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনে এই জাতীয় যুক্তি সমর্থনযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। ভট্টশালী মহাশয় যে সমস্ত পুথি মিলাইয়া গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মিলের তুলনায় অমিলও বড় কম নয়। এই অমিল অংশগুলিও তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ফলে পাঠভেদের এই গভীর অরণ্যের মধ্য হইতে আসল কৃত্তিবাসকে বাহির করা দুঃসাধ্য। তথাপি ভট্টশালী মহাশয়ের এই পরিশ্রম নিষ্ফল নহে। তাঁহার পূর্বে রামায়ণের পুথির এরূপ বিশ্লেষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আর কেহ করেন নাই। এ পর্যন্ত পুথির যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। রামায়ণের পুথিগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে কৃত্তিবাসের মূল রচনা উদ্ধার করা কতটা সম্ভবপর বুঝা যাইতে পারে— হয়ত বা উদ্ধারের একটা সূত্র মিলিতে পারে। পুথি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ নামে কি বস্তু আমরা পাইতেছি। কৃত্তিবাস বা অন্য যে-কোন কবির রচনাই ইহাদের মধ্যে রক্ষিত হউক না কেন, নানা দিক্ হইতে—বিশেষ করিয়া কাহিনীর বিচিত্র রূপান্তরের দিক্ হইতে—ইহাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে। ইহা মনে করিয়া আমি কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালাস্থিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথিগুলির আলোচনা আরম্ভ করি। ফলে, কিছু কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সুধীসমাজের বিচার-বিবেচনার জন্য সেগুলি এখানে উপস্থাপিত করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে, পুথিগুলির তুলনামূলক পরিচয় ও ইহাদের বিষয়বস্তুর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

আদিকাণ্ডের অনেকগুলি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত, কতকগুলি বিস্তৃত,[১] কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ বা পালার পুথি। গ্রন্থের যে-কোনও অংশ স্বতন্ত্রভাবে পুথির আকারে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত হইবার কারণ বুঝা যায় না। ১৪২১ সংখ্যক পুথিখানি ক্ষুদ্র হইলেও আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ পুথির বিবরণে ইহা সম্পূর্ণ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ রাম-লক্ষ্মণের মিথিলায়

১. কৃত্তিবাসের রামায়ণের এই দুইটি রূপের সন্ধান অন্যান্য পুথিশালার পুথিগুলির মধ্যেও পাওয়া যাইতে পারে মনে হয়। পুথির সামান্য বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কোন পুথি ক্ষুদ্র, কোনখানি বৃহৎ। ইহাদের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক বিশ্লেষণ আবশ্যক।

গমন, বিবাহের প্রস্তাব ও হরধনুর্ভঙ্গ— এই অংশটুকু মাত্র ইহাতে আছে। ৪৮৩১ সংখ্যক পুথিখানির আরম্ভ মারীচের পলায়নের পর রামের বিবাহের প্রস্তাব হইতে। ৩৮৫১ পুথিতে রামসীতার বিবাহব্যবস্থা, বিবাহানুষ্ঠান ও বাসরবর্ণনা অংশমাত্র আছে। ১৭ সংখ্যক পুথির আরম্ভ ভগীরথের গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ লইয়া। অথচ এই পুথিগুলির একখানিও খণ্ডিত নয়— পত্রাঙ্ক এক হইতে আরম্ভ করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে শেষ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ৩৬৫২, ৬৬০২ সংখ্যক পুথিতে আদিকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়—যদিও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে মিল খুব বেশি নাই। প্রথম পুথিখানি ভট্টশালী মহাশয়ের সংস্করণে 'ঝ' পুথি নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহার বিষয়বস্তু ঐ সংস্করণের অনুরূপ। ইহা ১-৪০ পত্রে সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় পুথিখানিতে আদিকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ডে সীতার অগ্নিপরীক্ষা অংশ পর্যন্ত আছে। ইহাতে আদিকাণ্ড ৫৩ পত্রে সম্পূর্ণ। পুথিখানিতে একটি বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পুথির পংক্তিগুলির মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে লেখক বা মালিকের নাম লিখিত হইয়াছে। এরূপ সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্ননির্দিষ্ট নামগুলি লক্ষণীয়— গঙ্গাচন্দ্র গুহ (৩ক, ১০ক, ১৩খ, ২০খ, ৬৬খ, ৭০খ, ৭৩খ, ৮০খ, ৮২খ, ১১৬খ, ১১৮খ, ১২৬খ, ১৩০খ, ১৩১খ, ১৩২খ, ১৩৪খ, ১৩৫খ প্রভৃতি), শ্রীরামরুদ্র (১০ক), কালীকান্ত (১৬খ), রামকান্ত সেন (৩১ক), কৃষ্ণচন্দ্র সেন (৩৫খ), গুরুপ্রসাদ বসোস্য (৫৩খ), কৃষ্ণদাস দাস (৬৯খ) রামমাণিক্য দে (৭২খ), জগচ্চন্দ্র দাস (৭৭খ, ১৯৮খ), ভৈরবনাথ (৭৭ক, ৯৬খ, ৯৭খ, ১০০খ), নিলমণি শর্মণঃ সাং রামপুর (৮৪খ), রামকমল দত্ত (৮৫খ), ভৈরবনাথ সেন (৮৮খ), রামকমল (৯২খ), ভৈরবনারায়ণ (১০৩খ), রামকানাই…দাষস্য (১৫৮খ)। ইহাদের মধ্যে গঙ্গাচন্দ্র সম্পন্ন লোক ছিলেন। তাহাকে মাঝে মাঝে রাজা বলা হইয়াছে (২০খ, ৫৬খ)। তাঁহার বাড়ী ছিল গোবিন্দীয়া, মহয়তপুর (৮২খ, ১১৬খ, ১২৬খ, ২০৩খ)। ১০ক পত্রে রামরুদ্র ও গঙ্গাচন্দ্রের নাম একত্র উল্লিখিত হইয়াছে— শ্রীরামরুদ্রস্য পূর্বা কীর্তি ইদানীং শ্রীগঙ্গাচন্দ্র গুহস্য।

এই পুথির মতে বাল্মীকি নর্মদানদীর কূলে তপস্যা করিতে যান (৪খ)—লোমপাদ বঙ্গদেশের রাজা (২৩খ)। ইহাতে সূর্যবংশের বংশলতিকা বর্ণন প্রসঙ্গে রামায়ণের প্রতি কাণ্ডের সার বর্ণনা করা হইয়াছে (৬খ-১২খ)। এই প্রসঙ্গে রামায়ণকে মহাপুরাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (ইতি রামায়ণে মহাপুরাণে আদিকাণ্ডের বংশাবলী সম্পূর্ণ—১২খ)। পুত্রলাভার্থে দশরথের করণীয় যজ্ঞে কামধেনুর দুগ্ধের প্রয়োজন হয়। কামধেনুর জন্য তাই দশরথের ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় (২৭খ)। কামধেনুর দুগ্ধের ঘৃত দ্বারা হোম করিতে অগ্নি উথলিয়া উঠে (ঘৃত হুনিতে[১] যেন উথলে অগ্নি—৩০খ)। ইহাতে রামচন্দ্র-নাবিক-সংবাদ নাই, শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের মাহাত্ম্যবর্ণনা নাই। রাম প্রভৃতির জন্ম ও বাল্যলীলা প্রভৃতি ইহাতে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১. এইরূপ শব্দ অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে :

ঘৃত হুনিবেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি (২৭খ)।

৩, ৪, ১৩, ১৭, ২৫৫, ৩৮৫১, ৪৮৩১ সংখ্যক পুথির মধ্যে বিস্তৃততর কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। কাহিনী ছাড়া ইহাদের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। কোন কোন পুথিতে কৃত্তিবাসের জন্মদিন যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবেই এই সমস্ত পুথিতে বিভিন্ন রাজাদের জন্মদিনও উল্লিখিত হইয়াছে, কোথাও কোথাও কৃত্তিবাসের জন্মদিনের সহিত এই দিনগুলি একেবারে মিলিয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে—

আদিত্যবার পঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাসে।
পুত্র প্রসবিল কন্যা রাত্রি অবশেষে॥
ত্রিশঙ্খের পুত্র রুক্মাঙ্গদের জন্ম (৩।৪৮ক)

আদিত্যবার পঞ্চমী পুণ্যাহ মাঘ মাসে।
পুত্র প্রসবিল রাণী রাত্রি অবশেষে॥
রুক্মাঙ্গদের জন্ম (১৩।৪৩ক)

মাঘ মাস শুক্লপক্ষের পঞ্চমী।
রাত্রিকালে প্রসব হইল মুনির নন্দিনী॥
রত্নাকরের জন্ম (১৩।৩ক)

আদিত্যবার পঞ্চমী পুণ্যাহ মাঘ মাসে।
প্রসবিল পুত্র রাণী জন্ম বিষ্ণু অংশে॥
দশরথের জন্ম (১৩।৭৭খ)

পঞ্চমী তিথি পুণ্যাহ মাঘ মাসে।
পুত্র প্রসবিল রাণী বাত্রি অবশেষে॥
দিলীপের জন্ম (১৩।৭০ক)

শ্রীপঞ্চমী তিথি পুণ্য মাঘ মাসে।
প্রসবিলা রাজরাণী রাত্রি অবশেষে॥
দিলীপের জন্ম (১৭।১৫খ)

আদিত্যবার পুণ্যমাসি পুণ্য মাঘ মাস।
প্রসব হইলা রাণি রাত্রি অবশেষে॥
অজ্যারম্ভের পুত্র ভারতের জন্ম (৩।৩৩ক)

পুণ্যতিথি একাদশী বৈশাখ মাসে।
প্রসব হইল পুত্র জন্ম বিষ্ণুর অংশে॥
ভগীরথের জন্ম (৩।৬৭ক)

আদিত্যবার পৌর্ণমাসী প্রথম মাসে।
প্রসবিল রাজরাণী রাত্রি অবশেষে॥
ভরতের জন্ম (১৩।২৭ক)

কতকগুলি বার ও তিথি বিশেষ পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। সেইগুলিকেই কবিগণ

তাঁহাদের কাব্যের নায়ক নায়িকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন মনে হয়। কৃত্তিবাসের জন্মতিথিও এই ভাবেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীতে উল্লিখিত জন্মদিন লইয়া গবেষণা করিবার অবকাশ থাকে না। তাঁহার অসামান্য জনপ্রিয়তা তাঁহার জীবনকে রহস্যাবৃত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার 'অদ্ভুত পাঁচালি গীত' ও 'অদ্ভুত কবিত্ব' লোককে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে কল্পনার জাল বুনিতে উৎসাহিত করিয়াছে। একজন তাঁহার পিতার নাম দিয়াছেন বিদ্যানন্দ ওঝা—

কীর্ত্তিবাসে বন্দম মুররি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে নিত্য বৈসে দেবী সরস্বতী॥
কীর্ত্তিবাসের পিতা বৈসে বিদ্যানন্দ ওঝা।
মান্যের ভিতরে মান্য সম্বন্ধে হএ আজ্ঞা॥ (১৬০২।২ক)

আর একজন কৃত্তিবাসকে সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন এবং গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার রত্নলাভের উল্লেখ করিয়াছেন—

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের সকল গোচর।
নানা রত্ন দিয়া যাকে পূজিল গৌড়েশ্বর॥ (২৫৫।১৬৭ক)

তাঁহার অসাধারণ খ্যাতিই পুথিতে নিয়মিত ভাবে তাঁহাকে কীর্ত্তিবাসরূপে অভিহিত করিবার কারণ, না উহাই তাঁহার আসল নাম ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই।

উল্লিখিত পুথিগুলির কাহিনীগত এবং মধ্যে মধ্যে পাঠগত মিল লক্ষণীয়। হুবহু মিল না থাকিলেও কিছু কিছু মিল এখানে ওখানে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাহা হইতে একটা মূল পাঠ গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নয়। তথাপি ইহাদের তুলনামূলক আলোচনার ফলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে প্রচলিত গ্রন্থের একটি রূপের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাইবে। পুথিগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, অন্ততঃ দুই শত সওয়া দুই শত বৎসর পূর্বে এই রূপটি বাংলার অংশবিশেষে প্রচলিত ছিল। পুথিগুলির বেশির ভাগই বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত। কয়েকখানিতে নকলের তারিখ পাওয়া যায়। তারিখগুলি মল্লাব্দ অনুসারে দেওয়া হইয়া থাকিতে পারে। ২৫৫ পুথির দুই রকম তারিখ মিলাইলে প্রথমটি মল্লাব্দের স্পষ্ট বুঝা যায়।

৪নং পুথিখানির তারিখ	১১৬৪ সাল ২৬শে আষাঢ়।
১৭নং পুথির তারিখ	১২৪০ সাল ১৩ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।
২৫৫নং পুথির তারিখ	১০৫৪ সাল, ১৬৭১ শকাব্দ।
৩৮৫১নং পুথির তারিখ	১০৮২ সাল ৬ ফাল্গুন রোজ সোমবার তিথি সপ্তমী।

১৩নং পুথিখানি ১-১৪০ পত্রে সম্পূর্ণ; ৪নং পুথি মাঝে মাঝে খণ্ডিত হইলেও প্রায় সম্পূর্ণ; ১৭নং পুথি আপাতদৃষ্টিতে ১ হইতে ১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইলেও ইহাতে প্রারম্ভের কিছু অংশ নাই—ভগীরথের গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ হইতে ইহার সূচনা; ২৫৫ সংখ্যক পুথিখানি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ। তবে ইহার গোড়ার অর্ধাংশের বেশি ও মাঝে মাঝে কিছু কিছু অংশ নাই। আদ্যন্তহীন ৩নং পুথির সঙ্গে ১৩নং পুথির মাঝে মাঝে মিল

দেখা যায়। ৩৮৭১ ও ৪৮৩১ পুথিতে এই বিস্তৃত কাহিনীর সামান্য অংশ মাত্র রক্ষিত হইয়াছে। প্রথমখানিতে মারীচের পলায়নের পর রামের বিবাহের প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত আছে— দ্বিতীয়খানিতে রামসীতার বিবাহ প্রসঙ্গ ও রামের বাসর বর্ণনা মাত্র আছে।

ইহাদের মধ্যে কোন কোন পুথিতে কেবল কৃত্তিবাসের ভণিতা পাওয়া যায়— কোথাও বা অন্য কবির ভণিতাও মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনন্তদাস (২৫৫।২৩১খ, ৪।৭২খ, ৮০খ), লক্ষ্মণদাস (২৫৫।২৩৬খ), দ্বিজ মধুকণ্ঠ[১] (২৫৫।২৩৮ক, ২৩৯ক, ২৪০ক, ২৪১খ ; ৪৮৩১।৫ক, ৬খ, ৪১ক, ৪১খ, ৪৩ক, ৪৩খ, ৪৫খ), বাণীকণ্ঠ (৪৮৩১।৭৬খ, ২৭ক, ১৪ক) ও যাদব (১৩।১১২খ)।

এক্ষণে পুথিগুলির বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উহাদের তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে। ১৩নং পুথিখানির বিষয়বস্তুর উল্লেখ করিয়া অন্যান্য পুথির সঙ্গে ইহার মিল ও অমিলের বিবরণ দেওয়া হইবে। পুথিগুলির বেশির ভাগই পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় আলোচনার অসুবিধা পদে পদে অনুভূত হয়।

১৩ সংখ্যক পুথির প্রারম্ভে রামরূপে বিরাজিত নারায়ণের বর্ণনা— লক্ষ্মণ প্রভৃতি তাঁহার সেবারত— দেবগণ তথায় উপস্থিত। রামকথার জগতে প্রচার নাই দেখিয়া ব্রহ্মা চিন্তিত— চ্যবনপুত্রের দ্বারা ইহার প্রচার হইবে, নারদের এই আশ্বাস দান।[২] অতঃপর রত্নাকরের কাহিনী। শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্বন্ধে বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে নারদ কর্তৃক চন্দ্রবংশের ইতিহাসবর্ণন (১০খ-১২ক)। শ্বেত রাজা কর্তৃক নিজ মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ (১১খ)। সূর্যবংশের ইতিহাস বর্ণনপ্রসঙ্গে রামের কাহিনী (১২ক-খ)। সৃষ্টিবর্ণন (১৪ক-খ)। মরীচ রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যবংশের বিবরণ (১৬ক)। পিতার উদর ভেদ করিয়া মান্ধাতার জন্ম (১৭খ), লবণের সহিত যুদ্ধে মান্ধাতার পরাজয় ও মৃত্যু (১০খ)[৩] মুচকুন্দ কর্তৃক

১ মধুকণ্ঠ কৃত্তিবাসকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

সময়ে সকল ফলে দ্বিজ মধুকণ্ঠ বলে বন্দিআ পণ্ডিত কীর্তিবাস (৪৮৩১।৪৫খ, ২৫৫। ২৪১খ)।

২. ৪ সংখ্যক পুথির প্রারম্ভে শান্তার বিবাহের কথা। বিবাহপ্রসঙ্গের পরে রামনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা কর্তৃক সরস্বতীকে পৃথিবীতে প্রেরণ ও রামভক্তের কণ্ঠে অবস্থানপূর্বক রামনাম প্রচারের অনুরোধ। সরস্বতীর বরে রামচিন্তাপরায়ণ বাল্মীকির কবিত্বলাভ— নারদ কর্তৃক রামবৃত্তান্ত কথন (৪খ-৫খ)। ব্যাধ কর্তৃক পক্ষীর নিধন দর্শনের শোকে বাল্মীকির মুখ হইতে শ্লোকের উৎপত্তি ও ব্রহ্মার বরে তাহার সাহায্যে রামায়ণ রচনা (৬খ)।

৩. ৪নং পুথিতে (৬খ-৮খ) সূর্যবংশের রাজধানী অযোধ্যার গৌরববর্ণনা ও বংশের রাজগণের নাম উল্লেখমাত্র আছে— নামগুলি অনেক ক্ষেত্রে অভিনব বলিয়া মনে হয়।

৪. ৩ সংখ্যক পুথির ২৬ক পত্র।

পিতার শ্রাদ্ধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান (২১খ), পৃথুরাজার বিবরণ (২৩খ), ইক্ষ্বাকুর বিবরণ (২৪ক)[১], ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাকুৎস্থের তারক্ষদৈত্যবধ (২৬ক)[২], দণ্ড ও শুক্রকন্যা অজার কাহিনী (২৮খ), হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী (৩০ক)[৩], রুইদাসের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাহিনী, বশিষ্ঠের শাপে মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাঘ্ররূপ ধারণ (৩৭খ), কল্মাষপাদ নামের তাৎপর্য (৩৭খ)[৪], রুক্মাঙ্গদের একাদশী (৪৬খ), মরুত রাজার রাবণের বশ্যতা স্বীকার (৪৭খ)[৫], রাবণের সহিত যুদ্ধে অনারণ্য রাজার পতন (৫০ক)[৬], সগরের অশ্বমেধ (৫৬খ)[৭], ভগীরথের জন্ম (৫৭খ)[৮], ভগীরথের গঙ্গানয়ন (৬৬খ-৬৭ক)[৯], ধ্রুবচরিত্র (৬৯খ) [১০], দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও রঘুর অভিষেক (৭৩ক)[১১], বরতন্তুশিষ্যকে রঘুর চৌদ্দ কোটি সুবর্ণ দান ও রাবণ কর্তৃক উহা অপহরণ (৭৫ক)[১২], দশরথের শনিসকাশে গমন ও রাজ্যের অনাবৃষ্টি দূরীকরণের ব্যবস্থা (৮৭খ)[১৩], দশরথ কর্তৃক দেবশত্রু দিতি নামক অসুর বধ (৮১ক)[১৪], কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট আহত দশরথ কর্তৃক কৈকেয়ীকে বরদানের

---

১. ইক্ষুবনে হৈল নাম থুইল ইক্ষ্বাকু—১৩।২৪ক , ইক্ষুবনে প্রসবিলা নাম থুইল ইক্ষ্বাকু—৩।৩০খ।

২. ৩।৩২ক।

৩. ৩।৩৬ক। 'হরিশ্চন্দ্র যুবরাজ হরিবিজয় রাজা। রাজকর নাই রাজ্যে সুখে বৈসে প্রজা॥'—সামান্য পাঠান্তর সহ দুই পুথিতেই এইরূপ বর্ণনা আছে। অন্য কোন কোন রাজার বর্ণনায়ও এইরূপ কথা পাওয়া যায়।

৪. দুই পাদ পুড়িল তার শাপের জলে। কল্মাষপাদ বলি তার খ্যাতি মহীতলে॥ ৩নং পুথিতেও অনুরূপ পাঠ আছে। ১৩নং পুথি অনুসারে তণ্ডুস নৃপতির পুত্র যযাতি (৩৮খ), তৎপুত্র পুরু, তৎপুত্র মহাশঙ্খ, তৎপুত্র ত্রিশঙ্খ (৪৩ খ)। ৩নং পুথিতে যযাতির কথা নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের পরে মহাশঙ্খ, তৎপরে ত্রিশঙ্খ (৪৭খ)—ত্রিশঙ্খের পুত্র রুক্মাঙ্গদ (৪৮ক)।

৫. মরুতরাজার যজ্ঞ—৩।৫৪খ।

৬ ৩।৫৭ক।

৭. সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জের বনবাস—৩।৫৯ক।

৮. ৩।৬৭ক।

৯. নদীয়া ফুলিয়া সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর মধ্য দিয়া গঙ্গাকে নিয়া যাওয়া হয়। নবদ্বীপ শান্তিপুরের উল্লেখ নাই।

১০. উত্তানপাদের দুই স্ত্রীর নাম এই পুথির মতে বাসবাবতী ও জ্ঞানাবতী।

১১. ১৭।১৭খ।

১২. ১৭।২২খ। ১৭নং পুথির মতে অজের স্ত্রী 'ইন্দুমতী পরাণ তেজিল সর্পাঘাতে' (২৫ক)।

১৩ ১৭।৩০ক।

১৪. ৯১ক পৃষ্ঠায় পুনরায় এই প্রসঙ্গ দেখা যায়। তবে, পূর্বের অংশের সহিত ইহার ভাষার মিল নাই।

ইচ্ছা (৮১), দশরথ কর্তৃক সিন্ধুমুনি বধ (৮৮)[১], দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও পুত্রলাভ(৯৯)[২], দশরথের নখব্রণ ও কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদানের অভিপ্রায়[৩], রাম কর্তৃক মায়ারাক্ষস বধ (১০৪-৫)[৪], বীরবাহুরূপী ইন্দ্রের নিকট রাম প্রভৃতির অস্ত্রশিক্ষা (১০৭)[৫], মাঘী পূর্ণিমায় দশরথের সপুত্র গঙ্গাস্নান যাত্রা, গুহকের সহিত সংঘর্ষ ও পরে মিত্রতা (১০৮)[৬], মারীচের অত্যাচার হইতে যজ্ঞরক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে নিতে বিশ্বামিত্রের আগমন— দশরথের অনিচ্ছায় বিশ্বামিত্র কর্তৃক অযোধ্যানগর দাহ— রাম স্বয়ং যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় বিশ্বামিত্রের কোপশান্তি ও রামলক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রের অনুগমন (১১১)[৭], তাড়কা রাক্ষসী বধ (১১৪)[৮], রামলক্ষ্মণের মন্ত্রদীক্ষা ও গঙ্গানদী পার হওয়া (১১৫)[৯],

১ ১৭।৩৫ক। ইহার পরে কৈকেয়ী কর্তৃক রাজার আঙুলের ব্যথার প্রতীকারের কথা বলা হইয়াছে (৩৬খ)।

২. পুত্রলাভার্থে দশরথের বিষ্ণুযজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ (১৭।৩৭ক)। ১৭নং পুথির মতে কৌশল্যার পুত্রজন্মের সংবাদ শ্রবণমাত্র কৈকেয়ী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মন্থরা তাঁহার পুত্রকে রাজা করাইবেন এই আশ্বাস দিলেন :

> মর্ম বুঝি মন্থরা কহিছে জোড় হাতে।
> এখনি তনয় হবে তোমার গর্ভেতে ॥
> প্রকারেতে ছত্রদণ্ড ধরাইব তায়।
> মোর ঠাই আছে রাণি অনেক উপায় ॥ (১৭।৪৫ক)

৪নং পুথিতে বর্ণিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সংবাদে বিষ্ণুর দশরথগৃহে জন্মের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইয়াছে (৪।৩৩খ)।

৩. ৩।১১২খ, ৭।৪১খ।

৪. অস্ত্র না শিখিয়া রাম মারিল নিশাচর—১০৬ক। বনমধ্যে রাম কর্তৃক পিঙ্গল রাক্ষস বধ (১৭।৫৩)।

৫. ৩।১১৫, ৪।৪৫-৬ ; ২৫৫।১৬৭। কালীপূজান্তে ইন্দ্র কর্তৃক রামলক্ষ্মণকে অস্ত্রদান (১৭।৪৮খ)।

৬. মহামহাবারুণী উপলক্ষ্যে দশরথের গঙ্গাস্নানে যাত্রা, বশিষ্ঠ কর্তৃক রামের নিকট গঙ্গার উৎপত্তিকাহিনীবর্ণনা, গুহকের সহিত দশরথ ও রামের যুদ্ধ— পরে মিত্রতা (১৭।৫৬-৫৮)।

৭. ২৫৫।১৭০-২ ; ৪।৪৯খ।

৮. ৪।৫২খ ; ২৫৫।১৭৫ক ; ১৭।৬৫খ। রামের সহিত তাড়কার যুদ্ধকালে 'বিশ্বামিত্র ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া' (১৭।৬৫খ)।

৯. ৪।৬৭।

অহল্যা-উদ্ধার[১], দিতির আশ্রম দর্শন (১১৮)[২], শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের গুণবর্ণনা (১২২)[৩], মারীচের ভঙ্গ (১২৭)[৪], রামের বিবাহ প্রস্তাব ও হরধনুর কাহিনী (১২৫)[৫], রামের ধনুর্ভঙ্গ (১২৭)[৬],

১. ২৫৫।১৮০, ৪।৬৯, ৩।১২৩, ১৭।৬৯।

এত বলি লক্ষ্মণ চরণের রেণু লইয়া। অহল্যার সর্বাঙ্গে দিলেন মাথাইয়া॥
অহল্যা পাইল যেই রামের পদরেণু। সর্বাঙ্গ সহিত হৈলা লোমাঞ্চিত তনু॥
(১৭।৬৯খ)।

৪নং পুথিতে এই প্রসঙ্গে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গানয়ন ও গঙ্গার ফুলিয়া, সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী হইয়া সমুদ্রে পতনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে (৫২-৬৭)। গঙ্গা পার হইয়া নাবিককে আশীর্বাদ করার কথা আছে (৬৭খ)। ৩নং পুথিতে অহল্যা-উদ্ধারের পরে গঙ্গানয়ন কাহিনী ও গঙ্গা পার হওয়ার কথা আছে—পাটনির কথা নাই (১২৪)। ১৭নং পুথির মতে উদ্ধারের পরে অহল্যা রামের নিকট স্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করেন—ইন্দ্রকে শাপদানের বৃত্তান্ত গৌতম নিজে বর্ণনা করেন (৭০-৭২)—রামের কৃপায় গঙ্গার মাঝির নৌকার স্বর্ণত্বপ্রাপ্তি ঘটে (৭৫)।

২. ২৫৫।১৮২, ৪।৭০।

নর্মদা নদীর তরে দেখে দিব্যজল।
নানা পুষ্প পদ্মে ভ্রমর করে কোলাহল॥
• • •
আজি রাত্র বঞ্চিব আমি বৈশালিক দেশে।
কালি প্রাতে করিব রাম মিথিলা প্রবেশে॥ (৪।৭০-৭১)

১৩নং পুথির বর্ণনাও অনুরূপ (১১৮ক পত্র দ্রষ্টব্য)।

৩. ৪।৭১খ-৭৪ক। ২৫৫।১৮৩ক-১৮৭খ।

৪. ৪।৭৬; ৩।১২৬।

৫. ২৫৫।১৯৪; ৪।৭৯।

৬. ৩।১৩০। ৪ ও ১৭নং পুথিতে রামদর্শনে সীতার ব্যাকুলতা বর্ণিত হইয়াছে (৪।৮০, ১৭।৮০)। ১৭নং পুথিতে এই প্রসঙ্গে কিছু লঘুভাবের অবতারণা করা হইয়াছে :

বিশ্বামিত্র চাহিলেন শ্রীরামের পানে।
ধনু ভাঙ্গ রাঘব বিলম্ব কর কেনে॥
ঝরকার পথে দৃষ্টি কর নারায়ণ।
দেখ রাম ধনু ভাঙ্গি পাইবে কি ধন॥
এতেক শুনিয়ে রাম ঈষদ নয়ানে।
চাহিলা জানকীনাথ জানকীর পানে॥
জানকীর নেত্রে রামের লাগিল নয়ন।
কৃতাঞ্জলি জানকী দাণ্ডান ততক্ষণ॥

।বশ্বামিত্রের দশরথ আনয়নে গমন—(১৩১), বিবাহের দিন নিরূপণ (১৩৩)[২], অধিবাস (১৩৪)[৩], সুমন্ত মুনির স্ত্রী কৌশল্যা কর্তৃক রামাদির স্ত্রিয়াচার (১৩৪)[৪], রামসীতার বাসরঘর (১৩৭)[৫] রামসীতার অযোধ্যাযাত্রা ও পরশুরামের সহিত সংঘর্ষ (১৩৯)[৬]।

পুথিগুলির মধ্যে যে যে অংশে কাহিনীগত মিল রহিয়াছে, তাহা মিলাইতে গিয়া হতাশ হইতে হইয়াছে। পাঠের মিল খুব কমই আছে। খুটিনাটি বিষয়ে কাহিনীগত পার্থক্য যথাস্থানে কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। এগুলি কৌতুককর সন্দেহ নাই। পুরাণ-কাহিনীর বিবর্তনের ইতিহাসে ইহাদের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গলে বস্ত্র হাতে মালা কন জনকের ঝি।
বরমালা দিতে রাম বসে রয়েছি ॥ (১৭।৮০ক)

সুখের বিষয়, রাম এই বরমাল্য গ্রহণে অসম্মত হন।

১. ২৫৫।২০১ ; ৪।৮৮ ; ১৭।৮৫।

২. কার্তিকের তেসরা লগ্ন পৌর্ণমাসী তিথি।
শুভক্ষণ লগ্ন কৈল বিবাহের মতি ॥ (১৩।১৩৩খ)
অধ্যায়নের তিরিস দিনে ত্রিয়োদসি তিথি।
সুলগ্ন করিয়া হরিস হৈলা নরোপতি ॥ (৪।৯৩খ)
কার্তিকের তেইসোঁ পৌউস পুন্নমাসী তিথি।
শুভদিবস [ক]ইল বিবাহের তিথি ॥ (৪৮৩১।১৬)
কার্তিকের তেইসোঁ পুন্নমাসী তিথি।
শুভলগ্ন দিবস কইল বিভা হইব তথি ॥ (৩৮৫১।২)

৩. ২৫৫।২০৫।

৪. ৪।৯৬।

৫. ২৫৫।২৩০। ইহাতে বাসরঘরে যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ৪।১০১ (ইহাতে বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত)। ৪৮৩১।৩১ ; ৩৮৫১।১৬।

৬. ৪।১০২ ; ২৫৫।২৩৪ ; ৪৮৫১।৪৫।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংগীত

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগীতাংশ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা হয়েছে কিন্তু এই গ্রন্থে প্রযুক্ত সংগীতাদির যথাযথ স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। বোধ করি এ যুগে সেটি সম্ভবও নয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো গীতরূপ বর্তমানে প্রচলিত নেই। প্রত্যক্ষ প্রয়োগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলে সংগীতের আকৃতি বা প্রকৃতির সম্যক্ বিচার সম্ভব নয়। অতএব এ বিষয়ে অনুমান ভিন্ন তর্কাতীত সিদ্ধান্তের অবকাশ নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কারক বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় গত যুদ্ধের সময় কয়েক বৎসর ব্যারাকপুরে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় তার কাছ থেকে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক আলোচনা শোনবার সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল। রায় মহাশয় সংগীত সম্বন্ধে তেমন উৎসাহী ছিলেন না— তিনি শুধু এটুকু বিশ্বাস করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝুমুর শ্রেণীর গান এবং এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এটি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত (ভূমিকা– ।৵০)।

সেকালে সংগীতগুলিকে প্রবন্ধ অনুসারে ভাগ করা হত। দেশী সংগীতের এক-একটি বৃহৎ গোষ্ঠী এক-একটি প্রবন্ধ নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে প্রবন্ধের প্রয়োগ হয়েছে সেগুলি সাধারণত বিপ্রকীর্ণ জাতীয়। এই শাস্ত্রীয় "বিপ্রকীর্ণ" শব্দটি কেবল প্রকীর্ণ বা প্রকীর্ণক শব্দে প্রকাশ পেয়েছে। দেশের চতুর্দিকে ছোটখাট যে সব গীতরূপ দেখতে পাওয়া যেত তাদের বলা হত বিপ্রকীর্ণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব তৎপ্রণীত "সঙ্গীত-রত্নাকর"-এ ছত্রিশটি বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের উল্লেখ করেন। বলা বাহুল্য তিনি ভারতের সমগ্র আঞ্চলিক গীতগুলির উল্লেখ করেন নি। নতুন ধরনের যে সমস্ত গানের প্রচলন হত সে সবই বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রমণীয় গীতিনাট্য। এই বৃহৎ গ্রন্থটির মধ্যে কোথাও গতি এতটুকু শ্লথ হয় নি এবং একটির পর একটি ঘটনার বৈচিত্র্য দর্শক এবং শ্রোতার আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রাখত। গানের মধ্যে যাতে একঘেয়েমি না এসে পড়ে তার জন্য গ্রন্থকারের চেষ্টার ত্রুটি নেই। স্বর, তাল এবং গায়নরীতি প্রতিটি পদের সঙ্গে পালটে গেছে। এ ছাড়া ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব নেই। এই ছন্দগুলি লক্ষ্য করলে অনেক সময় মনে হয় যে, নৃত্যের পরিকল্পনাও হয়তো এই গীতিনাট্যে ছিল। আর একটি লক্ষণীয় বিষয়— কোনো পদই বিশেষ দীর্ঘ নয় এবং কাব্য-সুষমায় এত সমৃদ্ধ যে স্বভাবতই এগুলি পুরোপুরি গীতধর্মী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে ঝুমুর শ্রেণীর গান সেটি বিশ্বাস করবার কারণ আছে। পুথি-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় ভূমিকায় (পৃঃ ।৵০) পাদটীকায় লিখেছেন— "১৭-ঝুমুর মাত্রেই অশ্লীল বা ছোটলোকের গান নহে। সংগীতশাস্ত্রে উহার নির্দিষ্ট স্থান আছে।" এই উক্তি সমীচীন।

বস্তুত, ঝুমুর গান যে কত প্রাচীন তা বলা শক্ত। 'ঝোম্বড়া' নামক এক বৃহৎ গীতগোষ্ঠীর পরিচয় "সঙ্গীতরত্নাকরে" পাওয়া যায়। এটি সেকালকার সবচেয়ে বড় দেশী সংগীত শুদ্ধ "সূড়"-এর অন্তর্গত ছিল। অনুমান হয় যে, এই ঝোম্বড়াই বর্তমান ঝুমুরের আদিরূপ। অবশ্য এমন কোনো প্রত্যক্ষ সূত্র আজ আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় যা দিয়ে আমরা পূর্ববর্তী ঝোম্বড়ার সঙ্গে ক্রমবিবর্তন অনুসারে বর্তমান ঝুমুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারি, তথাপি ঝোম্বড়ার সঙ্গে ঝুমুরের নামগত এবং লক্ষণগত কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে এটা অস্বীকার করা যায় না। "সঙ্গীতদামোদরে" এবং "পঞ্চসার-সংহিতা"য় "ঝুমরী" নামক গীতকে 'সালগ' বা মিশ্র সূড়ের অন্তর্গত করা হয়েছে। এই ব্যাপারে মনে হয় যে, পূর্ব যুগের 'শুদ্ধ সূড়' পর্যায়ের ঝোম্বড়া পরবর্তীকালে 'মিশ্র সূড়' ঝুমরীতে পরিণত হয়েছিল। "ভক্তিরত্নাকর"-এও উক্ত গ্রন্থদ্বয় থেকে ঝুমরীর উল্লেখটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। রত্নাকর ঝোম্বড়ার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। শুদ্ধ ঝোম্বড়ায় পূর্ব যুগের উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ— এই চারটি কলিই যুক্ত ছিল। এই গীত সেকালকার বিখ্যাত দশটি তালের যে-কোনো একটিতে গাওয়া হত। এই দশটি তাল হচ্ছে— নিঃসারুক, কুডুক্ক, ত্রিপুট, প্রতিমণ্ঠ, দ্বিতীয়, গারুগী, রাস, যতি, লগ্ন, অড্ড এবং একতালী। এর অনেকগুলি প্রাচীন বাংলাতেও প্রচলিত ছিল। যতি, কুডুক্ক এবং একতালী—এই তালগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযুক্ত হয়েছে। সম্ভবত এই গীতগোষ্ঠীতে প্রযুক্ত কোনো তালই অধুনাপ্রচলিত ঝোমরা তালে রূপান্তরিত হয়েছে। ঝোম্বড়া গানের মোট প্রকারভেদ হচ্ছে ৩৫১০। এ থেকেই বোঝা যায় এর প্রচলন কত ব্যাপক এবং বহুল ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের এই গীতিনাট্যে "চিত্র" এবং "বিচিত্র" নামক দুটি গীতরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দুটি এই ঝোম্বড়ারই অন্তর্গত ছিল। সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে এই যে, ঝোম্বড়া গানে বিবিধ অলংকারের প্রয়োগ হত—তার মধ্যে উপমা, রূপক এবং শ্লেষের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ঝুমুর গানেও অলংকার-গুলির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এ ছাড়া নয়টি প্রচলিত রসেই এই গীত নানাভাবে বিনিযুক্ত হত। এই ঝোম্বড়া গান আবার গদ্য, পদ্য, গদ্য-পদ্য তিনটিকে অবলম্বন করেই রচিত হত। এই সব লক্ষণ থেকে অনুমান হয়, সেকালে ঝোম্বড়া গীত নানা অভিনয়াত্মক প্রবন্ধে বা বিষয়ে প্রযুক্ত হত। এই সব ধারাই পরবর্তী ঝুমুরে বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছে বলে মনে হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেকালকার গীতরূপগুলি পদের উপরে দেখান হয়েছে। যথা—

রামগিরি রাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

পাহাড়িআ রাগঃ ॥ একতালী ॥ প্রকীর্ণকং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকং ॥ ইত্যাদি।

এই উল্লেখ থেকে মনে হয় এই গীতিনাট্যে একাধিক প্রবন্ধসংগীতের মিশ্রণ হয়েছিল। একটি পদে চিত্রক, লগনী এবং দণ্ডক— এই তিনটি গীতরূপ প্রযুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে দণ্ডক সেকালের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। দণ্ডকছন্দ থেকেই এই রূপটি প্রধানত এসেছে। পরে এর বহু প্রকারভেদ হয়েছিল। এই গানে মোটামুটি তিনটি কলি থাকত— উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব এবং

আভোগ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যখন অভিনীত হয় তখন বাংলায় এই প্রবন্ধ কি ভাবে প্রচলিত ছিল এবং এর প্রয়োগ কি ভাবে করা হয়েছে সেটি না শুনলে বোঝা সম্ভব নয়— অতএব এ বিষয়ে লিখে কিছু বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভাল। লগনী বা লগ্নী আজও উত্তরভারতে একপ্রকার গীত হিসাবে বিশেষ প্রচলিত। প্রাচীন মিথিলাতেও লগনীর বহুল প্রচলন ছিল। সম্ভবত ক্রমাগত লগ্নক তালে গীত হওয়ার ফলে এটি লগ্নী নামক একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহু গীতরূপ প্রচলিত ছন্দ থেকে এসেছে; যেমন দণ্ডক, পদ্ধড়ী ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রেও লগ্নক তালে গীত একপ্রকার গান পরে লগ্নী নামক এক বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। লোচনের "রাগতরঙ্গিণী"তে বড় বড় সুরের সঙ্গে সেই সেই নামের ছন্দের উল্লেখও দেখা যায়। এ বিষয়ে ভূমিকায় বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের চিত্তাকর্ষক মন্তব্যটিও উদ্ধৃত করার মত—"পূর্বে জন্মবাসরে বিশেষত বিবাহকালীন বরবধূকে লইয়া নৃত্যোৎসবে এক প্রকার গীতবাদ্য অনুষ্ঠিত হইত। এই গীত এবং তদুচিত তালকেও লগ্নী বলিত। অনুষ্ঠানটি এক সময় সমগ্র উত্তরাপথে প্রচলিত ছিল, এখনও কোথাও কোথাও উহার নিদর্শন পাওয়া যায়।" খুব সম্ভব বিশেষ বিশেষ লগ্নে এই গীতের প্রচলন ছিল বলে এর একটি বিশেষ তাল এবং রূপ আপনা থেকেই গড়ে উঠেছিল এবং পরে এর নাম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল লগ্নী। অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় দু-একটি চমৎকার বাংলা লগ্নী রচনা করেছিলেন—তার মধ্যে "কে গো গাহিলে পথে" বা "কেন এলে মোর ঘরে" বিশেষ বিখ্যাত।

পূর্বে যে সব প্রবন্ধ গাওয়া হত সেগুলি মোটামুটি তিন রকম— সূড়স্থ, আলিসংশ্রয় এবং বিপ্রকীর্ণ। সূড় প্রবন্ধের অন্তর্গত রূপ ছিল আটটি—এলা, করণ, ঢেঙ্কি, বর্তনী, ঝোম্বড়া, লম্ভ, রাসক এবং একতালী। সূড় এবং আলিক্রম মিলিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল বত্রিশটি, বাকি যে সমস্ত গীতরূপ নানা দেশে ছড়িয়ে ছিল সেগুলি ছিল বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্গত।

চিত্র এবং বিচিত্র— এই দুটি যে ঝোম্বড়া প্রবন্ধের অন্তর্গত এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঝোম্বড়া সূড় প্রবন্ধের অন্তর্গত হওয়ায় প্রকীর্ণকের মধ্যে পড়ে না। এই কারণেই মনে হয় যখনই চিত্র বা বিচিত্র রীতির সঙ্গে লগনী রীতির মিশ্রণ হয়েছে তখনই প্রকীর্ণক থেকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে; যথা—"চিত্রক লগনী" বা "বিচিত্র লগনী", দুটি রূপ মিলিয়ে যেখানে সুর রচনা করা হয়েছে সেখানে "প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী" বা "প্রকীর্ণক বিচিত্র লগনী"—এই রকম আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দু-একটি আখ্যা আছে যা পূর্বে গীতরূপ হিসাবেও প্রচলিত ছিল; যেমন একতালী বা রূপক। তবে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগীতে এগুলি গীতরূপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নি নিশ্চিত। কেননা এগুলি যে ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে তাতে তালের সংজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। গীতগোবিন্দতেও এ দুটি তালরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিম্নোল্লিখিত রাগ এবং তালের প্রয়োগ হয়েছে—

রাগ—কোড়া, বরাড়ী, ধুমুষী, গুর্জরী, পাহাড়ী, দেশাগ, আহের,
রামগিরি, মালব, বেলাবলী, দেশবরাড়ী, ভাটিয়ালী,
কেদার, মল্লার, কহু, ললিত, কোড়াদেশাগ, মালবশ্রী,
শৌরী (গৌরী), বসন্ত, মাহারঠা, কহুগুর্জরী, বিভাষ, ভৈরবী,
শ্রী, বঙ্গাল, বিভাষকহু, বঙ্গালবরাড়ী, পঠমঞ্জরী, সিন্ধোড়া,
কোড়াদেশ।

তাল— যতি, ক্রীড়া, একতালী, লঘুশেখর, রূপক, কুড়ুক্ক, আঠতালা।

জয়দেবের পরবর্তীকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময়ের মধ্যে অনেক নতুন রাগ, নবতর রীতিনীতি বাংলা গানে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগীতাংশ থেকে সেটা অনুমান করা যায়। পাহাড়ী রাগটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সব চেয়ে প্রিয় রাগ। জয়দেব এটি গীতগোবিন্দে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু এ সব সুর জয়দেব প্রয়োগ করেন নি বলেই যে তাঁর সময় এগুলি প্রচলিত ছিল না এমন সিদ্ধান্ত করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন, বঙ্গাল রাগটি সুপ্রাচীন অথচ জয়দেব এটি ব্যবহার করেন নি; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই রাগটি প্রযুক্ত হয়েছে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে, এক-একটি সুর এক-একটি জনপদের প্রিয়। অতএব বিশেষ বিশেষ জনপদে বিশেষ বিশেষ সুর বা গীতিরীতির প্রয়োগ ঘটা স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আর একটি বহুল ব্যবহৃত রাগ হচ্ছে—কোড়া। বহু সংস্কৃত গ্রন্থেই এই রাগের উল্লেখ আছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এটির নাম "কোরড়া", "সঙ্গীতদর্পণ" বা "সঙ্গীত-পারিজাত"-এ "কুড়ায়িকা"; লোচনের "রাগতরঙ্গিণীতে" "কোডার", লোচন ন'টি সঙ্কীর্ণরাগের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি তীরভুক্তি দেশে প্রচলিত ছিল। এগুলি হচ্ছে—বিভাস, আহির, গোপীবল্লভ, শারঙ্গী, কোডার, ধনছী (ধনশ্রী), গৌড়মালব, রাজবিজয় এবং নাট। এর মধ্যে কোড়ার রাগের অনেকগুলি প্রকারভেদ আছে; যথা—স্মরসন্দীপন কোডার, বিয়োগি কোডার, মোরাঙ্গিয়া কোডার, দণ্ডক কোডার এবং শুদ্ধ কোডার। দণ্ডক কোডার নিশ্চয়ই দণ্ডক প্রবন্ধে ব্যবহৃত হত। দণ্ডক প্রবন্ধ যে একদা খুবই জনপ্রিয় ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই তার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আর একটি বিচিত্র রাগ হচ্ছে—"কহু"। প্রধান সংগীতশাস্ত্রাদিতে এই রাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কহুগুর্জরী নামক একটি মিশ্র রাগের উল্লেখও এই গ্রন্থে রয়েছে। "কহু" শব্দটি "ককুভ"-এর পরিবর্তিত রূপ কিনা বলা যায় না। "কৌ" নামক একটি রাগের উল্লেখ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" বা মৈথিলীগ্রন্থ "বর্ণরত্নাকরে" পাওয়া যায়। চর্যায় "কহ্নুগুর্জরী" নামক একটি রাগের উল্লেখ আছে। এই "কহ্নুগুর্জরী" এবং "কহুগুর্জরী" এক কিনা সেটাও যথাযথভাবে বলা সম্ভব নয়।

"শৌরী" নামক রাগটি "গৌরী"র স্থলে লিপিকার প্রমাদ কিনা সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। শৌরী রাগ শবরীর অপভ্রংশও হতে পারে।

"মাহারঠা" রাগ গুজরীর অন্তর্ভুক্ত। "সঙ্গীতরত্নাকর"-এ এটি "মহারাষ্ট্রী গুর্জরী" নামে পরিচিত।

অপর রাগগুলি বিশেষ বিখ্যাত, অতএব সেগুলির সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযুক্ত তালগুলিও সেকালেব বিশেষ বিখ্যাত তাল। এগুলি দেশী সংগীতে ব্যবহৃত দেশী তালের অন্তর্ভুক্ত। প্রধান সংগীতশাস্ত্রগুলিতে এসব তালের লক্ষণ এবং বর্ণনা আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নিয়ে বহু তর্ক আছে। কেউ কেউ এই গীতিনাট্যকে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেন। সংগীতের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে ধারণা হয় এটি সেই যুগের রচনা যখন দেশে প্রাচীন প্রবন্ধগায়ন শিথিল হয়েছে, নব নব রীতির অভ্যুদয় হচ্ছে, কিন্তু মোগল যুগে (বিশেষ করে আকবরের সময়) যে নূতন গীতরূপের প্রচলন হয়েছে তার প্রতিষ্ঠা হয় নি। এই গ্রন্থের রচনাকাল যে ১৪০০ বা ১৪৫০-এর এধারে কিছুতেই হতে পারে না—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মতটি সাংগীতিক বিচারেও সমর্থিত হয়।

ব্যবহৃত গ্রন্থের সূচী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সঙ্গীতরত্নাকর। অ্যাডায়ার লাইব্রেরি, মাদ্রাজ

রাগতরঙ্গিণী। দ্বারভাঙ্গা সংস্করণ

বর্ণরত্নাকর। এসিয়াটিক সোসাইটি

শ্রীকৃষ্ণবিজয়। খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত

বৃহদ্ধর্মপুরাণ। বঙ্গবাসী সংস্করণ

বৌদ্ধগান ও দোহা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ভক্তিরত্নাকর। বহরমপুর সংস্করণ

সঙ্গীতপারিজাত। কালীবর বেদান্তবাগীশ এবং সারদাপ্রসাদ ঘোষ।

বেথুন সোসাইটি

নবম প্রস্তাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেথুন সোসাইটি চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা দিয়া ভারতীয় সমাজের যে কতখানি হিতসাধন করিতেছিল তাহা আমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি। ইহা ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মিলনক্ষেত্র। ঐ যুগে স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে যে জাতিবৈরিতার উদ্ভব হইতেছিল তাহার কুফল সোসাইটির কোন কোন সদস্য ইতিপূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি সোসাইটির মত একটি মিলনক্ষেত্র থাকায় ইহার কুফল হইতে আমরা কতকটা রেহাই পাইতেছিলাম সন্দেহ নাই। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত অধিবাসীদের মধ্যে বেথুন সোসাইটি একটি সার্থক মিলনক্ষেত্র রচনার আয়োজন করিতে পারে এ বিষয়েও কোন কোন মনীষী তখন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশবর্ষের প্রারম্ভে বেথুন সোসাইটির শাখা-সমিতিগুলি পুনরুজ্জীবীত হইয়াছিল, কিন্তু এ বৎসরের কার্যবিবরণ হইতে ঐ সব শাখা-সমিতির কর্মপ্রয়াসের কোন উল্লেখ পাই না। তবে যথানিয়মে দুইটি মাসিক অধিবেশন হয় এবং তৎসমুদয়ে বিভিন্ন বক্তা সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ করেন, কেহ কেহ মৌখিক বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর যে সব আলোচনা হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও আমরা পাইয়াছি। ইহা পাঠে বুঝা যায়, সদস্যগণ ।ববিধ সমাজ-কল্যাণকর বিষয়ে কত চিন্তা করিতেন। সোসাইটির যে ট্র্যানজ্যাক্‌শনস্‌ হইতে ইহার কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধসমূহের কোন-কোনটি পুরাপুরি মুদ্রিতও রহিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ হইতে সমসাময়িক চিন্তা ও নানা বিষয়ের তথ্যমূলক আলোচনাও পাইয়া থাকি। গত শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা-গবেষণা করিতে চাহেন, তাহাদের নিকট এ ধরণের ট্র্যানজ্যাক্‌শনস্‌ বিশেষ মূল্যবান।

দেখিতে দেখিতে সোসাইটি ষোড়শবর্ষে (১৮৬৮-৬৯) আসিয়া পৌছিল। এ বৎসরও বিচারপতি জন্‌ ব্যাড্‌ ফিয়ার সোসাইটির সভাপতি থাকিয়া বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ইহার কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। ঐ সময়ের সদস্যগণের মধ্যে তিনি বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে সমর্থ হন। একটি সভায় সভাপতির ঐকান্তিক প্রযত্নের কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক সদস্য এই ইংরেজী প্রবাদটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন : "The willing horse gets the largest burden to carry"। বস্তুতঃ সভাপতি ফিয়ার সোসাইটি পরিচালনার দায় যেন নিজের দায় বলিয়াই এ সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোসাইটির প্রথম মাসিক বা সাধারণ অধিবেশন হইল ১৬৬৮, ১৯শে নবেম্বর তারিখে। এ দিনকার মূল বক্তা সভাপতি স্বয়ং। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল : The Periodic winds and Rains of the Calcutta Seasons : অর্থাৎ কলিকাতার বিভিন্ন ঋতুতে মাঝে

মাঝে যে ধরণের ঝড় বধা হইয়া থাকে তৎসম্পর্কে। ফিয়ার মাত্র কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আসিয়াছেন। ইহার মধ্যেই দেশের নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগী নিষ্ঠাবান ছাত্রের মত অনুধাবন ও অনুশীলন করিয়াছেন। দেশীয় সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁহার চিন্তা ও প্রযত্নের প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেই সোসাইটির অধিবেশনকালে অন্যত্র পাইয়াছি। এই বক্তৃতার মধ্যেও তাঁহার ভারত-প্রীতির পরিচয় মিলিতেছে। ফিয়ারের বক্তৃতার বিষয় মূলতঃ বৈজ্ঞানিক। ব্যবহার-শাস্ত্র ছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়েও যে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল তাহার পরিচয় পাই এই বক্তৃতার মধ্যে। ফিয়ার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথমে সাধারণ ভাবে আলোচনা করেন। কলিকাতা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার উপরে সূর্যরশ্মি খাঁড়াভাবে পড়িয়া থাকে। তাই আমরা এত উত্তাপ অনুভব করি। লণ্ডন শীতপ্রধান দেশে অবস্থিত, ইহার উপরে সূর্যকিরণ বরাবর বাঁকা হইয়া পড়ে, এজন্য উত্তাপ আমরা আদৌ টের পাই না। জল, জঙ্গল, বিল বা পতিত জমি এই সকল কাছাকাছি থাকায় কলিকাতার জলবায়ু এক আশ্চর্য রকমে বিভিন্ন ঋতুতে বদলাইয়া যায়। ঐ দশকে কলিকাতায় কয়েকটি ভীষণ ঝড় হয়। ঝড়ের প্রকোপ এখানে তখন যেরূপ অনুভূত হইয়াছল এমনটি দীর্ঘকালের মধ্যে দেখা যায় নাই। বক্তার এরূপ ভাষণের মূলে এই অভিজ্ঞতাও অনেকটা প্রেরণা দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ফিয়ার বক্তৃতার শেষে ভারতীয় যুবকগণকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রসর হইতে আবেদন জানান।

বক্তৃতার পর আলোচনায় যোগদান করেন ডাঃ ডব্লিউ রব্সন্। মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ, যদুনাথ ঘোষ, রেভাঃ ডঃ মারে মিচেল এবং হেনরী উড্রো। ডাঃ রব্সন্ প্রথমে বক্তার সাধুবাদ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, ভারতীয় যুবকদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহারা ইতিহাস এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় পরাঙ্মুখ। ইতিহাস সম্বন্ধে হয়তো এই উক্তি কথঞ্চিৎ সত্য, কিন্তু নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, ভারতীয় যুবকেরা বিজ্ঞান শিক্ষায় আদৌ বিমুখ নহে। ইউরোপীয় ছাত্রদের মতই তাহারা সমান আগ্রহশীল এবং তৎপর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান তথা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই। ইহাকে ইচ্ছাধীন (optional) বিষয় বলিয়া গণ্য করায় ইহার অনুশীলন মোটেই আশানুরূপ হইতেছে না। অবশ্য বিলাতের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সেদিন মাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষক এবং যন্ত্রপাতি ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা চলিতে পারে না। এ দেশে একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি ইচ্ছাধীন হওয়ায় অল্প মাত্র অধ্যয়নেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

যদুনাথ ঘোষ এবং ডঃ মারে মিচেল উভয়েই ডাঃ রব্সনের একটি উক্তির প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাঙালী যুবকেরা ইতিহাস চর্চায় উদাসীন এ কথা যথার্থ নহে। ডঃ মিচেলের মতে দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন মানুষের উন্নতির পক্ষে একান্ত

প্রয়োজনীয়। কেননা দর্শন সকল বিদ্যার মূলে। ভারতবাসীদের দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অধিকতর আগ্রহ থাকায় ভাববিলাসী বলিয়া দুর্নাম করা হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে এই মন্তব্য কত অসার। তবে তিনিও এ কথার উপর বিশেষ জোর দিলেন যে, ভারতীয় ছাত্রদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানানুশীলনের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া কর্তৃপক্ষের বিশেষ কর্তব্য।

সাময়িক সভাপতি হেনরী উড্রো এই দিনকার মূল বক্তা বিচারপতি ফিয়ারকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর কোন কোন আলোচকের ভ্রান্তিমূলক উক্তির প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি তিনি ইহার কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রহিয়াছেন। যখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পাঠ্য বিষয়াদি নির্ধারিত হয়, তখন তাঁহারা যোগ্য অধ্যাপক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির (apparatus) অভাবহেতুই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ছাত্রগণের ঐচ্ছিক বিষয় বলিয়া নির্ধারিত করিতে বাধ্য হন। মূল বক্তা ফিয়ার উপসংহারে এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আরও একটি বিষয় সদস্যদের গোচরে আনেন। তিনি বলেন যে এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থার নিমিত্ত সম্প্রতি বড়লাটের নিকট একখানি স্মারকলিপি প্রেরণ করা হইয়াছে।

সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল পরবর্তী ১০ই ডিসেম্বর। এদিনকার সভার একটি বৈশিষ্ট্য বড়লাট সার্ জন লেয়ার্ড মেয়ার লরেন্সের (১২ই জানুয়ারি, ১৮৬৪—১২ জানুয়ারি, ১৮৬৯) উপস্থিতি। সার্ জন ভারতবর্ষের প্রথম আই. সি. এস.-বড়লাট। তিনি ভারতবাসীর প্রতি নানা বিষয়ে সহৃদয়তার প্রমাণ দিয়াছিলেন। এই বৎসরের প্রথম দিকে সপরিষদ বড়লাট বাংলা সরকারকে এই মর্মে একটি লিপি প্রেরণ করেন যে, সরকারী রাজকোষ হইতে নিছক উচ্চশিক্ষার খাতেই অর্থ ব্যয় হওয়ায় সরকারকে বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হইতেছে। তাঁহারা এ অপবাদ ক্ষালন করিতে ইচ্ছুক অথচ রাজকোষে এমন উদ্বৃত্ত অর্থ নাই যাহা দ্বারা জনশিক্ষার জন্য কিছু মাত্রও ব্যয় করা যায়। তাঁহারা বাংলা সরকারকে অর্থাগমের উপায় সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার নির্দেশ দেন। ইহার পর হইতে প্রাথমিক তথা জনশিক্ষা সম্বন্ধে সভা সমিতিতে নানারূপ আলোচনার সূত্রপাত হয়। বেথুন সোসাইটির এই দ্বিতীয় অধিবেশনেও মূল আলোচনার বিষয় ছিল : বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education in Bengal)। ঐইরূপ বিষয়বস্তু দৃষ্টেই হয়তো বড়লাট এদিনকার সভায় উপস্থিত হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকিবেন।

বক্তা রেভাঃ লালবিহারী দে ভাষণের আরম্ভেই ভারতসরকারের উক্ত অনুকূল মনোভাবের উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষীয় সভা (British Indian Association) বাংলা সরকারের নিকট হইতে মতামত প্রেরণের নির্দেশ পাইয়া যে সভার অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে এই মর্মে বলা হয় যে, উচ্চশিক্ষা অব্যাহত রাখিলে দেশমধ্যে জনসাধারণের শিক্ষারও সুরাহা হইবে। ঐ সময়ে দেশীয় প্রথায় পরিচালিত সর্বত্র যে সকল পাঠশালা ছিল তাহা

দ্বারা সাধারণ কৃষক, মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানেরা প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছিল। উচ্চশিক্ষার সংকোচ সাধন করিয়া জনশিক্ষার বহুল প্রচলন ব্যবস্থার কোনো আবশ্যকতা নাই। বক্তা ভাষণে প্রথমেই এই সকল উক্তির প্রতিবাদ করেন। জনসাধারণের মধ্যে যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রচলিত আছে, বলা হয়, তাহা অতি নিকৃষ্ট ধরণের এবং ইহা হইতেও তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর সন্তানেরাই কতকটা সুযোগ সুবিধা পায়, সাধারণ চাষী, মজুর ও শিল্পিকদের ছেলেরা ইহার কাছ ঘেষিয়াও অনেক ক্ষেত্রে যাইতে পারে না। জনসাধারণকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া সামান্য সংখ্যক লোকের উচ্চশিক্ষা লাভে সমগ্র দেশের ও জাতির কল্যাণ কোনমতেই সাধিত হইতে পারে না।

বক্তা ইহার পর প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার-সাধন এবং ইহার পরিচালনা ও ব্যয়ভার-বহন উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখান যে, ঐ সময়ে সাধারণ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অংশতও প্রবর্তন করিতে হইলে অন্যূন ষাট লক্ষ টাকার প্রয়োজন। মাথা পিছু প্রতি ছাত্রের জন্য এক আনা করিয়া বেতন ধরিলে আদায় হইতে পারে দশ লক্ষ টাকা। ভূমির উপরে 'এডুকেশন সেস্' বা শিক্ষাকর ধার্য করিয়া মোট সাত লক্ষ টাকা পাওয়া সম্ভব। বক্রী টাকা নানা খাতে সরকার হইতে প্রাপ্তির কথা তিনি উল্লেখ করেন। এই এডুকেশন সেস্ বা শিক্ষাকর লইয়াই ভারতবর্ষীয় সভায় কোন বক্তা বিশেষ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। বক্তা দে মহাশয় বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিয়া এ দেশের অনুসরণীয় পাঠ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। তিনি প্রসঙ্গত বলেন যে, ব্রিটেন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে তখনও অনগ্রসর রহিয়াছে। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আর্থিক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিবার পর বক্তা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক (compulsory) করিবার কথাও উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বহুকাল পোষিত 'filtration theory'র ব্যর্থতা এখন সর্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। শ্রেণী বিশেষের অথবা উচ্চস্তরের লোকেরা ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে নিম্ন শ্রেণী বা স্তরের লোকেরাও উহাদের দ্বারা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইবে— পঞ্চাশ বৎসর পরেও কি এই ধারণার ব্যর্থতা নূতন করিয়া প্রত্যেককে বুঝাইয়া দিতে হইবে? প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ছেলেদের কেবলমাত্র লিখন পঠন এবং সামান্য অঙ্ক শিখাইয়াই শেষ করা উচিত নয়। বিবিধ শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষা, শিল্পকার্যে এবং কৃষিকর্মে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও তাহাদের কার্যকর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে সোসাইটির সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রথমেই তিনি বড়লাটের উপস্থিতিতে তাঁহাদের অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রশস্তিবাদ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষের মানসিক শক্তি ও বৃত্তি-সমূহের উন্মেষ সাধনই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইতিহাস বা ভূগোলে বর্ণিত

রাজারাজড়ার নাম, যুদ্ধবিগ্রহ, বংশতালিকা, বিভিন্ন দেশ স্থান পাহাড় পর্বত নদ নদীর নাম ইত্যাদি মাত্রই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত নয়। প্রাথমিক শিক্ষার ধরন-ধারণ এমন করিয়া করিতে হইবে যাহাতে সাধারণ লোকের মনে জ্ঞাতব্য এবং কাযকর বিষয়ে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কৌতূহল এবং সত্যিকার স্পৃহা জাগে, তবেই ইহা সার্থক হইতে পারে। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই-একটি কথার উল্লেখ করেন। ছুরি-কাঁচি শেফিল্ড হইতে আমদানী হয়। ছুরি-কাঁচি প্রসঙ্গে ছেলেদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিবে ইহা কোথা হইতে আসে, ইহা কিসের দ্বারা তৈরী হয়, কিরূপে তৈরী হয় প্রভৃতি। এইরূপ এক একটি দ্রব্য বা বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভূগোল, ভূতত্ব, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে কিশোর মনকে যথাযথ শিক্ষিত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বর্তমান বুনিয়াদী শিক্ষার বীজ দেখিতে পাই। গোপালচন্দ্র দত্ত বড়লাটকে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। তিনি মূল ভাষণ সম্বন্ধে বলেন যে, ভারতবর্ষীয় সভা প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক বিতর্কমূলক প্রস্তাব সম্পর্কে সম্প্রতি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, বক্তার এই দিনকার বক্তৃতায় প্রধানতঃ তাহারই প্রতিবাদ আমরা পাই। প্রতিবাদের জবাবে ঐ সভাপক্ষীয়দের কি বলিবার আছে সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। তিনি অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জ্ঞান দান সাধারণ শ্রেণীর সন্তানদের সম্ভব হইবে তখনই, যখন মাতৃভাষায় বিভিন্ন পুস্তক রচিত হইয়া তৎসমুদয় পরিবেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইবে।

সভাপতি ফিয়ার রাত্রি অধিক হওয়ায় সভার কার্য সত্বর শেষ করেন। সমাপ্তি-বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে মূল বক্তা যাহা যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ একমত। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার ব্যয়ভার ঐ শ্রেণীর লোকেরাই বহনে সমর্থ। তথাকথিত নিম্নশ্রেণী তথা জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে সরকারের বিশেষ ভাবে অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ কৃষক শ্রমিক ও শিল্পিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে শিক্ষার অভাবে সমাজের যে কতখানি অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হইতেছে তাহার বিষয়েও তিনি সকলকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করেন।

সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হইল ১৪ই জানুয়ারী। ১৮৬৯ দিবসে। এই দিনের প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ সি. আর. ফ্রান্সিস। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল : "To England and Back Under the Canvas," অর্থাৎ বিলাতে যাওয়া ও বিলাত হইতে ফিরিয়া আসা সম্পর্কে।

বর্তমানে বিলাত মনে হয় আমাদের একেবারে ঘরের কোণে। পূর্বযুগে কিন্তু এমনটি ছিল না, তখন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া বিলাত যাইতে হইত এবং সময় লাগিত অন্যূন ছয় মাস। বাঙালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই পথ ঘুরিয়া বিলাত গমন করেন। গত শতাব্দীর চতুর্থ দশক অবধি ইউরোপে যাইবার আর-একটি পথ ব্যবহৃত হইতে থাকে— ইহা মিশরের পথ। জলপথে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত গিয়া মিশরের ভূমিতে

অবতরণ করিতে হইত। সেখান হইতে কায়রোর পথে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌছিয়া পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিয়া বিলাত বা ইউরোপে লোকেরা গমন করিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পথে দুইবার বিলাত গিয়াছিলেন।

এদিনকার বক্তা যখন বক্তৃতা দেন তখন সুয়েজ খালের পথ সবেমাত্র খুলিয়া গিয়াছে। ভাষণের আরম্ভেই বক্তা এই দুইটি পথের কথা উল্লেখ করেন। যাঁহারা স্বাস্থ্যলাভের আশায় স্বদেশে যাতায়াত করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাওয়াই প্রশস্ত। অবশ্য কাজের তাড়া থাকিলে নূতন পথে যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। সমুদ্র যাত্রায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মে। মাঝে মাঝে আমাদিগকে কত ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রায় ঝড়ের মতই একপ্রকার বায়ু বরাবর বহিতে থাকে। কখনও কখনও আর এক প্রকারের বায়ু বহিতে দেখা যায় ইহার নাম মৌসুমী বায়ু। 'মৌসুমী' কথাটি আসিয়াছে মালয় শব্দ 'Mousin' (মৌসিন্) হইতে। বক্তার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা—সমুদ্রবক্ষে ভাসমান বিচিত্র রকমের জীবজন্তু, মৎস্য, সর্প ইত্যাদি দেখা। তিনি উপসংহারে একটি আশ্চর্য বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন উপসাগরের (বিস্‌কে উপসাগর) পথে যাইবার সময় দেখা যায় বিপরীত দিক্ হইতে দুইটি স্রোত বহিতেছে। উহার একটির জল উষ্ণ অন্যটির জল শীতল।

সোসাইটির চতুর্থ অধিবেশনে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯) বক্তৃতা দেন ইহার অন্যতম প্রধান সদস্য গোপালচন্দ্র দত্ত। বক্তৃতার বিষয় ছিল: "Educated Natives, their Duties and Responsibilities" অর্থাৎ শিক্ষিত ভারতবাসী, তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ভাষণের প্রথমেই বক্তা বলেন যে, শিক্ষিত ভারতবাসী বলিতে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কথাই তিনি বলিতেছেন। ইংরেজ শাসনের অধীন হইয়া তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষা-সাহিত্যের চর্চায় তেমন রত না হইয়াও এরূপ একটি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতেছেন যাহার ফলে তাঁহাদের চিত্তোৎকর্ষ সম্ভব হইয়াছে, আধুনিক উন্নততর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গেও তাঁহারা ক্রমশঃ পরিচিত হইতেছেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে ইংরেজী শিক্ষার সুফল পুরাপুরি তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। প্রথমতঃ, বাল্যবিবাহ, যৌথ-পরিবার প্রভৃতি প্রথাগুলি আমাদের মানসিক শক্তির বিকাশে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থকরী হওয়ায় আমরা ইহার দ্বারা আশানুরূপ লাভবান হইতে পারিতেছি না। আমরা যাহা কিছু শিখি কর্মজীবনে অগ্রসর হইতে হইতে তাহা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। আমাদের জীবনের উপরে শিক্ষার শুভংকর প্রভাব কচিৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

নব্যশিক্ষিত সমাজের পক্ষে জাতীর অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতি গভীর দায়িত্ব রহিয়াছে। কৃষক ও শিল্পিক শ্রেণীর উন্নতিকল্পে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বৃত্তিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগও জানিয়া লইতে হইবে। শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদের এবম্বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তবেই স্বদেশের যথার্থ উন্নতি হওয়া সম্ভব। ইংরেজ আমলে তাঁহারা যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও

স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন তাহার ফলে স্বদেশবাসীর উন্নতি-প্রয়াসে বিশেষ কোন বাধা পরিলক্ষিত হয় না। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বাধাগুলি তিরোহিত হইবে। যে সকল প্রথা আমাদের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হইয়া আছে তাহাও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। জাতীর তখনই যথার্থ উন্নতি হইবে যখন ইহার অন্তর্ভুক্ত মানব-সাধারণের ব্যক্তিগত চারিত্রিক উৎকর্ষ, বিশুদ্ধ কর্মৈষণা এবং সকল কর্মে সততা প্রভৃতি গুণের অনুশীলন হইবে।

বক্তার ভাষণের পর আলোচনায় যোগদান করেন ওয়ালটার বুর্ক (Bourk W.), মণিলাল সাণ্ডাল, কালীমোহন দাস এবং সভাপতি স্বয়ং। বুর্ক বক্তার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত যে, ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ ও যৌথ-পরিবার প্রথা রহিত হইবার সুযোগ ঘটিতেছে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের সম্বন্ধে বক্তা যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা তিনি সমর্থন করিতে পারেন না। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা পূর্বার্জিত বিত্থা এবং আগেকার জীবন যাপন প্রণালী ভুলিয়া যান—ইহার কোন ছাপ তাহাদের কর্মে প্রকটিত হয় না ইহা কিরূপে সম্ভব? অর্জিত বিত্থার প্রভাব মানুষের জীবনে কোনও রকমে থাকিয়াই যায় এবং ইহা তাহার পরবর্তী কার্যকলাপকে কথঞ্চিৎ মাত্রও নিয়ন্ত্রিত করে। মণিলাল সাণ্ডাল বাংলার সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যে সুমার্জিত হইয়া প্রকর্ষ লাভ করিতেছে তাহার বিষয় উল্লেখ করেন। সোসাইটির অন্যতম প্রধান সদস্য কালীমোহন দাস বলেন যে, সমাজের জাতি-বিভাগ এবং বাল্য-বিবাহের সঙ্গে কোনরকম আপোষ রফা করিলে চলিবে না। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপই একটি আপোষ রফার মনোভাব সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

সভাপতি ফিয়ার একটি সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়া অধিবেশন সমাপ্ত করিলেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজের উন্নতির অর্থ ইহা নয় যে, ইউরোপীয় রীতি-নীতি হুবহু ইহার মধ্যে প্রবর্তন করিতে হইবে। ভারতীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উন্নতিসাধনই সমাজের প্রকৃত উন্নতি বলিয়া বিবেচনা করা কর্তব্য। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, বর্তমানে বাঙালী নারীগণ শিক্ষালাভ করিতেছেন কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ইউরোপীয় নারীদের হুবহু অনুকরণ করিবেন কেন? ইহা তিনি মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভ করিলে দেশীয় সমাজের অন্তর্ঘাতী কুপ্রথাগুলি স্বতঃই লুপ্ত হইয়া যাইবে। তাঁহার মতে ইউরোপীয় যাহা-কিছু ভালো তাহা গ্রহণপূর্বক জাতীয় রীতি-নীতি আচার-আচরণ ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া ইহাকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করিয়া তুলিতে পারিলেই তবে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইবে। শিক্ষিত বাঙালী সন্তানদের কর্মশক্তি এবং স্বাবলম্বনের অভাব পদে পদে দেখা যায়। ইহার মূলে রহিয়াছে শিক্ষাপদ্ধতির ভুলত্রুটি।

বেথুন সোসাইটির পঞ্চম মাসিক বা সাধারণ অধিবেশন হইল ১৮৬৯ সনের ২৫শে মার্চ।

এদিনকার প্রধান বক্তা পাদ্রী চার্লস্ এম. গ্রান্ট। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল : "Grecian Mythology" বা গ্রীসদেশের পুরাণশাস্ত্র— তথা পৌরাণিক দেবদেবী সম্পর্কে। তিনি প্রথমে প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ যেমন অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতির ক্রিয়া ও প্রকোপ হইতে বিভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রীকদের মনে যে সব ধারণা জন্মে তাহার উল্লেখ করেন। এই সকলই পরে এক-একটি দেবতারূপে কল্পিত হয়। এই ধরণের কল্পনা বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্যে বিধৃত রহিয়াছে। গ্রীক 'Zeus', লাটিন 'Deus', সংস্কৃত 'Devas' ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বক্তা উল্লেখ করেন। গ্রীকগণ ক্রমে মানুষের বিভিন্ন বিদ্যা এবং গুণাবলীর ধারক-বাহকরূপেও এক-একটি দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের এই প্রকার উচ্চতর ধারণা হইতেই এইরূপ বলিষ্ঠ এবং মাধুর্যময় স্থাপত্যের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। কল্পিত বা সৃষ্ট দেবতাগণকে গ্রীকেরা ক্রমে মানুষের মতই কারিয়া লন এবং মানুষের দোষগুণ, সুখদুঃখ, শোকতাপ প্রভৃতিও তাহাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। এই সময়েও কিন্তু গ্রীকজাতির মনে এক এবং অবিনশ্বর ঐশী শক্তির ভাবনার উন্মেষ হয় নাই, বিভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন শক্তির প্রতীক বলিয়াই গ্রীকেরা ক্ষান্ত ছিল। গ্রীক-চিন্তা যেখানে উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে তাহার পরেই এক ঐশী শক্তির ভাবনা সমাজচিত্তে দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে এই কথা বলা যায় যে, পরবর্তী এক ঈশ্বরের ধারণার নিকট পূর্ববর্তী গ্রীক ধারণা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের।

সভাপতি ফিয়ার বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় কোন কোন বিষয়ে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার মতে গ্রীসের একেবারে প্রথম যুগের পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে আরও আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। বিভিন্ন দেশের পুরাণ শাস্ত্র তথা পৌরাণিক কাহিনী ও দেবদেবীর সৃষ্টি বা উদ্ভবের মধ্যে বেশ একটা মিল রহিয়াছে। ভবিষ্যতে সোসাইটির কোন অধিবেশনে হিন্দু মাইথলজি বা পৌরাণিকী সম্বন্ধে তথ্যমূলক আলোচনায় যদি কেহ অগ্রসর হন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধেও অনেক নূতন কথা জানা যাইবে।

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ছিলেন সোসাইটির ষষ্ঠ বা শেষ মাসিক অধিবেশনে (২৯শে এপ্রিল, ১৮৬৯) প্রধান বক্তা। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল : "The Effects of English Education upon Bengali Society" বা বাঙালী সমাজের উপরে ইংরেজী শিক্ষার ফল। সে যুগের শিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারা তখন বিভিন্ন বিষয়ে কোন্ খাতে প্রধাবিত হইতেছিল এই বক্তৃতা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বক্তা প্রথমেই বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে যুগ যুগ সঞ্চিত কু-ধারণা কু-সংস্কার এবং কু-অভ্যাসগুলি আমরা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেছি। অতঃপর তিনি ইংরেজী শিক্ষার ফলে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিমানসে ও সমষ্টিগত চিন্তায় কিরূপ সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। সমাজের ভিতর হইতে বাল্যবিবাহ নিরাকৃত হইতেছে, যৌথ-পরিবার প্রথা ভাঙিয়া গিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশ সম্ভব হইতেছে, অসবর্ণ বিবাহও

কিছু কিছু সংঘটিত হইয়া উচ্চ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মিলনও ঘটিতেছে। আহারে নিষিদ্ধ বস্তু বলিয়া কিছু এখন আর নাই বলিলেই হয়। পংক্তিভোজনে আপত্তি একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে।

তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সমাজের যতখানি সংস্কার হওয়া উচিত তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। আংশিকভাবে নিজেদের অভ্যাস সংস্কৃত ও পরিমার্জিত হইবার সুযোগ হইয়াছে বটে, কিন্তু সংস্কারসাধন পুরাপুরি না হইলে তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই হয় বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথমে তিনি সুরাপানের কথা উল্লেখ করেন। ইউরোপীয় সমাজে সুরাপান একটি প্রাত্যহিক এবং সামাজিক রীতি। ইউরোপীয়েরা যাহাতে সুরাপান করিতে গিয়া সংযম না হারায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। কেহ সংযম হারাইলে তাহার প্রতি সামাজিক শাস্তিবিধানেরও যথোচিত বিধিব্যবস্থা আছে। এদেশবাসীরা সুরাপান প্রথার অনুকরণ করিতে গিয়া অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। এখন সমাজের পক্ষে ইহা একটি অভিশাপ বলিয়া গণ্য হয়। সুরাপান নিবারক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার দ্বারাও ইহার গতি রোধ করা সম্ভব হইতেছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সচেতন হইয়াছিলেন। শিক্ষাদ্বারা নারীচিত্ত উৎকর্ষিত হইবে, কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান উন্নত না হইলে নানা কুফল ঘটিবারই সম্ভাবনা। আবার নারীরা শিক্ষালাভের ফলে যদি পুরুষের সমান বলিয়া কি সামাজিক কি অন্যবিধ ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অনেক অনর্থের হাত হইতে আমরা রেহাই পাইতে পারি। সুরাপায়ীদের অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার নিরাকরণে শিক্ষিতা নারীর ক্ষমতা বিস্তর।

বক্তা ভাষণের উপসংহারে বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক অনিয়ম ও অপ্রীতিকর কোন কোন বিধিব্যবস্থার দরুণ উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের মনে ইউরোপীয়গণের প্রতি একটি বিতৃষ্ণার ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবাসিগণের সর্ববিধ উন্নতির নিমিত্তই এখানে ইউরোপীয়দের অবস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন। এ সময়কার বাঙালীচিত্তে Nationality তথা বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতেছিল। এই বিষয়ে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর এবং হিন্দুমেলার উদ্ভাবক ও স্থাপয়িতা নবগোপাল মিত্রের কার্যকলাপ আমাদের অবশ্যই স্মরণীয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় "শিক্ষা-দর্পণে" এই ধরণের জাতীয়তার বিষয়েও অহরহ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বক্তা মনোমোহন ঘোষ এবম্প্রকার জাতীয়তা বা 'Nationality'র বিরুদ্ধে জাতিকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপীয়েরা তখনই যদি এদেশ হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলেরই হেতু হইবে সর্বপ্রকারে। তাঁহার ভাষণের এই অংশে প্রথম আমরা 'Quit' কথাটির প্রয়োগ পাইতেছি। প্রায় পচাত্তর বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর "Quit India" বা "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের মধ্যে ইহার পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি।

ভাষণের একস্থলে মনোমোহন ঘোষ বলেন যে,বাঙালী জাতিকে ইউরোপীয় আচার-আচরণ তথা অভ্যাসগুলি অন্ধভাবে গ্রহণ করিবার তিনি পক্ষপাতী নন। ভারতীয় শাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে অবশ্যই, কিন্তু তাহাও যেন নূতনকে গ্রহণের পথে বিঘ্ন না জন্মায়। জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বিবিধ চিন্তায় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ইহার অগ্রগতি আমরা কোনমতেই অস্বীকার করিতে পারি না। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য জ্ঞানভাণ্ডারে পূর্ণ। ইহার উন্নত রূপ সম্বন্ধেও কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। সমসময়ে ইহা জগতের মধ্যে যে-কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইতে উন্নততর অবস্থায় পৌছিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বিদ্যা ও আবিষ্কার সমূহের মানদণ্ডে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে উহাও অনেকটা পিছনে পড়িয়া আছে। কাজেই আমাদিগকে একটি সুস্থ, সবল ভারতীয় মহাজাতিতে পরিণত হইতে হইলে প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের এবং পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের উচ্চতর ভাবনা ও কর্মপ্রণালীর সমন্বয়সাধন করিতে হইবে।

পাদ্রী চার্লস এম. গ্রাণ্ট বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া প্রথমেই তাঁহার ভাষণের ভাষা-পারিপাট্যের প্রশংসা করেন। তাঁহার মতে পাশ্চাত্য সভ্যতার হুবহু অনুকরণ বাঙালী জাতির পক্ষে কখনই কল্যাণকর হইবে না। ইহার মন্দ দিকটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে উন্নতর উপায়গুলি গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি মন্দ দিকের দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বলেন যে, মার্কিন মুলুকে নারীর সর্বক্ষেত্র পুরুষের সমান হইবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা শুভফল প্রদান করিবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বক্তার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে নিজের ঐকমত্য প্রকাশ করেন। বাঙালী জাতির সত্যকার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক আচরণের সংস্কার সাধন আবশ্যক। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের আদর্শ তাহাদের গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির সম্মিলিত প্রযত্নে উভয়েরই উপকার সাধিত হইবে। তিনি Nationality বা বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত জাতীয়তায় বিশ্বাসী নন। হিন্দু জাতির কথা উল্লেখ করিয়া, দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন যে, যুগে যুগে হিন্দু সমাজে এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনা করিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বর্তমান যুগে তাহাদের প্রকৃত উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞানসাধনা। সভা সমিতি করিয়া বা শুধু সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে ইহা সম্ভব নয়। এই সাধনা প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানীশ্রেষ্ঠগণের মত নিভৃত কক্ষে করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট হইতে সমান ব্যবহার আশা করিবার পূর্বে তাহাদিগকে সাধ্যমত বিজ্ঞান অনুশীলনে তৎপর হইতে হইবে।

কালীমোহন দাস বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষার দরুণ সামাজিক বিবর্তনের অথবা ইংরেজী শিক্ষায় সমাজের উপরে প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধেই বক্তা এবং অন্যান্যেরা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার

দিকে আমাদিগের যেন মোটেই দৃষ্টি পড়ে না। ইংরেজী শিক্ষার ফলে বিবিধ কুসংস্কার বর্জিত হইতেছে। শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি বহু দেবতার পূজার পরিবর্তে এক ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে সমাজে নানারূপ সংস্কার সাধনও সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু বলেন, ইউরোপীয় আচার-আচরণ সমাজমধ্যে প্রবর্তিত যে হইবে তাহা কাহারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে না। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ইহা কতকটা স্বাভাবিক ভাবেই আসিবে। তিনি বলেন, এই পরিণতির জন্য কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইউরোপের যাহা ভালো তাহা আমরা সর্বপ্রকারে গ্রহণ করিতে শিখিব, মন্দ দিক বর্জিতই হইবে।

সভাপতি ফিয়ার উপসংহারে মূল বক্তাকে এরূপ একটি হৃদয়গ্রাহী অথচ সময়োপযোগী বক্তৃতার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি ভাষণের মূল উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন যে, ইউরোপীয়দের হুবহু অনুকরণ না করিয়া যাহাতে তাহাদের গুণাবলীর আদর্শে বাঙালী সমাজ সংস্কৃত মার্জিত ও সংশোধিত হইয়া উন্নততর হইতে পারে ইহাই বক্তা বলিতে চাহিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারেই এই পরিবর্তন সম্ভব হইবে, ইহাও তাঁহার অভিমত। 'ন্যাশনালিটি' কথাটির উল্লেখ করিয়া ফিয়ার বলেন যে, বাঙালীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং ইউরোপীয়দের সংস্রবে আসিবার ফলে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা করা অমূলক। তিনি বিশেষ করিয়া পাদ্রী গ্রাণ্টের কোন কোন উক্তির প্রতিবাদ করেন। ইউরোপীয় সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা স্বীকৃত। কোথাও কোথাও কিছু অনাচার বা স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা লক্ষিত হইলেও মূলে নারী-পুরুষের এতাদৃশ ব্যবহারসাম্যহেতুই পাশ্চাত্য দেশসমূহের এত দ্রুত উন্নতি সাধিত হইতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার মন্দ দিকটির উপরে জোর না দিয়া তাহার দ্বারা এদেশের অধিবাসীদের কিরূপে হিতসাধন হইতে পারে সেই কথাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া আবশ্যক। কারণ আমরা সকলেই বর্তমান বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজের সত্যকার উন্নতি চাই।

বেথুন সোসাইটির প্রথম আঠারো বৎসরের কার্যকলাপ এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহার পরে সোসাইটি যে অন্যূন কুড়ি (২০) বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ আমরা কয়েকটি সূত্র হইতে পাইতেছি। এরূপ একটি সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই হয়তো প্রথম যুগের বার্ষিক, মাসিক এবং বিশেষ অধিবেশনগুলির বিবরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই সকল বিবরণের উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া সোসাইটির প্রথম আট-নয় বৎসরের ইতিহাস

সংকলন করিতে সক্ষম হইয়াছি। সোসাইটির দুইখানি ট্র্যানজ্যাক্‌শনস্‌ পুস্তক[1] আমার হস্তগত হয়, ইহা হইতে ১৮৫৯-৬৯ এই দশ বৎসরে সোসাইটি যে সকল কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তাহার পরিচয় প্রদান আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। শেষ কুড়ি বৎসরে বেথুন সোসাইটির কর্তৃপক্ষ কোন ট্র্যানজ্যাক্‌শনস্‌ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা জানিতে পারি নাই। প্রথম যুগে যেমন সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনের বিষয় প্রকাশিত হইত পরবর্তীকালে, অন্ততঃ যে সমুদয় পত্র-পত্রিকা আমার দেখিবার ও পাঠ করিবার সুযোগ হইয়াছে তাহাতে এ সকল প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। কাজেই সোসাইটির এ সময়কার ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করা সম্ভব হইল না। সে যুগের প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক (১৮৫৪-৬৩) রামচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠাবধি সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ইহার দ্বিতীয় সম্পাদক (১৮৫৪-৬০)। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি সোসাইটির প্রথম যুগের কার্যকলাপ সোৎসাহে সম্পন্ন করেন। ১৮৭৪ সনের প্রারম্ভে রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। বেথুন সোসাইটি যে অধিবেশনে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে, তাহার বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল দেখিয়াছি।

সোসাইটির আর একটি অধিবেশনের বিবরণও কথঞ্চিৎ আমাদের পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দ্বাবিংশতি বর্ষে বেথুন সোসাইটিতে ২৯ এপ্রিল, ১৮৮১ সনে (৮ই বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) "সংগীত ও ভাব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সংগীত সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কণ্ঠসংগীত দ্বারাও তিনি সভাজনদের আনন্দ দান করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটির আলোচনা-অংশ ভারতীতে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) প্রকাশিত হয়।[2] এই দিনকার সভায় সভাপতিত্ব করেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেথুন সোসাইটির তৃতীয় বারের উল্লেখ আর-একটি সূত্র হইতে আমরা পাইয়াছি।

১. এই পুস্তক দুইখানির নাম আখ্যাপত্রে নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে :

1. The Proceedings of The Bethune Soceity for the Sessions of 1859-60, 1860-61. (1862)

2. The Proceedings And Transactions Of The Bethune Society From November 10th 1859 To April 20th 1869. (1870)

২. এ সম্বন্ধে 'ভারতী'-সম্পাদক লেখেন : "এই বক্তৃতাতে বক্তার মত উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় বহু সংখ্যক গান গাহিয়া কি কি সুর-বিন্যাস দ্বারা কি কি ভাব প্রকাশিত হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক গানের ভাবকে ও তৎসঙ্গে সুরকে বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন। সে সকল উদাহরণে কণ্ঠের সাহায্য আবশ্যক, এ নিমিত্ত সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইল, কেবলমাত্র ভূমিকা ও উপসংহার প্রকাশিত হইতেছে।—সং"

মনস্বী বিপিচনন্দ্র পাল ৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ তারিখে বেথুন সোসাইটির একটি অধিবেশনে—"The Present Social Reaction : What Does It Mean ?" -শীর্ষক একটি মৌখিক বক্তৃতা দেন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সিবিলিয়ান হেনরী জে. এস্. কটন্ (ভারত-হিতৈষী এবং ১৯০৪ সনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি)। এই বক্তৃতাটি পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্র আত্মজীবনীতে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরির পূর্বজ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাধ্যক্ষপদ লাভে এই বক্তৃতাটি বিশেষ সহায় হয়। ইহার পর বেথুন সোসাইটির কোন উল্লেখই আর কোথাও পাই নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীজীবনের উন্নতি-চিন্তা ও উন্নয়ন কার্যে বেথুন সোসাইটি যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এমনটি একক অন্য কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঙালী চিত্তে প্রাচীন ও নবীন ভাবনার সংযোগ এবং সংমিশ্রণে যে নব জাগরণের উদ্ভব হয় তাহার মূলে বেথুন সোসাইটির দান রহিয়াছে অনেকখানি।

ভ্রম সংশোধন

পৃ. ২৬৮ পঙক্তি ২৪ জন্ ব্যাঙ ফিয়ার স্থলে জন্ বার্ড ফিয়ার পড়িতে হইবে

বাঙ্গলার গ্রামের নামে অনার্য ও দেশী উপাদান

শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির আর্যশাখা ভারতে সর্বপ্রথমে কখন আসিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন আমাদের নাই। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে আর্য জাতি ইরাণ হইতে ভারতে আসিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেন। আর্য জাতি যখন তাহাদের বৈদিক ভাষা ও মহান সংস্কৃতি লইয়া এই দেশে আসিলেন, তখন দ্রাবিড় ও অস্ট্রো-এসিয়াটিক (Austro-Asiatic) গোষ্ঠীর কোল, মুণ্ডা, সাঁওতালী প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষগণ ভারতে বাস করিত। আর্যেরা ছিলেন সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী, অপর দিকে অনার্য জাতিরা ছিল বিচ্ছিন্ন। তাহাদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। সুতরাং আর্যদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির নিকট তাহারা পরাজয় বরণ করিল। ফলে বিজিত অনার্যগণ সুসভ্য আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আস্তে আস্তে গ্রহণ করিতে লাগিল। অপরপক্ষে বিজেতা আর্যেরা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যদের ভাষাগুলি হইতে বহু শব্দ ও তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি কিছু কিছু গ্রহণ করিলেন। এইরূপে আর্য অনার্যের সংমিশ্রণের ফলে নূতন সমাজব্যবস্থার পত্তন হইল। অনার্যেরা ছিল মুখ্যতঃ প্রকৃতির উপাসক। আর্য অনার্যের মিলনের পরে আর্যেতর জাতিগুলির দেবতারা আর্যপূজায়তনে স্বীকৃতিলাভ করিলেন।

অনার্যগণ কর্তৃক আর্যদের ভাষা গ্রহণ করিবার ফলে বৈদিকযুগ হইতেই ভাষার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসিতে থাকে। এই পরিবর্তন শুধু ধ্বনিগত নয়, সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডারেও এই আদিম ভাষাগুলি হইতে বহু শব্দ গৃহীত হয়। এমন-কি বেদের মধ্যেও দুই চারিটি শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি মূলতঃ প্রাগার্য ভাষার শব্দ [যেমন—ঘোটক, শিথিল প্রভৃতি]। এইরূপ সংস্কৃতের মধ্যেও বহু শব্দ বা ধাতু পাওয়া যায়— যেগুলির মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের অনার্য ভাষাগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় [যেমন—লড্ডুক, হড্ডিক প্রভৃতি শব্দ, খিট্ট, খট্ট প্রভৃতি ধাতু]। উচ্চারণরীতি ও বাক্যের আভ্যন্তরীণ রূপের মধ্যেও একটা লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আসিতে থাকে। যেমন, ট-বর্গের ধ্বনিগুলি মূলতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ছিল না। এই বর্ণগুলি সম্ভবতঃ দ্রাবিড় কিংবা অষ্ট্রিক ভাষা হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে। তালব্য বর্ণগুলির উচ্চারণরীতি প্রাকৃতযুগ হইতেই পরিবর্তিত হইতে থাকে। বর্তমানে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে চ-বর্গের ধ্বনিগুলি ঘৃষ্টবর্ণে (Affricate) রূপান্তরিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে মারাঠী গুজরাটী ও সিন্ধী ভাষায় কণ্ঠনালীয় (Glottal stop) স্পর্শ ধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণগুলির এই প্রকার উচ্চারণ ভারতের অন্যান্য আর্যভাষাগুলিতে দৃষ্ট হয় না।

এই উচ্চারণরীতিও সম্ভবতঃ অনার্য ভাষাগুলির প্রভাবের ফল। উত্তর ভারত অপেক্ষা পূর্ব ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে অনার্য উপাদান বেশী করিয়া পাওয়া যায়। ইহার কারণ

পূর্ব ভারতে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা যে শব্দগুলিকে "দেশী" পর্যায়ে ফেলিয়াছেন সেইগুলিও নিঃসন্দেহে অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে "প্রতিধ্বনি" বা "অনুকার" শব্দ (Echo words) পাওয়া যায়। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতেও অনুরূপ শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে [যেমন, জলটল, দুধটুধ, ঘোড়াটোড়া প্রভৃতি]। আধুনিক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মাতঙ্গ, অলাবু, কদলী, তাম্বুল, মরিচ, লাঙ্গল প্রভৃতি শব্দগুলি অষ্ট্রো-এসিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে। সেই প্রকার অনল, অগুরু, কানন, কটু, কুটিল, কুণ্ড, কুন্তল, চন্দন, তুলা, পণ্ডিত, ময়ূর, মুকুট, মালা, শব প্রভৃতি শব্দগুলি দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

অনুরূপ ভাবে বাংলার গ্রামের নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে এমন অনেক শব্দ বা প্রত্যয় পাওয়া যায় যেগুলি মূলতঃ অনার্য ভাষাগুলি হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত কতকগুলি গ্রামের নাম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এইগুলিও আর্য ভাষা হইতে গৃহীত হয় নাই [যথা—অঝডা চৌবল, পিণ্ডারবীটি জোটিকা, আউহাগড্ডী, মোডালন্দী প্রভৃতি]।

এতদ্ব্যতীত অনুশাসনে প্রাপ্ত গ্রামের নামের শেষে জোল, জোলী, জোট, জোটিকা, হিটি, ভিটি, গড্ড, গড্ডী, পোল, বোল, কুণ্ড, কুণ্ডি, চবটি, চবাড়, বড়া প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন যে এই শব্দগুলি দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। [পৃষ্ঠা—৬৫-৬৭]।

নিম্নলিখিত গ্রামের নামগুলি আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এই নামগুলি বা নামগুলির অন্তর্গত প্রত্যয়গুলি দ্রাবিড়, অস্ট্রিক বা ভোট-বর্মণ জাতির ভাষাগুলি হইতে আসিয়াছে।

(১) আম্রেড়িত বা দ্বিত্ব (Reduplicated names) :—

এই ধরণের গ্রামের নাম অস্ট্রিক ভাষারই প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমিত হয়। যথা—দমদম (চব্বিশ পরগণা) [চপ]; বজবজ (চপ), কোল কোল (বর্ধমান) [বর্ধ]; বুদবুদ (বর্ধ), টংটঙ্গি (ময়মনসিংহ) [ময়]; জলজলি (মেদিনীপুর) [মেদি]; গড়গড়ি (রাজসাহী) [রাজ]; করকরি (বীরভূম, বাঁকুড়া) [বীর, বাঁ]; জামজামি (খুলনা) [খু]; ঝলঝলিয়া (মালদহ) [মাল]; ঠনঠনিয়া (বগুড়া, কলিকাতা) [ব, কলি]; ঝুরঝুরিয়া (পাবনা) [পা]; ঝুমঝুমি (হাওড়া) [হা], ভেড়ভেড়ি (রংপুর) [রং]; ভুরভুরিয়া (ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম) [ত্রি, চট্ট]; চকচকা (ঢাকা) [ঢা]; হলহলিয়া (ব); ঝুনঝুনি (বর্ধ); চিরুচিকা (মেদি); ভুরভুরিয়া (ত্রি, পা, চট্ট); বিনবিনা (রং); হুলহুলিয়া (পা, খু); ভূতভূতি (মেদি, বর্ধ); সীমাসীমা (বর্ধ); হদহদি (বর্ধ); ভুমভুমি (মেদি), কুরকুবা (বর্ধ); দগদগা (ময়); প্রভৃতি।

(২) ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ (Onomatopoetic and echo words) :—

আইহাই (রাজ) ; লট্‌পটিয়া (নোয়াখালী) [নোয়া] ; দলবলিয়া (বর্ধ) ; ঝিলিমিলি (বাঁ, মেদি, বর্ধ) ; কড়মড়িয়া (ময়) , আকুরটাকুর (ময়) ; ইন্দাবিন্দা (বাঁ) ; কেলেমেলে (বাঁ, মেদি) ; ঘোড়দৌড় (ব) ; ভুধেবুধে (বর্ধ) , ধামধুম (রং) , যশাবিশা (মেদি) , শৈলমাইল (বীর) ; হিলিমিলি (চট্ট) ; হুহাস্থহা (দিনাজপুর) [দিনা] , চকবগা (বাঁ) ; বিরিসিরি (ঢা) , লালিপালি (মুর্শিদাবাদ) [মুর্শি] , হাসিবাসি (ঢা) ; হুআকুআ (ব) , প্রভৃতি ।

(৩) কুণ্ড, কুণ্ডা, কুণ্ডি, কুণ্ড :—

এই শব্দগুলি দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত (তুলনীয়—তেলুগু কোণ্ড (পাহাড়, পাথর, অর্থে) ; তামিল, মালয়ালাম্ কুন্ট্ (গর্ত, জলাশয় অর্থে)

যথা—বিলাইকুণ্ড (মেদি) ; নোনাকুণ্ড (হা) ; তৈলকুণ্ড (পা) ; লাড়ুয়াকুণ্ড (ঢা) ; মুড়িয়াকুণ্ড (ঢা) ; শোলাকুণ্ড (ফরিদপুর) , [ফরি] ; মারকুণ্ডা (মেদি) ; ভুরকুণ্ডা (মুর্শি, চপ, বর্ধ, বাঁ) ; ধনকুণ্ডা (ঢা) , কোচকুণ্ডা (বাঁ) ; সোনাইকুণ্ডি (যশোহর) [যশো] খলিসাকুণ্ডি (নদীয়া) [ন] , চাউলকুণ্ডি (মেদি) , নাইকুণ্ডি (মেদি) ; কামারকুণ্ড (হুগলী) [হু] ; যুগীকুণ্ড [হু] , টুকুনিয়াকুণ্ড (চপ, মেদি) ; সীতাকুণ্ড (চট্ট, মেদি, চপ) প্রভৃতি ।

(৪) কুড়, কুড়া (তুলনীয় তামিল, মালয়ালাম কুন্ট্ , কানাড়া, কোড)

যথা—মহিষকুড (খু, যশো) ; রাজকুড় (ঢা) ; ভুসকুড (রাজ) ; সোণাকুড় (ফরি, বাঁ, খু, বর্ধ) ; সোলাকুড়া (খু) , ধানকুড়া (ময়, বর্ধ) , নলকুড়া (যশো, চপ) ; মউয়াকুড়া (<মধুক) (ময়) ।

কুড়ি, কুড়িয়া (সাঁওতালী "কুড়ি" শব্দেরও প্রভাব থাকিতে পারে) । পিচকুড়ি (বর্ধ) ; জিলাকুড়ি (মেদি) , কইলাকুড়ি (<কপিলা) (বীর) , আলতাকুড়ি (<অলক্ত) (ময়) ; গেণ্ডকুড়ি (রং) ; ঝিনাইকুড়ি (দিনা, মাল) , বোদাকুড়ি (বীর) , কুজকুড়িয়া (বাঁ) ; শিলাকুড়িয়া (ময়) ; বিহারকুড়িয়া (মেদি) প্রভৃতি ।

(৫) কোট, কোটা (বাড়ী, দুর্গ অর্থে)—দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় (তুলনীয় তামিল, কানাড়া—কুট্টু)

যথা—ভাণ্ডার কোট (খু) ; মঙ্গলকোট (যশো, বর্ধ) ; পাকাকোট (মাল) ; ফুলকোট (রাজ) ; ফৈরকোট (নোআ) , পাটাকোটা (চট্ট) হিজলকোটা (পা) ; কুইকোটা (মেদি) আশ্বিনকোটা (মেদি) প্রভৃতি ।

(৬) জোল, জোলি, জুলী :—গ্রামের নামের শেষে জোল, জোলা শব্দগুলি (নদী, জল, খাল, অর্থে) দ্রাবিড় ভাষার জোট, জোটিকা শব্দগুলি হইতে আসিয়াছে । ধর্মপালের খালিমপুর অনুশাসনে জোট, জোটিকা শব্দগুলি পাওয়া যায় ।

যথা—বাঁকাজোল (বাঁ) ; কাঁকড়াজোল (হু) সোনাজোল (হু, মাল) ; শিংজোল

পুঁটিজোল (মুর্শি) ; নাড়াজোল (মেদি) ; বাগাজোল (বাঁ) ; খাড়জোলী (বর্ধ) , কইজুলি (বীর) ; তলজুলি (মেদি) ; আমজোল (মুর্শি) প্রভৃতি ;

(৭) জোড়, জোড়া, জুড়ি, জুড়িয়া প্রভৃতি শব্দগুলিও দ্রাবিড় জোট, জোটিকা হইতে আসিয়াছে।

যথা—পাপিয়াজোড় (ময়) , কেওড়জোড় (ময়) ; হাইলজোড় (ঢা) ; হুইজোড় (পা) , ফুলজোড় (ব) ; বাকলজোড়া (ময়) ; বাটাজোড়া (বরি) ; শুকজোড়া (বাঁ) , কবণজোড়া (বাঁ) , ভাইজোড়া (বরি) , দাপানজুড়ি (বাঁ) ; ডোমজুড়ি (বরি) ; বাটাজুড়ি (চট্ট) ; পালাইজুড়ি (ঢা) ; বাইনজুড়ি (চট্ট) ; পালাজুড়িয়া (বাঁ) ; নেকড়াজুড়িয়া (বর্ধ) প্রভৃতি।

(৮) ঝরা, ঝরি, ঝরিয়া, ঝুরি, ঝোর, ঝোরু প্রভৃতি শব্দগুলি কানাড়ীয় ছোরু (soru) (জল, জলপ্রবাহ অর্থে) শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

যথা—নলঝরা (মেদি) ; পালঝরি (মেদি) ; পাটাঝরিয়া (মেদি) , কেতকিঝরিয়া (মেদি) , তালঝরিয়া (বাঁ) , কইঝুরি (মেদি) ; ফুলঝুরি (মেদি) ; বুড়িঝোরে (বাঁ) ; বাটিঝোর (বীর) , আসনঝুরি (বাঁ) , কর্ণঝোরা (ময়) ; বিরিঝোরা (ঢা) ; পাথর ঝোরা (জলপাইগুড়ি) [জল] , বলহিঝোরা (দার্জিলিং) [দার্জি] , সিঙ্গিঝোরা (দার্জি) , সাঁকোঝোরা (জল) (<সংক্রম) প্রভৃতি।

(৯) ভিটা, ভিটি (বাড়ী, বাড়ীর জমি) :—দ্রাবিড় হিট্টি শব্দ ভিটা, ভিটিরূপে গ্রামের নামে পাওয়া যায়। হিট্টি, ভিট্টি শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত গ্রামের নামগুলিতেও দেখা যায় (তুলনীয়—তামিল বিড়ু, বিট্টু—বাড়ী অর্থ)।

যথা—হিরিভিটা (ময়) ; রাঙ্গাভিটা (মাল) ; বনভিটা (ব) , যুগীভিটা (দার্জি) , বেতভিটা (যশো) ; করিয়াভিটা (খু) , চৈতারভিটা (ময়) প্রভৃতি।

(১০) গুড়া, গুড়ি :—গ্রামের নামে প্রাপ্ত গুড়া, গুড়ি শব্দগুলি দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে। (তুলনীয়—তেলুগু—গড্ড, কানাড়ীয় গড্ডে, নদীর তীর, পার অর্থে)। এই নামগুলি সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গেই দৃষ্ট হয়।

যথা—ভালাগুড়ি (রং) , বৈরাতিগুড়ি (জল) ; বিন্নাগুড়ি (জল) ; বল্লালগুড়ি (রং) ডোহাগুড়ি (দার্জি) ; বাউগুড়ি (দার্জি) ; তেঁতুলগুড়ি (দার্জি) ; শিলিগুড়ি (দার্জি) ; কেন্দুয়াগুড়ি (বর্ধ) ; নেমরাগুড়ি (হু) পায়রাগুড়ি (বাঁ) প্রভৃতি।

(১১) পোল, ভোল :—এই শব্দ দুইটিও দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত। (তুলনীয়—তেলুগু পোলমু, কানাড়ীয় পোলন—মাঠ অর্থে)।

যথা—পিপলা পোল (খু) ; বেনাপোল (যশো) ; আলতাপোল (যশো) ; যোগীপোল (চপ) ; গিলাপোল (নদী) [ন] , গুড়েপোল (হা) ; বাগাতাপোল (বরি) ; কাশিয়া ভোল (মেদি) ; কপতি ভোল (মেদি) প্রভৃতি।

(১২) শোল, শোলা, শুলি (নদী, খাল, জল অর্থে) :—গ্রামের নামের শেষে শোল, শুলি

প্রভৃতি শব্দগুলি জোল, জোলীর মতই দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে। এই শব্দগুলি সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতেই পাওয়া যায়।

যথা— আসানশোল (বর্ধ), শিয়ারশোল (বর্ধ, বীর), টাঙ্গাশোল (মেদি), ভেতুয়াশোল (মেদি); খুদিয়াশোল (মেদি), আশনাশোল (বাঁ), মহুলাশোল (বীর), ফেগুয়াশোল (বাঁ), জুনশোলা (মেদি); হাতিয়াগুলি (মেদি); টাংগুলি (বীর), নোলগুলি (বীর); পিণ্ডরাগুলি (মেদি) প্রভৃতি।

(১৩) ড়া, ডী :—গ্রামের নামের শেষে ডা, ড়ী প্রত্যয়গুলির অধিকাংশই দ্রাবিড় "বড়া" কিংবা কোলশব্দ "ওডক" (বাড়ী অর্থে) হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যথা— দাদড়া (ময়); জাওড়া (ত্রি); জাজিডা (ঢা); বলোডা (নোআ), চাওড়া (খু); বাবডা (যশো), হিলোডা (মুর্শি), হাদিডা (মেদি), ওথডা (চট্ট), ধাবড়া (মাল), কয়ডা (বাজ, ময়), কলোডা (হা), সোমডা (হু), ঢামড়া (বীর), বাঁকুড়া (মেদি, হা, যশো, বাঁ), নেতড়া (চপ), খোকডা (পা), হুনড়ি (বীর); ঘুনডী (চপ), ঢেংডি (মুর্শি), টিওডি (ঢা) ইত্যাদি।

আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে ডা < সংস্কৃত বাটক, ডী < সংস্কৃত বাটিকা হইতে আসিয়াছে। যথা—দিয়াডা < দ্বীপ বাটক (ময়, খু) আগড়া < অগ্রবাটক (যশো, মেদি), চন্দড়া < চন্দ্রবাটক (বর্ধ, যশো), বিলাড়া < বিল্ববাটক (হু), ওঝডা < উপাধ্যায় বাটক (মুর্শি), দেয়াড়া < দেববাটক (বাঁ); ইন্দড়া < ইন্দ্রবাটক (ঢা), গোয়াডী < গোপবাটিকা (ন); বেলড়ী < বিল্ববাটিকা (বর্ধ) প্রভৃতি।

মল্লাসারুল তাম্রশাসনে কপিস্তবাটক (= আধুনিক কৈতারা) ও মধুবাটক (= আধুনিক মহড়া, মওড়া) নাম পাওয়া যায়।

(১৪) হাকণ্ড শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। (তুলনীয়—তামিল অণডই—পার্শ্ববর্তী, মাঠের উচ্চ অংশ)।

যথা—ছোট হাকণ্ড (মেদি); গুজি হাকণ্ড (মেদি)।

(১৫) দা, দহ, দহা, দহি শব্দগুলি কোল শব্দ "দাক্" (নদী, জল অর্থে) হইতে আসিয়াছে। অনেকে অবশ্য হ্রদ > দহ, দা, (বর্ণ বিপর্যয়ে) হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।

যথা—চাকদা (ঢা, চপ); হলদা (যশো), নেওদা (চপ), আমুদা (ত্রি), মাকরদা (হা); ধলদা (মাল), শোলদা (দার্জি), খোলদা (বর্ধ), সোরঙ্গদা (বাঁ), নওদা (বর্ধ, মুর্শি), সাবলদহ (মুর্শি), সাটিদহ (হু); শিয়ালদহ (চপ), দানদহ (রাজ); লুনদহ (বাজ, পা); পুটিয়াদহ (ঝাঁ), লাউদহা (বীর); কেউদহা (বীর), ডমদহা (বাঁ); নরদহি (ময়); ইলামদহি (রাজ), আমলাদহি (বাঁ); কালিদহি (মেদি) প্রভৃতি।

(১৬) কোল, কোলা, কুলি (নদী, খাল, জল অর্থে) :—এই শব্দগুলি অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত।

যথা—পরাসকোল (মুর্শি), কেশেকোল (বাঁ), উলাকোল (যশো); ধাওয়াকোল (ব), উষাইকোল (পা); শৈলকোলা (দিনা); নাটাকোলা (রাজ); হইকোলা (ফরি), নেটকুলি (মুর্শি); পিড়রাকুলি (মেদি); তেঁতুলকুলি (হা); কাঁটাকুলি (বাঁ) প্রভৃতি।

(১৭) বাড়—এই শব্দটিও অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত। (তুলনীয়—হো, বাবুরে, বাহির বাহির অর্থে)

যথা—বাড়বলিয়া (মেদি), বাড়বাকড়া (বাঁ), বাড়মাথুরি (মেদি); বাড়যশুয়া (মেদি)।

(১৮) বির, বু—(বন অর্থে) সাঁওতালী ভাষা হইতে আসিয়াছে।

যথা—বিরশিমুল (বর্ধ), বিরবান্দী (মেদি), বিরমাস্কা (পা); বিরগুছিলা (ময়); বিরগইলা (ময়), বিরঘসা (মেদি), বিরফুলিয়া (ব); বৃচিকলি (ময়), বুকুৎসা (রাজ), বুহাচলা (যশো) প্রভৃতি।

(১৯) চঙ্গ (বসতি অর্থে) ভোট-বর্মণ ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা—চঙ্গবিরৈ (ময়), চঙ্গডাঙ্গা (ঢা), বানিয়াচঙ্গ (ত্রি); মৈনচঙ্গ (ত্রি); ফকিরাচঙ্গ (চট্ট) প্রভৃতি।

(২০) চু, চো (জল অর্থে) ভোট-বর্মণ ভাষা হইতে আসিয়াছে। চু, চো—শব্দবিশিষ্ট গ্রামের নামগুলি শুধুমাত্র ত্রিপুরা জিলায় পাওয়া যায়। যথা—দাড়াচু, লাড়ুচু; কালিয়া চো; পাপাচো, সানিচো; নারাচো; রাণীচো প্রভৃতি।

(২১) কোচজাতির নাম অনুসারে ও কয়েকটি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। যথা—কোচবিহার, কোচক্ষীরা (ময়), কোচপাড়া (ময়); কোচচর (ঢা) প্রভৃতি।

(২২) গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত অঙ্গ, অঙ্গী, অঙ্গি (নদী, জল অর্থে) শব্দগুলি ভোট-বর্মণ ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যথা—করঙ্গ (খু); তিলঙ্গ (বর্ধ), সবঙ্গ, দলঙ্গ, কেলঙ্গ (মেদি); হারঙ্গ (ত্রি); উদঙ্গ (হা), দহিলঙ্গ (ময়); ধুরঙ্গ (চট্ট); টেটঙ্গ (চট্ট), নাটাঙ্গ (চট্ট, ময়); নাপাঙ্গ (ত্রি); পাইনাঙ্গ (চট্ট), সরঙ্গা (বর্ধ), গরঙ্গা (মেদি), সলঙ্গা (মেদি), জলঙ্গা (ব), মলঙ্গা (বরি), উচঙ্গা (ত্রি); সাপলঙ্গা (চট্ট); বুড়ঙ্গি (রং); ঝলঙ্গি (জল); নারাঙ্গি (বাঁ), এরঙ্গি (বীর)। অঙ্গা প্রত্যয়ান্ত নামগুলি "গঙ্গা" হইতেও আসিতে পারে। কাটঙ্গা (= ? কাটাগঙ্গা), বরঙ্গা (= ? বড়গঙ্গা)।

নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে "দেশী" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত। এই শব্দগুলিও সম্ভবতঃ অনার্যদের ভাষা হইতে আসিয়াছে।

(১) খড়ি (নদী অর্থে):—

যথা—খড়িগোদা (চপ), খড়িগাড়া (বাঁ); খড়িবোলা (বাঁ)।

(২) খয়রা (একপ্রকার মাছ)

খয়রাবাড়ী (ময়) ; খয়রাশোল (বর্ধ)।

(৩) ঘিলা (একপ্রকার ফল) :—

ঘিলাচৌকা (ময়) ; ঘিলাকান্দী (ময়), ঘিলাসাইর (ঢা)।

(৪) ঘুঘু :—

ঘুঘুজানি (বাঁ), ঘুঘুমারি (ময়), ঘুঘুডাঙ্গা (চপ), ঘুঘুদহ (যশো)।

(৫) ঘোলা :—

ঘোলা বাড়ী (ময়), ঘোলা পাড়া (ময়)।

(৬) ঘোল :—

ঘোলসাহী (মেদি), ঘোলসুণ্ডি (মেদি), ঘোল সাহাপুর (চপ)।

(৭) চর :—

চরলাম কাইন (ময়), চরসিন্দুর (ঢা), চরহড়কা (বরি), চর নাপাঙ্গ (ত্রি), চর ধুরঙ্গ (চট্ট), [নাপাঙ্গ ও ধুরঙ্গ শব্দ দুইটি ভোট-বর্মণ ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়]। চর মালিপাটন (খু), চর মহুলা (মুর্শি), চর মাথুরি (মেদি) প্রভৃতি।

(৮) ছন (খড় অর্থে) :—

ছন খোলা (বরি), ছন খরিয়া (খু, ত্রি), ছন খাদা (যশো), ছনহাল (ময়), ছন রাশিয়া (মেদি)।

(৯) ঝাল [ছড়ি বা ছড়ির সমষ্টি] :—

ঝালকাঠি (বরি), ঝালপাড়া (ময়)।

(১০) ঝিকর (গাছ অর্থে) :—

ঝিকরগাছা (যশো, ময়), ঝিকরডাঙ্গা (বর্ধ), ঝিকরহাটি (বীর, ফরি)।

(১১) টিটা :—

টিটাগড় (চপ), টিটাহার (রাজ), টিটামারি (রাজ)।

(১২) টেঁক (উচ্চভূমি) :—

টেঁক ছাতিয়ান (ঢা), টেঁকনোয়াদ্দা (ঢা), টেক কাথোয়া (ঢা), গাজির টেঁক (ফরি) ; বতুর্ল টেঁক (ঢা) ; কলার টেঁক (ত্রি)।

(১৩) নল খড়, (ডাঁটা অর্থে) :—

নল নাওডাঙ্গা (মাল) ; নলহারা (ময়), নলসোন্দা (ময়), নলচাপরা (ময়)।

(১৪) পল, পলা (খড় অর্থে) :—

পলসারা (বীর) ; পলসোনা (বর্ধ)।

(১৫) বাউ (ফল বিশেষ) :—

বাউশালা (খু) ; বাউফল (ময়),

(১৬) বাওর (নদীর ধারে ঝোঁপ) :—

বাওর খাট্‌রা (যশো), বাওর ডাঙ্গা (যশো), বাওর খেদাপাড়া (যশো)।

(১৭) বিল (জলাভূমি) : –

বিলকাথুলি (খু), বিল এড়ল (যশো), বিলষণ্ডা (বর্ধ), বিলচাকিলা (ন); বিলসিঙ্গলা (ময়), বিলখুকসিয়া (যশো)।

(১৮) হোগল (গাছবিশেষ) :—

হোগল ডহরা (খু), হোগলদাড়া (চপ); হোগলবেড়্যা (মেদি)।

(১৯) খাড়া (নদীর ধারে উচ্চভূমি) :—

গোড়খাড়া (চপ), রাজখাড়া (মুর্শি)।

(২০) খিল, খিলা (অনুর্বর ভূমি) :—

আগুয়ান খিল (নোয়া), নাহারখিল (নোয়া); হাজিরখিল (চট্ট), টাইরখিল (ত্রি); পাবনখিল (ময়), ভীমখিল (ত্রি); আকবরখিলা (ময়), গায়সখিলা (ময়); রংখিলা (বর্ধ), বাতুখিলা (বাঁ),

(২১) খুন্দা (খনন অর্থে) :—

নেকড়াখুন্দা (মেদি), কুসুমখুন্দা (বাঁ)।

(২২) খুপী (সঙ্কীর্ণ স্থান বা আশ্রয়) :—

পারইখপী (যশো), কুকুরাখুপী (মেদি)।

(২৩) খুর (খনন অর্থে) :—

বেলখুর (ব); পানিখুর (নোয়া)।

(২৪) খুলি, খুলিয়া (নীচু জমি) :—

তেঁতুলখুলি (চপ), তিলাখুলি (মেদি), সুবর্ণখুলি (হু), চাটরাখুলিয়া (মেদি); বাগাখুলিয়া (বাঁ)।

(২৫) খৈর (নদী, খাল অর্থে) :—

হরিদ্রাখৈর (রাজ), সলখৈর (মাল), মহাখৈর (দিন), চাটখৈর (ব); চোরখৈর (রাজ)।

(২৬) খোড়া (?) :—

পানিখোড়া (ত্রি); সালুখোড়া (ত্র)।

(২৭) খোলা (জমি, মাঠ অর্থে) :—

আখড়াখোলা (আখড়া < অক্ষবাটক) (খু), কায়েমখোলা (খু, পা); ধোপাখোলা (খু, যশো), পিপুলখোলা (ল), সরখোলা (হু); কাউলাখোলা (ময়); ইটখোলা (ঢা, নোয়া), নাসিরখোলা (ত্রি)।

(২৮) গড়, গড়া, গড়ি, গড়িয়া, গড়্যা :—

হাওড়াগড় (ময়); ধামগড় (ঢা); টোরাগড় (ত্রি), মুরাদগড় (খু); পানাগড় (বর্ধ), হুমগড় (ময়); ইন্দ্রগড় (হা); নমাজগড় (হু); চিলাগড়া (ময়); আজগড়া

(ময়, ত্রি, খু) ; সিলাইগড়া (চট্ট), পাচগড়া (হু) ; ভীমগড়া (বীর) ; বইগড়ি (হা), আলাগড়ি (বর্ধ) ; জিগলগডি (দিনা), টোপগড়িয়া (মেদি), দামরাগড়িয়া (বাঁ), আলিসাগড়িয়া (হু) ; কাটাগড়্যা (বর্ধ, হু), ঘুটগড়্যা (বরি), বেহারগড়্যা (বাঁ) প্রভৃতি।

(২৯) গোদা (পাহাড়ের ক্রোড়দেশ) :—ফুটিগোদা (চপ), জোতগোদা (বর্ধ), নাগরগোদা (মেদি), কেলেগোদা (মেদি)।

(৩০) ঘোনা (বাঁশের তৈয়ারী মাছ ধরিবার ফাঁদ বিশেষ) :—ফলিয়া ঘোনা (ময়); চেগার ঘোনা (ঢা) ; আন্দর ঘোনা (চট্ট), নোনাঘোনা (চপ), নলঘোনা (খু, চপ)।

(৩১) ঘোপ :—

গুড়ার ঘোপ (যশো) ; হাড়িয়ার ঘোপ (যশো), তুলনীয় যুগীযোপা—(আসাম)

(৩২) ছড়া :—

মিটাছড়া (চট্ট), ধনিছড়া (চট্ট), ধান্যছড়া (মেদি), কলাছড়া (হু), নামছড়া (বাঁ), আকছড়া (মেদি)।

(৩৩) ছাড়া :—

কলাছড়া (হু), নেংটিছাড়া (জল), মুড়াছাড়া (বাঁ)

(৩৪) ছড়ি (ছোট পাহাড়িয়া নদী) :—

মেঘাছড়ি (চট্ট), ভরণছড়ি (চট্ট) ; নোনাছড়ি (চট্ট),

শ্রীহট্ট এবং কাছাড জিলায় ছড়ি শব্দ দিয়া বহু গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

(৩৫) ছিরা (?) :—

স্বর্ণছিরা (মেদি), ছাগলছিরা (যশো),

(৩৬) টাঙ্গা (উচ্চভূমি) :—

কাউয়াটাঙ্গা (বাঁ)।

(৩৭) টিকর, টিকরি, টিকুড়ি (উচ্চভূমি, পাহাড) :—

সরাইটিকর (বর্ধ), শাঁকটিকর (বর্ধ) (শাঁকটিকর বর্তমানে শক্তিগড় হইয়াছে), সোনাটিকরি (যশো, খু, চপ), উলাসটিকরি (বর্ধ), লোআটিকরি (মেদি), বালিটিকরি (ব, হু) ; নামটিকরি (মাল), গঙ্গাটিকুরি (বর্ধ), ধুলটিকুরি (বীর), মহিষটিকুরি (হু) প্রভৃতি।

(৩৮) টোলা, টুলি (গ্রাম, পাড়া) :—

নাইয়াটোলা (ঢা) ; ক্ষেত্রিটোলা (ফর) ; উগরিটোলা (মাল), কুমিটোলা (মুর্শি) ; ফিরিঙ্গিটোলা (মেদি) ; মোগলটুলি (চট্ট), পাঠানটুলি (চট্ট) ; নওদাটুলি (মুর্শি) ; হরিণটুলি (বাঁ) ;

(৩৯) ডগি (চূড়া) :—

গিমাডগি (বরি), কেওড়াডগি (বরি, নোয়া); কুমরডগী (নোয়া); আবুয়াডগি (নোয়া);

(৪০) ডহর, ডহরি (পুকুর, হ্রদ অর্থে) [সংস্কৃত হ্রদ হইতেও আসিতে পারে— তুলনীয়—পালি দহর] :—

যথা :—বামন ডহর (ময়, খু), কোক ডহর (ময়), খলিসা ডহর (ঢা), মেঘডহর (মাল), হোগল ডহরা (খু), শাল ডহরা (মেদি, বাঁ), জাম ডহরি (বাঁ), কামডহরি (চপ)।

(৪১) ডাঙ্গা, ডাইঙ্গ, ডাঙ্গরি, ডাঙ্গুরি, ডুঙ্গুরি (উচ্চভূমি) :—

উলুডাঙ্গা (চপ, খু), মুগীডাঙ্গা (যশো), চুয়াডাঙ্গা যশো, নদী, বর্ধ, (বাঁ), ঘুঘুডাঙ্গা (চপ, মেদি), ঘোড়াডাঙ্গা (বর্ধ, বাঁ), তুরকডাঙ্গা (বর্ধ), পলতাডাঙ্গা (যশো); হালসীডাঙ্গা (বীর), মোল্লাডাইঙ্গ (রাজ), কাঠাল ডাঙ্গুরি (ময়), পিঠা ডুঙ্গুরি (বাঁ), ভালকা ডুঙ্গরি (বাঁ), যোগীর ডাঙ্গুরি (ময়)।

(৪২) ডালা, ডালি :—

একডালা (বর্ধ), বরণডালা (বর্ধ), নগরডালা (পা), রাজাডালি (মেদি), শুখাডালি (বাঁ), ডাঙ্গাডালি (মেদি)।

(৪৩) ডুবি, ডোব (নীচুজমি, জলাজমি) :—

কন্যাডুবি (খু), শৈলডুবি) খু, যশো), পাথারডুবি (হা), ঘোড়াডুবি (বাঁ); নাওডুবি (ফরি), পাঠাডুবি (বাঁ), ভৈষডুবি (দাজি), ধলডোব (পা), মাজডোব (যশো), মেট্যাল ডোবা (বাঁ), ভুই ডোবা (ব), মুক ডোবা (ফরি)।

(৪৪) পাহাড়, পাহাড়ী :—

গড়ের পাহাড় (মুর্শি), তুরুপাহাড় (বর্ধ), সিহিকা পাহাড়ী (বাঁ), নেকড়াপাহাড়ী (বাঁ)।

(৪৫) বাইদ (নীচুজমি অর্থে) :—

ধানালীবাইদ (ময়), চিতারবাইদ (ময়), সল্লাবাইদ (ঢা), ছাতিনবাইদ (বাঁ), করবাবাইদ (বর্ধ); হারবাইদ (ঢা)।

(৪৬) বেদা, বেদি, বেদিয়া :—

এই শব্দগুলি দিয়া গ্রামের নাম কেবলমাত্র বাঁকুড়া জিলায় পাওয়া যায়।

যথা—জামবেদা, কৈদাবাদ, স্থরিবেদিয়া, সারসবেদিয়া, কাশিবেদ্যা প্রভৃতি।

(৪৭) বোত (?)

বাড়ীবোত (বর্ধ), সারবোত (বর্ধ)।

(৪৮) (শংকা) সম্ভবতঃ সাঁওতালী ভাষা হইতে আসিয়াছে।

এই শব্দ দ্বারা গ্রামের নাম শুধুমাত্র বীরভূম জিলায় দেখা যায়।

যথা—বনশংকা, বাঁশশংকা, ভুবশংকা।

(৪৯) (হাল তীর অর্থে) ঃ—

মাটিহাল (মেদি), ধান্যহাল (হু)।

(৫০) হুলা (?)

কাজির হুলা (খু), ঘোনার হুলা (খু); সোনার হুলা (চপ).

মোটামুটি ভাবে গ্রামের নামের উপর অনার্য প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাঙ্গলাদেশে আর্যভাষা ও সভ্যতার আগমনের বহুপূর্ব হইতেই অনার্যগণ এই দেশে বাস করিত। অষ্ট্রিক ও ভোট-বর্মণ ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। পূর্ববঙ্গের উপভাষা ও গ্রামের নামগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে ভোট-বর্মণ ভাষার উপাদান রহিয়াছে। ভারতের অনার্য ভাষাগুলির সম্যক আলোচনা হইলে এই দেশের সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং সর্বোপরি আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

দীপ্তি ত্রিপাঠী

বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ মধ্যবর্তী যুগের কবিকুলে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী অন্যতম। এ যুগের কবিদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ এঁদের কাব্য ছিল মন্ময়। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও যেমন এঁদের প্রীতি ছিল, ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গেও তেমনি পরিচয় ছিল। তবে ঝোঁকটা ছিল দেশজ সাহিত্যের প্রতি। পূর্ববর্তী যুগের ইংরেজিনবীস কবিরা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শকে মুখ্য করে তুলেছিলেন। ক্রম-জাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এ যুগের কবিদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। তৃতীয়তঃ দৃঢ়পিনদ্ধ ক্লাসিক বন্ধন ছিন্ন করে এঁরা রোম্যান্টিক অনুভূতিকে তাঁদের কাব্যে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করলেন। ফলে বাংলা কাব্যের গতি যেমন নতুন মোড় নিল তেমনি আবার তার মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটিও দেখা গেল। ক্লাসিক সংযম বিনষ্ট হওয়ায় কাব্যে দেখা দিল হৃদয়াবেগের প্রাবল্য, ছন্দে ও শব্দ চয়নে লালিত্য সত্ত্বেও ভাব-ভাষার অসামঞ্জস্যে কবি-কৃতির শিথিলতা। এ যুগের কবি বৃন্দের উপর বিহারীলালের প্রভাব সমধিক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রভাবও অন্তর্ভৌম পথে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষতঃ স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব সে যুগের প্রায় সব কবির উপরেই পড়েছিল। এই কবি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান হলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অক্ষয় বড়াল ও কামিনী রায়। (স্বর্ণকুমারী দেবীর উপর বঙ্কিমচন্দ্র ও মানকুমারী বসুর উপর মধুসূদনের প্রভাব অধিক ছিল)। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায় এ দুজন মহিলা কবির ধাতটি ছিল লিরিক্যাল। এঁদের কাব্যে তাই যুগের সুরটি প্রতিধ্বনিত।

নারীসমাজ তখনও গৃহের চতুঃসীমা ছাড়িয়ে বাইরের দিকে পা ফেলে নি। সে যুগে অনুকূল পরিবেশ না পেলে লেখিকা হওয়া সহজ ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয় গিরীন্দ্রমোহিনী এদিক থেকে ভাগ্যবতী ছিলেন। পিতামহী উমাসুন্দরী দেবী ও পিতা হারাণচন্দ্র মিত্র যেমন শৈশবেই তার মধ্যে কাব্যানুরাগের বীজটি বপন করেছিলেন তেমনি পতিগৃহে স্বামী নরেশচন্দ্রের উৎসাহ তাকে ফলে-ফুলে বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। এ ছাড়া সাহিত্যিক জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকূল সমালোচনা, 'ভারতী' সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সখ্য, 'সাহিত্য' সম্পাদক ও তৎকালীন যুগের প্রখ্যাতনামা কঠোর সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির পৃষ্ঠপোষকতা, অক্ষয়কুমার বড়াল ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সাহায্য, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সহকারিতা ও 'বসুমতী' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্য লাভ করে গেছেন।

কবির শ্বশুরালয় সাবিত্রী লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম সভ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি বলে এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর সখী বলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যে পড়েছে। (১২৯৪ সালের ভারতী ও বালকে) হেঁয়ালীনাট্য লিখে যে কয়জন লেখক লেখিকা সে যুগের পাঠক পাঠিকাদের আনন্দ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, হিরণ্ময়ী ও গিরীন্দ্রমোহিনী।

অবশ্য এমন অনুকূল পরিবেশ স্বর্ণকুমারী দেবী ও কামিনী রায়ও পেয়েছিলেন। কিন্তু এঁরা দুজনেই ছিলেন আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা। সেদিক থেকে গিরীন্দ্রমোহিনীকে স্বভাব-কবি পর্যায়ে ফেলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ থাকলেও যাকে **Formal Education** বলে সে ধরণের শিক্ষা তাঁর ইস্কুলেই শেষ হয়েছিল। তাই কি তাঁর রচনায় একটি বাঙ্গালী নারী-মানসের আশা, আকাঙ্ক্ষা এমন স্বাভাবিক পরিবেশে দেখি ?

পিতামহী-সংগৃহীত দেশীয় কাব্য যথা কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ইসুফ জোলেখা, বাসবদত্তা, যোজনগন্ধা, কোকিলদূত ইত্যাদি সেকালের কাব্যকাহিনী তাঁর পড়া ছিল। সেই সঙ্গে পিতার নির্দেশিত ইংরেজি সাহিত্যগ্রন্থের মধ্যে পল অ্যাণ্ড ভর্জিনিয়া, থিয়োডোসিয়াস, কনস্টানশিয়া প্রভৃতি তিনি পড়েছিলেন। তাঁর কোনো কোনো কবিতায় ('দাম্পত্য প্রণয়,' 'সখীর প্রতি ডেসডিমোনা') শেক্সপীয়র পাঠের পরিচয় আছে। এ-ছাড়া অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র ও বিহারীলালের কবিতা তিনি পড়তেন।

কিন্তু এসব পাঠ করে থাকলেও কবিকে মোটামুটি স্বশিক্ষিতা (self-educated) বলা অন্যায় হবে না। আন্তরিকতা ও সততা তাই তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ। কোন আড়ম্বর বা কৃত্রিমতার পরিচয় সেখানে পাই না। কিন্তু স্বভাব-কবির মেজাজ থাকলেও গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনা কোথাও অমার্জিত নয়। তাঁর প্রথম দিকের কাব্যে পূর্বসূরীদের অনুকরণ চেষ্টা খুবই প্রবল। তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্ট দেখা গেল অশ্রুকণাতে। একটি সুকুমার শিল্পী-মানস সর্বদাই তাঁর রচনার পশ্চাতে জাগ্রত। এবং শুধু রচনাবলীতেই নয় তাঁর গৃহকর্মে, রন্ধন প্রতিভায়, সূচীশিল্পে, চিত্র অঙ্কণে প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে তাঁর নৈপুণ্যের যে কথা শোনা যায়, তাতে এই শিল্পী মনেরই প্রকাশ দেখি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। শোনা যায় এ গ্রন্থের প্রথম চারটি পত্রই স্বামীকে লিখিত এবং শেষ পত্রটি সম্ভবতঃ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে লিখিত।[১]

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাহার' প্রকাশিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) কবিতা-গ্রন্থটির প্রশংসা করে বলেন—"ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহা কোন প্রকারেই অল্প বয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আশীর্বাদ করি, নবীনা গ্রন্থকর্ত্রী সর্বসুখভাগিনী হউন।" বাস্তবিক বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, শব্দ চয়নে, ছন্দের নৈপুণ্যে কবি

---

১. মানসী ও মর্মবাণী, কার্তিক ১৩৩২-এ প্রকাশিত।

যে বয়সের তুলনায় পরিণত মানসের অধিকারিণী ছিলেন তা গ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন গিরীন্দ্রমোহিনী ঠিক সাধারণ অন্তঃপুরিকা ছিলেন না। শৈশব থেকে অন্যান্য সংকবির মত তাঁর মন ছিল সূক্ষ্ম সংবেদনশীল এবং দৃষ্টি ছিল দূরপ্রসারী। পত্র রচনায় তাঁর পরিণত মানসের পরিচয়ের কথা ইতিপূর্বে বলেছি। 'কবিতাহার' পাঠ করে দীনবন্ধু মিত্রও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং কবিকে তাঁর নাটকাবলী উপহার দেন। মহীয়সী মেরি কার্পেন্টার এজন্য তাঁর সাক্ষাতের অভিলাষিণী হন। যদিও নানা কারণে আর তা হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু পরবর্তী কবিতা পাঠ করলে দেখা যাবে তাঁর প্রতিভা তখনও ঠিক বিকশিত হয় নি। মহাজনদের অনুসরণে প্রস্তুতির পথে কবি ধীরে ধীরে পা ফেলছেন যেন। 'কবিতাহার' এবং পরবর্তী কাব্য 'ভারতকুসুমে' (১৮৮২) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও হেমচন্দ্রের প্রভাব অধিক, বিহারীলালের স্বল্প। অবশ্য বিষয় অনুসারে বিহারীলালের প্রভাব স্বতই এসেছে। যেমন 'উষাবর্ণনে'।

> হে শুভ্রবসনা, লোহিত বরণা
> তোমার উদয়ে জগৎ মাঝে
> সকলেই সুখী, সবারি বাসনা
> হেরিতে তোমারে মোহিনী সাজে।

কিন্তু ঐ কবিতাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও পাশাপাশি আছেন,—

> চাতক চীৎকার করিছে সঘনে,
> জলদ! জল দে, জল দে রবে।

'বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা' কবিতাটি সে যুগের মেয়েদের একটি সুন্দর চিত্র। কি প্রতিকূল পরিবেশে যে মেয়েদের শিক্ষালাভ করতে হত এতে তারই বর্ণনা আছে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও হেমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

> আমাদের মধ্যে যদি কোন বিনোদিনী
> লেখে যদি ধরি করে কখন লেখনী।
> শাশুড়ী আসিয়া তার বাঘিনীর প্রায়
> বলে আজি কেবা রক্ষা করে দেখি আয়।

বিষয় নির্বাচনেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যেমন—শরৎ বর্ণন, লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু।

'ভারতকুসুম' যদিও কবির পরিণত বয়সে মুদ্রিত হয় কিন্তু এতে বাল্য রচনাও কিছু ছিল। এখানেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র ও বিহারীলাল পাশাপাশি আছেন। 'পতিভক্তি' সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতে বিহারীলালের মধুর সুর যেমন ধ্বনিত—

> কে তুমি সুন্দরী! বিষণ্ণ বদনে?
> সমুজ্জ্বল তব সুন্দর তনু,

ঢাকিয়াছে হায়! যেন কাদম্বিনী,
অরুণে উদিত নবীন ভানু।

তেমনি গুপ্ত-কবির শ্লেষের ঝাঁজও রণিত। যেমন 'পুনঃ বিবি অনুকারী, অনেক সুন্দরী হয়েছে এখন বঙ্গের মাঝে!' অথবা 'বুটপরা মেয়ে বড় বালাই।' তাই বলে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির শুভ দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। যেমন,—'শ্বেতাঙ্গী রমণী, সভ্যতার খনি, বঙ্গবালা তাই কেন না হবে?' (পতিভক্তি, ভারতকুসুম) সেক্সপীয়রের প্রেমের আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করেছে দেখা যায়।

আহা! রোমিওর প্রাণ প্রেয়সী,
নারী জুলিয়েৎ রূপসী শশী,
পান করি প্রিয়-বিষাক্ত অধর,
পরিহরি প্রাণ প্রণয়ি-প্রবর,
ধরাতল ছাড়ি গেল রে!
এ পবিত্র প্রেম-সম কি আছে ভূতলে রে!

(দাম্পত্য প্রণয়, ভারতকুসুম)

শেষের দুই চরণের অন্তস্থ 'রে'তে হেমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি শুনি।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নরেশচন্দ্রের মৃত্যুতে গিরীন্দ্রমোহিনীর সমগ্র কবিসত্তার আমূল পরিবর্তন হয়। প্রচণ্ড শোকে হৃদয়ের অগ্নিগিরি থেকে বেদনার যে লাভাস্রোত নির্গত হল কবির সমগ্র জীবন ধরে তা প্রবাহিত হয়েছে। 'অশ্রুকণা'র মধ্যে এই প্রথম আঘাতের ধূম উদ্গীরণ ও মুহুর্মুহুঃ উৎক্ষেপের প্রাবল্য লক্ষণীয়। কবিমানস কবিতার তন্ময় রাজ্য ছেড়ে আশ্রয় নিল মন্ময় রাজ্যে। বিহারীলালের রোম্যান্টিক বিষাদের গভীরেও প্রিয়বিয়োগ বেদনা উহ্য ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনায় তা আরও স্পষ্ট। বিহারীলালের আত্মমগ্ন কল্পনার স্বপ্নময় লঘুতা গিরীন্দ্রমোহিনীতে নেই, আছে তীব্র বেদনার গুরুভার। অশান্ত কবির তাই আকুল প্রশ্ন,—

তবে কেন এত আড়ম্বর,
কেন তবে প্রকৃতি সুন্দর
কেন তব হৃদয়ে উল্লাস,

..

তুমি আমি শুধু যদি ছাই
জীবনের পরপার নাই—
কেন তবে এতেক আকুল
তুমি যদি ভস্মের পুতুল!

কেন বা বিহগ করে গান
লতিকায় কেন ফুটে ফুল ?

(ছাই, অশ্রুকণা)

কখনো তিনি উদাসিনী রাধিকা,—

আকুল ব্যাকুল হৃদি, কি যেন বাজিছে প্রাণে !
শূন্য দৃষ্টে চেয়ে আছি শূন্য আকাশের পানে !

(আকুল ব্যাকুল হৃদি, অশ্রুকণা)

কখনো বা রবীন্দ্রনাথের অনুরণন সেখানে ঢেউ তোলে,—

আজি বড় মনে পড়ে তায় !
বিগত সুখের কথা,
জাগাতে পুরাণ ব্যথা
মিশিয়াছে বাসন্তী সন্ধ্যায় !

(মনে পড়ে তায়, অশ্রুকণা)

কখনো সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছেন,—

তুমি কি গিয়াছ চলে ? না না, তা ত নয়
যদিন বাঁচিব আমি, তদিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো শুধু তোমা-ময় ।

(তুমি, অশ্রুকণা)

আবার কখনো দুঃখের তীব্র জ্বালায় জলতে চেয়েছেন,—

এই চির-প্রজ্বলিতা
সুখের প্রদীপ্ত চিতা
জ্বলুক অনন্তকাল—না চাহি নির্বাণ ,

(শ্মশান, অশ্রুকণা)

ভাগ্য বা ধর্মের কাছে আশ্রয়ভিক্ষা না করে অশান্ত হৃদয়ের সান্ত্বনাহীনতাকেই বরণ করে নেওয়া বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন । 'নব্যভারত' সমালোচক এজন্যই বলেছিলেন —"সর্বত্রই নূতন চিন্তা, নূতন ভাব,—নূতন গান"[১]... । অশ্রুকণা পরবর্তী এষা (১৯১২) প্রভৃতি বিখ্যাত শোক-কাব্যের প্রেরণা জুগিয়েছিল মনে হয়। অক্ষয়কুমার বড়াল অশ্রুকণার কবিতাগুলির সম্পাদন, নির্বাচন ও সংশোধন করেছিলেন বলে ভূমিকাতে কবি লিখেছেন, হয়তো সেই প্রসঙ্গে তিনি কবির বেদনার নিবিড় স্পর্শ পেয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের 'এষা' যেমন বিরহী পুরুষ মনকে রূপ দিয়েছে, গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা'ও তেমনি ফুটিয়েছে বিকীর্ণ মূর্ধজা বিরহিণী নারীর রূপ। 'অশ্রুকণা'র পূর্বে মানকুমারীর 'প্রিয়প্রসঙ্গ' (১৮৮৪) স্বামীবিয়োগ নিয়ে রচিত হলেও তা ছিল গদ্যপদ্যের মিশ্রণ। 'অশ্রুকণা'

১. নব্যভারত, আষাঢ়, ১২৯৪

নিছক লিরিক। নিবিড় ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের শ্রেষ্ঠ পথ লিরিকের পথ। স্বর্ণকুমারী 'অশ্রুকণা'কে বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতেও দ্বিধা করেন নি ·· "কারণ সে শোক উদার, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে।'" আর চন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন—"This is poetry in life and as expression of that poetry Asrukana is the history of the soul of a noble Hindu woman"[২] অনুভূতি প্রকাশের একান্ত সততাতেই 'অশ্রুকণা'র মূল্য। মহৎ কাব্যে যে নির্বিশেষত্বের স্পর্শ লাগে 'অশ্রুকণা'য় তার কিছু অভাব আছে সন্দেহ নেই। শোকের ভাবটি কবি-মানসে করুণরসের অলৌকিকত্বে সর্বদা পৌঁছতে পারে নি। কিন্তু একটি বেদনার্ত নারীহৃদয়ের বিভ্রান্ত মর্মভেদী রূপটি তার করুণ মাধুরী নিয়ে 'অশ্রুকণা'য় উজ্জ্বল,—কবিপ্রসিদ্ধির কৃত্রিমতায় তা বিড়ম্বিত নয়।

'অশ্রুকণা' প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য আছে। গ্রাম্যছবি অঙ্কনে কবির দক্ষতা দেখা গেল। 'গ্রাম্যছবি' ও 'গার্হস্থ্য চিত্র' নামে দুটি বহু মুদ্রিত কবিতা এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত। দীনবন্ধু মিত্রের 'রাত পোহাল ফর্সা হোল' কবিতাটির অনুসরণে রচিত 'পাড়াগাঁ' ও 'বর্ষা' কবিতা দুটিও কৌতূহলের বস্তু।

আভাষ (১৮৯০) প্রকৃতপক্ষে 'অশ্রুকণা'রই পরিশিষ্ট। চিত্রবিদ্যায় নিপুণা গিরীন্দ্রমোহিনী শোকাতুর হৃদয়ে স্বামীর চিত্র অঙ্কনে নিষ্ফলা হয়ে কবিতা রচনা করেছেন,—

কি করে লিখিব সই ?
লিখিতে তাহারে
তুলিকা না সরে
আঁখি-নীরে অন্ধ হই।

(কেমনে লিখিব, আভাষ)

যদিচ বিরহিণী নারীহৃদয় এ গ্রন্থেও বিধুর তবু মনে হয় কবি ধীরে ধীরে সুস্থ হতে চলেছেন। 'অশ্রুকণা'য় শোকের উন্মত্ততায় কবিতাকে বিদায় দিয়ে তিনি বলেছিলেন,—"কবিতা দাঁড়ায়ে কেন আর ?" আভাষে তিনিই বললেন,—

কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি,
লইয়া কোথাও চল,
মেঘের আঁধার ছেয়েছে গগন,
সই, ছেয়েছে মরমতল !

(বাদল, আভাষ)

অন্যত্র,—

বৈরাগ্যের নামে, কভু নির্মমতা, এসো না নিকটে মোর।
ভালবেসে সুখ, কেন না বাসিব, ছিঁড়িব মমতা-ডোর ?

(নির্মমতা, আভাষ)

১. ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৭ ২. ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৭

বিভিন্ন কবির বিচিত্র আঙ্গিকের অনুশীলন এখনো তিনি করে চলেছেন যেমন মধুসূদনের অনুসরণে রচিত 'কাকাতুয়া' কিংবা ভানুসিংহের পদাবলীর[১] অনুসরণে রচিত 'কাহে বালা পুছসি' ইত্যাদি। কিন্তু কবির মৌলিকতা এ গ্রন্থে বেশি পরিস্ফুট। 'প্রভাতে জলাক্ষেত্র,' 'নিদাঘে, 'গ্রামসন্ধ্যা,'[২] 'গ্রাম্যঝটিকা' প্রভৃতিতে গ্রাম্য ও গার্হস্থ্য চিত্র সুন্দর ফুটেছে। বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে রচিত 'কালের শিক্ষা' ও 'প্রাচীন' কবিতাদুটির মৌলিকতা লক্ষ্য করবার। উপমাতেও নতুনত্ব দেখা যায় যেমন—"গড়গড়িয়ে ডাকে মেঘ, জাঁতায় ডাল ভাঙা" (গ্রাম্যঝটিকা)। লৌকিক, তৎসম, ব্রজবুলি, ফার্সী এমনকি ইংরেজি শব্দও কবি অনায়াসে তার কবিতার জন্য চয়ন করে গেছেন। স্থানাভাবে আর তা আলোচিত হল না।

এই সময় থেকে কবি ক্রমশঃ সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্বন্ধে জড়িত হলেন। ১৮৯০ সালের এপ্রিলে সুরেশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশিত হোল এবং প্রথম বছরেই গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনা মুদ্রিত হয়। সম্ভবতঃ সেই পরিচয়ের ফলেই সুরেশচন্দ্র 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই' নাটক, 'শিখা ও অর্ঘ্য' কাব্যের প্রকাশক হন।

ভারতী সম্পাদিকার সঙ্গে সখ্য ইতিপূর্বে হয়েছিল। ১২৯৪ সালের ভারতী ও বালকে জ্যৈষ্ঠ থেকে মাঘ পর্যন্ত গিরীন্দ্রমোহিনীর বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হতে দেখি। যেমন,—জ্যৈষ্ঠ মাসে 'কে' ও 'আক্ষেপ', আষাঢ়ে 'আমি', ভাদ্রে 'হেঁয়ালী নাট্য' ও 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামক গদ্যরচনা 'তৃপ্তি'[৩] ও 'ভোগ', কার্তিকে 'ভুল', পৌষে 'মিলন ও বিরহ'[৪] নামক গিরীন্দ্রমোহিনী ও স্বর্ণকুমারীর বিখ্যাত উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা, মাঘে 'বসন্ত পঞ্চমী'[৫]। আভাষের বিভিন্ন কবিতায় দুই সহৃদয়হৃদয় সংবাদী-মহিলা সাহিত্যিকের চিত্র ছড়িয়ে আছে। 'কেন'? কবিতাটি স্বর্ণকুমারীর কন্যা হিরণ্ময়ীকে ও 'সরলা' সরলা দেবীকে লিখিত। এ প্রসঙ্গে সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণকুমারী তার 'স্নেহলতা' উপন্যাসখানি গিরীন্দ্রমোহিনীকে উৎসর্গ করেন ১২৯৬ সালে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সখিসমিতির অন্যতমা সদস্যা ছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী। ১২৯৮ সালের 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত সখিদের তালিকায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ওরফে Mrs. N. C. Dutt-এর নাম পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রমোহিনীও তাঁর 'শিখা' (১৩০৩) সখীকে উৎসর্গ করেন।

১ ভানুসিংহের পদাবলী ১২৮৪, আশ্বিন, ভারতীতে প্রকাশিত হতে সুরু হয়। আভাষ প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে।

২. গ্রাম্যসন্ধ্যা প্রথম প্রকাশিত হয় 'নব্যভারতে', ফাল্গুন ১২৯৪।

৩. প্রবন্ধ প্রতিভায় (বসুমতী গ্রন্থাবলী) 'তৃপ্তি' ও 'ভোগ' পরে মুদ্রিত হয়।

৪ 'মিলন ও বিরহ' আভাষে মুদ্রিত হয়।

৫. 'বসন্ত পঞ্চমী' পরে 'বীণাপাণি' নামে আভাষে মুদ্রিত হয়। ত্রিপদীছন্দের একটি সুন্দর উদাহরণ।

আভাষের পর কবি 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই' নাটক লেখেন (১৮৯২)। গ্রন্থটি পিতামহীকে উৎসর্গিত। এই পিতামহীর সংগৃহীত কাব্যখণ্ডগুলি একদা বালিকা কবির মনে কবিত্বপ্রীতি জাগিয়েছিল। সম্ভবতঃ তাঁর যে প্রীতি অন্তঃপুরের অন্তর্লোকে সীমাবদ্ধ ছিল গিরীন্দ্রমোহিনীতে তাই বিকশিত হয়ে সাধারণের সম্পদ হয়। 'আভাষ' কাব্যের 'কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি' কবিতাটি এই নাটকে বিরহী রত্নসিংহের মুখে দেওয়া হয়েছে। কাব্যনাট্যটির উপর রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী এবং বিসর্জনের প্রভাব আছে। যেমন ভীল বালিকা সোহিয়ার উক্তি, 'রাক্ষসী দিল না দেখা কঠিনা পাষাণী।' মীরার অনাসক্তি ও কুম্ভের প্রেমে সুমিত্রা ও বিক্রমের ছায়া আছে মনে হয়।

নাটকটিতে নতুনত্ব এই যে, মীরাবাই নাটক সাধারণতঃ শেষ হয় মীরার অন্তর্ধান ও কুম্ভের অনুতাপে কিন্তু এখানে কুম্ভের মৃত্যুতে শেষ করা হয়েছে। লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের বিরহই সম্ভবতঃ এর মূলে। এইজন্যই স্বর্ণকুমারী বলেছিলেন-"অশ্রুকণার পরে প্রকাশিত কাব্যেও এই শোকের ধারা বয়ে গেছে। কোথাও কলপ্লাবী সাগরের মত তা বিপুল কোথাও অন্তরবাহিনী ফল্গুর মত শীর্ণ রেখা।"

'শিখা' (১৮৯৬) স্বর্ণকুমারীর ভাষায় "পতিযজ্ঞের উজ্জ্বল হোমাগ্নি শিখা।" যদিও 'শিখা'ও বিরহের কাব্য কিন্তু 'অশ্রুকণা'র বেদনার তীব্র আত্যন্তিকতা সময়ের প্রলেপে তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। কবি হয়তো তাই শেষ কবিতায় বলেছেন,

সন্ধ্যার স্বর্ণ রাগে মরি পথ ভুলে—
কম্পিত এ শিখা ক্রমে হয়ে আসে ক্ষীণ
(শিখা, শিখা)

কবি ক্রমেই জীবনের বৈচিত্র্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কবিত্বের মাধুর্যে নিজেকে ফিরে পেতে সুরু করেছেন।

জীবন শ্মশান নয় অনন্তের নাট্যালয়
পাতিব নবীন সিংহাসন।
আবার জাগিছে ক্ষুধা পরিপূর্ণ প্রাণ সুধা
আহরি করিব সঞ্জীবন!
(বিদায় পর্য্যায়, শিখা)

এটা দুঃসাহসিক নয়। কারণ প্রকৃত কবি কখনোই জীবনবিমুখী হতে পারেন না। যদি গিরীন্দ্রমোহিনী তা হতেন, ধর্ম বা আর কিছুকে আশ্রয় করতেন তা হলে তিনি আর কবিতা রচনা করতে পারতেন না। জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে তাঁর কবি-মন বার বার আকৃষ্ট হচ্ছে, তৎসঙ্গে স্বামী-বিচ্ছেদ-বেদনা তরঙ্গের মত দুলে দুলে উঠে মাধুর্যকে বিষাদে বা বিষাদকে মাধুর্যে পরিণত করছে, সেই সঙ্ঘাতের তীব্র পেষণে কবিহৃদয় বিকশিত হচ্ছে। এই দ্বন্দ্বে গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিসত্তার উন্মোচন।

'শিখা'র পর 'অর্ঘ্য' (১৯০২)। কবি তখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন। একটি নিরাসক্ত বৈরাগিণীর দৃষ্টিতে তিনি জীবন ও প্রেমকে দেখছেন।

ঘন ঘনচ্ছায়ে ঘোর আকুল অন্তর মোর,
নবরূপে চাহে বঁধু সঁপিতে আপনা ;

(কবির প্রতি কবিপ্রিয়া, অর্ঘ্য)

অন্যত্র,

মনে হয় কে যেন
আমায় ভালবাসে ,
তাহার বাসনাখানি
মোর চারিপাশে

(পরশ ফাঁদ, অর্ঘ্য)

এ যেন তীব্র বিরহ অন্তে ভাবসম্মিলন। অথচ তাঁর বলিষ্ঠ সত্তা রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' বিশ্রুত কবিতাটিরই অনুপন্থী ছিল। ইতিপূর্বে আভাষে তিনি বলেছিলেন 'বৈরাগ্যের নামে কভু নির্মমতা এস না নিকটে মোর' এখানেও তিনি সেই কথাই বলেছেন,—

নিবাণ মুক্তি দিও না আমারে
মোহান্ধ-রমণী আমি,
সুন্দর এ ধরা ফিরে ফিরে মোরে
দিও হে জগত-স্বামী।

(ভিক্ষা, অর্ঘ্য)

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন গিরীন্দ্রমোহিনীর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 'অশ্রুকণা' থেকেই লক্ষণীয়। সে যুগের সমালোচকেরাও তা লক্ষ্য করেছিলেন। 'নব্যভারতে' (১২৯৪, আষাঢ) সমালোচনা করতে গিয়ে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী তখনি বলেছিলেন "স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়িয়াছে।" সমকালীন কবি বলে এ প্রভাব খুব স্বাভাবিক এবং তা স্বীকার করে নিয়েও তিনি গিরীন্দ্রমোহিনীকে মৌলিকতা বজায় রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার রশ্মিজালকে অপসারিত করা সহজ ছিল না। পারিবারিক সখ্য ও স্বভাবের প্রেরণাকে অস্বীকার করাও কি গিরীন্দ্রমোহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল? বিশেষতঃ রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে এ এক বিশেষ সমৃদ্ধ যুগ। ১২৮৯এ তাঁর 'প্রভাত সঙ্গীত' যখন লেখা হচ্ছে তখন গিরীন্দ্রমোহিনীর 'ভারত-কুসুম' প্রকাশিত হয়। 'অশ্রুকণা' প্রকাশের পূর্বেই 'ছবি ও গান,' 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয়েছে। 'মানসীর' সমযুগে 'আভাষ,' রাজা ও রানী এবং 'বিসর্জনের' পরে 'মীরাবাই' ; 'সোনার তরী—চিত্রা—চৈতালীর' পর লেখা হয়েছে 'অর্ঘ্য'। গিরীন্দ্রমোহিনীর উপর রবীন্দ্রপ্রভাব তাই 'অশ্রুকণা'র থেকে ক্রমেই গভীর হয়েছে। 'অশ্রুকণা'র 'ধীরে ধীরে', 'মনে পড়ে তায়' , 'আভাষের' 'নির্মমতা', 'মরণ', 'কাহে বালা

পুছসি' ইত্যাদির কথা পূর্বেই বলেছি। 'শিখার' 'ছবি', 'সুন্দরের প্রতি' এবং 'সোনার তরী'র 'কোনও কবিতা পাঠে' তুলনীয়। 'অর্ঘ্যে' সে প্রভাব গভীরতর।

১। অয়ি তন্বী শুচিস্মিতা, হে সুন্দরী অনিন্দিতা
অয়ি মম আলেখ্য-নিন্দিতা!

(চিত্রাঙ্কণে, অর্ঘ্য)

তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন।
জানি না মূলে।
গুঞ্জরি কেহ কহে কানে কানে,
কুহরিয়া কেহ গাহে বনে বনে,
তাই কভু আসে সংশয় মনে—
আপনা ভুলে,

(অপবাদ, অর্ঘ্য)

৩। অপূর্ব বাসনা যত অস্ফুট মুকুল মত—
ধূলায় বহিয়া গেল পড়ি।
জীবনের কত ব্রত, অসম্পূর্ণ চিত্র মত,
হেথা হোথা বল' ছড়াছড়ি।

(জীবন সন্ধ্যায়, অর্ঘ্য)

'অর্ঘ্যে'র পর কবির আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে 'স্বদেশিনী' ও ১৯০৭ সালে 'সিন্ধুগাথা'। 'স্বদেশিনী'র পেছনে সে যুগের স্বাদেশিক প্রেরণা ছিল। তা ছাড়া কবির অন্যতম মানসগুরু হেমচন্দ্রের প্রভাব ছিল মনে হয়। যেমন 'আত্মদ্রোহিতা'। সে যুগের অনেকগুলি ঘটনা কবি এতে ধরে রেখেছেন—'রাখী সংক্রান্তি, 'অঙ্গচ্ছেদ' ইত্যাদি। 'বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান'টি সে যুগের ভাঙা কীর্তন ও বাউল মিশ্রিত স্বদেশী গানের ধারাকে স্মরণে জাগায়। এই গ্রন্থের 'শিবাজী উৎসব' গানটি ১৩০৯ সালে সখারাম গণেশ দেউস্করের আহ্বানে পালিত শিবাজী উৎসবের সময় রচিত। সখারামের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথও এই সময় 'শিবাজীর দীক্ষা' রচনা করেন। বাংলার অন্তঃপুরিকারাও সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন— তার প্রমাণ গিরীন্দ্রমোহিনীর সংগীত। গানটির উপর সত্যেন্দ্রনাথের "মিলে সবে ভারত সন্তান" গানটির প্রভাব আছে মনে হয়। বসুমতী-গ্রন্থাবলীতে গানটি আছে কিন্তু ৯, ১০, ১১ চরণ ভুল মুদ্রিত হয়েছে। সে তিনটি চরণ উদ্ধৃত করলাম—

কত শিবময় সে শিব-বাহিনী![1]
কত শক্তিময় সে শিব-বাহিনী!
বল শিব শিব, জপ শিব বাণী,—

১. শিবাজী (সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত) ১৩১৩, বৈশাখ (শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের সংগ্রহে প্রাপ্ত)।

'সিন্ধুগাথা' কবি উৎসর্গ করেন স্বর্গীয় পিতাকে। স্বর্ণকুমারী এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"পতিস্মৃতি উদ্বেলিত হৃদয় সিন্ধুর গম্ভীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত।" কিন্তু মনে হয় 'অশ্রুকণা,' 'আভাষ' ও 'অর্ঘ্যে'র প্রতিভা যেন এখানে অবসিত। কয়েকটি সুন্দর চিত্রধর্মী কবিতা এখানেও আছে, কিন্তু ভাবধর্মের গভীরতা বিশেষ নেই। ১৩১৪ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, এ বছরেই কবি 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। প্রথম বছরে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতির রচনা ছিল। এই সময়কার রচনা 'অলক' ও 'প্রবন্ধ প্রতিভা'য় (বসুমতী গ্রন্থাবলী) স্থান পেয়েছে বলে ব্রজেনবাবু বলেছেন। কিন্তু 'অলকে'র দু-একটি কবিতা পূর্ববর্তী গ্রন্থেও দেখা যায়, যেমন—'বাদল' (আভাষ ও মীরাবাই), 'মন্ত্রহীনা' (অর্ঘ্য) ইত্যাদি।

'প্রবন্ধ-প্রতিভায়' কবির গদ্যরচনার নিদর্শন আছে। গিরীন্দ্রমোহিনী যে গদ্য ও পদ্যের জুড়িগাড়ি সমানে চালাতে পারতেন এ কথাটি না জানলে তার প্রতিভার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। "বুড়ার অ্যালবামে" যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আছে তবু রম্যরচনা হিসাবে এর মূল্য স্বীকার্য্য।

১। "'আমি' কে জান কি ? আমি তোমাদের সেই নির্জন সঙ্গিনী, আনন্দ, দুঃখ ও সুখ বিধায়িনী ত্রিকাল-চিত্রকরী শ্রীমতী স্মৃতি। আমারই লোহার সিন্ধুকটি বুড়ার সম্বল। ·····বুড়ার এ্যালবাম দেখিতে ভাল লাগিবে কি ? যাই হ'ক দেখিতে যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন দেখ।" (বুড়ার এ্যালবাম : প্রবন্ধ-প্রতিভা, বসুমতী গ্রন্থাবলী)

২। "যাহা কিছু সুন্দর, তাহার মধ্যেই অতৃপ্তি বিরাজিত, তাই যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই অনন্ত, তৃপ্তি সুখ নহে—উহা পার্থিব বস্তু, অতৃপ্তিই সুখ—অতৃপ্তি অনন্তের সোপান। ······প্রেম সুন্দরের মধ্যে সুন্দর প্রেম অনন্ত। সেই জন্যই প্রেমে এত অতৃপ্তি! প্রেম, তাই কি তোমাকে 'কোটি কোটি জনম হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ?' তুমি এক জন্মের আয়ত্ত নও বলিয়া, তুমি অনন্ত বলিয়া, তাই কি প্রকৃতি-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ প্রেমিক কবি তোমার উদ্দেশে বলিয়া গিয়াছেন 'লাখে না মিলল এক ?' জানি না তুমি কোন মহাযামিনীর সুখ-স্বপ্ন !" (তৃপ্তি, প্রবন্ধ-প্রতিভা, বসুমতী গ্রন্থাবলী)

১৩৩১ সালের ২৮শে শ্রাবণ গিরীন্দ্রমোহিনীর দেহান্তর ঘটে। তাঁর বেশ কিছু রচনা এখনো ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। যেমন 'জাহ্নবী' পত্রিকায় (১৩১৪) 'জাহ্নবী,' 'শ্রাবণে,' 'আতিথ্যে,' 'সুন্দরের প্রতি'; চন্দ্রনাথ বসুর 'সাবিত্রী-তত্ত্বে'র সমালোচনা। মাসিক বসুমতীতে (১৩৩৩) 'এই ত জীবন'; বার্ষিক বসুমতীতে (১৩৩৩) 'অমানিশার অশ্রু' ও 'পার্বতী', ; মাসিক বসুমতীতে (১৩৩৪) 'নববর্ষ' ইত্যাদি। উল্লিখিত কবিতাগুলির সবই যে কবিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে তা নয়। তবে কখনো কখনো সুন্দর চরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—

পদ্মকলির বুকের মাঝে
ব্যথার আঁখি-জল

আমার এই বুকেতে লুকিয়ে আছে
তরল মুক্তাফল। (অমানিশার অশ্রু)

প্রবন্ধটির পটভূমিকায় যে গ্রন্থগুলি আছে :—

১। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (পঞ্চম খণ্ড) ৫৫ সংখ্যা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী (বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির) ১৩৩৪ (১ম সং)
৩। শিবাজী, সখারাম গণেশ দেউস্কর বৈশাখ, ১৩১৩
৪। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০
৫। ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৭
৬। নব্যভারত, আষাঢ়, ১২৯৪
৭। জাহ্নবী, ১৩১৪
৮। মাসিক বসুমতী ও বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩৩
৯। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩০৪
১০। মানসী ও মর্মবাণী, কার্তিক, ১৩৩২
১১। ভারতী ও বালক, ১২৯৪
১২। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮৮০ শক

প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ

(২)

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

চ। কবি আত্মারামের সারদাচরিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে সরস্বতী মাহাত্ম্য-কাহিনীর একটি বিশিষ্ট ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধারার অন্যতম কবি দয়ারাম দাসের সারদাচরিত বা ধুলাকুটার পালা (ধুনাকুটা নহে) পাঠক সমাজে সুপরিচিত। আমরা সম্প্রতি কবি আত্মারামের সারদাচরিতের একখানি তালপত্রের পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথিখানির বিশেষত্ব এই যে, উহা উড়িয়া হরপে লেখা বাংলা পুঁথি। বঙ্গ-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে যেমন উড়িয়া হরপে বাংলা পুথি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই বাংলা হরপেও উড়িয়া পুঁথি সুদুর্লভ নয়।[1] আলোচ্য পুঁথির আকার ১৪"×১½", ৩৪ খানি পত্রে সম্পূর্ণ। উভয় পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তি করিয়া লেখা। পুঁথিতে পত্রাঙ্ক নাই, লিপিকালও নাই। বয়স আনুমানিক দেড়শত বৎসর। কবির ভণিতা—

> কবি আত্মারাম বলে সারদা চরণে। আপনি যাহারে দয়া করিলে স্বপনে॥
>
> কবি আত্মারামে বলে আপনার কর্ম্মফলে তুমি হবে সারদার দাস॥

দয়ারামের কাব্যের সহিত আত্মারামের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিতেছি। দয়ারামের কাব্যে সুরেশ্বরের রাজা সুবাহু শিবের বরে পুত্রলাভ করেন, আর আত্মারামের কাব্যে চাঁপদার অধিপতি চন্দ্রকেতু সরস্বতীর কৃপায় পুত্রের জনক হন। সুবাহুর পুত্রের নাম লক্ষধর, আর চন্দ্রকেতুর পুত্র জয়কেতু। লক্ষধর বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত কিছুই লেখাপড়া শিখিতে পারিল না, আর জয়কেতু অল্প বয়সে বিদ্যা অধিগত করিলেও, সরস্বতীর প্রতি ভক্তি না থাকায় দেবী তাহার সকল বিদ্যা হরণ করিলেন। দয়ারামের কাব্যে সুবাহু পুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেও, কোটাল কৌশলে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া বনবাস দিয়া আসিল, আর আত্মারামের কাব্যে চন্দ্রকেতু সরাসরি পুত্রের বনবাসের আদেশ প্রচার করেন। দয়ারামের কাব্যে সরস্বতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে লক্ষধরকে লালন করিতে লাগিলেন, আর আত্মারামের কাব্যে জয়কেতু বনে মেনকা মালিনীর ছয়কুড়ি ছাগল চরাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন ঘটনাক্রমে লক্ষধর 'বৈদের' দেশের রাজার পঞ্চকন্যার নিকট উপস্থিত হইল, আর জয়কেতু নিষিদ্ধ উত্তর দিকে ছাগল চরাইতে গিয়া পঞ্চ কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করিল। দয়ারামের কাব্যে শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে দেবী পূজা গ্রহণ করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়া গেলে, লক্ষধর তাঁহাকে খাটের খুরায় বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিল, আর

---

১. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পুঁথি সংখ্যা ৯৬৩

আত্মারামের কাব্যে দেবী কাঠবিড়ালীর বেশে পূজোপকরণ আহার করিতে আসিয়া জয়কেতুর 'আখা'র মধ্যে প্রবেশ করিলে, জয়কেতু আখার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া দেবীকে 'বালিয়ার ছাল' দিয়া প্রহার করিল। দয়ারামের কাব্যে শিক্ষক জনার্দন পণ্ডিতই পঞ্চকন্যা লইয়া পলায়নের মতলব করিয়াছিল, আর আত্মারামের কাব্যে শিক্ষক পুরন্দর চক্রবর্তীর পুত্র শুকদেব চক্রবর্তীই পঞ্চকন্যা লইয়া পলাইবার ফিকির খুঁজিয়াছিল। লক্ষধরের ডিঙ্গা গুরেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল, আর জয়কেতুর ডিঙ্গা সিংহলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছিল।

কাঁথি (মেদিনীপুর) নীহার প্রেস হইতে ১৩৫৭ সালে কবি আত্মারামের 'সারদামঙ্গল বা ধুলাকুটার পালা'র দ্বাদশ সংস্করণ বাহির হইতে দেখিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয়, এই পুস্তিকাটির প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকার বা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস লেখকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই। মেদিনীপুর নিবাসী স্বর্গীয় কেদারনাথ মণ্ডল মহাশয়ের নিকট আত্মারামের 'বাঘাম্বরের পালা' ও শীতলাচরণের 'সারদামঙ্গল' পুঁথিদ্বয় ছিল।[১] দুঃখের বিষয়, অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সহিত উক্ত পুঁথিদ্বয়ও কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সত্যনারায়ণ পাঁচালি-রচয়িতা দ্বিজ আত্মারাম ও আলোচ্য কবি আত্মারাম অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

চ। শ্রীমন্ত দাসের 'গৌর অবতার'

চৈতন্যদেবের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন কয়েকখানি মূল্যবান কাব্য রচিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার জীবনের কোন কোন বিশিষ্ট ঘটনা লইয়াও বহু কবি কাব্য রচনা করেন। যেমন বাসুদেব ঘোষ, নৃপরাজ বংশী[২] প্রভৃতির রচিত গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস। আমরা সম্প্রতি শ্রীমন্তদাসের গৌরাঙ্গবিষয়ক একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাইয়াছি। প্রথম চারিখানি পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। পুঁথির আকার ১৩"×৪½", আনুমানিক দেড় শত বৎসরের পুরাতন। শ্রীমন্ত দাসের প্রসাদ বা প্রহ্লাদচরিত্রের পুঁথি পাইবার পর এই অপ্রকাশিত পুঁথিখানি পাওয়া গেল। পুঁথির প্রারম্ভে চৈতন্যদেব সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলিয়া তাঁহার গৃহত্যাগের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, কাজেই ইহাকে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পুঁথি বলিয়াই মনে হয়।

কবির ভণিতা—

> হরিনাম সংকীর্ত্তন চারিবেদ সার। রচিলা শ্রীমন্ত দাস গৌর অবতার ॥
> গৌর অবতার কথা বড়ই মধুর। শ্রীমন্ত রচিল পদ শোক গেল দূর ॥

রচনার নমুনা—

> দ্বাদশ বৎসরের গৌরাঙ্গ দিব্য মূরতি। অষ্টমিতে আইলা তথা কেশব ভারতি ॥
> কর্ণে দিলে বীজমন্ত্র হইল বেসধারী। ভ্রমিলা অনেক দেশ কাসি কান্ত পুরি ॥

১. কেদারনাথ মণ্ডল -সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের (১৩৩৫) ভূমিকা পৃ. ১

২. শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদের বাঙ্গালা পুথির তালিকা, প্রথম খণ্ড (১৩৫২) পৃ. ১

দ্বারকা মথুরা আদি শ্রীবৃন্দাবন। গয়া বারানসি আর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
দক্ষিণে জলধি গেলা জথা জগন্নাথ। সেতুবন্ধ রামেশ্বর কাঙরি কামত ॥
পঞ্চকুটি মেরুর পদ স্থমেরু পর্ব্বতে। হেমগিরি হ্রিমগিরি গতে ॥
উদয়াস্ত গিরি গেলা অজোধ্যা নগর। পূর্ব্ব পশ্চিম আর দক্ষিণ উত্তর ॥…
নবদ্বীপ নিজ পাট প্রভুর নিবাস। আপনে জাহে মহাপ্রভু লভিলা সন্ন্যাস ॥
দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে নানা বেসধারি। হরিদাস শ্রীনিবাস গুপ্ত মুরারি ॥
দণ্ড কুমণ্ডলধারি জত তীর্থবাসি। শ্রীনিবাস সঙ্গে আছেন আন্যের সন্ন্যাসী ॥
শ্রীশান্তিপুরবাসী আচার্য গোসাঞি। জার সঙ্গে মহাপ্রভুর তিলেক ভেদ নাই ॥
সভে মেলি যুক্তি করি বসি একাসনে। জীবের নিস্তার হেতু ভাবিলেন মনে ॥
মনেতে ভাবিলা প্রভু শমণের ডরে। হরিনাম সংকীর্ত্তন দেন ঘরে ঘরে ॥

জ। দুঃখী শ্যামদাসের 'তুলসীবন্দনা'।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণমঙ্গলের কবি দুঃখী শ্যামদাসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার 'গোবিন্দমঙ্গলে'র একখানি প্রামাণিক সংস্করণ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইল না, বঙ্গবাসী সংস্করণও বর্তমানে সুলভ নয়। গোবিন্দমঙ্গল ছাড়াও দুঃখী শ্যামদাস একখানি একাদশীর পাচালি রচনা করেন এবং শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বন করিয়া মূল ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন বলিয়া যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় জানাইয়াছেন।[১] গোবিন্দ-মঙ্গলের কবি দুঃখী শ্যামদাস ও 'গুরুদক্ষিণা' পাচালির রচয়িতা 'দুঃখিত শ্যামদাস' একই ব্যক্তি কিনা, তাহা পণ্ডিতগণেরই বিচার্য।

গোবিন্দমঙ্গলের কোন কোন পুঁথিতে চৈতন্য বন্দনা, গুরু বন্দনা ও শ্রীরাম বন্দনা পাওয়া গেলেও, বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক সেগুলি মুদ্রিত করেন নাই। শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় একখানি প্রাচীন পুঁথি (সন ১১২৪ সাল) হইতে শ্রীরাম বন্দনা, চৈতন্য বন্দনা ও বৈষ্ণব বন্দনা প্রকাশ করিয়া পাঠকদের বিচারের সুযোগ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গুরু বন্দনা, ন মাহাত্ম্যের বিবরণ, শিববন্দনা, রাগবন্দনা ও গঙ্গার জন্ম—এই কয়টি নূতন অংশের সংবাদও তিনি দিয়াছেন।[২] আমরা একখানি বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধের পুঁথিতে দুঃখী শ্যামদাসের একটি তুলসীবন্দনা পাইয়াছি। পুঁথির লিপিকাল সন ১২১৮ সালের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ। দুঃখের বিষয় পুঁথির কালি জলিয়া যাইতেছে, পরে পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হইবে বিবেচনায় এই অপ্রকাশিত পদটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বন্দো মাতা তুলশি ত্রৈলোক্যতারিণী। আগম নিগম তন্ত্র বেদেতে বাখানি ॥
জাহার পত্রেতে গোবিন্দ অভিলাসি। বল্লুকায় তপস্যা করেন সাটি সহস্র রিশি ॥

১. বঙ্গ সাহিত্যে মেদিনীপুর (১৩২১) পৃ. ৪৪
২. বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ, ১৩৫৯, পৃ. ১০৩

তপস্যা ভঙ্গ হইলা না পায়্যা তুলশি। থিরদ উত্তর তীরে বসি সর্ব্ব রিশি ॥
ধন্য মাতা তুলশি আনিলা রঘুপতি। প্রাতকালে ছড়া ঝাটি সন্ধ্যাকালে বাতি ॥
তুলশি সেবন কৈলে বিষ্ণুলোকে স্থিতি। তুলশি মহিমা মাত্র জানেন পশুপতি ॥
সেইত তুলশি তাহে হয় বহু ফুল। তাহা শিরে জল দিলে গঙ্গা সমতুল ॥
তুলশি পত্রের জল যেই নর খায়। ইহলোক সুখে থাকে আন্তে সর্গ জায় ॥
তুলশি কাষ্ঠের মালা জেই ধরে শিরে। অবিলম্বে সেইজন জায় বিষ্ণুপুরে ॥
তুলশি কৃষ্ণের মালা গলাতে জে ধরে। চতুদ্দশ জম তার কি করিতে পারে ॥
শুখায় তুলশির গাছ রহিয়া জায় মাটি। তেত্রিশ কোটি দেব আসি দেন গড়ানটি ॥
শুনহ ভকত সভ তুলশি মহিমা। শুকদেব নারদ আদি দিতে নারে সীমা ॥
সত্যভামা কৃষ্ণে নারদে কৈলে দান। নারদ কৃষ্ণেরে পাইয়া নিজপুরে জান ॥
তরাজ ধরিয়া জুখে জত দেবগণ। একদিগে বসাল্যা কৃষ্ণে আর দিগে ধন ॥
জত ধন দিল তাহা সকলি অমূল। তথাচ না হল্য কৃষ্ণনাম সমতুল ॥
হেনঞি সময় তথা উদ্ধব ভকত। কিঞ্চিত জানেন তিহো তুলশি মহত্ত ॥
সকলি ফেলায়্যা দিল এক তুলশির পাত। তাহার সমান হৈলা প্রভু রাধানাথ ॥
বক্ষে বৈসেন নরসিংহ ফুলে মহাদেব। তারতলে বৈসেন তেত্রিশ কোটি দেব ॥
তুলশি কৃষ্ণেরে ছাড়া নহে কদাচন। ইহার বৃত্তান্ত সর্ব জানে ত্রিনয়ন ॥
জয় ২ হরিধ্বনি এ তিন ভুবনে। দুখী শ্যামদাস কহে তুলশি সেবনে ॥

ঝ। বলরাম দাসের 'গুরু গোসাঞি মাহাত্ম্য'।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একাধিক কবি বা পদকর্তা বলরাম দাস আছেন। ওড়িয়াতেও প্রসিদ্ধ রামায়ণকার বলরাম দাস আছেন। বলরাম দাস-ভণিতায় বহু পুঁথি আবিষ্কৃত হইলেও বর্তমান পুঁথির নাম কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা 'গুরু গোসাঞি মাহাত্ম্যে'র দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি। একটির লেখা বেশীর ভাগই জলিয়া গিয়াছে, অপরটির অবস্থা মন্দ নহে। শেষোক্ত পুঁথির আকার ১৩" × ৪½"; দুভাঁজ করা কাগজে মাত্র তিনখানি পত্রে সম্পূর্ণ। লিপিকাল—'সন ১১৫৭ তারিখ ২৫ চৈত্র'।

বলরাম গুরু আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া গুরুসেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 'গুরু অনুগত হৈয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লৈয়া সদা কর গুরুর সেবন।' গুরু হরি অভেদজ্ঞানে একনিষ্ঠভাবে গুরুসেবা করিলে তবেই জীবের মুক্তি। গুরুবাক্যলঙ্ঘন গুরুলঙ্ঘনেরই সমতুল্য। বলরামের সূত্রে—

হরি যদি রুষ্ট হন গুরু করে পরিত্রাণ গুরুদেব রুষ্ট হয় জারে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবে আর নানা তীর্থ সেবে কেহো তারে নিস্তারিতে নারে ॥

তাই তিনি উপদেশ দিতেছেন—

কৃষ্ণ মন্ত্রতত্ত্ব বার্তা গুরু সেই সর্ব্বজ্ঞাতা তাহারে ভজিব দৃঢ় করি।
বৈষ্ণব গুরু করি দীক্ষা করিবেক অতিনিষ্ঠা শ্রদ্ধা করি ভজিব তাঁহারে ॥

(শ্রীহরি ?)

ভণিতা--

বলরাম দাস কহে ইথে কিছু আন নহে সর্ব্ব শাস্ত্র ইথে আছে সাক্ষী ॥
সংক্ষেপে কহিল এই বলরাম দাস সেই সাবধানে শুনে ভক্তি রহে ॥

নিবন্ধটি আগাগোড়া ত্রিপদীতে রচিত।

ঞ। যুগলকিশোর দাস অধিকারীর 'শরীর নির্ণয়'।

বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগলদাস বা যুগলকিশোর দাস-ভণিতায় বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যুগলকিশোর দাস অধিকারীর ভণিতায় কোন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। আমরা সম্প্রতি যুগলকিশোর দাস অধিকারী-ভণিতায় শরীর নির্ণয়ের একখানি পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথির আকার ১৩½"×৪¾", এগারখানি পত্রে সম্পূর্ণ, উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। পুষ্পিকা—"ইতি শ্রীশরির নিন্ন্র্য় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। সক্ষর শ্রীপ্রেমচাদ দাষ অধিকারী সাং ডুগাপুর। পঠিতিয় শ্রীযুত ব্রজমোহন দাষ সাং জানালাবাদ পরগণে মণ্ডলঘাট সন ১২৩১ সাল তাং ২০ অগ্রহায়ণ।"

যুগলকিশোর সপারিষদ চৈতন্যের বন্দনা করিয়া মদনগোপালের করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন। যুগলকিশোরের মতে জীব পাপপুণ্য অনুসারেই মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। কোন্ পাপে কোন্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কবি তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। পূর্বজন্মের কিছু কিছু অভ্যাস যে পরজন্মেও প্রতিফলিত হয় ইহারও সরস বর্ণনা তিনি দিয়াছেন।

বানরদেহ ছাডি জে মনুষ্যদেহ ধরে। বানরের কার্য্য সেই ছাডিতে না পারে ॥
সমস্ত দিবস তার মুখ ব্যাজ নয়। কাষ্ঠ চর্ব্বণা করে জদি কিছু না মিলয় ॥
তার জন্মে জেবা হয় কুক্কুর শৃগাল। রাত্রিদিন গান করি বেডায় পচাল।
আর জন্মেতে ভূত জেবা এ জন্মেতে নর। বৎসর বৎসর তার এক ঠাঁই ঘর ॥

যুগলকিশোরের মতে বহু পুণ্যফলেই মনুষ্যজন্ম লাভ ঘটে। মানবদেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ষড়রিপু, পঞ্চভূত, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ ইত্যাদি বিরাজিত। যুগলকিশোর বলেন—

শরীরের মধ্যে এই দশ দ্বার হয়। দশ প্রাণ পুরুষ সেই দশ দ্বারে রয় ॥
দশ পবন বৈসে দশ দ্বার মাঝে। দশ প্রাণ পুরুষ তার সঙ্গেতে বিরাজে ॥

এবং সপ্ত দ্বীপে সপ্ত সাঁই বিরাজ করেন। রাজা যেমন তহশীলদারের সাহায্যে রাজ্য চালনা করেন, 'করতার'ও তেমনই যমকে লইয়া সংসার চালনা করিতেছেন। জীবের দুর্গতি-মোচনের জন্য যুগলকিশোর অক্ষর সাধনা করিয়া রাধাশ্যামমদনমোহনের ভজনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গকার বলিয়া নাম নিত্য সেবা কর শ্যাম কায়মনে ভজ রাধা মদনমোহন।

কবির ভণিতা—

মদনগোপাল দীনবন্ধু প্রভু মোর। তাহার দাসের দাস যুগল কিশোর॥
একে২ কহি অর্থে ইহাত বিচারি। বিবচিল কিশোর দাস অধিকারী॥
মদনগোপাল মোরে জে আজ্ঞা কহিল। কিশোর দাসের মনে তাহাই রচিল॥

যুগলকিশোর দাস ও যুগলকিশোর দাস-অধিকারী একই কি পৃথক ব্যক্তি, পণ্ডিতগণই তাহা স্থির করুন।

ভ্রম সংশোধন

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার (১৩৬৪) ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় 'প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে ১২০ পৃষ্ঠায় ১৫শ ও ১৬শ পংক্তিতে বন্দি ধর্ম্মসেন ও বন্দি ধর্ম্মদাস স্থলে যথাক্রমে 'বদ্দি' ধর্ম্মসেন ও 'বদ্দি' ধর্ম্মদাস হইবে।

স্বরলিপি

কটকের জাজপুরে গোপালের জন্ম হয়। গোপাল অল্পবয়সে কলিকাতায় আসেন এবং তিনি নাকি রাস্তায় ফল বিক্রয় করিতেন। শোনা যায় বহুবাজারের এক বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তি রাধামোহন সরকারের গৃহে যখন সখের "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রার বৈঠক চলিতেছিল তখন গোপাল "চাঁপাকলা" বলিয়া পথে হাঁকিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া গৃহস্থ বাবুরা তাঁহাকে ফেরিওয়ালার কাজ হইতে নিবৃত্ত করিয়া গান শিখাইয়াছিলেন। গোপাল রাধামোহন সরকারের "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রায় মালিনী সাজিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর গোপাল নিজে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন এবং পূর্বের বিদ্যাসুন্দর পালার বহু পরিবর্তন সাধন করেন। কথিত আছে সিঙ্গুরের ভৈরব হালদার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। গোপাল নিজে গান রচনা করিতেন ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না কেননা তিনি লেখাপড়া জানিতেন এমন প্রমাণ নাই। গোপাল প্রিয়দর্শন, সুকণ্ঠ এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার গানের এবং যাত্রার খ্যাতি সেকালে মুখে মুখে ফিরিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত "ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া" গানটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই ঢঙের গান বাংলায় একসময় বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং ক্রমে ইহা বাংলার একটি বিশিষ্ট রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। এই গানটি ভিন্ন সুরে ওস্তাদি ঢঙেও গাওয়া হইত। তবে ইহা ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম।

কালাংড়া—আড়খেমটা

ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া
ভ্রমরেতে গুন্ গুন্ করে কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে
আনন্দিত কুসুম বনে
আমার ঐ ফুলবাগানে তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া।

গোপাল উড়ের "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রা

স্বরসংগ্রহ—শ্রীকালীপদ পাঠক   স্বরলিপি—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

গা II মা পা দা । পদা -নর্সা র্সনা । দা পা -া ।-দপা -মগা গা I
ঐ দে খা যায় বা ০ ০ ০ ড়ি আ মা ০ ০ ০ ০ র্ চার

॥

মা পদা দপা । মা -া পা । পমা গা -া । -া -া মা I
দি কে ০ মা ০ ল ০ ঞ্চ বে ড়া ০ ০ ০ -ভ্র

মা মপা মগা । মা দা -া । না র্সা -া । র্সা -া নর্সা I
ম রে০ তে ০ গুন্ গু ন্ ক রে ০ কো ০ কি ০

-র্গা র্ঋা র্সা । না -া র্সনা । দা পা -া । -দপা -মগা গা II
০ লে তে দি ০ চ্ছে ০ সা ড়া ০ ০ ০ ০ ০ "ঐ"

দা II দা না র্সা । র্ঋা র্সা -র্ঋর্সা । না র্সা -া । -া -া না I
ভ্র ম রা ভ্র ম রী ০ ০ স নে ০ ০ ০ আ

র্সা না ধা । ধা ধা -পধনা । না না -া । -া -া দা I
ন ন্দি ত কু সু ০ ০ ম্ ব নে ০ ০ ০ ভ্র

দা না র্সা । র্ঋা র্সা -র্ঋর্সা । না র্সা -া । -া -া র্সা I
ম রা ভ্র ম রী ০ ০ স নে ০ ০ ০ আ

নর্সর্গা র্ঋা র্সা । না র্সা -র্সনা । দা পা -া । -া -া গা I
ন ০ ০ ন্দি ত কু সু ম্ ব নে ০ ০ ০ আ

মা পা দা । পা ণা দণা । দা পা -া । না -র্সা নর্সা I
মার এ ই ফু ল্ বা গা নে ০ তি ০ লে

-র্গা র্ঋা র্সর্ঋা । না র্সা র্সনা । দা পা -া । -দপা -মগা গা IIII
ক্ নাই ব ০ স ন্ ত ০ ছা ড়া ০ ০ ০ ০ ০ "ঐ"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চষষ্টিতম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বিগত ৮ শ্রাবণ ১৩৬৫ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬৪ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্যসেবী, মনীষী এবং সদস্য পরলোক গমন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি।

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিগত বৈশাখ মাসে পরলোকগত হইয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যরূপেও তিনি কয়েক বৎসর পরিষদের সেবা করেন।

(খ) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ দ্বারা এবং পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ('অনাদিমঙ্গল' ও 'শ্রীধর্ম্মপুরাণ') সম্পাদন করিয়া পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

(গ) অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় প্রায় ১৫ বৎসর আজীবন সদস্যপদে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, ভোট-পরীক্ষকরূপে এবং আয়-ব্যয়-সমিতির সভ্যরূপে ও অন্যান্য নানা ভাবে পরিষদের কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

(ঘ) পরিষদের অন্যতম হিতৈষী এবং বিশিষ্ট-সদস্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

(ঙ) শুভেন্দু সিংহ রায় পরিষদের পুরাতন হিতৈষীদিগের মধ্যে অন্যতম। সতের বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সাধারণ-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং কিছুকাল পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-রূপেও কাজ করেন। জীবিত কালেই তিনি তাঁহার সংগৃহীত অধিকাংশ প্রত্নবস্তু ও পুথিসংগ্রহ পরিষৎকে দান করেন। তাঁহার সংগৃহীত এবং প্রদত্ত 'বাশুলীমঙ্গল' পুথিটি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

(চ) বিধুশেখর শাস্ত্রী পরিষদের প্রথম যুগের কর্ম্মী এবং সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সম্পাদনায় 'মিলিন্দ-পঞ্হো' গ্রন্থটি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী কালে তিনি পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন।

(ছ) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং মন্মথনাথ ঘোষও পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য ছিলেন॥

(জ) বিজ্ঞানাচার্য্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও প্রত্নবিৎ স্যার জন মার্শালের মহাপ্রয়াণও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

(ঝ) পরিষদের সাধারণ-সদস্য গোবিনচন্দ্র ঘোষ, প্রবোধকুমার দত্ত এবং সিদ্ধেশ্বর দে আলোচ্য বর্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন।

এই সকল মনীষী ও পরিষদের হিতৈষীদের বিয়োগে দেশের এবং পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

আনন্দ সংবাদ

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাসখণ্ডে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক-সম্মেলনে ভারতীয় লেখকগণের মুখপাত্র হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু ভারত সরকারের ডিরেক্টর অফ অ্যানথ্‌পলজি (Director of Anthropology) পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভ্য শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল উপাধি এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বর্ত্তমান সভ্য শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার রচিত 'বাংলার বাউল' গ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের সকলকেই আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

(খ) পরিষদের চিত্রশালা ও গ্রন্থাগারের নূতন সংযোজন একটি বিশেষ সংবাদ। পরিষদের পরলোকগত সভ্য শুভেন্দু সিংহ রায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী লীলাবতী দেবী তাঁহার স্বামীর সংগৃহীত অবশিষ্ট প্রত্নবস্তু ও পুথিগুলি পরিষদের চিত্রশালায় ও পুথিশালায় দান করিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিকেলের কর্ত্তৃপক্ষ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ব্যক্তিগত কাগজ ও খাতাপত্র দান করিয়াছেন। অন্য আচার্য্য রায়ের যে চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাও বেঙ্গল কেমিকেল-কর্ত্তৃপক্ষ দান করিয়াছেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার জন্য একটি প্রাচীন ব্রোঞ্জমূর্ত্তি এবং শ্রীসুনীলবিহারী সেনশর্ম্মা মানভূম জেলা হইতে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন মূর্ত্তি দান করিয়াছেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থসংগ্রহ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগণেশপ্রসাদ ত্রিবেদী এবং দৌহিত্র শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায় ও শ্রীজয়দেব রায়ের সহায়তায় পরিষৎ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

(গ) ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পরিষদের বহু আকাঙ্ক্ষিত কোষ-গ্রন্থের জন্য আপাততঃ ৩৯,৭৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ও উভয় সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া একটি প্রস্তাব প্রেরিত হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকার আপাততঃ উক্ত অর্থ প্রথম কিস্তিতে দান করিয়াছেন। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করিতে অন্যূন দুই বৎসরকাল সময় লাগিবে ও প্রায় এক লক্ষ আশী হাজার টাকা খরচ পড়িবে। এই বিষয়-কোষটি 'ভারত-কোষ' নামে প্রকাশের আয়োজন করা হইতেছে ও ইতিমধ্যে প্রাথমিক কার্য্য কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছে। এই কোষ-গ্রন্থ সংকলনের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য একটি উপদেশক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে ও দেশের জ্ঞানী-গুণীদের সক্রিয় সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইব না, এইরূপ আশ্বাস আমরা তাঁহাদের অনেকের নিকট হইতে পাইয়াছি। ইতিমধ্যে

তাঁহাদের কয়েক জনের সহিত একটি পরামর্শ-সভায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি ও কতকগুলি মূল সূত্র স্থির করিয়া লইয়া শব্দ-সংগ্রহের কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি।

(ঘ) অর্থকৃচ্ছ্রতাবশতঃ আমরা আমাদের গ্রন্থাগারের উন্নতিবিধানে এতাবৎ বিশেষ সক্ষম হইতে পারি নাই। আলাপ আলোচনার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৯-এর এপ্রিল মাস হইতে একজন লাইব্রেরীয়ান ও তিন জন সহকারী লাইব্রেরীয়ান ও একজন হিসাব-রক্ষকের নিয়োগ সরকার-অনুমোদিত বেতন ও ভাতার হারে মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সকল নূতন কর্ম্মচারীদের বেতনাদির অর্দ্ধেক সরকার দিবেন ও বাকি অর্দ্ধেক পরিষৎকে বহন করিতে হইবে। গুরুভার হইলেও পরিষৎ সরকার-প্রস্তাবিত এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন ও ইতিমধ্যে দুই জন সহকারী লাইব্রেরীয়ান ও একজন হিসাব-রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন ও বাকি দুইটি পদের জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) রকফেলার ফাউন্‌ডেশন্ সোসাইটি একটি পুরাতন ইংরাজী টাইপ-যন্ত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণ

বান্ধব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্টসদস্য : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু, মাঘ ১৩৬৫), শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

আজীবন-সদস্য : ১। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৩। শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৪। শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৫। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৬। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ৭। শ্রীহরিহর শেঠ, ৮। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ৯। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১০। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র সিংহ, ১১। শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১২। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৩। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১৪। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৫। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৬। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ১৭। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, ১৯। ত্রিদিবেশ বসু, ২০। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ২১। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, ২২। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ২৩। শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সেন, ২৪। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীসুধাকান্ত দে, ২৬। শ্রীবিভূভূষণ বসু, ২৭। শ্রীঅজিত বসু, ২৮। শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী, ২৯। শ্রীআর্থার হিউজ, ৩০। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ, ৩১। শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়।

অধ্যাপক-সদস্য : বর্ষশেষে ৬ জন।

সহায়ক-সদস্য : বর্ষশেষে ৬ জন।

সাধারণ-সদস্য : কলিকাতাবাসী ৮৯৯ জন এবং মফঃস্বলবাসী ৪৮ জন = মোট ৯৪৭ জন।

দীর্ঘকাল চাঁদা বাকি পড়ায় ১১৫ জনের নাম সদস্যতালিকা হইতে বাদ গিয়াছে।

বর্ষমধ্যে ৮৫ জন সদস্য নানাবিধ অসুবিধা হেতু সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৩ জন সদস্যের আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু হইয়াছে।

পঞ্চষষ্টিতম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

সভাপতি : শ্রীসুশীলকুমার দে। সহকারী সভাপতি : শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সম্পাদক : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সহকারী সম্পাদক : শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীত্রিবিদনাথ রায়, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (পদত্যাগ—২৫ পৌষ, ১৩৬৫), শ্রীপ্রবোধকুমার দাস। কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য

শ্রীঅমল হোম
শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীআমিনুর রহমান
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
রেভাঃ ফাদার এ. দোঁতেন
শ্রীকামিনীকুমার কর রায়
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীমনোমোহন ঘোষ
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা
শ্রীসুশীল রায়

শাখা-পরিষৎ-পক্ষে :

শ্রীঅতুল্যচরণ দে
শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়
শ্রীমানিকলাল সিংহ
শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

পৌরসভার প্রতিনিধি : শ্রীকানাইলাল দাস

পরিষদের বিবিধ কার্য্যকলাপের বিবরণ

১। পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের সহায়তার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়, আলোচ্য বর্ষেও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, ছাপাখানা, গ্রন্থপ্রকাশ, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হয়।

২। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক সংশোধিত নিয়মাবলী বিগত ২৪ মাঘ ১৩৬৫ তারিখের সাধারণ সভায় উপস্থাপিত ও অনুমোদিত এবং ২২ ফাল্গুন ১৩৬৫ তারিখের সাধারণ সভায় পুনরনুমোদিত হইয়াছে।

৩। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এবং সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ও অনুমোদিত পরিষদের ন্যাস-রক্ষকগণের নাম অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। ন্যাসরক্ষক নিয়োগের অন্যান্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।

৪। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষদের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছে।

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—(১) কমলা বক্তৃতা সমিতি—শ্রীসুশীলকুমার দে, (২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা সমিতি—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

(খ) নিখিল ভারত ইতিহাস কংগ্রেস—ত্রিভান্দ্রম—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

(গ) ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টের মনোনীত পুস্তকগুলি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের জন্য পরিষদের প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছে।

(ঘ) নিখিল-ভারত লোকসংস্কৃতি সম্মেলন—এলাহাবাদ—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

(ঙ) ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অনুরোধক্রমে তাঁহাদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নব শিক্ষিতদের পাঠোপযোগী পুস্তকগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণ : (১) শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, (২) শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, (৩) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, (৪) শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল।

৫। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক জন্মোৎসব : এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি পসমিতি গঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পরিষৎ, দেশের বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্রনাথের সম্যক্ পরিচয় ও তাঁহার আদর্শের ব্যাখ্যা দ্বারা দেশের মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য একটি অভিনব কার্য্যসূচী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষৎ এই উৎসব সুষ্ঠুরূপে পালনের জন্য (ক) একটি সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান এবং (খ) রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময় পর্য্যন্ত দেশের সমসাময়িক মনীষীদের তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত অভিমতগুলির সংকলন-পুস্তক প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীর সহিত পরিষৎ এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। পরিষদের প্রথম প্রস্তাবটি সম্বন্ধে সরকার এখনও কোন মতামত দেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া, উপরন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ আর একখানি পুস্তক পরিষৎকে দিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব তাঁহারা করিয়াছেন।

৬। All India Law Teachers' Conference-এর কলিকাতা অধিবেশনের দারভাঙ্গা হলের প্রদর্শনীতে আইনের বাংলা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত বোম্বের Audit Bureau of Circulation-এর প্রদর্শনীর জন্য কতিপয় বাংলা সাময়িক পত্রের আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়।

পরিষদের অধিবেশন

১। ৬৪ বার্ষিক অধিবেশন ও ৬৫ প্রতিষ্ঠাদিবস ৮ শ্রাবণ, ১৩৬৫।

২। প্রথম মাসিক অধিবেশন ৬ ভাদ্র, ১৩৬৫।

৩। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন ৩ আশ্বিন, ১৩৬৫।

৪। জগদীশচন্দ্র বসু ও বিপিনচন্দ্র পালের জন্মশতবর্ষ উৎসব পালন উপলক্ষ্যে বিশেষ অধিবেশন ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত কর্তৃক গ্রন্থিত 'আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য' নামে একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয়। ভারত সরকারের Film Division কর্তৃক প্রেরিত 'জগদীশচন্দ্র' ফিল্ম প্রদর্শিত হয়।

৫। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫।

৬। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৫ পৌষ, ১৩৬৫।

৭। বিশেষ অধিবেশন—২৪ মাঘ, ১৩৬৫।

৮। বিশেষ অধিবেশন ১০ ফাল্গুন, ১৩৬৫। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গ্রন্থ-সংগ্রহের দ্বারোদ্ঘাটন এবং আচার্য্য যদুনাথ সরকার, আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, অনুরূপা দেবী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়।

৯। বিশেষ অধিবেশন ২২ ফাল্গুন, ১৩৬৫।

১০। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন ২১ চৈত্র, ১৩৬৫।

১১। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬।

১২। মধুসূদন দত্তের সমাধিস্তম্ভে মাল্যদান ১৪ আষাঢ়, ১৩৬৬।

গ্রন্থপ্রকাশ

(ক) পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৯৭ সংখ্যক নূতন পুস্তক 'কেশবচন্দ্র সেন' (যোগেশচন্দ্র বাগল-রচিত) প্রকাশিত হইয়াছে। এই চরিতমালার ৬৬ সংখ্যক পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে। শুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত মুকুন্দ কবিচন্দ্রের 'বাশুলীমঙ্গল' প্রকাশিত হইয়াছে। 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র ২য় সংস্করণ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত বাংলা পুথির বিবরণের ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র একটি নূতন (৩য় সংস্করণ) মুদ্রণ চলিতেছে।

(খ) ঝাড়গ্রাম-তহবিল হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ৫ম সংস্করণ ও 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'র ৫ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। বিগত বর্ষে আয়োজিত 'নবীনচন্দ্র সেনের রচনাবলী' ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড 'আমার জীবন'(মূল গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত)-এর নূতন পরিষৎ-সংস্করণ মাসাধিক পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য খণ্ডগুলির মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে।

(গ) লালগোলা-তহবিল হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে।

(ঘ) চণ্ডীদাস-পদাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব পরিষৎ গত বৎসরে গ্রহণ করিয়াছেন ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার সম্পাদনার কার্য্যে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন। আশা করিতেছি, তাঁহার সম্পাদনাকার্য্য শীঘ্রই শেষ হইবে ও আগামী বর্ষে পুস্তকটি প্রকাশিত হইবে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই তহবিল হইতে ২৪৬৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকার ৬৫ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংখ্যার মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে। এ বৎসর পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার জন্য ব্যয়ও উল্লেখ-যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিজ্ঞাপনের আয় বৃদ্ধি পাইলে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে বর্দ্ধিত হারে সাহায্য পাওয়া গেলে পত্রিকা বর্দ্ধিত আকারেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

গ্রন্থাগার

পুস্তকতালিকা সংকলনে রত কর্ম্মীরা এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থাদির কার্ড প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা যথারীতি কার্ড-কেবিনেটে রক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতিরেকে বিদ্যাসাগর-সংগ্রহের যাবতীয় পুস্তকাদির কার্ড প্রস্তুত ও কেবিনেটে রক্ষিত হইয়াছে। ৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত মোট ৯,৪৪৮ খানি পুস্তকের কার্ড তৈয়ারী ও সেগুলির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যথাযথরূপে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাধারণ পুস্তকাগারের পুস্তক সংখ্যা, ইংরাজী ২০০৫, বাংলা ৩৯০৯, সংস্কৃত ২৬১, বিদ্যাসাগর-সংগ্রহের ইংরাজী ২৯৪৩, বাংলা ৩৩০।

সাধারণ-সংগ্রহের পুস্তকাদির জন্য ৩০টি ড্রয়ারযুক্ত আরও দুইটি কেবিনেট তৈয়ারী হইতেছে।

পরিষদ্-গ্রন্থাগার বৃহস্পতিবার ছুটির দিন ব্যতিরেকে প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। আলোচ্য বর্ষে প্রতিদিন গড়ে ৯০ জন পাঠক ও গবেষক পরিষদের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত পুস্তকাদির সংখ্যা : ক্রীত ১০৫ খানি, উপহৃত (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-সংগ্রহ) প্রায় ১২০০, পশ্চিমবঙ্গের Registrar of Publication-প্রদত্ত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদির সংখ্যা প্রায় ৭৫০, এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত ৯৪ খানি = মোট ২,১৪৯ খানি।

গ্রন্থাগার : বিষয়-সূচী (Subject Catalogue), গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) ও গ্রন্থসূচী (Catalogue) ও প্রতীক-সংখ্যা বা অক্ষরে (Notation) তৈয়ারীর জন্য বাংলায়

সর্ব্বজন-স্বীকৃত কোন বিধি-বিধান নাই। এই সকল কার্য্য শুধু বিদেশী পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা সম্ভবপর নয়। দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সহযোগিতায় একটি বিধি (Code) গঠন করিয়া লইতে পারিলে সকলের কাজের সুবিধা হয়। এ বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি॥

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে ভাগলপুর, মেদিনীপুর, শিলং, বিষ্ণুপুর, নৈহাটী—এই কয়টি শাখায় অধিবেশনাদি হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে পরিষদের নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে ভাদ্র, ১৩৬৫ তারিখে।

চিত্রশালা

পরিষদের চিত্রশালার মূর্ত্তিগুলির কাষ্ঠের পাদপীঠগুলিসহ চিত্রশালার গৃহটি সম্পূর্ণ রঙ করান ও নূতন ভাবে সাজান হইয়াছে। চিত্রশালার সুষ্ঠু পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধনাদির জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আশা করিতেছি যে, সরকারের সাহায্য আগামী বর্ষে আমরা পাইব।

পুথিশালা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে যে সকল পুথি সঞ্চিত ছিল, ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগণেশপ্রসাদ ত্রিবেদী ও দৌহিত্র শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায় ও শ্রীজয়গোপাল রায় আলোচ্য বর্ষে সেগুলি পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তন্মধ্য হইতে ৮১ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ ১০ খানি এবং শ্রীএস. সি. ব্যানার্জী একখানি পুথি দিয়াছেন। এইরূপে বর্ষমধ্যে ৯২ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বাংলা পুথি ২৮ খানি ও সংস্কৃত পুথি ৬৪ খানি। এই পুথিগুলি তালিকাভুক্ত হইয়া বর্ষশেষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—বাংলা পুথি ৩,৩৪৯; সংস্কৃত পুথি ২,৫৪০; তিব্বতী পুথি ২৪৪; ফার্সী পুথি ১৩ খানি=মোট ৬,১৪৬ খানি।

আলোচ্য বর্ষে বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ (৩য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে ১,৩৩১ হইতে ১,৬৩৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত ৩০৪ খানি বাংলা পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে। পরিষদের সদস্য ও গবেষণারত পণ্ডিতগণ পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া ৮২ খানি পুথি ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বরোদার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটকে রামায়ণ সম্পাদনকার্য্যে সাহায্য করার জন্য দুইখানি রামায়ণের পুথি ধার দেওয়া হইয়াছে।

আর্থিক অবস্থা

পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারেব নিয়মিত দান, গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক দান এবং সদস্যগণের দেয় চাঁদা ও পুস্তক বিক্রয়ের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া, চারিটি প্রধান বিভাগ সহ পরিষদের কার্য্যালয় সাধারণের জন্য খোলা রাখা এবং অনুসন্ধিৎসু ও গবেষকদিগের প্রয়োজন মিটান যে কত কঠিন, তাহার কিছু আভাস আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের কার্য্যবিবরণে দিয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই কাজ কঠিনতর বলিয়া মনে হইয়াছে। কয়েকজন নূতন কর্ম্মচারীর নিয়োগ, পুস্তক-তালিকা সংকলন এবং পুস্তক বাঁধাইয়ের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ইতিমধ্যে ১৮৯৬৩৲ টাকা পরিষদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে পরিষদের কিছু সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যয়ের অপর অর্দ্ধাংশের জন্য পরিষৎকে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। তথাপি নানা দিক্ বিবেচনা করিয়া পরিষৎ এই ঝুঁকি লওয়াই স্থির করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে গচ্ছিত তহবিলগুলিতে কিছু লাভ হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ তহবিলে ব্যয়ের পরিমাণ আয় অপেক্ষা অধিক। চিত্রশালার জন্য প্রায় তিন হাজার টাকা এবং পত্রিকার মাত্র দুই সংখ্যার জন্য প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি এবং আলো, পাখার উন্নততর ব্যবস্থার জন্যও খরচ কিছু অধিক হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পরিষৎকে তাঁহাদের নিয়মিত বাৎসরিক সাহায্য (পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশের জন্য দুই হাজার টাকা এবং গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য এক হাজার দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। পরিষদের গ্রন্থতালিকা সংকলন এবং গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি বাঁধাইবার ব্যয়ের অর্দ্ধেক বহন করিতে সম্মত হইয়া রাজ্যসরকার ইতিমধ্যেই পরিষদের হস্তে যথাক্রমে ৬৫০০৲ এবং ১২৪৬৩৲ টাকা দিয়াছেন। পরিষদের কার্য্যে কয়েকজন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের অর্দ্ধেক ব্যয়ভারও তাঁহারা বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ ভবন ও রমেশ ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। তাঁহাদের দেয় বার্ষিক সাহায্য (দুই বৎসরের) ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের প্রথমেই পাওয়া গিয়াছে। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীহেমরঞ্জন বসু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রাপ্ত ভোটপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া উহার ফলাফল নির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীসরলকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকে এবং পরিষদের অন্যান্য হিতৈষী এবং সাহায্যকারীদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহার

গত বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনে সরকারের সর্ব্বপ্রকার সহায়তা ও সহযোগিতা কামনা করিয়া পরিষদের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ শেষ করিয়াছিলাম। এ বৎসরে তাঁহাদের সহায়তা ও সহযোগিতা আমরা কিছু কিছু লাভ করিয়াছি, কিন্তু এই সহায়তা সর্ত্তহীন নহে। সরকার যে দান মঞ্জুর করিয়াছেন বা যাহা ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিষৎকে বহন করিতে হইবে। এই সকল সর্তাধীন দান গ্রহণ করিয়া অপরার্দ্ধ পূরণ করিবার মত যথেষ্ট শক্তি আমাদের আছে কি না, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় ছিল। কিন্তু যে প্রাণশক্তি এই পঞ্চষষ্টি বৎসরকাল ধরিয়া আমাদের সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতিই সেই প্রাণশক্তি। ইহার সহিত আমাদের পূর্ব্বগামী সাধকদের আশীর্ব্বাদ যুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে। এই গভীর বিশ্বাস লইয়া আমরা এই সমস্ত গুরুভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। পরিষদের সকল সদস্য ও দেশের সুধীসমাজ যদি আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের এতাবৎকালের অস্তিত্ব সার্থকতা লাভ করিবে।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৬

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদির তালিকা

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: ত্রয়ী, শরৎচন্দ্রের দেশ ও সমাজ, যাত্রী, রাশিয়ার কবিতা, বিহারী সতসই ; **শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়:** ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ; **শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য:** কালীঘাটের ঐতিহাসিক কথা (১ম খণ্ড) ; **Govt. Press, Madras:** Report of Museum 1955-56 ; **শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী:** উছল সবুজ, মধুবাগ, **শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী:** ছায়াবিহীন ; **শ্রীসন্তোষকুমার বসাক:** শিশুভারতী, বিষের তীর, সত্যের পথ, আইভ্যান হো, কাউণ্ট অফ মণ্টিক্রস্টো, আরব বেদুইন ; **শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়:** কুশপুত্তলিকা, **শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী:** শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন শতকম্, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ কৃপাকটাক্ষ, শ্রীমহাপ্রভু গ্রন্থাবলী, প্রার্থনা, উদ্ধব সন্দেশ, হংসদূতম্, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, শ্রীগৌরাঙ্গভূষণম্, নিত্যক্রিয়া, স্মরণ মঙ্গল, নবরত্ন, ভক্তিরস তরঙ্গিণী, ভাগবত ভাষা, গ্রন্থরত্ন, শ্রীপ্রেমসম্পুট, **শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব:** জন্মমাস বিচার ; **শ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রামাণিক:** পরমাত্মতত্ত্ব ; **শ্রীসুবোধ বসু:** মহুয়া, Golden Treasury ; **শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত:** সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, **শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী:** মঞ্জরী, ভবাণীমঙ্গল, পল্লীকবি রসিকচন্দ্র, সোনা রায়ের গান, মাণিক্য মিত্রের কথা, প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, ভারতীয় সভ্যতা ; **শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য:** বাংলা ছন্দ, **শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু:** Bengali Self Taught, Coins of India, কলাভূমি কলিঙ্গ, ডিঙ্গি ; **শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য:** সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, **শ্রীপ্রভাময়ী দেবী:** আখ্যায়িকা কাব্য ; **শ্রীকুমারেশ ঘোষ:** ম্যানিয়া, নতুন মিছিল, ব্যঙ্গ কবিতা, সালোমে, কটাক্ষ, ফ্যাসন ট্রেনিং স্কুল, চক্র, ফাঁকিস্থান, স্বামীপালন পদ্ধতি, **শ্রীগোবর্দ্ধন দাস:** শ্রীশ্রীব্রজধাম (১ম), **শ্রীসুখেন্দুশেখর সরকার:** লালু ; **শ্রীবামাপদ বসু:** মধ্যম ব্যায়োগ, স্বপ্ন বাসবদত্তা ; **শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য:** বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস ; **শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়:** নীলকণ্ঠ ; **National Publishers:** With Nehru in China ; **ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস:** মেঘদূত, রাজগাথা ; **বেঙ্গল পাবলিশার্স:** পঞ্চতন্ত্র, আরোগ্য নিকেতন, জাগরী, জঙ্গম, শ্রেষ্ঠ গল্প, যৌন জিজ্ঞাসা ; **ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড:** রত্নমালা, সৃষ্টি, স-নি-গল্প (তারাশঙ্কর), বিজ্ঞানের চিঠি, **শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী:** উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য ; **শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়:** India (Govt. of India Pub.) ; **শ্রীসুশীলকুমার দে:** কাব্যরশ্মি, পদ্যপুষ্পাঞ্জলি, খাদ্যকথা, ভগবৎ প্রসঙ্গ, ভাবরূপা, পতাকা প্রকাশ, রৌদ্রজ্যোৎস্না, নরেন্দ্রনাথের জীবনকথা, সারদা-রামকৃষ্ণ, ভারত মহিলা, পঞ্চপ্রদীপ, মন্দার ও মালঞ্চ, তপস্বিনী ; **বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ:** ধর্ম্মজীবন সাধনা, বেদান্তের প্রস্থান ; **মন্মথ রায়:**

জীবন মরণ, গুপ্তধন, জটা গঙ্গার বিধি, লাঙ্গল, মুক্তির ডাক, দেবাসুর ; **সারদারঞ্জন পণ্ডিত :** মহাপ্রভু ; **Chinese Bhuddhist Asson. :** A record of the Bhuddhist Countries ; **Smithsonian Inst. :** Araucanlan Child life ; **শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় :** প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ; **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ :** গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (২য়, ৩য়) ; **শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :** প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ; **রেজিস্ট্রার অফ পাবলিকেশন (পঃবঃ সরকার) :** ঘরে বাইরে, ধর্ম্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, দৈনন্দিন, উপরাগ, সোভিয়েট নাট্যমঞ্চ, গোদান, অভিজ্ঞান, হিন্দু রসায়নী বিদ্যা, আত্মজ্ঞান, সরল ধাত্রী শিক্ষা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিস্মরণী, শ্রীশ্রীলীলাতত্ত্ব কুসুমাঞ্জলি, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস ৩য়, বাংলার নবযুগ, মুক্তি সংগ্রামে জনসেবা, পরিভাষাবৃত্তি, এই দেশেরই মেয়ে, হাওয়ার নিশানা, নতুন পাঠমালা, তবুও মানুষ, বন জ্যোৎস্না, সূর্য্য সারথি, কল্পান্ত, আত্মপরিচয়, উনপঞ্চাশী, নবীনচন্দ্র দাস, ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ, শিল্পীর নবজন্ম, শ্রীশ্রীভক্তিরত্নহার, বাংলা দেশের সোনার ছেলে, অভিযান, কমিউনিষ্টের জবাব, শতদল, অহিংস ও গান্ধী, ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি, আমার জীবন (চেকভ), দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, নোয়াখালির পটভূমিকায় গান্ধীজী, গল্পভারতী প্রথম বার্ষিকী, কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, আজো ওঠে চাঁদ, বাংলা সাহিত্যের কথা, জাগ্রত দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া, ত্রিকাল, পুতুলনাচের ইতিকথা, স্বর্ণনদী, রক্তরাখী, জাতবেদা, মল্লিকা, কাব্যবিচার, রাজধানী, যে দেশে জন্মেছি, সাহিত্যের পথে, মায়ের ডাক, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সোভিয়েট দুনিয়া, লরেন্সের গল্প, দি ইনভিজিবল ম্যান, বেদের মেয়ে, আমার ধ্যানের ভারত, নিকিতের শৈশব, সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা, রায়তের কথা, বৈদিক দেবতা, মুক্তাগড়, শতাব্দী, মহামানব মহাত্মা, শিবানন্দবাণী (২), এই কলকাতায়, স্মৃতিচিত্র, দেশীয় প্রজা আন্দোলন, বিশ বছর আগে, মৃত্যুর পরপারে (২), শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত (৬), শাক্তপদাবলী, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ, অনেক-রকম, শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ, সুরের সিঁড়ি, শ্রীশ্রীরামায়ণ গান, অবতারতত্ত্ব, বিচিত্র প্রবন্ধ, চিত্রা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, জীবন মৃত্যু, বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, ভারতের কবি, কথা শিল্প, ডন নদীর গতিপথে, নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, বেআইনী জনতা, শিল্প ও সংগ্রাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতন্ত্র, শ্রুতিস্মৃতি, মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী, কল্লোল রাজগৃহ ও নালন্দা, বেদান্তরহস্য, রামদাস ও শিবাজী, মাটির কান্না, সমালোচনা সংগ্রহ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (২), বহ্নিবলয়, প্রগতিশীলা, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, মাটির ঘর, বিশ বছর আগে, মহাকবি ইকবাল, রাশিয়া ১৯৪৫, একতারা, জতুগৃহ, কালকল্লোল, শ্রীমতী, কল্পনা, রাজযোগ সাধন, জনগণের রবীন্দ্রনাথ, দার্জিলিং সাথী, উদয়াস্ত, রাজসিংহ, কালোপাঞ্জা, জনৈকা, বাংলা কাব্যে প্রাক রবীন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত, বাস্তহারা, মেরা বচপন, রাষ্ট্রসংগ্রামের এক অধ্যায়, বিচিত্র মণিপুর, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, শতাব্দীর সূর্য্য, সাহিত্য সংকলন, সেরা লিখিয়েদের সেরা গল্প, রঙরুট, কল্পনা, ভারততীর্থ, পদার্থবিদ্যার নবযুগ, রসাঞ্জন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, উপনিষদের আলো, মাস্টারদা, দ্বীপ ও দ্বীপান্তর,

বিশ্বশান্তি, নটীর পূজা, আত্মকথা, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, আমরা আবার বাঁচব, সাহিত্য প্রবাহ, জীবনকথা, প্রেম ও কামনা, অভিষেক, স্রোত বহে যায়, দাবী, আরোগ্য, বুদ্ধবাণী, বেদান্তদর্শন, বুভুক্ষু মানব, বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, দিনদুপুরে, তীর্থরেণু, দামোদর পরিকল্পনা, মাহেশমঙ্গল, নক্সী কাঁথার মাঠ, শিবরামের সেরা গল্প, শেলী, ফাঁসীর আশীর্বাদ, অদৃশ্য শত্রু, জীবনপ্রভাত, মেসমেরিজম, টাকার বাজার, অপরাধ বিজ্ঞান (৪), অমূল তরু, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, শ্যামলী, শ্রীমদ্ভাগবত, পরিচিতা, মেঘনাদবধ কাব্য, প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১), যোগচতুষ্টয়, বেদান্ত ও সুফীদর্শন, উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ, সোনার তরী, অভিনব ঐতিহাসিক গল্পগুচ্ছ, জীবনের গতি, সরল পৌরবিজ্ঞান, প্রায়শ্চিত্ত, গল্পের ফোয়ারা, অবশ্যম্ভাবী, রুদ্রাক্ষ, যুগ-শংখ, হিপনটিজম, ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি, গীতপঞ্চাশিকা, আনন্দমেলা ও মণিমেলা ১৯৫২, কাব্যে শকুন্তলা, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, রাগ ও রূপ, পুরাণো কথা, বাঙ্গালা নাটক, চলচ্চিত্র (১), পথের পাঁচালী, গীতা ও হিন্দুধর্ম, পুতুলনাচের ইতিকথা, অর্থশাস্ত্রের রূপরেখা, জীবনের বসন্ত, আত্মচরিত, মানিক গ্রন্থাবলী, সরস গল্প, বড়দের হাসিখুসী, নরেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, রবিরশ্মি (২), রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, চিত্রোৎপলা, জীবন ও মরণ, বিংশতি মহামানব, সাগরিকা, একদম বাধকে জানানা, অশোক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠগল্প, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, কাব্যজিজ্ঞাসা, সদগুরুসঙ্গ, উষসী, দুরন্ত দুপুর, পুনর্জন্মবাদ, রমণের আবিষ্কার, পৃথিবীর পথে, আজাদহিন্দ ফৌজ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতাবলী, চলন বিল, কবি সার্বভৌম, মুক্তির উপায়, শিক্ষা ও শিক্ষানীতি, কঠোপনিষদ্ সপ্তসাগর, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ত্রিকাল, মহামানবের জীবনকথা, পূর্ণকুম্ভ, শ্রীঅরবিন্দ, আজাদহিন্দ ফৌজ দিবসে গুলিবর্ষণ, পণ্ডিত রসিকমোহন, গালি ও গল্প, ধারাবাহিক, হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা, যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি, অসমীয়া কথাসাহিত্য, কৃষাণ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (২), রক্তকরবী, ভারত ও যুগসঙ্কট, বিল্বদল, মায়াবতীর পথে, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি, তরুণের স্বপ্ন, মধুরাতি জাগর, রেফারীস চার্ট, কাজল, স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম, নরেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রহাসিনী, বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশ প্রেম, শেষ লেখা, আমার বন্ধু সুভাষ, রিক্সাওয়ালা, হিতোপদেশের গল্প, মুকুন্দদাসের যাত্রা, সাহিত্যের স্বরূপ, বন্দনার বিয়ে, যুগেযুগে, বাংলার রায়ত ও জমিদার, ভারতের রাসায়নিক শিল্প, প্রফুল্ল চাকী, চৈতালি, আরণ্যক, প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন, বহ্নিবলয়, সমাজ ও সংস্কৃতি, তারুণ্য, চিতা-বহ্নিমান, বাংলার জনশিক্ষা, কালান্তর, দূরেক্ষণ, ব্যাধির পরাজয়, উড়িয়া সাহিত্য, বিভক্ত ভারত, সাহিত্য প্রসঙ্গ, দেহ ও দেহাতীত, ছিন্নমস্তার খড়্গ, ধূলিকণা, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, চট্টগ্রামের বিদ্রোহের কাহিনী, বাঙলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা, বঙ্গসাহিত্যে নারী, সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, রুদ্ধকারার দিনগুলি, বিজলীর কীর্তি, বেদ-পরিচয়, বিড়লাবাড়ীর রহস্য, সারিপুত্ত ও মোগ্গাল্লায়ন, প্রশ্নোপনিষৎ, শ্রীশ্রীচণ্ডী, বিরস নাটক, প্রাচীন বাংলার গৌরব, শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়, শুশ্রূষা বিদ্যা (৩), আমাদের খাদ্য, ভারতীয় রাজনীতি ও

ডায়লেকটিক, ধীমতির অার্থনীতি, ডননদীর গতিপথে, আণবিক বোমা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কম্যুনিস্টের জবাব, মা, স্বয়ংসিদ্ধা (২), ব্রহ্মচর্য্য ও ছাত্রজীবন, বাঙ্গালা সাহিত্য (২) শ্লোক, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন, ত্রিস্রোতা, বুভুক্ষু ছুনিয়া, জনান্তিক, ভারতে মাউণ্টব্যাটেন, আমাদের শিক্ষা, মহামানব জাতক, পুণ্যপুথি, অনুশ্রুতি, হাফিজ, গান্ধীজীর রাষ্ট্র পরিকল্পনা, কাণ্টারবারি টেলস, রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস, যারবেদা মন্দির হইতে, যে কথা আজ সবাই ভাবছে, বাপুকী জীবন কহানী, ভারতমাতা, দক্ষিণের বিল, ছায়া মিছিল, শারদোৎসব, লাস্ট অব দি মিহকানস্, ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত, বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, শেষরক্ষা, ছায়া পথিক, শ্রীশ্রীচণ্ডী, মৃত্যুহীন প্রাণ, অরণ্যের ক্ষুধা, যে গল্পের শেষ নেই, দামোদর পরিকল্পনা, কাব্যালোক, দস্যু মোহন, শিশু ভোলানাথ, ফটো শিক্ষা, পথের কড়ি, সারিপুত্ত, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থনীতি, শিল্পভারতের প্রতিরোধ, দূরেক্ষণ, জয় যাত্রার গান, বেদান্ত দর্শন, হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনা, প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ বিদ্যা, অভিব্যক্তি, শিক্ষাপ্রকল্প, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, রঞ্জনদ্রব্য, যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি, উপনিষদ (৩), প্রধূমিত বহ্নি, আমেরিকা, ভারতের পণ্য, নবযুগের রূপকথা, পদার্থের স্বরূপ, হাউই, রূপবতী, আকাশপ্রদীপ, উপনিষদের আলো, সত্যের সন্ধানে, কবি রবীন্দ্র, রবীন্দ্র কাব্য, শরীর পরিচয়, নৃত্য, ঋতুসম্ভার, বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, জপ-সূত্রম (২), বাংলা সাহিত্যের কথা, লরেন্সের গল্প, কংগ্রেস বিপ্লবের পূর্ব্বাভাষ, বর্ষায়, গোর্কির তিনটি গল্প, দিনের পর দিন, মর্ত্ত্যের স্বর্গ, ঝালাপালা, ভবঘুরের বিলাতযাত্রা, মুস্লিম-প্রতিভা, গোধূলি লগ্ন, জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞান ও দর্শন, জাগরী, মহাকাশ, মোহন সিংহের ফাঁসী, আলোর পিপাসা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা (২), বৈষ্ণব পদাবলী, খণ্ডিত ভারত, বিস্মরণী, ভাষা পরিচ্ছেদ, মৈমনসিংহ গীতিকা (১), কমিউনিজ্‌ম ও সোভিয়েট রাশিয়া, চক্রধারী, অপরাধবিজ্ঞান (২), নন্দিতা, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, গোর্কির ছোটগল্প, সুভাষ আলেখ্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বিবেকানন্দ স্মৃতি, কবিগুরু গ্যেটে, আচার্য্য বাণী (১), কথাপ্রসঙ্গ, অলঙ্কার চন্দ্রিকা, স্বরাজ ও গান্ধীবাদ, Hindu Temple II, Kol Tribe, Indian Succession Act, Tissue Remedies, Ain-i-Akbari, Eng. Materials III, Shah Alam, Longmans Misc. 4, The Legends of the Topes, Kama Sutra, Eng. Works of R. M. Roy III 3, 3rd I. S. C. Proceeding, Year Book R. A. S. 1944, Hist. of Mahishadal Raj Estate, I. E. Industries, Folk Art of Bengal, Clinical Methods in Surgery, The Limitation Act, Siva and Buddha, Bombay Pentangular, Russian Vignette, Manures and their application, Price Control, C. U. Calender 1946, Bengal tenancy act III, Recent Banking development, Nehru Your Neighbour, Principles of Philosophy, My Experience in Russia, Inter Physics, Royal Air Force, Poems of Kalidasa, Discovery

of India, Rise of the Sikh power, Old Cal. Cameos, Tall Trees Fall, Rabindranath, A Scholar in Clive Street, Trees of Calcutta, Toilet goods, Secrets of Achivements, What is Philosophy, Sayings of Ramkrishna, New Hist. of Indian People, Naked Nagas, Insurance Act, The Indian Insurance Fadaration, Attitude of Vedanta, The Annual Registrar, Songs of Love and Death, Land of Freedom, Marxism and the National Colonial Question. অবিনাশচন্দ্র সেন, দামোদর পরিকল্পনা, বিক্রমপুর, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, ভারত সন্ধানে নেহরু, বসন্ত, প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি, রবীন্দ্র চিত্রকলা, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, শিক্ষাপ্রকল্প, অভিব্যক্তি, সম্প্রদায়িকতার গ্লানি, দক্ষিণেশ্বর (১), চীনা ইতিহাসের ধারা, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল লীলামাধুরী, সফল, নতুন চীনের নবীন জীবন, ঘরোয়া, জেলে ত্রিশ বছর, বেপরোয়া, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস, কুমির, মাদার রাশিয়া, শ্রীশ্রীনাটক চন্দ্রিকা, ভারতীয় সভ্যতা, স্বরবিতান (২০), হলিউডের আত্মকথা, গাজী সালাহউদ্দীন, ষঠচক্র, রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, ভারতের রাজনৈতিক কার্য্যসূচী, ভারতের বনৌষধি, কবিকঙ্কণচণ্ডী, বাংলা কাব্য সাহিত্যের কথা, ষ্টালিন, কালোরক্ত, আর্ত্তনাদ, প্রকৃতির পরিহাস, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, পাতঞ্জল যোগদর্শন, বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ, শ্রীগীতায় গুরুতত্ত্ব, বাংলার কুটীর শিল্প, সাহিত্যে প্রগতি, অহিংসা ও গান্ধী, বিদ্যুৎতত্ত্ব শিক্ষক, আপনি কী হারাইতেছেন, গান্ধীবাদের পুনর্ব্বিচার, মার্কসবাদ, শ্রীশ্রীবন্ধু লীলাতরঙ্গিণী, দোহাবলী, ঝান্সীর রাণী, বিশ্বামিত্র, সাহিত্য সংগমে, যোগচতুষ্টয়, ভাবী-কাল, শাদা পৃথিবী, রঞ্জন দ্রব্য, মুসলিম সভ্যতায় নারীর দান, দেশমাতৃকা স্তুতি, ছন্দাঞ্জলি, সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা, Calcutta I. S. C., Hinduism, Hindu Ideal of Life, Philosophy of Aurobindo, Printing Ink, Devaluation, Dhammapad, Mahabodhi Soceity. Thakers Directory, Indepedence and After, Gandhi-Nehru, Physical Chemestry, This Europe, Siddhanta Sekhera, Significance of Jataka, Indian War of Independence, Poems of Kalidasa, Eastern Frontier of Br India, Elements of Astronomy, Modern Age of India, Laughs by P G., Satya & Ahimsa, In search of Truth, 50 ways of cooking, Cultural Hist. of Hindus, Basis of Pakistan, Call of the Land, Vivekanda, Asvaghosa, Budhaghosa, Indian Engineering Industries, Gita, Round the World, Hist. & Destiny, Gold in the Future, Cabinet Mission in India, Elements of Hindu Law, Excavations in Mayurbhunj, Modern Shakespeare, Political Thought of Tagore, Agricultural Econ. of Bengal Pt. I, The Murias & Their Ghotal, Gandhism, Rambles in Vedanta, Satyagraha, Vedic Culture, Vedic Selections, Food & Nutrition in India, Calender : Persian Correspondence, Ironies & Sarcasms, Netaji Bose, Bengal in

Agony, Delhi & its Monuments, Path of Realization, Notes of some Wanderings, Daniel Defoe, The Great Sentinal, Eastern Light of Sanatan Culture, Law of Evidence, The Investors Year Book, Developing Village India, Western Influence of Bengali Literature. Central Banking, White Dawns of Awakening,Blue Annals, Indian Philosophy, Masir-I-Alamgiri, Psychic Phenomena, Indian Mercantile Law, Remnisences, Controversy, Tolstoy & Gandhi, Jaina Philosophy, Revolution, Ancient Society, Voice of Silence, Entomology, Evolution of Human, Palitical Science, Religion as a quest for Values, At the Cross Roads,Ashoka and His Inscriptions,Unemployment, Economic Geography, Banking Theory, World Situation, While Waiting for Dawn, Agrarian Question, Inflation in India, Batanagar, World Understanding, Hindu Will, Industrialisation, Tropical Disease, Indian Company Manual, Indian Rly. Act, South Africa, Indias New Constitution, Jute Cultivation, Economic Planning, Burma Facts & Figures, Patents & Designs, Call of the Land, Wooden Age & India, Primary Education in India, Evolution of Human Institutions, Cultural Fellowship of Bengal, Dialectical Materialism, Exploration in Tibet, History & Destiny, Vedanta Philosphy, Rainbow Over Malaya, Political Science, Economic Geography of India, Tie Middle East, Sugar & Gur Industry, Economic Geography of Orissa, Rukmini Haran, Ancient Indian Civilisation, Evolution of the Khalsa.

ঢাকা বেঙ্গলী একাডেমী : সাহিত্য প্রকাশিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, Far India & Islam, চট্টগ্রামের ইতিহাস, বহ্নিবীণা, পরমাণু পরিচিতি। **বিশ্বভারতী :** স্বরবিতান ৫৬, পুথির পরিচয়। **মুহম্মদ শহীদুল্লাহ :** ইকবাল। **ডাঃ কবিতা রায় :** প্রেমানন্দ মহারাজ। **নরেন্দ্রচন্দ্র রায় :** সুন্দরী কাশ্মীর। **এ. সি. দে :** শরতের ফুল। **শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী :** ভক্তিভারতী। **প্রকাশকৃষ্ণ মিত্র :** অভাব ও পরিপূর্ণ, শান্তির পর্ব, বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের একমাত্র প্রণালী। **অমল হোম :** এক দুই তিন।

ষট্‌ষষ্টিতম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের তালিকা

সভাপতি ঃ শ্রীসুশীলকুমার দে—১৯।এ, চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪।

সহকারী সভাপতি ঃ শ্রীঅজিত ঘোষ—৪২, শ্যাম বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪; শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—২৮।৩। বি, সাহানগর রোড, কলিকাতা-২৬; শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—পি. ২৫৬, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯; শ্রীনরেন্দ্র দেব—৭২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯; শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু—৩৭।এ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩; শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহরায়—১৫, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২০; শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—২২৭।২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০; শ্রীসজনীকান্ত দাস—৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭।

সম্পাদক ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পি. ১০, সি. সি. ও. এস.-কলিকাতা-২।

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীকুমারেশ ঘোষ—৪৫।এ, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীপ্রবোধকুমার দাস—৭।১, ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীত্রিদিবনাথ রায়,—১৯।এ, শ্রীনাথ মুখার্জ্জী লেন, কলিকাতা-৩০।

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীপুলিনবিহারী সেন—৫৪।বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯।

পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত—২৬, পীতাম্বর ঘটক লেন, কলিকাতা-২৭।

চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস—৮, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯।

কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ—৫৯, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২।

কাঃ নিঃ সঃ সদস্য ঃ শ্রীঅমল হোম—১৬৯।বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪; শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—১২৮।১২, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬; শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—৩৩।৫।১।সি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯; শ্রীকামিনীকুমার কর রায়—হরিদেবপুর, কলিকাতা-৪১; শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত—৪৫।১।বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬; শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৫০।৮০।সি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪; শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য—৩৫, স্কটস লেন, কলিকাতা-৯; শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০; শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য—৬৬।বি, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪; শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত—৯।ই, যোগোদ্যান লেন, কলিকাতা-১১; শ্রীমনোমোহন ঘোষ—৯২।এ, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪; শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল—৪০।বি, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-১১; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীরজনীকান্ত রায়—৩।এ, হরঠাকুর স্কোয়ার, কলিকাতা-১৪; শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়—১।১।এ, উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬; শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—৪৩, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬; শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়—৩২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা—৭, নন্দলাল বোস লেন, কলিকাতা-৩ ; শ্রীসুশীল রায়—১৩।বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ ; শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৯, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা-২৬।

শাখা-পরিষৎ পক্ষেঃ শ্রীঅতুল্যচরণ দে—পঞ্চাননতলা, নৈহাটী, ২৪ পরগণা ; শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়—পি-৮, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০ ; শ্রীমানিকলাল সিংহ—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ; শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—মোক্ষদা কুটীর, আটগাঁও, গৌহাটী, আসাম।

পৌর-প্রতিষ্ঠান পক্ষেঃ শ্রীকানাইলাল দাস—৫৫।বি, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের নির্ব্বাচিত পরিষদের সাধারণ-সদস্য তালিকা

১। শ্রীরেবা রায়চৌধুরী- ৯।৬।১এ পিয়ারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা, ২। শ্রীসনৎ-কুমার বাগচী- ৩।বি নন্দী স্ট্রীট, কলিকাতা, ৩। শ্রীশান্তনুকুমার ঘোষ- ৮।১০ আলিপুর পার্ক রোড, কলিকাতা, ৪। শ্রীঅমল হালদার— ১৮১।বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, ৫। শ্রীগৌরদেব মুখোপাধ্যায়— পি২৫৭ সি আই.টি. স্কিম ৪৭, কলিকাতা, ৬। শ্রীইন্দিরা গুহ—১৩৩।২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, ৭। শ্রীসুবোধকুমার মালাকার—৫।বি ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা, ৮। শ্রীদীপককুমার পাল—৪২।২ দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, ৯। শ্রীতরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়—৩ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ১০। শ্রীধীরেন রায়—১০।২ নীলরতন মুখার্জী রোড, কলিকাতা, ১১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত- ৪৬ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা, ১২। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৬৫ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, ১৩। শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত- ৮৮ ভূপেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪, ১৪। শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ—৫৫।২এ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৫। শ্রীগীতা গঙ্গোপাধ্যায়—২১।১এ ফার্ণ রোড, কলিকাতা, ১৬। রফিকুল ইসলাম—ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, ১৭। শ্রীরেণু লাহিড়ী—১৪।২।১ হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা, ১৮। শ্রীভোলানাথ ঘোষ—৮ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা, ১৯। শ্রীছায়া সরকার—৩০ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা, ২০। শ্রীরোহিণীচন্দ্র দেব—৩৬।৪।৩ বেনিয়া টোলা লেন, কলিকাতা, ২১। শ্রীকবিতা কুণ্ডু—৭ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, ২২। শ্রীনিতাইচন্দ্র গড়াই—৫০ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা, ২৩। শ্রীমমতাজুর রহমান তরফদার—Dacca University, পূর্ব পাকিস্তান, ২৪। শ্রীভারতী বসু—৫।১ সচ্চাষী পাড়া রোড, কলিকাতা, ২৫। শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায়—১৩২।১এ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা, ২৬। শ্রীমঞ্জু চট্টোপাধ্যায়—২৭।৪ রাজা দীনেন্দ্র

স্ট্রীট, কলিকাতা, ২৭। শ্রীভূপতি মজুমদার—১।৮ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ২৮। শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়—৫৭ গালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা, ২৯। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—জগদ্দল, ২৪ পরগণা, ৩০। শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য—২৪ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিকাতা, ৩১। শ্রীদীপককুমার সেন—দমদম, ২৪ পরগণা, ৩২। শ্রীঅনিলা দাশগুপ্তা—আন্দুল, হাওড়া, ৩৩। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ—৬।২।w১এ উমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা, ৩৪। শ্রীমণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—৩৫।এ মতিঝিল কলোনী, ২৪ পরগণা, ৩৫। শ্রীমনোমোহন দেবনাথ—১৭ স্কট লেন, কলিকাতা, ৩৬। শ্রীগোপীনাথ গিরি—পি ১৪ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা, ৩৭। শ্রীতপতী দেব চৌধুরী—ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, ৩৮। শ্রীঅপর্ণা দত্ত—১৮।এ শাঁখারী টোলা স্ট্রীট, কলিকাতা, ৩৯। শ্রীকণকলতা ঘোষ—পি ৬৩ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ—১২ রতনবাবু রোড, কলিকাতা, ৪১। শ্রীউমা মৈত্র—১০ হরিপদ দত্ত লেন, কলিকাতা, ৪২। শ্রীপ্রণতি সিংহ—৬১ একডালিয়া রোড, কলিকাতা, ৪৩। শ্রীশিশিরকণা পাণ্ডা—১৫৫।৮এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা, ৪৪। শ্রীমিনতি মিত্র—৬০ যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, কলিকাতা, ৪৫। শ্রীঅনুপম সেন—৮০ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪৬। শ্রীজ্যোৎস্না সরকার—৩।এ আণ্টুনি বাগান লেন, কলিকাতা, ৪৭। শ্রীআশা দেবী—২২।এ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪৮। শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—২২।এ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪৯। শ্রীঅঞ্জু পাল—২৫ ট্যাংরা রোড, কলিকাতা, ৫০। শ্রীপ্রসিতকুমার রায়চৌধুরী—রাজপুর, ২৪ পরগণা, ৫১। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—পানিহাটী, ২৪ পরগণা, ৫২। শ্রীশেখর দেব—৩৬।বি সিমলা রোড, কলিকাতা, ৫৩। শ্রীবিজয়কিরণ পাল—২৪৪।সি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, ৫৪। শ্রীঅজয় চট্টোপাধ্যায়—চাকদহ, নদীয়া, ৫৫। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত—১৭২।২২ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ৫৬। শ্রীবাদলচন্দ্র দাস—২৪৩।৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা, ৫৭। শ্রীসুনীলকুমার সরকার—পীরপুর, হাওড়া, ৫৮। শ্রীঅখিলকুমার ঘোষ—৮১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৫৯। শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক—হেতেমপুর, বীরভূম, ৬০। শ্রীসুরঞ্জিতা চক্রবর্তী—২৬।এ নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬১। শ্রীকল্যাণী মুখার্জী—৫৫ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী রোড, কলিকাতা, ৬২। শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য—১০।২ ট্যামার লেন, কলিকাতা, ৬৩। শ্রীবনবিহারী গোস্বামী ২৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, ৬৪। শ্রীঅমলকৃষ্ণ সাহা—১১৪।২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬৫। শ্রীমঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ৪৫।সি মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা, ৬৬। শ্রীপ্রদীপকুমার কুণ্ডু—৭ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬৭। শ্রীসুধেন্দুশেখর সরকার—১০৫ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬৮। শ্রীজয়কৃষ্ণ লস্কর—৩২ চণ্ডী বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬৯। শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়—২২ অন্নদা ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা, ৭০। শ্রীনির্মল সরকার—৫৩ চাউলপট্টি রোড, কলিকাতা, ৭১। শ্রীব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী—৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা, ৭২। শ্রীবীণা চক্রবর্তী—১১৪।বি হাজরা রোড, কলিকাতা, ৭৩। শ্রীপ্রভঞ্জনকুমার রায়চৌধুরী—২।এ ডাক লেন, কলিকাতা-৬, ৭৪। শ্রীনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়—

১৩২।১এ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৫। শ্রীঅরূপকুমার চট্টোপাধ্যায়—শ্যামপুর, বজবজ, ২৪ পরগণা, ৭৬। শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২ ৭৭। শ্রীআইভি রাহা—৬৭।১ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৮। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—২৭ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৯। শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য—৮৭বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮০। শ্রীবীণা মৈত্র—৬৪।এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৬, ৮১। মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ—২ কড়েয়া রোড, কলিকাতা, ৮২। শ্রীতারককুমার মল্লিক—২৮।৫ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮৩। শ্রীসুনীলরঞ্জন দাশগুপ্ত—৪ নস্করপাড়া লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া, ৮৪। শ্রীপ্রতিভাকণা বসু—৯৫ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫, ৮৫। শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫।১ স্কট লেন, কলিকাতা, ৮৬। শ্রীভবাণীচরণ দাস—লালা বাগান, চন্দননগর, ৮৭। শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিক—৭৮ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯, ৮৮। শ্রীগীতা মিত্র—২৬।৩ই সিমলা রোড, কলিকাতা, ৮৯। শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিক—৭ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৬, ৯০। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দেব—৩৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, ৯১। শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—২২ রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭, ৯২। শ্রীপরীক্ষিৎচন্দ্র সাধুখাঁ—১০ নিয়োদবিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা-৬, ৯৩। শ্রীসুনীলকুমার দত্ত—২৭।৪ জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, কলিকাতা, ৯৪। শ্রীঅরুণা রায়—সরস্বতী সদন, বি. এস. দাস রোড, পাটনা-৪, ৯৫। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১৯ গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ রোড, বাঁকুড়া, ৯৬। শ্রীকেদারনাথ সোম—৩বি গোরাচাঁদ বসু রোড, কলিকাতা, ৯৭। শ্রীঅরুণকুমার মিত্র—৩৩।১।এ বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩, ৯৮। শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—৮০।৮বি গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৯৯। শ্রীদীপালি সেন—২৮ সুধীর চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১০০। শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ—১৫৩।৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা, ১০১। শ্রীআশীষ সেনগুপ্ত—ডি ২৬ সি. আই. টি. বিল্ডিং কলিকাতা-৭, ১০২। শ্রীসরোজনাথ মিত্র—শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া, ২৪ পরগণা, ১০৩। শ্রীকমল সেনগুপ্ত—শান্তিনগর, রহড়া, ২৪ পরগণা, ১০৪। শ্রীস্বাতী ঘোষ—৮।১ কাশীঘোষ লেন, কলিকাতা, ১০৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়—১৯১ বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ১০৬। শ্রীবাসুদেব পাল—সখের বাজার, ভদ্রকালী, হুগলী, ১০৭। শ্রীসরোজকুমার দত্ত—৩।১ রামকৃষ্ণ দাস লেন, কলিকাতা-৯, ১০৮। শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায়—১৩২।১এ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা, ১০৯। শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী—৭৪সি শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ১১০। শ্রীগোপেশ শ্রীমানী— ১৫ মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১১১। শ্রীলিলি সেন—৬।৩৬ রাণী রাসমণি গার্ডেন লেন, কলিকাতা-১৫ ১১২। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ধর—বি ২০ সি আই. টি. বিল্ডিং, কলিকাতা-৭ ১১৩। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—২৫ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬, ১১৪। শ্রীসমর ঘোষ—৪৭ডি গড়পার রোড, কলিকাতা-৯, ১১৫। শ্রীকেদার-নাথ মাইতি—আর ৫০৬।এ দমদম এয়ারপোর্ট, কলিকাতা-২৮, ১১৬। শ্রীস্বামী সচ্চিদানন্দ—ভট্টনগর, হাওড়া, ১১৭। শ্রীপ্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত—৬ডি রাজা অপূর্বকৃষ্ণ লেন,

কলিকাতা-২৮, ১১৮। শ্রীকৃষ্ণলাল চক্রবর্তী—১৯ গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৩, ১১৯। শ্রীপ্রতিমা প্রামাণিক—২৭৭ মহারাজা নন্দকুমার রোড নর্থ, কলিকাতা, ১২০। শ্রীচণ্ডীকুমার চট্টোপাধ্যায়—৩২বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২১। শ্রীউষা নাগ—২৫ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২২। শ্রীজয়শ্রী ঘোষ—১১৮।এফ নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা-১১, ১২৩। শ্রীসুনীলকুমার রায়—পি ৬৩বি· রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২৪। শ্রীসুকেশচন্দ্র মৌলিক—পি ৬৫ টালা পার্ক, কলিকাতা-২, ১২৫। শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—পি ৬৫ টালা পার্ক, কলিকাতা-২, ১২৬। শ্রীঅরুণ ঘোষ—৭ রসিকলাল ঘোষ লেন, কলিকাতা, ১২৭। শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য—৪৮ বি কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২৮। শ্রীসনৎকুমার ভট্টাচার্য—৪৮ বি কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২৯। শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়—১৩।এ বৃন্দাবন মল্লিক প্রথম গলি, কলিকাতা-৯, ১৩০। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪ রুস্তমজী পার্শী রোড, কলিকাতা-২, ১৩১। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী ৪।১ কুমারটুলী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩১। শ্রীকৃষ্ণা মৌলিক—৪।৪এ যোগেন্দ্র বসাক রোড, বরাহনগর, ১৩২। শ্রীঅঞ্জলী ঘোষ—২২ গোপীনাথ সাহা স্ট্রীট, হুগলী, ১৩৩। শ্রীমানিকলাল নাথ—৮ডি রতন নিয়োগী লেন, কলিকাতা, ১৩৪। শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী—৫৩।এ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫। শ্রীকমলা দাশ—৭।সি কারবলা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ১৩৬। শ্রীযোগানন্দ দাস—৫৭।১।১এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ১৩৭। শ্রীভবানীপ্রসাদ চন্দ—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা, ১৩৮। শ্রীবীথিকা ঘোষ—৩১বি বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৯। শ্রীআরতি চক্রবর্তী—৫৮।এ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৪০। শ্রীদীপালি আচার্য—৬৮ মুর্গিমহল, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, ১৪১। শ্রীইলা বন্দ্যোপাধ্যায়—৫২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৪২। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ ঘোষ—১নং তেলীপাড়া লেন, কলিকাতা-৪, ১৪৩। শ্রীঝর্ণা তরফদার—১৭৬ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা, ১৪৪। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন—পি ৮৬ ব্যাঙ্ক কলোনী, কলিকাতা, ১৪৫। শ্রীকুমুদবন্ধু দেবনাথ—৯।২।১।এ প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬, ১৪৬। শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮।২ বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া, ১৪৭। শ্রীউষা সেন—৫৭।১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৪৮। শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—৩৬ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ১৪৯। শ্রীবিমলহরি দাস—৪২ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলিকাতা-১০, ১৫০। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়—১৬১।৮ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা, ১৫১। শ্রীজ্যোৎস্না ঘোষ—১৫ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা, ১৫২। শ্রীজীবনরঞ্জন দে—৮।১ গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪, ১৫৩। শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ—১৬৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১৫৪। শ্রীস্বর্ণকমল রায়চৌধুরী—২বি নর্থ রেঞ্জ, কলিকাতা-১৭, ১৫৫। শ্রীগীতা চৌধুরী—৩৮।৩৫ এস. কে. দে রোড, কলিকাতা-২৮, ১৫৬। শ্রীচম্পা দাশগুপ্ত—নিমতা, জনকল্যাণ, ২৪ পরগণা, ১৫৭। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৯ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া, ১৫৮। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়—১২৩।১।১

আচায প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা, ১৫৯। শ্রীমিহির বসু—৮৩ বাবুরাম ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০ ১৬০। শ্রীবীণা পালিত—১১৪ রিজেণ্ট এস্টেট, টালিগঞ্জ, ১৬১। শ্রীকমল সরকার—৫২।১৫ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা, ১৬২। শ্রীশিবনাথ রায়—ই।১৮ সি. আই.টি. বিল্ডিং, মদন চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৭, ১৬৩। শ্রীবৈদ্যনাথ শীল—টাকী গভর্নমেণ্ট কলেজ, ২৪ পরগণা, ১৬৪। শ্রীপুষ্প কর—৫ইসমাইল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৪, ১৬৫। শ্রীগৌর সরকার—৯।৩ অমৃতলাল বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৬৬। শ্রীঅরুণা বাগচী—৪, রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৬৭। শ্রীঅজয়কুমার বসু—১৬।বি ডালিমতলা লেন, কলিকাতা, ১৬৮। শ্রীবীরেন নাগ—৩৩।বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৬৯। শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী—৩১ হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা, ১৭০। শ্রীঝরণা সেন—কাঁচড়াপাড়া টি. বি. হাসপাতাল, ২৪ পরগণা, ১৭১। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কর্মকার—পোলের হাট, ২৪ পরগণা, ১৭২। শ্রীবিকাশরঞ্জন দে—২৪৯।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, ১৭৩। শ্রীসোমেন্দ্র-মোহন কর—১৯ যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা, ১৭৪। শ্রীনীলিমা দত্ত—১৭ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৭৫। শ্রীবাণী হালদার—২৬।১ শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৭৬। শ্রীশচী ঘোষ—১৭।১ নীরদবিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা, ১৭৭। শ্রীবহ্নিকুমারী দেবী—২০।১।এন বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলিকাতা, ১৭৮। শ্রীঅরবিন্দ গুহ—পি ৪৬ দক্ষিণ বেহালা রোড, কলিকাতা, ১৭৯। শ্রীভক্তি ঘোষ—৫ হাজী জ্যাকেরিয়া লেন, কলিকাতা, ১৮০। শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য—শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ১৮১। শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক—বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৮২। শ্রীপ্রমথচন্দ্র দত্ত—All India Radio, Calcutta, ১৮৩। শ্রীসলিল গঙ্গোপাধ্যায়—৭৫ পাঠকপাড়া রোড, কলিকাতা, ১৮৪। শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র—৫৬।১এ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা, ১৮৫। শ্রীরবীন্দ্র গুপ্ত—২৩ বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৮৬। শ্রীগৌরলাল দত্ত—৩৩।২ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৮৭। শ্রীজ্যোৎস্না মিত্র—২৪।বি কুমারটুলি স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৮৮। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—বারাসত ২৪ পরগণা, ১৮৯। শ্রীমোহনলাল মিত্র—৭৫।বি মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা, ১৯০। শ্রীকৃষ্ণা দেবী—২৮।৩, মহেন্দ্র শ্রীমাণী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯১। শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্র—২২।৩ এল শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, কলিকাতা।